বাংলায় নারী শিক্ষার প্রসারে ব্যক্তি ও বেসরকারি উদ্যোগ (১৮৪৯-১৯৪৭)

[Individual and Non-Governmental Initiatives for the Promotion of Female Education in Bengal (1849-1947)]

গবেষক

আলো আরজুমান বানু

সহকারী অধ্যাপক

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি

ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুল এন্ড কলেজ

আইইআর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়ক

প্রফেসর ড. নাজমা বেগম

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ.ডি. ডিগ্রির জন্য প্রস্তুতকৃত অভিসন্দর্ভ

নভেম্বর-২০২৩

বাংলায় নারী শিক্ষা প্রসারে ব্যক্তি ও বেসরকারি উদ্যোগ (১৮৪৯-১৯৪৭)

[Individual and Non-Governmental Initiatives for the Promotion of Female Education in Bengal (1849-1947)]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ.ডি. ডিগ্রির জন্য প্রস্তুতকৃত অভিসন্দর্ভ

গবেষক

আলো আরজুমান বানু
সহকারী অধ্যাপক
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি
ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুল এন্ড কলেজ
আইইআর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
রেজিঃ ১৬৯ (পুনঃ), শিক্ষাবর্ষ ২০১৭-২০১৮

তত্ত্বাবধায়ক

প্রফেসর ড. নাজমা বেগম
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
নভেম্বর ২০২৩

ঘোষণা পত্র

এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, **বাংলায় নারী শিক্ষার প্রসারে ব্যক্তি ও বেসরকারি উদ্যোগ (১৮৪৯-১৯৪৭)** [Individual and Non-Governmental Initiatives for the Promotion of Female Education in Bengal (1849-1947)] শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচ.ডি. ডিগ্রি লাভের নিমিত্তে আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক প্রফেসর ড. নাজমা খান-এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে আমি প্রণয়ন করেছি। এটি সম্পূর্ণরূপে আমার নিজস্ব, একক ও মৌলিক গবেষণালব্ধ রচনা। আমি এই অভিসন্দর্ভটি পিএইচ.ডি. ডিগ্রির জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থাপন করছি। ইতোপূর্বে অভিসন্দর্ভটির সম্পূর্ণ বা এর অংশবিশেষ অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোনো প্রকার ডিগ্রি বা প্রকাশের জন্য উপস্থাপন করা হয়নি। আমার জানা মতে, আলোচ্য শিরোনামে ইতোপূর্বে অন্য কোথাও পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভ রচিত হয়নি।

(আলো আরজুমান বানু)
পিএইচ.ডি. গবেষক
রেজি: ১২, শিক্ষাবর্ষ ২০১৩-২০১৪
রেজি: ১৬৯ (পুনঃ), শিক্ষাবর্ষ ২০১৭-২০১৮
ও
সহকারী অধ্যাপক
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি
ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুল এন্ড কলেজ
আইইআর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রত্যয়ন পত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের পিএইচ.ডি. গবেষক জনাব আলো আরজুমান বানু কর্তৃক পিএইচ.ডি. ডিগ্রির জন্য **বাংলায় নারী শিক্ষার প্রসারে ব্যক্তি ও বেসরকারি উদ্যোগ (১৮৪৯-১৯৪৭)** [Individual and Non-Governmental Initiatives for the Promotion of Female Education in Bengal (1849-1947)] শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় রচিত হয়েছে। এই অভিসন্দর্ভের পাণ্ডুলিপি আমি সম্পূর্ণ পড়েছি। আমার বিবেচনায় এটি একটি মৌলিক গবেষণাকর্ম। এতে ব্যবহৃত তথ্য উৎসসমূহ নির্ভরযোগ্য। আমার জানা মতে, গবেষক তার উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভের সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোনো প্রকার ডিগ্রি লাভ বা প্রকাশের জন্য উপস্থাপন করেননি।

পিএইচ.ডি. ডিগ্রি লাভের উদ্দেশ্যে এই অভিসন্দর্ভটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে জমাদানের জন্য গবেষক জনাব আলো আরজুমান বানুকে অনুমতি প্রদান করা হলো।

(প্রফেসর ড. নাজমা বেগম)
গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক

সূচিপত্র

পৃষ্ঠা নম্বর

প্রসঙ্গ কথা iii-v

ভূমিকা ১-১৭

প্রথম অধ্যায়
উনিশ শতকে বাংলায় নবজাগরণ ও নারীসমাজ ১৮-৪৬

দ্বিতীয় অধ্যায়
বাংলায় নারীশিক্ষা: ঐতিহাসিক পটভূমি ৪৭-৭১

তৃতীয় অধ্যায়
উনিশ শতকের সংবাদ-সামায়িক পত্র ও সাহিত্যে নারীশিক্ষা প্রসঙ্গ ৭২-১০৮

চতুর্থ অধ্যায়
বাংলায় নারীশিক্ষা প্রসারে ব্যক্তি ও বেসরকারি সাংগঠনিক প্রয়াস (১৮৪৯-১৯০৫ খ্রি.) ১০৯-১৫৪

পঞ্চম অধ্যায়
উনিশ শতকে বাঙালি মুসলিম সমাজে নারীশিক্ষা প্রসারে বেসরকারি প্রয়াস: গতি-প্রকৃতি অনুসন্ধান ১৫৫-১৭৮

ষষ্ঠ অধ্যায়
বাংলায় মুসলিম নারীশিক্ষার প্রসারে ব্যক্তি ও বেসরকারি প্রচেষ্টা: মধ্য বিশ শতক পর্যন্ত ১৭৯-২৩৬

সপ্তম অধ্যায়
বাংলায় নারীশিক্ষা প্রসারে অমুসলিম ব্যক্তি ও সাংগঠনিক প্রয়াস (১৯০৫-১৯৪৭ খ্রি.) ২৩৭-২৮১

উপসংহার ২৮২-২৯৩

পরিশিষ্ট ২৯৪-৩১৮

গ্রন্থপঞ্জি ৩১৯-৩৩৩

প্রসঙ্গ কথা

বাংলায় নারী শিক্ষার প্রসারে ব্যক্তি ও বেসরকারি উদ্যোগ (১৮৪৯-১৯৪৭) [Individual and Non-Governmental Initiatives for the Promotion of Female Education in Bengal (1849-1947)] **শীর্ষক** অভিসন্দর্ভটি আমার পিএইচ.ডি. গবেষণার ফসল। আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের আমার শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষক অধ্যাপক ড. নাজমা বেগম-এর তত্ত্বাবধানে আমি উপর্যুক্ত শিরোনামে গবেষণা অভিসন্দর্ভটি রচনা করি। এর আগে আমি ২০০২ সালে একই বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ইব্রাহিম এর তত্ত্বাবধানে "মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ (১৮৬১-১৯০৭): তাঁর ইসলাম সেবা ও সমাজ চিন্তা" শিরানোমে গবেষণা অভিসন্দর্ভ রচনা করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.ফিল. ডিগ্রি অর্জন করি। আমার এম.ফিল. গবেষণা অভিসন্দর্ভটি পরিমার্জিতরূপে ২০১৮ সালে *মুন্সী মহম্মদ মেহেরউল্লা: ধর্মসেবা সমাজচিন্তা ও সাহিত্য সাধনা* শিরোনামে গ্রন্থকারে প্রকাশিত হয়েছে। ইতোমধ্যে অনেক দিন অতিক্রম হয়ে যায়। পেশাগত এবং পারিবারিক জীবনের নানা ব্যস্ততার কারণে একান্ত ইচ্ছা সত্ত্বেও পিএইচ.ডি. গবেষণা কাজ শুরু করা সম্ভব হয়নি। নিজের একান্ত আগ্রহ এবং প্রিয়জনদের উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায় শেষ পর্যন্ত পিএইচ.ডি. গবেষণার ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করি এবং ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপক ড. নাজমা বেগম (নাজমা খান মজলিস নামে সমধিক পরিচিত) শরণাপন্ন হই। তিনি উৎসাহের সঙ্গে পিএইচ.ডি. গবেষণায় আমার তত্ত্বাবধায়ক হতে সম্মত হন। গবেষণার বিষয়বস্তু নির্বাচন থেকে শুরু করে অভিসন্দর্ভের কাঠামো বিন্যাস, তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ এবং বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে তাঁর সুচিন্তিত মতামত, বিশেষজ্ঞ পরামর্শ ও জ্ঞানগর্ভ দিক-নির্দেশনা আমার গবেষণা কাজকে বোধগম্য করতে বিশেষভাবে সহায়ক হয়েছে। তাঁর পরামর্শ আমার অভিসন্দর্ভ রচনাকেও সহজতর করেছে। অধ্যাপক ড. নাজমা বেগম তাঁর সীমাহীন ব্যস্ততা সত্ত্বেও আমার গবেষণাকর্মের প্রতিটি অধ্যায়ের ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধন ও পরিমার্জনের মাধ্যমে গবেষণাটি সম্পাদনে যে অবদান রেখেছেন, তা ছিল আমার জন্য অনেক বড় প্রাপ্তি। বস্তুত আমার নিজের অক্ষমতা ও সীমাবদ্ধতাকে তিনি উদারভাবে প্রশ্রয় দিয়েছেন। সর্বোপরি তাঁর অকৃত্রিম অনুপ্রেরণা ও উপর্যুপরি তাগিদের ফলেই আমার গবেষণা কর্মের সমাপ্তি ও অভিসন্দর্ভ রচনা সম্ভব হয়েছে। ব্যক্তিগতভাবে তো বটেই, গবেষক হিসেবে আমি তাঁর কাছে চির কৃতজ্ঞ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ. ডি. গবেষণার নীতিমালার শর্তপূরণের জন্য আমাকে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে "উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলায় নারী শিক্ষা বিস্তারে মিশনারী উদ্যোগ: একটি পর্যালোচনা" এবং "ব্রাহ্মসমাজ ও উনিশ শতকে বাংলায় নারী শিক্ষা" শিরোনামে দুটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করতে হয়েছে। প্রবন্ধ দুটি

উপস্থাপনের অনুমতি দিয়ে সহযোগিতা করেছেন বিভাগের দুজন চেয়ারম্যান যথাক্রমে অধ্যাপক মোঃ মাহফুজুল ইসলাম এবং অধ্যাপক ড. মোঃ আতাউর রহমান মিয়াজী। উপস্থাপিত এ দুটি প্রবন্ধের ওপর প্রাসঙ্গিক মন্তব্য ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ পেয়েছি আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অধ্যাপক ড. মো: আখতারুজ্জামান, অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ইব্রাহিম, অধ্যাপক ড. আয়শা বেগম, অধ্যাপক ড. মো: মোশাররফ হোসেন ভূইয়া, অধ্যাপক মো: আতাউর রহমান বিশ্বাস ছাড়াও অধ্যাপক ড. এ কে এম গোলাম রব্বানী, অধ্যাপক ড. আবদুল বাছির, অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ হুমায়ূন কবির, অধ্যাপক ড. নুসরাত ফাতেমা, অধ্যাপক ড. মো: নুরুল আমিন, অধ্যাপক ড. আবুল কালাম আজাদ, অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ, অধ্যাপক ড. এ টি এম সামছুজ্জোহা, অধ্যাপক সুরাইয়া আক্তার, জনাব এ কে এম ইফতেখারুল ইসলাম ও জনাব মাহমুদুর রহমানসহ বিভাগীয় শিক্ষকবৃন্দের কাছ থেকে। এই সুযোগে আমি তাদের সকলের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

আমার গবেষণাকর্মকে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে পরামর্শ ও তথ্য-উপাত্ত দিয়ে যারা সহযোগিতা করেছেন, তাঁরা হলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের জনাব এম এ কাউসার, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ড. এমরান জাহান, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের ড. আনোয়ারা আক্তার ও ড. কামাল হোসেন। আমার বন্ধুরা এবং কর্মক্ষেত্র ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুল এন্ড কলেজের সহকর্মীগণ গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করার ব্যাপারে নিরন্তর উৎসাহ দিয়েছেন, নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন, তাদের সকলের প্রতি আমার শুভ কামনা রইলো।

সুষ্ঠুভাবে গবেষণা সম্পাদনে ব্যক্তিগত সংগ্রহ ছাড়াও আমাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি, জাতীয় গণগ্রন্থাগার, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি লাইব্রেরি, বাংলা একাডেমি লাইব্রেরি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ স্মৃতি পাঠাগার, বাংলাদেশ আর্কইভস, জাতীয় গ্রন্থাগার, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সেমিনার লাইব্রেরি, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ লাইব্রেরি, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। গবেষণার প্রয়োজনে বাংলাদেশের বাইরে কলকাতা ন্যাশনাল লাইব্রেরি, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরি, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাগার, কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটি গ্রন্থাগার, বেথুন কলেজ লাইব্রেরি, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ লাইব্রেরি এবং বিদ্যাসাগর কলেজ লাইব্রেরি ইত্যাদি থেকেও তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করতে হয়েছে। দেশের এবং দেশের বাইরে উপর্যুক্ত গ্রন্থাগার ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমাকে সহযোগিতা দিয়ে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন গ্রন্থাগারসমূহের সংশিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ। আমি তাদেরকে কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি। প্রসঙ্গত ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রিন্সিপাল এডমেনিস্ট্রেটিভ অফিসার জনাব মোঃ ছরোয়ার হোসেন এবং সহকারী গ্রন্থাগারিক মিসেস সাজেদা সুলতানাসহ অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে তাদের সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ

জানাচ্ছি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পিএইচ.ডি. শাখার ডেপুটি রেজিস্ট্রার জনাব মোঃ আব্বাছ আলী এবং সহকারী রেজিস্ট্রার জনাব মোজাম্মেল হক লিটনকে আন্তরিক সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

পারিবারিক সহযোগিতা ও উৎসাহ ছাড়া একটি গবেষণা কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন অসম্ভব। এক্ষেত্রে আমি অনেক সৌভাগ্যবান। আমার বাবা অবসরপ্রাপ্ত ব্যাংকার জনাব মোহাম্মদ আলী এবং মা মাহমুদা মমতাজ রহমানী আমার সকল কাজের সতত প্রেরণার উৎস। এক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম নয়। তাঁদের উৎসাহ ও শুভ কামনা আমাকে শত প্রতিকূলতার মধ্যেও গবেষণা কাজটি সম্পন্ন করতে সাহস ও শক্তি যুগিয়েছে। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেই তাঁদের ঋণ শোধ করার নয়। আমি তাঁদের দীর্ঘ জীবন কামনা করছি। পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের জন্যও রইলো শুভ কামনা।

আমার সকল কাজের শক্তি ও সাহসের উৎস পুত্র কে এম সামিন ইয়াসার এবং কন্যা সাগুফতা শেহরীণ খান। পেশাগত কাজের পাশাপাশি গবেষণা কাজে ব্যস্ততার জন্য তাঁদের প্রাপ্য সময় থেকে তারা বঞ্চিত হলেও হাসি মুখেই তা মেনে নিয়েছে। কেবল তাই নয়, কাজটি যেন দ্রুত শেষ করতে পারি সে জন্য নিরন্তর উৎসাহ যুগিয়েছে। তাদের এ অবদানের কথা কোন ভাষায় স্বীকার করবো জানা নেই। তাদের জন্য কেবলই অন্তরের গভীর থেকে দোয়া ও অফুরান ভালোবাসা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান। ব্যক্তি জীবনে আমরা জীবনসঙ্গী, জীবন চলার পথের সহযাত্রী। তাঁর অকৃত্রিম উৎসাহ, অনুপ্রেরণা এবং গবেষণা কাজের প্রতিটি পর্যায়ে তাঁর আন্তরিক সহযোগিতা, প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও দিক-নির্দেশনায় আমি শেষ পর্যন্ত অভিসন্দর্ভটি সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছি। ধন্যবাদ জানিয়ে বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তাঁর অবদানের ঋণ স্বীকারকে প্রথাবদ্ধ করতে চাই না। তাঁর জন্য কেবলই নিরন্তর শুভ কামনা।

অলো আরজুমান বানু
ঢাকা, ২৬ নভেম্বর ২০২৩

শব্দ-সংক্ষেপণ

ইং : ইংরেজি

বাং : বাংলা

খ্রি. : খ্রিস্টাব্দ

ড. : ডক্টর

খ. : খণ্ড

পৃ. : পৃষ্ঠা

তা. বি. : তারিখ নেই

অনু. : অনুবাদ

p. : Page

Ibid : the abbreviation for “Ibidem”, meaning in the same place/ from the same source

op.cit : is an abbreviation of the Latin phrase *opere citato*, meaning “in the work cited.”

Ed. : Edited/ Editor

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলা অনুষদের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধীনে পিএইচ. ডি. ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভের

সার-সংক্ষেপ

গবেষণার শিরোনাম: বাংলায় নারী শিক্ষার প্রসারে ব্যক্তি ও বেসরকারি উদ্যোগ (১৮৪৯-১৯৪৭) [Individual and Non-Governmental Initiatives for the Promotion of Female Education in Bengal (1849-1947)]

মানব সভ্যতা বিনির্মাণ ও অগ্রগতিতে পুরুষের পাশাপাশি নারী জাতির ঐতিহাসিক ভূমিকা সুবিদিত। এজন্যই কবি কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে "বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি, চির কল্যাণকর অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।" কবির এ উক্তিতে নারী জাতির ঐতিহাসিক ও বাস্তব ভূমিকার স্বীকৃতি আছে সত্য, তবে পুরুষশাসিত সমাজ কী সবসময় নারীর কৃতি-কর্মের স্বীকৃতি দিয়েছে? সভ্যতার ঊষালগ্নে নারী-পুরুষের মধ্যে বৈষম্যমুক্ত সক্ষমতা সম্পর্কের পরিবেশ বিরাজমান ছিল বলে সমাজতত্ত্ববিদগণ মনে করেন। কিন্তু পরবর্তীতে নানামুখী সামাজিক বিরূপ পরিস্থিতিতে অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। সম্পদ ও সম্পত্তিতে ব্যক্তি মালিকানার চিন্তা, পতিত্ব ও পিতৃপরিচয় নির্ভর পারিবারিক ধারার বিকাশের প্রেক্ষাপটে নারী ও পুরুষের মধ্যে সাম্যের সম্পর্ক ক্রমশ শিথিল হতে থাকে এবং নারী পুরুষের সম্পর্কে বৈষম্যমূলক অবস্থা শক্ত ভিত্তি লাভ করে। পরবর্তী সময়ে জ্ঞাতি সম্পর্ক, সমাজ-সংস্কৃতি, ধর্ম, ও রাষ্ট্রশক্তি অসম সম্পর্ককে শুধু লালন করেনি, বরং নারীর উপর পুরুষের শাসন ও শ্রেষ্ঠত্বকে স্বীকৃতি দেয়। এমনকি কালের পরিক্রমায় নারীর উপর পুরুষের নির্যাতন ও অত্যাচার সমাজের চোখে অনেকটাই স্বাভাবিক এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে শাস্ত্রসিদ্ধ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। পৃথিবীর অনেক দেশে, এমনকি ভারতবর্ষেও দীর্ঘদিন এ ধারণা প্রতিষ্ঠিত থাকে যে, সর্বগুণে গুণান্বিত নারীও একজন অধম পুরুষের চাইতে হীন। এরূপ সমাজ বাস্তবতায় নারী জাতি কেবল ভোগ্য ও সন্তান উৎপাদকে পরিণত হয়। আলোচ্য বাংলা অঞ্চলেও দীর্ঘকাল ধরে নারীসমাজ এরূপ অধঃপতিত অবস্থার মধ্যে নিপতিত ছিল। কিন্তু কালক্রমে অবস্থার পরিবর্তন ঘটতে থাকে। বাংলায় মুসলিম শাসনামলে নারী তাঁর মানবিক অধিকার লাভ করে। তবে এ সময় নারীসমাজ মানবিক পরিচয় লাভ করলেও সাধারণভাবে সমাজ বা রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে তো নয়ই, এমনকি পারিবারিক জীবনেও নারী তাঁর যথাযথ অবস্থান তৈরি করতে পারেনি। শিক্ষার মতো অত্যাবশকীয় মৌলিক অধিকার থেকেও নারীসমাজকে বঞ্চিত রাখা হয় সচেতনভাবেই।

ভারতীয় সমাজে নারীকে সবসময়ই পুরুষের আজ্ঞাধীন হিসেবে দেখা হতো। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১ খ্রি.) তাঁর *বহু বিবাহ* নামক রচনায় উল্লেখ করেছেন "ভারতবর্ষে স্ত্রীজাতির প্রতি পুরুষজাতি যেরূপ নৃশংসতা, স্বার্থপরতা, অবিমৃশ্যকারিতা প্রদর্শন করে, তা তুলনাহীন।" নারীদের সম্পর্কে পুরুষদের ভাবনা ছিল

স্ত্রীজাতি অপেক্ষাকৃত দুর্বল ও সামাজিক নিয়ম দোষে পুরুষ জাতির নিতান্ত অধীন। কিছু ব্যতিক্রম হয়তো ছিল, তবে উনিশ শতকে এসেও দেখা যায় যে, সাধারণভাবে ভারতীয় তথা বাঙালি সমাজে পুরুষদের চোখে নারীরা ছিল গৃহকর্মে উপযুক্ত ক্রীতদাসী তুল্য। এমনকি মেয়েদের মানসিক শক্তি সম্পর্কেও পুরুষদের প্রবল অবজ্ঞার মনোভাব ছিল। এরূপ বাস্তবতায় এদেশে নারীশিক্ষার যে বিশেষ প্রচলন ছিল না, এ কথা বলা বাহুল্য। আঠোরো শতকের শেষার্ধে এসে দেখা যায় যে, বাংলায় উচ্চবর্গের কতিপয় নারী প্রথাগত শিক্ষা লাভ করলেও সামগ্রিক সমাজ ব্যবস্থার উপর তার কোনো প্রভাব পড়েনি। অশিক্ষা এবং কুশিক্ষাই ছিল সাধারণভাবে বাঙালি নারীজাতির বিধিলিপি। ১৮৩৫ ও ১৮৩৮ সালে প্রকাশিত উইলিয়াম এডামসের (William Adams) প্রণীত বাংলার শিক্ষা সংক্রান্ত প্রতিবেদনেও এ সত্য প্রতিভাত হয়েছে।[১] বস্তুত এ সময়কার শিক্ষিত বাঙালি নারীদের দৃষ্টান্ত দিতে গেলে লীলাবতী, ভানুমতি, কর্ণট রাজার স্ত্রী, কালিদাসের পত্নী, মৈত্রেয় দেবী, রাণী ভবানী ও হটি বিদ্যালঙ্কার প্রমুখের নামোল্লেখের মধ্যেই থেমে যেতে হয়। আর এ থেকেই বাংলার নারীশিক্ষার দুর্গতি সম্পর্কে ধারণা করা যায়।

বাংলায় নারীশিক্ষার অধোগতির পেছনে বহুদিনের কুসংস্কার অন্যতম কারণ ছিল বলা যায়। লেখাপড়া শিখলে মেয়েরা বিধবা, অসতী এবং অহঙ্কারবশে স্বামী ও গুরুজনদের অবাধ্য হয়, মেয়েরা কালির আঁচড় দিলে গৃহে অলক্ষ্মী প্রবেশ করে এবং ইংরেজি শিখলে উচ্ছৃংখল হবে ইত্যাদি বিশ্বাস ও আশঙ্কা নারীশিক্ষার অন্তরায় হিসেবে কাজ করে। এমনকি নারীশিক্ষাকে শাস্ত্রবিরোধী বলেও মনে করা হতো। এসব কারণে অশিক্ষিত সাধারণ লোকেরা কথা দুরে থাক, সেকালের সমাজের প্রধান প্রধান শিক্ষিত ও নেতৃস্থানীয় লোকেরা পর্যন্ত নারীশিক্ষাকে স্বাগত জানাতে পারেননি।

আঠারো শতককে বলা হয় ইউরোপের 'আলোকিত যুগ'। তবে এ সময়েও নারী সমাজের সামগ্রিক অবস্থার উন্নতি ঘটেনি। এ সময়ে ইউরোপীয় সমাজ জীবনে যুক্তি ও বিজ্ঞান মনস্কতা প্রাধান্য পেলেও পুরুষ ও যাজকতন্ত্রের প্রাবল্যের কারণে নারী জাতি তার যোগ্য মর্যাদা পায়নি। সমকালীন ইউরোপের বাস্তবতা যখন এমন, তখন আমাদের বঙ্গ-ভারতের কথা সহজেই অনুমেয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, আঠারো শতকে ইউরোপে যখন আলোক-যুগের সূচনা ঘটে, তখনকার সময়টি ছিল বাঙালির জীবনের একটি ব্যর্থ ও পরাজয়ের সময়। এসময় বাংলা তার স্বাধীনতা হারিয়ে ব্রিটিশ শক্তির উপনিবেশে পরিণত হয়। অবশ্য এ ব্যর্থতা ও পরাজয়ের গ্লানির মধ্যেদিয়েও ঔপনিবেশিক বাংলায় কিছু ইতিবাচক অর্জন ঘটে। বাঙালি সমাজের অন্তত একটি অংশ ইউরোপের জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোতে আলোকিত হয়।

১. দ্রষ্টব্য, Adam's Reports on Vernacular Education in Bengal and Behar submitted to the Government in 1835. 1836 and 1838, by the Rev. J. Long, Calcutta, Home Secretaries Press

উপর্যুক্ত আলোকিত মানুষের প্রচেষ্টায় উনিশ শতকে বাংলায় এক নতুন যুগের সুচনা হয় এবং রাজনীতি, সমাজ, ধর্ম ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে ক্ষয়িষ্ণু ও রক্ষণশীল মনোভাবের বিরুদ্ধে এ যুগেই এক নবজাগরণের সূচনা হয়। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনাধীনে পাশ্চাত্য সভ্যতা, শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভাব জনজীবনকে বিশেষভাবে নাড়া দেয়। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনে পরিবর্তনের পাশাপাশি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনাচারণেও পরিবর্তন ঘটে। জীবনদৃষ্টিতে পরিবর্তন ও আত্মসচেতনতা বৃদ্ধির ফলে এদেশের পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত একটি নব্য শ্রেণির মধ্যে নতুন জীবন জিজ্ঞাসার সূত্রপাত হয়। এজন্য উনিশ শতককে অনেকেই বলে থাকেন নবজিজ্ঞাসার যুগ।[২] গোলাম মুরশিদ লিখেছেন যে, খানিকটা নতুন সেক্যুলার মূল্যবোধের উন্মেষ ও বিকাশ, খানিকটা পাশ্চাত্যের জীবনধারার অনুকরণবশত এবং খানিকটা নগরায়নজাত সচলতার ফলে উনিশ শতকের বাংলায় নানা ধরনের সামাজিক পরিবর্তন ও সমাজ-সংস্কারের প্রয়োজন অনিবার্য হয়ে পড়েছিল।[৩] ইউরোপীয় ভাবাদর্শে উজ্জীবিত শিক্ষিত বাঙালিগণ সমকালীন ইউরোপে বিশেষ করে ইংল্যান্ডের নারী মুক্তি আন্দোলন দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত ব্যক্তিবর্গ স্বদেশী নারী সমাজের করুণ অবস্থা প্রেক্ষাপটে তাদের মানবিক অধিকার সম্পর্কে সচেতন হতে শুরু করেন। তাদের মধ্যে নারী জাগরণ ইস্যুটি বিশেষভাবে গুরুত্ব পায়। আর এ নারী জাগরণের অন্যতম অনুসঙ্গ ছিল নারী সমাজের জন্য শিক্ষার দ্বার উন্মুক্তকরণ।

উনিশ শতকে ইউরোপে নারী জাগরণের দ্বারা প্রভাবিত বঙ্গ-ভারতীয় সমাজের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত পুরুষগণ অনুভব করেন যে, বাংলার সামাজিক জীবনের ক্ষয়িষ্ণুতা রোধে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বহুমুখী পুর্ণজাগরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হচ্ছে, মানব সমাজের অর্ধেক নারীজাতিকে তাদের অধঃপতিত অবস্থা থেকে উদ্ধার করা। আর এ অধঃপতিত অবস্থা থেকে নারীসমাজকে রক্ষার পূর্ব শর্ত হচ্ছে তাদের মাঝে শিক্ষার প্রসার। এরূপ বাস্তাবতায় উনিশ শতকের বাংলায় সৃষ্ট একটি নবতর পরিস্থিতিতে এখানে নারীশিক্ষার বিস্তারে পরিকল্পিত প্রচেষ্টা শুরু হয়। ইংরেজ ঐপনিবেশিক রাজশক্তির সাথে আগত ইউরোপীয় খ্রিস্টান মিশনারিরা বাঙালি সমাজে নারীশিক্ষার প্রসারের কাজটির শুভ সূচনা করলেও উনিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত এ বিষয়ে রাজশক্তির পক্ষ থেকে কোনো উদ্যোগ বা পৃষ্ঠপোষকতা পাওয়া যায়নি। তবে সুখের বিষয় এই যে, বাঙালি সমাজে নারীশিক্ষার প্রসারে এ দেশীয় কিছু মহৎপ্রাণ মনীষী এগিয়ে এসেছিলেন। এদের মধ্যে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩ খ্রি.), ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১ খ্রি.)ও রাজা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৭১৭-১৯০৫ খ্রি.) প্রমুখ সমাজ সংস্কারকগণ। আর এর ফলে প্রথমে পরিবার এবং পরবর্তীতে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে নারীসমাজ তাদের অবস্থান তৈরি করতে সক্ষম

২. স্বপন বসু, *উনিশ শতকে বাংলায় নব চেতনা: উদ্ভব, বিকাশ ও পরিণতি*, পরিবর্ধিত সুবর্ণ সংস্করণ, সুবর্ণ, ঢাকা, ২০১১, পৃ. ১৭

৩. গোলাম মুরশিদ, *সমাজ সংস্কার আন্দোলন ও বাংলা নাটক*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৪, পৃ. ৪

হয়। ফলে তাদের জন্য ক্রমশ শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত হয়। তবে নারীশিক্ষা বিশেষ করে নারীদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ব্যাপারে তাদের উদ্যোগ চিন্তা-ভাবনার স্তর পেরুতে পারেনি। রাজা রামমোহন রায় প্রমুখ বাঙালি মনীষীরা নারীশিক্ষার পক্ষে লিখলেন বটে, কিন্তু তাদের শিক্ষার কার্যকর উদ্যোগ নিয়ে বাঙালি মনীষীদের তেমন কাউকে তখনো বিশেষভাবে এগিয়ে আসতে দেখা যায়নি।

আঠারো শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, কোম্পানি সরকার প্রথমে এদেশের শিক্ষার ব্যাপারে কোনো দায়িত্ব গ্রহণ করেনি। ১৮১৩ সালের সনদ আইনে কোম্পানি এ দেশীয় জনগণের শিক্ষা বিস্তারের জন্য প্রথম বার্ষিক এক লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিধান চালু করে। তবে এতে নারীশিক্ষার ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত ছিল না। ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের শিক্ষার ইতিহাসে Thomas Babington Macaulay (১৮০০-১৮৫৯ খ্রি.) এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি ব্রিটিশ ভারতের আইন সভার সদস্য ও *General Committee of Public Instruction* এর সভাপতি ছিলেন। মেকেলের প্রস্তাবনা অনুযায়ী ব্রিটিশ ভারতের ভবিষ্যত শিক্ষার স্বরূপ সংক্রান্ত বিতর্কের অবসান ঘটে। তবে আশ্চর্যের বিষয় হলো মেকেলের প্রস্তাবনায় এদেশীয় নারীদের শিক্ষার ব্যাপারে কোনো উল্লেখমাত্রও ছিল না। এদেশীয় নারীদের শিক্ষার ব্যাপারে কোম্পানি সরকারের এরূপ অবস্থানের পটভূমিতে ১৮৪৫ সালে উত্তরপাড়ার বিখ্যাত জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখার্জী এবং রামকৃষ্ণ মুখার্জী অর্ধেক খরচ তাদের এবং বাকী অর্ধেক খরচ সরকারের- এই ভিত্তিতে একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য *Council of Education* - এ প্রস্তাব দেন। কিন্তু সরকার এ প্রস্তাবটি অগ্রাহ্য করে। বস্তুত ১৮৫৪ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির *Board of Control* এর সভাপতি Sir Charles Wood (১৮০০-১৮৮৫ খ্রি.) এর শিক্ষা সংক্রান্ত নীতিমালা (Wood's despatch) এদেশীয় নারীদের শিক্ষাকে প্রথম সরকারিভাবে স্বীকৃতি দেয়া হয়।

সরকারি এবং এদেশীয় সমাজপতিদের উদ্যোগে বাংলায় নারীশিক্ষা কার্যক্রম বিলম্বিত হলেও এ ব্যাপারে ইউরোপ হতে আগত খ্রিস্টান মিশনারিদের তৎপরতা শুরু হয়েছিল আঠারো শতকের শেষপাদেই। Calcutta Church Mission, Ladies Society, The Ladies Association, এবং Srirampur Mission এর উদ্যোগে বাংলার বিভিন্ন স্থানে বেশ কিছু সংখ্যক মেয়েদের স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। তবে এসব স্কুল বাংলায় নারীশিক্ষা বিস্তারে বিশেষ তাৎপর্য ভূমিকা রাখতে পারেনি। কারণ মিশনারিদের দ্বারা পরিচালিত এসব স্কুলের পাঠ্যক্রমে খ্রিস্টান ধর্ম বাধ্যতামূলক থাকায় কোনো মুসলমান ঘরের মেয়েতো নয়ই, উচ্চবর্ণের হিন্দু পরিবারের মেয়েরাও এসব স্কুলে যেতো না। সাধারণত নিম্ন ও নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের হিন্দু এবং স্থানীয় ধর্মান্তরিত খ্রিস্টান পরিবারের মেয়েরাই এসব স্কুলে পড়াশুনা করতো। তদুপরি ১৮৩৮ সালের পর অর্থ সংকটের কারণে অধিকাংশ মিশনারি স্কুলের শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। এসব স্কুল রক্ষায় বাঙালি সমাজপতি বাবুরাও

এগিয়ে আসেননি। বাংলায় নবজাগরণের দিশারী ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীও এ ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখতে ব্যর্থ হয়।

উপর্যুক্ত বাস্তবতায় বাংলার নারীশিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্তের সূচনা হয় ১৮৪৯ সালে। ঐ বছর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সরকারের পদস্থ কর্মকর্তা জনশিক্ষা পরিচালক John Elliot Drinkwater Bethune (১৮০১-১৮৫১ খ্রি.) কলকাতায় একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করলেন। পরবর্তীকালে বেথুন স্কুল নামে পরিচিত এ স্কুল প্রতিষ্ঠায় সহায়তা নিয়ে এগিয়ে এসেছিলেন রামগোপাল ঘোষ (১৮২৫-১৮৬৮ খ্রি.), দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় (১৮১৪-১৮৮৭ খ্রি.) এবং মদনমোহন তর্কালঙ্কার (১৮১৭-১৮৫৮ খ্রি.) প্রমুখ বাঙালি ভদ্রলোক। পরবর্তীতে এ স্কুলটির সাথে সর্বোতভাবে যুক্ত হয়েছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। জোড়াসাকুর ঠাকুর পরিবারসহ সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত পরিবারের মেয়েরা বেথুন স্কুলে পড়তে আসায় অনেকেই উৎসাহিবোধ করেন এবং তাদের নিজেদের মেয়েদের এ স্কুলে পাঠান। স্কুল প্রতিষ্ঠার দুই বছর পর বেথুন মারা যান। তবে তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়টি বাংলার নারীশিক্ষা প্রসারে একটি মাইলফলক ভিত্তিরূপে কাজ করে। বেথুন স্কুলের সাফল্য দেখে পরবর্তীতে অনেক শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি উদ্যোগে কলকাতা এবং এর বাইরে মফস্বল এলাকাতে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনে এগিয়ে আসেন। এ প্রসঙ্গে উত্তরপাড়ার জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখার্জী এবং কিশোরীচাঁদ মিত্র, কালীকৃষ্ণ মিত্র, প্যারীচরণ মিত্র ও নবীনকৃষ্ণ মিত্রের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাদের প্রচেষ্টায় উত্তরপাড়া, রাজশাহী এবং বারাসাত এলাকায় কয়েকটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল।

উনিশ শতকের ষাটের দশক থেকে সমাজের নানা প্রতিরোধ প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও নারীশিক্ষা প্রসারে বাংলায় অগ্রগতি সাধিত হয়। মেয়েরা শিক্ষিত হলে জাতীয় জীবনের উন্নতি ছাড়াও প্রাত্যহিক জীবনে তারা প্রকৃত ও উপযুক্ত ভূমিকা পালন করতে পারবে- এই বোধ বাংলার প্রগতিমনস্ক তরুণ সমাজ ও সমাজ সংস্কারকদের উদ্বুদ্ধ করে। 'বেথুন সোসাইটি' 'ব্রাহ্মবন্ধু সভা', 'বামবোধিনী সভা' ও 'ভারত সংস্কার সভা' প্রভৃতি সংগঠন এবং কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮-১৮৮৪ খ্রি.), সত্যেনন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪২-১৯২৩ খ্রি.), উমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৪০-১৯০৭ খ্রি.), দ্বারকনাথ গাঙ্গুলি (১৮৪৪-১৮৯৮ খ্রি.), বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী (১৮৪১-১৮৯৯ খ্রি.), শিবনাথ শাস্ত্রী ১৮৪৭-১৯১৭ খ্রি.), শশীপদ বন্দোপাধ্যায় (১৮৪০-১৯২৪ খ্রি.) ও দুর্গামোহন দাস (১৮৪১-১৮৯৭ খ্রি.) প্রমুখ বাংলায় নারী জাগরণের জন্য যে কর্মোদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন তাতে নারীশিক্ষা বিশেষ গুরুত্ব পায়। এসময় পূর্ব বাংলার বিভিন্ন স্থানে ব্যক্তি উদ্যোগে কিছু নারীশিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। উদাহরণ স্বরূপ পাবনার বামা সুন্দরী বালিকা বিদ্যালয়, ময়মনসিংহের আলেকজেণ্ডার ডাফ স্কুল (পরবর্তীতে যা বিদ্যাময়ী স্কুলে রূপান্তরিত হয়), ঢাকার বাংলাবাজার গার্লস স্কুলের নাম উল্লেখ করা যায়। বিদেশীদের মধ্যে এসময় Miss Mary Carpenter এবং Miss Annette Akroyd বাংলায় নারীশিক্ষা প্রসারে ভূমিকা রাখেন। মিস একরোয়েড ১৮৭৩ সালে কলকাতায় 'হিন্দু মহিলা বিদ্যালয়' নামে একটি মেয়েদের স্কুল চালু করেন যা

পরে মিস কার্পেন্টারের সহায়তায় কলেজে উন্নীত হয়। প্রকৃত অর্থে একেই বাংলার নারীদের উচ্চশিক্ষার সার্থক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কেননা এ প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত নারীদের কথা বিবেচনা করেই ১৮৭৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় মেয়েদের এন্ট্রান্স ও এফ এ পরীক্ষার স্বীকৃতি দেয়। এজন্য ১৮৭৭ সালকে বাংলার নারীশিক্ষার অগ্রগতির একটি বিশেষ ধাপ হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

বাংলায় নারীশিক্ষা প্রসারে ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। এ সমাজের মেয়েদের পড়াশুনার জন্য শুভসাধিনী সভার উদ্যোগ ও পৃষ্ঠপোষকতায় *Dhaka Female School* প্রতিষ্ঠা করে। ১৮৭৮ সালে তৎকালীন গভর্নর স্যার অ্যাশলে ইডেনের নামানুসারে এর 'ইডেন গার্লস স্কুল' নামকরণ করে সরকারি নিয়ন্ত্রণে নেয়া হয়। ১৯২১ সালে এই স্কুলটি কলেজে পরিণত হয়। ব্রাহ্মসমাজ ছাড়াও ১৮৭০ থেকে ১৮৯০ সালের মধ্যে বিভিন্ন সামাজিক ও স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান পূর্ব বাংলার নারীশিক্ষা প্রসারে কাজ করে। এসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল বিক্রমপুর সম্মিলনী, ফরিদপুর সুহৃদ সভা, বাখরগঞ্জ হিতকরী সভা, বরিশাল অন্তপুর স্ত্রী শিক্ষা সভা, ত্রিপুরা হিতৈষণী সভা, ত্রিপুরা স্ত্রী শিক্ষা সমিতি, ময়মনসিংহ হিতকরী সভা, ময়মনসিংহ অন্তপুর স্ত্রী শিক্ষা সভা, ময়মনসিংহ ব্রাহ্মিকা সভা ইত্যাদি। এসব প্রতিষ্ঠান নারীশিক্ষা বিস্তারে প্রাতিষ্ঠানিক এবং অন্তঃপুর উভয় মাধ্যমেই কাজ করে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, উনিশ শতকের সত্তরের দশকের মধ্যে বাংলায় নারীশিক্ষার যে অগ্রগতি সাধিত হয়েছিল সেখানে হিন্দু নারীদেরই একচ্ছত্র প্রাধান্য দেখা যায়। বস্তুত উনিশ শতকের সত্তরের দশকের পূর্বে বাংলায় শিক্ষা ক্ষেত্রে মুসলিম নারীদের অংশগ্রহণ উল্লেখ করার পর্যায়ে ছিল না। এর অন্যতম কারণ প্রাতিষ্ঠানিক নারীশিক্ষার ব্যাপারে মুসলিম সমাজ সংস্কারকদের নির্লিপ্ততা। মুসলিম জাগরণের অগ্রদূত স্যার সৈয়দ আহমেদ খান (১৮১৭-১৮৯৮ খ্রি.) ভাবনা ও কর্মোদ্যোগের মধ্যে যেমন নারীশিক্ষা কোনো গুরুত্ব পায়নি, তেমনি বাংলার নবাব আবদুল লতিফের (১৮২৮-১৮৯৭ খ্রি.) ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। এমনকি মুসলিমদের শিক্ষা বিস্তারে হুগলির হাজী মোহাম্মদ মহসীনেরকৃত ওয়াকফ ফাণ্ডের ব্যবস্থাপনায় নারীশিক্ষার কোনো স্থান ছিল না। তবে এক্ষেত্রে মুসলিম নেতা সৈয়দ আমীর আলী (১৮৪৯-১৯২৮ খ্রি.) ছিলেন ব্যতিক্রম। উনিশ শতকের শেষ দিকে এসে তিনি পুরুষের সমান্তরালে মুসলিম নারীদেরও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। তবে নারীশিক্ষা বিষয়ে সভা-সমিতিতে বক্তব্য বা কিছু লেখনী ছাড়া তিনিও কোনো বাস্তবভিত্তিক পদক্ষেপ নেননি।

নেতৃস্থানীয় মুসলমানদের নির্লিপ্ততার পটভূমিতে মুসলিম নারীদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ব্যাপারে কয়েকজন মহিয়সী নারীকে এগিয়ে আসতে দেখা যায়। এদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন কুমিল্লার পশ্চিম গাঁওয়ের জমিদার নওয়াব ফয়জুন্নেসা চৌধুরাণী (১৮৩৪-১৯০৩ খ্রি.), মুর্শিদাবাদের জমিদার নওয়াব শামসি জাহান ফেরদৌস মহল, রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন (১৮৮০-১৯৩২ খ্রি.), রোকেয়ার বোন এবং টাঙ্গাইলের জমিদার

Dhaka University Institutional Repository

পরিবারের করিমুন্নেসা বেগম (১৮৫৫-১৯২৬ খ্রি.), শামসুন্নাহার মাহমুদ (১৯০৮-১৯৬৪ খ্রি.), হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দির মাতা খুজিস্তা বানু বেগম (১৮৭২-১৯১২ খ্রি.), ফজিলাতুন্নেছা (১৮৯৯-১৯৭৭ খ্রি.), মুনশী মেহরুল্লাহর কন্যা খায়রুন্নেসা (১৮৮০-১৯১২ খ্রি.) প্রমুখ। এসব মহিয়সী নারীদের প্রচেষ্টায় বাংলার মুসলিম নারীশিক্ষায় দিগন্তের নতুন দ্বার উন্মোচিত হয়।

১৯০৫ সালে পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ গঠিত হওয়ার পর পূর্ববঙ্গেও নারীশিক্ষার জোয়ার আসে। এসময় সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি ও ব্যক্তি উদ্যোগে নারীশিক্ষা প্রসারের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে। এসময় বাংলার মুসলিম সমাজের বেশ কিছু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি এ ব্যাপারে উদ্যোগী হন, তাদের মধ্যে মজিবর রহমান (১৮৬০-১৯২৩ খ্রি.), নওশের আলী খাঁন ইউসুফ জাঈ, ব্যারিস্টার আবদুর রসুল (১৮৭২-১৯১৭ খ্রি.), ঢাকার নওয়াব পরিবারে খাজা আহসানউল্লাহ (১৮৪৬-১৯০১ খ্রি.) ও নওয়াব সলিমূল্লাহ (১৮৭১-১৯১৫ খ্রি.) প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

শুধু ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা নয় এ সময় বাংলায় মুসলিম নারীদের শিক্ষা প্রসারে কয়েকটি সংগঠনও এগিয়ে আসে। এসব সংগঠনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এসাসিয়েশন, ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী, বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি, মুসলিম সাহিত্য সমাজ ও শিখাগোষ্ঠী, সিলেট সম্মিলনী ও দিপালী সংঘ প্রভৃতি। নারীশিক্ষার স্বপক্ষে জনমত সৃষ্টিতে সংবাদপত্রসমূহও বিশেষ ভূমিকা রাখে। এ প্রসঙ্গে মুহাম্মদ নাসিরউদ্দীন (১৮৮৮-১৯৯৪ খ্রি.) সম্পাদিত *সওগাত* পত্রিকার কথা স্মরণ করা যেতে পারে।

বিশ শতকে বাঙালি নারী সমাজে শিক্ষা বিস্তারে লেডি অবলা বসু (১৮৬৪-১৯৫১ খ্রি.), সরলা বসু (১৯০৩-১৯৮৯ খ্রি.) এবং লীলা নাগ (১৯০০-১৯৭০ খ্রি.) প্রমুখের নামও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর শুধু ব্যক্তিগত প্রয়াসের মাধ্যমে নয় সাংগঠনিকভাবেও নারীশিক্ষাসহ নারী জাতির ভাগ্য পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। প্রসঙ্গত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম নারী শিক্ষার্থী লীলা নাগের প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত 'দিপালী সংঘ' এর নামোল্লেখ করা যায়।

উপরের আলোচনায় দেখা যায় যে, প্রথমত সামাজিক কুসংস্কার, সমাজপতিদের বিরোধিতা ইত্যাদি নানা কারণে উনিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত বাংলায় নারীশিক্ষা বিশেষ অগ্রগতি লাভ করেনি। এ সময় কোম্পানি সরকার বাংলার নারীশিক্ষা প্রসারে ন্যূনতম দায়িত্বও না নেয়ায় বাংলার নারীশিক্ষা বেসরকারি ও ব্যক্তি উদ্যোগেই পরিচালিত হয়। ১৮৫৪ সালে এ ব্যাপারে সরকারি উদ্যোগ গ্রহণের পক্ষে সিদ্ধান্ত হয় বটে, তবে নারীশিক্ষা প্রসারে সরকারি বরাদ্দ ছিল নিতান্তই অপ্রতুল। এরূপ বাস্তবতায় বাংলার নারী সমাজকে শিক্ষার আলোকে আলোকিত করার জন্য বেসরকারি ও ব্যক্তি উদ্যোগ অব্যাহত থাকে। বিশ শতকের শুরু থেকেই বাংলায় নারীশিক্ষা প্রসারে সরকারি প্রয়াস জোরদার হয়। তবে এতদসত্বেও বেসরকারি ও ব্যক্তি উদ্যোগের

গুরুত্ব কমেনি। ১৯৪৭ সালে ইংরেজ শাসনের অবসান পর্যন্ত সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি নারীশিক্ষা প্রসারে বাংলায় বেসরকারি ও ব্যক্তি উদ্যোগ ও তৎপরতা লক্ষ্য করা যায়। এমনকি বাস্তবতার নিরিখে বলা যায় যে, এক্ষেত্রে সরকারি উদ্যোগের তুলনায় বেসরকারি প্রচেষ্টার সফলতা ছিল অনেক বেশি। পর্যালোচনাধীন সময়ে ব্যক্তি ও বেসরকারি উদ্যোগে বাংলায় নারীশিক্ষা প্রসারে জেনানা বা অন্তঃপুর শিক্ষার পাশাপাশি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা প্রাসারেও বিশেষভাবে কাজ করা হয়েছে। লক্ষণীয় যে, বাংলায় নারীশিক্ষা বিষয়ে সরকারি উদ্যোগ ও প্রয়াস বিষয়ে অনেক আলোচনা এবং প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে অনেক গবেষণা হলেও, নারীশিক্ষা প্রসারে বেসরকারি ও ব্যক্তি উদ্যোগ বা প্রয়াস বিষয়টি সেভাবে আলোচনা বা গবেষণায় স্থান পায়নি। অথচ বাংলায় নারীশিক্ষা বিষয়ে সামগ্রিক অধ্যয়নের জন্য এ বিষয়ে আলোচনা ও প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণার বিশেষ গুরুত্ব অস্বীকার করার কোনো অবকাশ নেই। এরূপ বস্তবতায় পর্যালোচনাধীন সময়কালে বাংলার নারীশিক্ষা প্রসারে বেসরকারি ও ব্যক্তি উদ্যোগ সম্পর্কে নিবিড় পর্যবেক্ষণ ও গবেষণার প্রয়োজনীতা বোধ থেকেই উপর্যুক্ত শিরোনামে পিএইচ.ডি. গবেষণার বর্তমান প্রস্তাবনা উপস্থাপন করার প্রয়াস নেয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে আজকের প্রজন্মের কাছে বাংলার নারীজাগরণের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক নারীশিক্ষার প্রসারে বেসরকারি ব্যক্তি ও সাংগঠনিক তৎপরতা এবং এর প্রভাব ইত্যাদি বিষয় স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হবে। আর এ থেকে প্রেরণা এবং দিক-নির্দেশনা পেয়ে বর্তমান প্রজন্ম আরো বেশি করে নারীর প্রতি সম্মান এবং তাদের আত্মোন্নয়নে অবদান রাখতে উদ্বুদ্ধ হবে।

অভিসন্দর্ভের অধ্যায় বিন্যাস

বাংলায় নারীশিক্ষা প্রসারে ব্যক্তি ও বেসরকারি উদ্যোগ ((১৮৪৯-১৯৪৭ খ্রি.) শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি ভূমিকা ও উপসংহার ছাড়াও মোট সাতটি অধ্যায়ে বিভক্ত।

ভূমিকা: অভিসন্দর্ভের ভূমিকায় আলোচ্য গবেষণাকর্মের ক্ষেত্র ও পরিধি নির্ধারণসহ বিষয়বস্তু এবং গবেষণার যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। গবেষণা অভিসন্দর্ভ প্রণয়নে বিদ্যমান দ্বৈতায়িক সহায়ক তথ্য-উপাত্তেরও একটি পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন সংযোজন করা হয়েছে ভূমিকায়। প্রাসঙ্গিক কারণে এতে অভিসন্দর্ভের গঠন কাঠামো বা অধ্যায় বিন্যাসও স্থান পেয়েছে।

প্রথম অধ্যায়: অভিসন্দর্ভের প্রথম অধ্যায়ের শিরোনাম ' **উনিশ শতকে বাংলায় নবজাগরণ ও নারীসমাজ'**। এ অধ্যায়ে উনিশ শতকে ঔপনিবেশিক বাংলায় নবজাগরণ এবং এর প্রভাবে নারী জাগরণ বিষয়ে নানা উদ্যোগ ও পদক্ষেপ সম্পর্কে আলোচনা ও পর্যালোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়: 'বাংলায় নারীশিক্ষার ঐতিহাসিক পটভূমি' শিরোনামে অভিসন্দর্ভের দ্বিতীয় অধ্যায়ে বাংলায় নারী শিক্ষার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। এ অধ্যায়ে প্রাচীন কাল থেকে উনিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত বাংলায় নারীশিক্ষার একটি লেখচিত্র অংকনের প্রয়াস নেয়া হয়েছে। এ অধ্যায়ের

আলোচনার সূত্রপাত হয়েছে গুপ্ত যুগ থেকে এবং সমাপ্তি টানা হয়েছে উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলায় নারীশিক্ষা প্রসারে খ্রিস্টান মিশনারি উদ্যোগ বর্ণনার মাধ্যমে।

তৃতীয় অধ্যায়ঃ অভিসন্দর্ভের তৃতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম **'উনিশ শতকের সংবাদ-সামায়িক পত্র ও সাহিত্যে নারীশিক্ষা প্রসঙ্গ'**। উনিশ শতকে নবজাগরণের সূত্র ধরে বাংলায় নারী সমাজের অবস্থার উন্নয়নে সমাজপতিদের তৎপরতা পরিলক্ষিত হয়। নারীমুক্তির অত্যাবশকীয় শর্ত হিসেবে তারা নারীশিক্ষার বিষয়ে আগ্রহী হন। তবে তখনো বৃহত্তর বাঙালি সমাজ নারীশিক্ষার বিপক্ষে ছিলেন। এমতাবস্থায় নারীশিক্ষার সমর্থক বাঙালি বুদ্ধিজীবী ও সমাজপতিগণ নারীশিক্ষার প্রতি জনমত তৈরির কর্মসূচি গ্রহণ করেন। তাঁরা নারীশিক্ষার পক্ষে জনমত তৈরি ও একটি মনস্তাত্ত্বিক পটভূমি বিনির্মাণের লক্ষ্যে বক্তৃতা-বিবৃতি ছাড়াও সমকালীন সংবাদ ও সাময়িকপত্রে নারীশিক্ষার পক্ষে প্রচারণা চালান। অনেকে আবার পুস্তক-পুস্তিকা রচনার মাধ্যমে নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ব্যাপারে বাঙালি সমাজকে সচেতন করার উদ্যোগ নেন। তৃতীয় অধ্যায়ে নারীশিক্ষার পক্ষে জনমত তৈরির এ প্রচেষ্টা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ঃ 'বাংলায় নারীশিক্ষা প্রসারে ব্যক্তি ও বেসরকারি সাংগঠনিক প্রয়াস (১৮৪৯-১৯০৫ খ্রি.)' অভিসন্দর্ভের চতুর্থ অধ্যায়ের শিরোনাম। খ্রিস্টান মিশনারিদের মাধ্যমে উনিশ শতকে বাংলায় নারীশিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম সূচনা হলেও এর সাফল্য ছিল সামান্যই। এ অবস্থায় বাংলায় নারীশিক্ষা প্রসারে শিক্ষিত ও প্রগতিশীল বাঙালিদের অনেকেই ব্যক্তিগতভাবে এবং বেসরকারি পর্যায়ে সাংগঠনিক উদ্যোগে নারীশিক্ষা প্রসারে তৎপর হন। ১৮৪৯ সালে বেথুন স্কুল প্রতিষ্ঠা থেকে ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ পর্যন্ত সময়কালে ব্যক্তিগত ও সাংগঠনিক উদ্যোগে বাংলায় নারীশিক্ষা প্রসারের নানা দিক আলোচনা করা হয়েছে এ অধ্যায়টিতে।

পঞ্চম অধ্যায়ঃ অভিসন্দর্ভের এ অধ্যায়টির শিরোনাম **'উনিশ শতকে বাঙালি মুসলিম সমাজে নারীশিক্ষা প্রসারে বেসরকারি প্রয়াসঃ গতি-প্রকৃতি অনুসন্ধান'**। ঔপনিবেশিক যুগে অবিভক্ত বাংলার জনসংখ্যার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ছিল মুসলিম। কিন্তু সার্বিক বিবেচনায় এ সময় মুসলিম জনগোষ্ঠী তাদের প্রতিবেশি হিন্দু সমাজ অপেক্ষা পশ্চাদপদ ছিল। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে নারীশিক্ষায় হিন্দু সমাজ যতটা অগ্রসর হয়েছিল, মুসলিম সমাজ সে তুলনায় অনেকটাই পিছিয়ে ছিল। ব্যক্তি ও বেসরকারি উদ্যোগের বাইরেও সরকারি ব্যবস্থাপনায় প্রচলিত নারীশিক্ষার সুযোগ হিন্দুরা যতটুকু গ্রহণ করেছিল, মুসলমানরা তা পারেনি। ফলে নারীশিক্ষায় তারা অনেকটাই পশ্চাদপদ অবস্থায় ছিল। পঞ্চম অধ্যায়ে উনিশ শতকে নারীশিক্ষা প্রসারে বাঙালি মুসলিম সমাজের প্রচেষ্টা ও উদ্যোগের গতি-প্রকৃতি নির্ণয়ের চেষ্টা করা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়: 'বাংলায় মুসলিম নারীশিক্ষার প্রসারে ব্যক্তি ও বেসরকারি প্রচেষ্টা: মধ্য বিশ শতক পর্যন্ত' শিরোনামে ষষ্ঠ অধ্যায়ে ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তিকাল পর্যন্ত মুসলিম সমাজে নারীশিক্ষা প্রসারে ব্যক্তি ও বেসরকারি উদ্যোগের নানা দিক আলোচনা করা হয়েছে।

সপ্তম অধ্যায়: বাংলায় নারীশিক্ষা প্রসারে অমুসলিম ব্যক্তি ও সাংগঠনিক প্রয়াস (১৯০৫-১৯৪৭ খ্রি.) অভিসন্দর্ভের সপ্তম অধ্যায়ের শিরোনাম। এ অধ্যায়টি চতুর্থ অধ্যায়ের ধারাবাহিকতা। চতুর্থ অধ্যায়ে ১৮৪৯ সাল থেকে ১৯০৫ সাল পর্যন্ত নারীশিক্ষা প্রসারে অমুসলিম ব্যক্তি ও বেসরকারি প্রয়াস পর্যালোচনা করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত একই সম্প্রদায়ের নারীশিক্ষা প্রসারে ব্যক্তিগত ও বেসরকারি প্রচেষ্টার উপর আলোকপাত করা হয়েছে বর্তমান অধ্যায়ে।

উপসংহার: সপ্তম অধ্যায় শেষে রয়েছে উপসংহার। অভিসন্দর্ভের বিভিন্ন অধ্যায়ের মূল বক্তব্যের সার নির্যাস সম্পর্কিত বক্তব্য স্থান পেয়েছে উপসংহারে।

অভিসন্দর্ভের শেষদিকে একাধিক পরিশিষ্টে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোকচিত্রসহ কিছু দলিলাদি যুক্ত করা হয়েছে। সবশেষে রয়েছে এ গবেষণাকর্মে ব্যবহৃত সহায়ক তথ্য ও গ্রন্থপঞ্জির একটি তালিকা।

গবেষকের নাম: **আলো আরজুমান বানু**
রেজি: ১২, শিক্ষাবর্ষ ২০১৩-২০১৪
রেজি: ১৬৯ (পুনঃ), শিক্ষাবর্ষ ২০১৭-২০১৮

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

বাংলায় নারী শিক্ষার প্রসারে ব্যক্তি ও বেসরকারি উদ্যোগ ((১৮৪৯-১৯৪৭) শীর্ষক আলোচ্য গবেষণাকর্মটি ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামলে অবিভক্ত বাংলায় নারীশিক্ষা প্রসারে সরকারি প্রচেষ্টার বাইরে ব্যক্তি ও বেসরকারি নানা উদ্যোগ নির্ণয়, বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নের প্রয়াস।

মানব সভ্যতা বিনির্মাণ ও অগ্রগতিতে পুরুষের পাশাপাশি নারী জাতির ঐতিহাসিক ভূমিকা সুবিদিত। এজন্যই কবি কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে "বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি, চির কল্যাণকর অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।" কবির এ উক্তিতে নারী জাতির ঐতিহাসিক ও বাস্তব ভূমিকার স্বীকৃতি আছে সত্য, তবে পুরুষশাসিত সমাজ কী সবসময় নারীর কৃতি-কর্মের স্বীকৃতি দিয়েছে? সভ্যতার ঊষালগ্নে নারী-পুরুষের মধ্যে বৈষম্যমুক্ত সক্ষমতা সম্পর্কের পরিবেশ বিরাজমান ছিল বলে সমাজতত্ত্ববিদগণ মনে করেন। কিন্তু পরবর্তীতে নানামুখী সামাজিক বিরূপ পরিস্থিতিতে অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। সম্পদ ও সম্পত্তিতে ব্যক্তি মালিকানার চিন্তা, পতিত্ব ও পিতৃপরিচয় নির্ভর পারিবারিক ধারার বিকাশের প্রেক্ষাপটে নারী ও পুরুষের মধ্যে সাম্যের সম্পর্ক ক্রমশ শিথিল হতে থাকে এবং নারী পুরুষের সম্পর্কে বৈষম্যমূলক অবস্থা শক্ত ভিত্তি লাভ করে। পরবর্তী সময়ে জ্ঞাতি সম্পর্ক, সমাজ-সংস্কৃতি, ধর্ম, ও রাষ্ট্রশক্তি অসম সম্পর্ককে শুধু লালন করেনি, বরং নারীর উপর পুরুষের শাসন ও শ্রেষ্ঠত্বকে স্বীকৃতি দেয়। এমনকি কালের পরিক্রমায় নারীর উপর পুরুষের নির্যাতন ও অত্যাচার সমাজের চোখে অনেকটাই স্বাভাবিক এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে শাস্ত্রসিদ্ধ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। পৃথিবীর অনেক দেশে, এমনকি ভারতবর্ষেও দীর্ঘদিন এ ধারণা প্রতিষ্ঠিত থাকে যে, সর্বগুণে গুণান্বিত নারীও একজন অধম পুরুষের চাইতে হীন। এরূপ সমাজ বাস্তবতায় নারী জাতি কেবল ভোগ্য ও সন্তান উৎপাদকে পরিণত হয়। আলোচ্য বাংলা অঞ্চলেও দীর্ঘকাল ধরে নারীসমাজ এরূপ অধঃপতিত অবস্থার মধ্যে নিপতিত ছিল। কিন্তু কালক্রমে অবস্থার পরিবর্তন ঘটতে থাকে। বাংলায় মুসলিম শাসনামলে নারী তাঁর মানবিক অধিকার লাভ করে। তবে এ সময় নারীসমাজ মানবিক পরিচয় লাভ করলেও সাধারণভাবে সমাজ বা রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে তো নয়ই, এমনকি পারিবারিক জীবনেও নারী তাঁর যথাযথ অবস্থান তৈরি করতে পারেনি। শিক্ষার মতো অত্যাবশকীয় মৌলিক অধিকার থেকেও নারীসমাজকে বঞ্চিত রাখা হয় সচেতনভাবেই।

ভারতীয় সমাজে নারীকে সবসময়ই পুরুষের আজ্ঞাধীন হিসেবে দেখা হতো। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১ খ্রি.) তাঁর *বহু বিবাহ* নামক রচনায় উল্লেখ করেছেন "ভারতবর্ষে স্ত্রীজাতির প্রতি পুরুষজাতি যেরূপ

নৃশংসতা, স্বার্থপরতা, অবিমৃশ্যকারিতা প্রদর্শন করে, তা তুলনাহীন।" নারীদের সম্পর্কে পুরুষদের ভাবনা ছিল স্ত্রীজাতি অপেক্ষাকৃত দুর্বল ও সামাজিক নিয়ম দোষে পুরুষ জাতির নিতান্ত অধীন। কিছু ব্যতিক্রম হয়তো ছিল, তবে উনিশ শতকে এসেও দেখা যায় যে, সাধারণভাবে ভারতীয় তথা বাঙালি সমাজে পুরুষদের চোখে নারীরা ছিল গৃহকর্মে উপযুক্ত ক্রীতদাসী তুল্য। এমনকি মেয়েদের মানসিক শক্তি সম্পর্কেও পুরুষদের প্রবল অবজ্ঞার মনোভাব ছিল। এরূপ বাস্তবতায় এদেশে নারীশিক্ষার যে বিশেষ প্রচলন ছিল না, এ কথা বলা বাহুল্য। আঠোরো শতকের শেষার্ধে এসে দেখা যায় যে, বাংলায় উচ্চবর্গের কতিপয় নারী প্রথাগত শিক্ষা লাভ করলেও সামগ্রিক সমাজ ব্যবস্থার উপর তার কোনো প্রভাব পড়েনি। অশিক্ষা এবং কুশিক্ষাই ছিল সাধারণভাবে বাঙালি নারীজাতির বিধিলিপি। ১৮৩৫ ও ১৮৩৮ সালে প্রকাশিত উইলিয়াম এডামসের (William Adams) প্রণীত বাংলার শিক্ষা সংক্রান্ত প্রতিবেদনেও এ সত্য প্রতিভাত হয়েছে।[১] বস্তুত এ সময়কার শিক্ষিত বাঙালি নারীদের দৃষ্টান্ত দিতে গেলে লীলাবতী, ভানুমতি, কর্ণট রাজার স্ত্রী, কালিদাসের পত্নী, মৈত্রেয় দেবী, রাণী ভবানী ও হটি বিদ্যালঙ্কার প্রমুখের নামোল্লেখের মধ্যেই থেমে যেতে হয়। আর এ থেকেই বাংলার নারীশিক্ষার দুর্গতি সম্পর্কে ধারণা করা যায়।

বাংলায় নারীশিক্ষার অধোগতির পেছনে বহুদিনের কুসংস্কার অন্যতম কারণ ছিল বলা যায়। লেখাপড়া শিখলে মেয়েরা বিধবা, অসতী এবং অহঙ্কারবশে স্বামী ও গুরুজনদের অবাধ্য হয়, মেয়েরা কালির আঁচড় দিলে গৃহে অলক্ষ্মী প্রবেশ করে এবং ইংরেজি শিখলে উচ্ছৃংখল হবে ইত্যাদি বিশ্বাস ও আশঙ্কা নারীশিক্ষার অন্তরায় হিসেবে কাজ করে। এমনকি নারীশিক্ষাকে শাস্ত্রবিরোধী বলেও মনে করা হতো। এসব কারণে অশিক্ষিত সাধারণ লোকেরা কথা দুরে থাক, সেকালের সমাজের প্রধান প্রধান শিক্ষিত ও নেতৃস্থানীয় লোকেরা পর্যন্ত নারীশিক্ষাকে স্বাগত জানাতে পারেননি।

আঠারো শতককে বলা হয় ইউরোপের 'আলোকিত যুগ'। তবে এ সময়েও নারী সমাজের সামগ্রিক অবস্থার উন্নতি ঘটেনি। এ সময়ে ইউরোপীয় সমাজ জীবনে যুক্তি ও বিজ্ঞান মনস্কতা প্রাধান্য পেলেও পুরুষ ও যাজকতন্ত্রের প্রাবল্যের কারণে নারী জাতি তার যোগ্য মর্যাদা পায়নি। সমকালীন ইউরোপের বাস্তবতা যখন এমন, তখন আমাদের বঙ্গ-ভারতের কথা সহজেই অনুমেয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, আঠারো শতকে ইউরোপে যখন আলোক-যুগের সূচনা ঘটে, তখনকার সময়টি ছিল বাঙালির জীবনের একটি ব্যর্থ ও পরাজয়ের সময়। এসময় বাংলা তার স্বাধীনতা হারিয়ে ব্রিটিশ শক্তির উপনিবেশে পরিণত হয়। অবশ্য এ ব্যর্থতা ও পরাজয়ের

১. দ্রষ্টব্য, Adam's Reports on Vernacular Education in Bengal and Behar submitted to the Government in 1835. 1836 and 1838, by the Rev. J. Long, Calcutta, Home Secretaries Press

গ্লানির মধ্যেদিয়েও ঔপনিবেশিক বাংলায় কিছু ইতিবাচক অর্জন ঘটে। বাঙালি সমাজের অন্তত একটি অংশ ইউরোপের জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোতে আলোকিত হয়।

উপর্যুক্ত আলোকিত মানুষের প্রচেষ্টায় উনিশ শতকে বাংলায় এক নতুন যুগের সুচনা হয় এবং রাজনীতি, সমাজ, ধর্ম ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে ক্ষয়িষ্ণু ও রক্ষণশীল মনোভাবের বিরুদ্ধে এ যুগেই এক নবজাগরণের সূচনা হয়। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনাধীনে পাশ্চাত্য সভ্যতা, শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভাব জনজীবনকে বিশেষভাবে নাড়া দেয়। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনে পরিবর্তনের পাশাপাশি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনাচারণেও পরিবর্তন ঘটে। জীবনদৃষ্টিতে পরিবর্তন ও আত্মসচেতনতা বৃদ্ধির ফলে এদেশের পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত একটি নব্য শ্রেণির মধ্যে নতুন জীবন জিজ্ঞাসার সূত্রপাত হয়। এজন্য উনিশ শতককে অনেকেই বলে থাকেন নবজিজ্ঞাসার যুগ।[২] গোলাম মুরশিদ লিখেছেন যে, খানিকটা নতুন সেক্যুলার মূল্যবোধের উন্মেষ ও বিকাশ, খানিকটা পাশ্চাত্যের জীবনধারার অনুকরণবশত এবং খানিকটা নগরায়নজাত সচলতার ফলে উনিশ শতকের বাংলায় নানা ধরনের সামাজিক পরিবর্তন ও সমাজ-সংস্কারের প্রয়োজন অনিবার্য হয়ে পড়েছিল।[৩] ইউরোপীয় ভাবাদর্শে উজ্জীবিত শিক্ষিত বাঙালিগণ সমকালীন ইউরোপে বিশেষ করে ইংল্যান্ডের নারী মুক্তি আন্দোলন দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত ব্যক্তিবর্গ স্বদেশী নারী সমাজের করুণ অবস্থা প্রেক্ষাপটে তাদের মানবিক অধিকার সম্পর্কে সচেতন হতে শুরু করেন। তাদের মধ্যে নারী জাগরণ ইস্যুটি বিশেষভাবে গুরুত্ব পায়। আর এ নারী জাগরণের অন্যতম অনুসঙ্গ ছিল নারী সমাজের জন্য শিক্ষার দ্বার উন্মুক্তকরণ।

উনিশ শতকে ইউরোপে নারী জাগরণের দ্বারা প্রভাবিত বঙ্গ-ভারতীয় সমাজের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত পুরুষগণ অনুভব করেন যে, বাংলার সামাজিক জীবনের ক্ষয়িষ্ণুতা রোধে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বহুমুখী পুর্ণজাগরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হচ্ছে, মানব সমাজের অর্ধেক নারীজাতিকে তাদের অধঃপতিত অবস্থা থেকে উদ্ধার করা। আর এ অধঃপতিত অবস্থা থেকে নারীসমাজকে রক্ষার পূর্ব শর্ত হচ্ছে তাদের মাঝে শিক্ষার প্রসার। এরূপ বাস্তাবতায় উনিশ শতকের বাংলায় সৃষ্ট একটি নবতর পরিস্থিতিতে এখানে নারীশিক্ষার বিস্তারে পরিকল্পিত প্রচেষ্টা শুরু হয়। ইংরেজ ঐপনিবেশিক রাজশক্তির সাথে আগত ইউরোপীয় খ্রিস্টান মিশনারিরা বাঙালি সমাজে নারীশিক্ষার প্রসারের কাজটির শুভ সূচনা করলেও উনিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত এ বিষয়ে রাজশক্তির পক্ষ থেকে কোনো উদ্যোগ বা পৃষ্ঠপোষকতা পাওয়া যায়নি। তবে সুখের বিষয় এই যে, বাঙালি সমাজে নারীশিক্ষার প্রসারে এ দেশীয় কিছু মহৎপ্রাণ মনীষী এগিয়ে এসেছিলেন। এদের মধ্যে

২. স্বপন বসু, *উনিশ শতকে বাংলায় নব চেতনা: উদ্ভব, বিকাশ ও পরিণতি*, পরিবর্ধিত সুবর্ণ সংস্করণ, সুবর্ণ, ঢাকা, ২০১১, পৃ. ১৭

৩. গোলাম মুরশিদ, *সমাজ সংস্কার আন্দোলন ও বাংলা নাটক*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৪, পৃ. ৪

অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩ খ্রি.), ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১ খ্রি.)ও রাজা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৭১৭-১৯০৫ খ্রি.) প্রমুখ সমাজ সংস্কারকগণ। আর এর ফলে প্রথমে পরিবার এবং পরবর্তীতে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে নারীসমাজ তাদের অবস্থান তৈরি করতে সক্ষম হয়। ফলে তাদের জন্য ক্রমশ শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত হয়। তবে নারীশিক্ষা বিশেষ করে নারীদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ব্যাপারে তাদের উদ্যোগ চিন্তা-ভাবনার স্তর পেরুতে পারেনি। রাজা রামমোহন রায় প্রমুখ বাঙালি মনীষীরা নারীশিক্ষার পক্ষে লিখলেন বটে, কিন্তু তাদের শিক্ষার কার্যকর উদ্যোগ নিয়ে বাঙালি মনীষীদের তেমন কাউকে তখনো বিশেষভাবে এগিয়ে আসতে দেখা যায়নি।

আঠারো শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, কোম্পানি সরকার প্রথমে এদেশের শিক্ষার ব্যাপারে কোনো দায়িত্ব গ্রহণ করেনি। ১৮১৩ সালের সনদ আইনে কোম্পানি এ দেশীয় জনগণের শিক্ষা বিস্তারের জন্য প্রথম বার্ষিক এক লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিধান চালু করে। তবে এতে নারীশিক্ষার ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত ছিল না। ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের শিক্ষার ইতিহাসে Thomas Babington Macaulay (১৮০০-১৮৫৯ **খ্রি.**) এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি ব্রিটিশ ভারতের আইন সভার সদস্য ও *General Committee of Public Instruction* এর সভাপতি ছিলেন। মেকেলের প্রস্তাবনা অনুযায়ী ব্রিটিশ ভারতের ভবিষ্যত শিক্ষার স্বরূপ সংক্রান্ত বিতর্কের অবসান ঘটে। তবে আশ্চর্যের বিষয় হলো মেকেলের প্রস্তাবনায় এদেশীয় নারীদের শিক্ষার ব্যাপারে কোনো উল্লেখমাত্রও ছিল না। এদেশীয় নারীদের শিক্ষার ব্যাপারে কোম্পানি সরকারের এরূপ অবস্থানের পটভূমিতে ১৮৪৫ সালে উত্তরপাড়ার বিখ্যাত জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখার্জী এবং রামকৃষ্ণ মুখার্জী অর্ধেক খরচ তাদের এবং বাকী অর্ধেক খরচ সরকারের- এই ভিত্তিতে একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য *Council of Education* -এ প্রস্তাব দেন। কিন্তু সরকার এ প্রস্তাবটি অগ্রাহ্য করে। বস্তুত ১৮৫৪ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির *Board of Control* এর সভাপতি Sir Charles Wood (১৮০০-১৮৮৫ **খ্রি.**) এর শিক্ষা সংক্রান্ত নীতিমালা (Wood's despatch) এদেশীয় নারীদের শিক্ষাকে প্রথম সরকারিভাবে স্বীকৃতি দেয়া হয়।

সরকারি এবং এদেশীয় সমাজপতিদের উদ্যোগে বাংলায় নারীশিক্ষা কার্যক্রম বিলম্বিত হলেও এ ব্যাপারে ইউরোপ হতে আগত খ্রিস্টান মিশনারিদের তৎপরতা শুরু হয়েছিল আঠারো শতকের শেষপাদেই। Calcutta Church Mission, Ladies Society, The Ladies Association, এবং Srirampur Mission এর উদ্যোগে বাংলার বিভিন্ন স্থানে বেশ কিছু সংখ্যক মেয়েদের স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। তবে এসব স্কুল বাংলায় নারীশিক্ষা বিস্তারে বিশেষ তাৎপর্য ভূমিকা রাখতে পারেনি। কারণ মিশনারিদের দ্বারা পরিচালিত এসব স্কুলের পাঠ্যক্রমে খ্রিস্টান ধর্ম বাধ্যতামূলক থাকায় কোনো মুসলমান ঘরের মেয়েতো নয়ই, উচ্চবর্ণের হিন্দু পরিবারের

মেয়েরাও এসব স্কুলে যেতো না। সাধারণত নিম্ন ও নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের হিন্দু এবং স্থানীয় ধর্মান্তরিত খ্রিস্টান পরিবারের মেয়েরাই এসব স্কুলে পড়াশুনা করতো। তদুপরি ১৮৩৮ সালের পর অর্থ সংকটের কারণে অধিকাংশ মিশনারি স্কুলের শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। এসব স্কুল রক্ষায় বাঙালি সমাজপতি বাবুরাও এগিয়ে আসেননি। বাংলায় নবজাগরণের দিশারী ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীও এ ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখতে ব্যর্থ হয়।

উপর্যুক্ত বাস্তবতায় বাংলার নারীশিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্তের সূচনা হয় ১৮৪৯ সালে। ঐ বছর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সরকারের পদস্থ কর্মকর্তা জনশিক্ষা পরিচালক John Elliot Drinkwater Bethune (১৮০১-১৮৫১ খ্রি.) কলকাতায় একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করলেন। পরবর্তীকালে বেথুন স্কুল নামে পরিচিত এ স্কুল প্রতিষ্ঠায় সহায়তা নিয়ে এগিয়ে এসেছিলেন রামগোপাল ঘোষ (১৮২৫-১৮৬৮ খ্রি.), দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় (১৮১৪-১৮৮৭ খ্রি.) এবং মদনমোহন তর্কালঙ্কার (১৮১৭-১৮৫৮ খ্রি.) প্রমুখ বাঙালি ভদ্রলোক। পরবর্তীতে এ স্কুলটির সাথে সর্বোতভাবে যুক্ত হয়েছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। জোড়াসাকুর ঠাকুর পরিবারসহ সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত পরিবারের মেয়েরা বেথুন স্কুলে পড়তে আসায় অনেকেই উৎসাহিবোধ করেন এবং তাদের নিজেদের মেয়েদের এ স্কুলে পাঠান। স্কুল প্রতিষ্ঠার দুই বছর পর বেথুন মারা যান। তবে তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়টি বাংলার নারীশিক্ষা প্রসারে একটি মাইলফলক ভিত্তিরূপে কাজ করে। বেথুন স্কুলের সাফল্য দেখে পরবর্তীতে অনেক শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি উদ্যোগে কলকাতা এবং এর বাইরে মফস্বল এলাকাতে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনে এগিয়ে আসেন। এ প্রসঙ্গে উত্তরপাড়ার জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখার্জী এবং কিশোরীচাঁদ মিত্র, কালীকৃষ্ণ মিত্র, প্যারীচরণ মিত্র ও নবীনকৃষ্ণ মিত্রের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাদের প্রচেষ্টায় উত্তরপাড়া, রাজশাহী এবং বারাসাত এলাকায় কয়েকটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল।

উনিশ শতকের ষাটের দশক থেকে সমাজের নানা প্রতিরোধ প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও নারীশিক্ষা প্রসারে বাংলায় অগ্রগতি সাধিত হয়। মেয়েরা শিক্ষিত হলে জাতীয় জীবনের উন্নতি ছাড়াও প্রাত্যহিক জীবনে তারা প্রকৃত ও উপযুক্ত ভূমিকা পালন করতে পারবে- এই বোধ বাংলার প্রগতিমনস্ক তরুণ সমাজ ও সমাজ সংস্কারকদের উদ্বুদ্ধ করে। 'বেথুন সোসাইটি' 'ব্রাহ্মবন্ধু সভা', 'বামবোধিনী সভা' ও 'ভারত সংস্কার সভা' প্রভৃতি সংগঠন এবং কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮-১৮৮৪ খ্রি.), সত্যেনন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪২-১৯২৩ খ্রি.), উমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৪০-১৯০৭ খ্রি.), দ্বারকনাথ গাঙ্গুলি (১৮৪৪-১৮৯৮ খ্রি.), বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী (১৮৪১-১৮৯৯ খ্রি.), শিবনাথ শাস্ত্রী ১৮৪৭-১৯১৭ খ্রি.), শশীপদ বন্দোপাধ্যায় (১৮৪০-১৯২৪ খ্রি.) ও দুর্গামোহন দাস (১৮৪১-১৮৯৭ খ্রি.) প্রমুখ বাংলায় নারী জাগরণের জন্য যে কর্মোদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন তাতে নারীশিক্ষা বিশেষ গুরুত্ব পায়। এসময় পূর্ব বাংলার বিভিন্ন স্থানে ব্যক্তি উদ্যোগে কিছু নারীশিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। উদাহরণ

স্বরূপ পাবনার বামা সুন্দরী বালিকা বিদ্যালয়, ময়মনসিংহের আলেকজেণ্ডার ডাফ স্কুল (পরবর্তীতে যা বিদ্যাময়ী স্কুলে রূপান্তরিত হয়), ঢাকার বাংলাবাজার গার্লস স্কুলের নাম উল্লেখ করা যায়। বিদেশীদের মধ্যে এসময় Miss Mary Carpenter এবং Miss Annette Akroyd বাংলায় নারীশিক্ষা প্রসারে ভূমিকা রাখেন। মিস একরোয়েড ১৮৭৩ সালে কলকাতায় 'হিন্দু মহিলা বিদ্যালয়' নামে একটি মেয়েদের স্কুল চালু করেন যা পরে মিস কার্পেন্টারের সহায়তায় কলেজে উন্নীত হয়। প্রকৃত অর্থে একেই বাংলার নারীদের উচ্চশিক্ষার সার্থক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কেননা এ প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত নারীদের কথা বিবেচনা করেই ১৮৭৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় মেয়েদের এন্ট্রান্স ও এফ এ পরীক্ষার স্বীকৃতি দেয়। এজন্য ১৮৭৭ সালকে বাংলার নারীশিক্ষার অগ্রগতির একটি বিশেষ ধাপ হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

বাংলায় নারীশিক্ষা প্রসারে ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। এ সমাজের মেয়েদের পড়াশুনার জন্য শুভসাধিনী সভার উদ্যোগ ও পৃষ্ঠপোষকতায় *Dhaka Female School* প্রতিষ্ঠা করে। ১৮৭৮ সালে তৎকালীন গভর্নর স্যার অ্যাশলে ইডেনের নামানুসারে এর 'ইডেন গার্লস স্কুল' নামকরণ করে সরকারি নিয়ন্ত্রণে নেয়া হয়। ১৯২১ সালে এই স্কুলটি কলেজে পরিণত হয়। ব্রাহ্মসমাজ ছাড়াও ১৮৭০ থেকে ১৮৯০ সালের মধ্যে বিভিন্ন সামাজিক ও স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান পূর্ব বাংলার নারীশিক্ষা প্রসারে কাজ করে। এসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল বিক্রমপুর সম্মিলনী, ফরিদপুর সুহৃদ সভা, বাখরগঞ্জ হিতকরী সভা, বরিশাল অন্তপুর স্ত্রী শিক্ষা সভা, ত্রিপুরা হিতৈষণী সভা, ত্রিপুরা স্ত্রী শিক্ষা সমিতি, ময়মনসিংহ হিতকরী সভা, ময়মনসিংহ অন্তপুর স্ত্রী শিক্ষা সভা, ময়মনসিংহ ব্রাহ্মিকা সভা ইত্যাদি। এসব প্রতিষ্ঠান নারীশিক্ষা বিস্তারে প্রাতিষ্ঠানিক এবং অন্তঃপুর উভয় মাধ্যমেই কাজ করে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, উনিশ শতকের সত্তরের দশকের মধ্যে বাংলায় নারীশিক্ষার যে অগ্রগতি সাধিত হয়েছিল সেখানে হিন্দু নারীদেরই একচ্ছত্র প্রাধান্য দেখা যায়। বস্তুত উনিশ শতকের সত্তরের দশকের পূর্বে বাংলায় শিক্ষা ক্ষেত্রে মুসলিম নারীদের অংশগ্রহণ উল্লেখ করার পর্যায়ে ছিল না। এর অন্যতম কারণ প্রাতিষ্ঠানিক নারীশিক্ষার ব্যাপারে মুসলিম সমাজ সংস্কারকদের নির্লিপ্ততা। মুসলিম জাগরণের অগ্রদূত স্যার সৈয়দ আহমেদ খান (১৮১৭-১৮৯৮ খ্রি.) ভাবনা ও কর্মোদ্যোগের মধ্যে যেমন নারীশিক্ষা কোনো গুরুত্ব পায়নি, তেমনি বাংলার নবাব আবদুল লতিফের (১৮২৮-১৮৯৭ খ্রি.) ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। এমনকি মুসলিমদের শিক্ষা বিস্তারে হুগলির হাজী মোহাম্মদ মহসীনেরকৃত ওয়াকফ ফাণ্ডের ব্যবস্থাপনায় নারীশিক্ষার কোনো স্থান ছিল না। তবে এক্ষেত্রে মুসলিম নেতা সৈয়দ আমীর আলী (১৮৪৯-১৯২৮ খ্রি.) ছিলেন ব্যতিক্রম। উনিশ শতকের শেষ দিকে এসে তিনি পুরুষের সমান্তরালে মুসলিম নারীদেরও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার

Dhaka University Institutional Repository

কথা বলেন। তবে নারীশিক্ষা বিষয়ে সভা-সমিতিতে বক্তব্য বা কিছু লেখনী ছাড়া তিনিও কোনো বাস্তবভিত্তিক পদক্ষেপ নেননি।

নেতৃস্থানীয় মুসলমানদের নির্লিপ্ততার পটভূমিতে মুসলিম নারীদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ব্যাপারে কয়েকজন মহিয়সী নারীকে এগিয়ে আসতে দেখা যায়। এদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন কুমিল্লার পশ্চিম গাঁওয়ের জমিদার নওয়াব ফয়জুন্নেসা চৌধুরাণী (১৮৩৪-১৯০৩ খ্রি.), মুর্শিদাবাদের জমিদার নওয়াব শামসি জাহান ফেরদৌস মহল, রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন (১৮৮০-১৯৩২ খ্রি.), রোকেয়ার বোন এবং টাঙ্গাইলের জমিদার পরিবারের করিমুন্নেসা বেগম (১৮৫৫-১৯২৬ খ্রি.), শামসুন্নাহার মাহমুদ (১৯০৮-১৯৬৪ খ্রি.), হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দির মাতা খুজিস্তা বানু বেগম (১৮৭২-১৯১২ খ্রি.), ফজিলাতুন্নেছা (১৮৯৯-১৯৭৭ খ্রি.), মুনশী মেহরুল্লাহর কন্যা খায়রুন্নেসা (১৮৮০-১৯১২ খ্রি.) প্রমুখ। এসব মহিয়সী নারীদের প্রচেষ্টায় বাংলার মুসলিম নারীশিক্ষায় দিগন্তের নতুন দ্বার উন্মোচিত হয়।

১৯০৫ সালে পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ গঠিত হওয়ার পর পূর্ববঙ্গেও নারীশিক্ষার জোয়ার আসে। এসময় সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি ও ব্যক্তি উদ্যোগে নারীশিক্ষা প্রসারের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে। এসময় বাংলার মুসলিম সমাজের বেশ কিছু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি এ ব্যাপারে উদ্যোগী হন, তাদের মধ্যে মজিবর রহমান (১৮৬০-১৯২৩ খ্রি.), নওশের আলী খাঁন ইউসুফ জাঈ, ব্যারিস্টার আবদুর রসুল (১৮৭২-১৯১৭ খ্রি.), ঢাকার নওয়াব পরিবারে খাজা আহসানউল্লাহ (১৮৪৬-১৯০১ খ্রি.) ও নওয়াব সলিমূল্লাহ (১৮৭১-১৯১৫ খ্রি.) প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

শুধু ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা নয় এ সময় বাংলায় মুসলিম নারীদের শিক্ষা প্রসারে কয়েকটি সংগঠনও এগিয়ে আসে। এসব সংগঠনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এসাসিয়েশন, ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী, বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি, মুসলিম সাহিত্য সমাজ ও শিখাগোষ্ঠী, সিলেট সম্মিলনী ও দিপালী সংঘ প্রভৃতি। নারীশিক্ষার স্বপক্ষে জনমত সৃষ্টিতে সংবাদপত্রসমূহও বিশেষ ভূমিকা রাখে। এ প্রসঙ্গে মুহাম্মদ নাসিরউদ্দীন (১৮৮৮-১৯৯৪ খ্রি.) সম্পাদিত *সওগাত* পত্রিকার কথা স্মরণ করা যেতে পারে।

বিশ শতকে বাঙালি নারী সমাজে শিক্ষা বিস্তারে লেডি অবলা বসু (১৮৬৪-১৯৫১ খ্রি.), সরলা বসু (১৯০৩-১৯৮৯ খ্রি.) এবং লীলা নাগ (১৯০০-১৯৭০ খ্রি.) প্রমুখের নামও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর শুধু ব্যক্তিগত প্রয়াসের মাধ্যমে নয় সাংগঠনিকভাবেও নারীশিক্ষাসহ নারী জাতির ভাগ্য পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। প্রসঙ্গত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম নারী শিক্ষার্থী লীলা নাগের প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত ‘দিপালী সংঘ’ এর নামোল্লেখ করা যায়।

উপরের আলোচনায় দেখা যায় যে, প্রথমত সামাজিক কুসংস্কার, সমাজপতিদের বিরোধিতা ইত্যাদি নানা কারণে উনিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত বাংলায় নারীশিক্ষা বিশেষ অগ্রগতি লাভ করেনি। এ সময় কোম্পানি সরকার বাংলার নারীশিক্ষা প্রসারে ন্যূনতম দায়িত্বও না নেয়ায় বাংলার নারীশিক্ষা বেসরকারি ও ব্যক্তি উদ্যোগেই পরিচালিত হয়। ১৮৫৪ সালে এ ব্যাপারে সরকারি উদ্যোগ গ্রহণের পক্ষে সিদ্ধান্ত হয় বটে, তবে নারীশিক্ষা প্রসারে সরকারি বরাদ্দ ছিল নিতান্তই অপ্রতুল। এরূপ বাস্তবতায় বাংলার নারী সমাজকে শিক্ষার আলোকে আলোকিত করার জন্য বেসরকারি ও ব্যক্তি উদ্যোগ অব্যাহত থাকে। বিশ শতকের শুরু থেকেই বাংলায় নারীশিক্ষা প্রসারে সরকারি প্রয়াস জোরদার হয়। তবে এতদসত্ত্বেও বেসরকারি ও ব্যক্তি উদ্যোগের গুরুত্ব কমেনি। ১৯৪৭ সালে ইংরেজ শাসনের অবসান পর্যন্ত সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি নারীশিক্ষা প্রসারে বাংলায় বেসরকারি ও ব্যক্তি উদ্যোগ ও তৎপরতা লক্ষ্য করা যায়। এমনকি বাস্তবতার নিরিখে বলা যায় যে, এক্ষেত্রে সরকারি উদ্যোগের তুলনায় বেসরকারি প্রচেষ্টার সফলতা ছিল অনেক বেশি। পর্যালোচনাধীন সময়ে ব্যক্তি ও বেসরকারি উদ্যোগে বাংলায় নারীশিক্ষা প্রসারে জেনানা বা অন্তঃপুর শিক্ষার পাশাপাশি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা প্রাসারেও বিশেষভাবে কাজ করা হয়েছে। লক্ষণীয় যে, বাংলায় নারীশিক্ষা বিষয়ে সরকারি উদ্যোগ ও প্রয়াস বিষয়ে অনেক আলোচনা এবং প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে অনেক গবেষণা হলেও, নারীশিক্ষা প্রসারে বেসরকারি ও ব্যক্তি উদ্যোগ বা প্রয়াস বিষয়টি সেভাবে আলোচনা বা গবেষণায় স্থান পায়নি। অথচ বাংলায় নারীশিক্ষা বিষয়ে সামগ্রিক অধ্যয়নের জন্য এ বিষয়ে আলোচনা ও প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণার বিশেষ গুরুত্ব অস্বীকার করার কোনো অবকাশ নেই। এরূপ বস্তবতায় পর্যালোচনাধীন সময়কালে বাংলার নারীশিক্ষা প্রসারে বেসরকারি ও ব্যক্তি উদ্যোগ সম্পর্কে নিবিড় পর্যবেক্ষণ ও গবেষণার প্রয়োজনীতা বোধ থেকেই উপর্যুক্ত শিরোনামে পিএইচ.ডি. গবেষণার বর্তমান প্রস্তাবনা উপস্থাপন করার প্রয়াস নেয়া হয়েছে।

গবেষণাকর্মের ক্ষেত্র ও পরিধি

প্রস্তাবিত গবেষণাকর্মের পরিধি ১৮৪৯ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত। উল্লেখ্য যে বাংলার নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে ১৮৪৯ সালটি হলো মাইলফলক। কেননা এ বছরই বাংলার তৎকালীন জনশিক্ষা বিষয়ক পরিচালক এলিয়ট ড্রিংকওয়াটার বেথুন ব্যক্তিগত উদ্যোগে নারীশিক্ষার প্রতি অনুরাগী এ দেশীয় কয়েকজন সম্ভ্রান্ত হিন্দু ভদ্রলোকের সহায়তায় কলকাতায় একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথমে স্কুলটির নাম ছিল ‘হিন্দু ফিমেল স্কুল’ এবং পরে এর উদ্যোক্তার নামানুসারে এর নাম ‘বেথুন স্কুল’ রাখা হয়। বেথুন স্কুল প্রতিষ্ঠা বাংলায় নারীশিক্ষা প্রসারে একটি মাইলফলক ভিত্তিরূপে কাজ করে। বেথুন স্কুলের সাফল্য দেখে পরবর্তীতে অনেক শিক্ষানুরাগী ব্যক্তির উদ্যোগে কলকাতা এবং বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনে এগিয়ে আসেন। এ কারণেই ১৯৪৯ সালকে প্রস্তাবিত গবেষণার সূচনাবিন্দু ধরা হয়েছে। আর ১৯৪৭ সাল বাংলা তথা

উপমহাদেশের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ছেদ বিন্দু। এ বছর ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তি ভারত ত্যাগ করে এবং ব্রিটিশ শাসিত ভারত 'পাকিস্তান' ও 'ভারত ইউনিয়ন' নামে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়। এতে বাংলাও তার অখণ্ডতা হারায়। দ্বিখণ্ডিত বাংলার পূর্বাঞ্চল পাকিস্তানের সাথে এবং পশ্চিমাঞ্চল ভারতের সাথে যুক্ত হয়। এতে বাংলার ইতিহাসও স্বতন্ত্রখাতে প্রবাহিত হতে শুরু করে। এ জন্যই প্রস্তাবিত গবেষণার শেষবিন্দু হিসেবে অখণ্ড বাংলার শেষ বছর ১৯৪৭ সালকে নির্ধারণ করা হয়েছে। অর্থাৎ ১৮৪৯ সালে বেথুনের স্কুল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাংলায় নারীশিক্ষার ইতিহাসে যে নব ধারার সূচনা হয় এর ধারাবাহিকতায় ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্ত পর্যন্ত এর বিকাশে ব্যক্তি ও বেসরকারি প্রয়াস অনুসন্ধান ও বিচার-বিশ্লেষণ আলোচ্য গবেষণার নির্ধারিত পরিসীমাভুক্ত। তবে গবেষণার অনুসন্ধান ও বিচার-বিশ্লেষণকে সুদূরগ্রাহী করতে অতীত প্রেক্ষাপটে বাংলার নারীশিক্ষার গতি-প্রকৃতিকে গবেষণার সহ-উপজীব্য হিসেবে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। কেননা অতীতের নিরিখে বর্তমানের বিচার বিশ্লেষণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ইতিহাস চর্চা ও অধ্যয়নের দাবি।

গবেষণার উদ্দেশ্য ও যৌক্তিকতা

বর্তমান যুগকে বলা হয় নারীর ক্ষমতায়নের যুগ। এ সময় বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও নারীর ক্ষমতায়নে বিশেষ অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। শুধু শিক্ষা ও সামাজিক ক্ষেত্রে নয়, প্রশাসন ও রাজনীতিতেও বাংলাদেশের নারী সমাজ আজ সুপ্রতিষ্ঠিত। তবে আজকের এ অবস্থানে আসতে বাংলাদেশের নারী সমাজকে পাড়ি দিতে হয়েছে দীর্ঘ সংগ্রামের এক কঠিন ও কণ্টকাকীর্ণ পথ। উনিশ শতকে, এমনকি বিশ শতকের সূচনাপর্বেও শিক্ষাসহ অন্যান্য মানবাধিকার প্রশ্নে বাংলার নারীসমাজ ছিল চরমভাবে পশ্চাদপদ। ঔপনিবেশিক বাংলায় উনিশ শতকের মধ্যভাগেও সরকারি উদ্যোগে নারীসমাজের শিক্ষার কোনো উদ্যোগ দেখা যায় না। তবে সুখের বিষয় হলো এ সময়ের মধ্যেই কিছু দেশি-বিদেশি মহৎপ্রাণ ব্যক্তি নারীজাতির সামগ্রিক ভাগ্যোন্নয়নে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। তাঁদের প্রচেষ্টায় ব্যক্তিগত ও বেসরকারি উদ্যোগে বাংলায় প্রাতিষ্ঠানিক নারীশিক্ষার সূচনা হয়। এরপর এ ক্ষেত্রে সরকারি উদ্যোগ গৃহীত হলেও বাংলায় নারীশিক্ষায় ব্যক্তিগত ও বেসরকারি প্রচেষ্টা সবসময়ই অব্যাহত ছিল। বলতে গেলে এক্ষেত্রে ব্যক্তিগত এবং বেসরকারি খাতের উদ্যোগ–আয়োজনই বিশেষভাবে কার্যকর ও সাফল্য এনেছিল। পর্যালোচনাধীন সময়ে বাংলার নারী জাগরণ বিষয়ে যথেষ্ট আলোচনা-পর্যালোচনা দেখা যায়। এতে প্রাসঙ্গিকভাবে নারীশিক্ষাও স্থান পেয়েছে। এমনকি নারী শিক্ষা বিষয়ে স্বতন্ত্র অধ্যয়ন চর্চাও হয়েছে। তবে এসব ক্ষেত্রে নারীশিক্ষা প্রসারে সরকারি উদ্যোগই আলোচনায় এসেছে। ব্যক্তিগত ও বেসরকারি উদ্যোগ ও প্রচেষ্টায় নারী শিক্ষার প্রসার সম্পর্কে সামগ্রিক বা স্বতন্ত্র কোনো গবেষণা হয়নি। অথচ এ বিষয়ে গবেষণার যথেষ্ট সুযোগ আছে। এ অবস্থায় এ বিষয়ে বর্তমান শিরোনামে পিএইচ. ডি. গবেষণার প্রস্তাব করা হয়। কেননা এর মাধ্যমে আজকের প্রজন্মের

কাছে বাংলাদেশের নারীশিক্ষার প্রসারে ব্যক্তি ও বেসরকারি উদ্যোগ গ্রহণকারী পূর্বসূরি নারী-পুরুষদের অবদান স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হবে। এ বিষয়ে গবেষণার মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য দ্বারা অনুপ্রেরণা, উৎসাহ ও দিক-নির্দেশনা পেয়ে বর্তমান প্রজন্মও নারীসমাজের শিক্ষাসহ বাংলাদেশের সামগ্রিক জাতীয় জীবনের উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে ইতিবাচক ভূমিকা ও অবদান রাখবে বলে আমার বিশ্বাস।

অনুসৃত গবেষণা পদ্ধতি

আলোচ্য গবেষণাকর্মটি সম্পাদন এবং অভিসন্দর্ভ প্রণয়নে সাধারণভাবে মানববিদ্যা ও সামাজিক ইতিহাস গবেষণায় অনুসরণীয় দুটি গবেষণা পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। এর একটি পর্যালোচনামূলক বিশ্লেষণ এবং অন্যটি তথ্যনিষ্ঠ অনুসন্ধান (Analytical & Empirical)। তবে এতে গুণগত গবেষণা পদ্ধতি (qualitative method) প্রাধান্য পেয়েছে। এ পদ্ধতি অনুসরণ করে গবেষণাকর্মের জন্য সংগৃহীত তথ্য-উপাত্ত বাছাইপূর্বক বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণমূলক পর্যালোচনা করা হয়েছে। অনেক জ্ঞাত বিষয়কে নতুন যুক্তিগ্রাহ্য দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যাখ্যা ও বিচার বিশ্লেষণের প্রয়াস নেয়া হয়েছে। গবেষণা কাজের প্রাসঙ্গিক প্রয়োজনে নারীশিক্ষা বিষয়ে অধ্যয়ন ও গবেষণা করেছেন এমন কয়েকজন শিক্ষক ও গবেষকের সাথে আলোচনা করে তাদের লব্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার নিরিখে গবেষণার বিষয়বস্তু পর্যালোচনা ও মূল্যায়নের চেষ্টা করা হয়েছে।

গবেষণায় ব্যবহৃত তথ্য উৎসের পর্যালোচনা

বাংলায় নারী শিক্ষার প্রসারে ব্যক্তি ও বেসরকারি উদ্যোগ (১৮৪৯-১৯৪৭) শীর্ষক গবেষণাকর্ম সম্পাদন এবং অভিসন্দর্ভ প্রণয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সংগৃহীত তথ্য-উপাত্তকে প্রধানত প্রাথমিক এবং দ্বৈতীয়িক (primary & secondary) উৎস হিসেবে ভাগ করা হয়েছে। সরকারি নথিপত্র, শিক্ষা সংক্রান্ত সরকারি রিপোর্ট, সমসাময়িক পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ-নিবন্ধাবলী, গ্রন্থাদি, গবেষণার আলোচ্য বিষয়বস্তুর সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের আত্মজীবনী, জীবনী, স্মৃতিকথা, ব্যক্তিগত ডায়েরি, সংশ্লিষ্ট গবেষণার সাথে সামাঞ্জস্যপূর্ণ বিষয়ে কৃত এফিল ও পিএইচ.ডি.গবেষণার জন্য গবেষকদের রচিত অভিসন্দর্ভ, আদমশুমারীর রিপোর্ট ইত্যাদি প্রাথমিক তথ্যসূত্র হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। প্রাথমিক তথ্যসমূহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ ন্যাশনাল আর্কাইভসসহ কলকাতার বিভিন্ন লাইব্রেরি এবং অভিলেখ্যাগার থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।

দ্বৈতীয়িক উৎস হিসেবে বিভিন্ন গবেষকদের প্রকাশিত গবেষণাকর্ম ও নানা সময়ে প্রকাশিত বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় লেখা প্রবন্ধাবলী ব্যবহার করা হয়েছে। এক্ষেত্রে বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থ ও প্রবন্ধ ব্যবহার করা হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, বর্তমান সময়ে নারী বিষয়ক গবেষণা ও আলোচনা ক্রমশ গুরুত্ব পাচ্ছে। নারী বিষয়ক অধ্যয়ন ও গবেষণার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ হলো নারীশিক্ষা। এতদবিষয়ে কৃত গবেষণাকর্মের কিছু কিছু বিষয় ইতোমধ্যে গ্রন্থাকারেও প্রকাশিত হয়েছে। তবে নারীশিক্ষা বিষয়ে আলোচ্য গবেষণাকর্মের সাথে সংগতিপূর্ণ কাজ বলতে গেলে হয়নি। বর্তমান গবেষণার পরিধিভূক্ত সময়কালে নারীশিক্ষার প্রসার ও উন্নয়নে ব্যক্তি ও বেসরকারি প্রয়াসের উল্লেখযোগ্য অবদান থাকলেও এ বিষয়টি গবেষকদের ততটা নজর কাড়তে পারেনি। এতদসংক্রান্ত গবেষণায় সরকারি প্রচেষ্টাই গুরুত্ব পেয়েছে। কাজেই নারীশিক্ষা বিষয়ক প্রকাশিত গ্রন্থের ক্ষেত্রে সরকারি উদ্যোগের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। অবশ্য প্রাসঙ্গিকভাবে বেসরকারি প্রচেষ্টার কথাও বিক্ষিপ্তভাবে স্থান পেয়েছে। তবে এসব সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এসব রচনার গুরুত্ব কম নয়। আলোচ্য গবেষণায় এসব রচনার বহুল ব্যবহার করা হয়েছে। নিম্নে বর্তমান গবেষণায় ব্যবহৃত কিছু উল্লেখযোগ্য দ্বৈতায়িক তথ্যসূত্রের পর্যালোচনা লিপিবদ্ধ করা হলো।

নারী বিষয়ক গবেষণায় বাংলাদেশের একজন পথিকৃৎ গবেষক অধ্যাপক সোনিয়া নিশাত আমিন। তাঁর পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভ গ্রন্থাকারে *The World of Muslim Women in Colonial Benal (1876-1939),* (Brill, Lieden, 1996) শিরোনামে প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থটি বাংলায় অনূদিত হয় *বাঙালি মুসলিম নারীর আধুনিকায়ন* (১৮৭৬-১৯৩৯ খ্রি.), (অনু. পাপড়ীন নাহার, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ২০০২ খ্রি.) শিরোনামে। এটি বাংলার নারী সম্পর্কিত একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা গ্রন্থ। এ গ্রন্থটিতে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামলে বাংলার নারীদের জীবন ও কর্মের উপর আলোচনা করা হয়েছে। নয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত এ গ্রন্থের ষষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায়ে নারীশিক্ষা প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। গ্রন্থকার তাঁর বর্ণিত সময়ে নারীশিক্ষা বিষয়ে বাঙালি মননের রূপান্তর এবং নারীশিক্ষা প্রসারে নানামুখী তৎপরতা এবং সমাজজীবনে এর প্রভাব-প্রতিক্রিয়া বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। তাঁর আলোচনায় নারীশিক্ষা প্রসারে সরকারি প্রচেষ্টা গুরুত্ব পেলেও প্রসঙ্গক্রমে এতদবিষয়ে ব্যক্তি ও বেসরকারি প্রয়াসও স্থান পেয়েছে। সমসাময়িক বাঙালি নারীদের সাহিত্যচর্চা এবং সমকালীন সাহিত্যে নারীকে কিভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে, সে সম্পর্কেও আলোকপাত করা হয়েছে সোনিয়া নিশাতের গ্রন্থে। এ গ্রন্থটি বাংলায় নারীশিক্ষার প্রসারে ব্যক্তি ও বেসরকারি উদ্যোগ সম্পর্কে পুরোপুরি নির্ভর করার মতো পর্যাপ্ত তথ্য উৎস নেই, তবে বর্তমান গবেষণায় সহায়ক উপাদান হিসেবে কাজে লাগানো হয়েছে।

গোলাম মুরশিদ একজন বাংলাদেশী লেখক, অধ্যাপক ও গবেষক। তাঁর রচিত অন্যতম একটি বিখ্যাত গ্রন্থ হলো *The Reluctant Debunate Response of Bengali Women to Modernization 1849-1905* (Sahitya Samsad, Rajshahi University, 1983)। এ গ্রন্থটির বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করা হয় *সংকোচের বিহ্বলতা: আধুনিকতার অভিঘাতে বঙ্গরমণীর প্রতিক্রিয়া ১৮৪৯-১৯০৫* (বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫)

শিরোনামে। উনিশ শতকে পাশ্চাত্য শিক্ষিত বাঙালি ভদ্রলোকদের একাংশ এদেশীয় নারীদের কিভাবে আধুনিকতা ও নবজাগরণ প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত করেছিলেন এবং নারীসমাজ কিভাবে এতে সাড়া দিয়েছিলেন, এ গ্রন্থটিতে লেখক তা বিচার-বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছেন। পাঁচটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত এ গ্রন্থটির প্রথম অধ্যায়েই উনিশ শতকে বাংলার নারী শিক্ষা প্রসঙ্গটি আলোচিত হয়েছে। প্রাথমিক তথ্যসূত্রের ব্যবহার করে লেখক উনিশ শতকে বাঙালি নারীদের শিক্ষার অবস্থা, নারীশিক্ষার বিকাশে সরকারি প্রয়াসের পাশাপাশি বাঙালি ভদ্রলোকদের উদ্যোগ এবং সমাজে এর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন। গ্রন্থটির শেষ সীমা ১৯০৫ সাল পর্যন্ত হওয়ায় এতে বিশ শতকের প্রথমার্ধেও ঔপনিবেশিক বাংলার নারীশিক্ষা প্রসঙ্গটি অনুপস্থিত রয়েছে। আলোচ্য গ্রন্থটিও বর্তমান গবেষণাকর্মের অংশ বিশেষ করে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে নারীশিক্ষার বেসরকারি প্রচেষ্টার আলোচনায় একটি বিশেষ সহায়ক উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

গোলাম মুরশিদ রচিত অন্যতম গ্রন্থ *সমাজ সংস্কার আন্দোলন ও বাংলা নাটক* (বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৮৪)। এ গ্রন্থটিতেও উনিশ শতকের বাঙালি সমাজ ও নারী প্রসঙ্গ বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে। নারী প্রসঙ্গে আলোচনায় নারীশিক্ষা বিষয়ে উনিশ শতকীয় বঙ্গীয় বাস্তবতা এবং বাংলা নাটকে এর প্রতিফলন বিষয়ে আলোচনা রয়েছে। উল্লেখ্যযোগ্য না হলেও এ গ্রন্থটিতেও বর্তমান গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় কিছু বিক্ষিপ্ত উপকরণ পাওয়া যায়। *নারী প্রগতির একশো বছর রাসসুন্দরী থেকে রোকেয়া* (১৯৯৩) গোলাম মুরশিদ রচিত আরেকটি গ্রন্থ। গ্রন্থটিতে কয়েকজন বাঙালি নারী যেমন- রাসসুন্দরী দেবী, কৈলাসবাসিনী দেবী, জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, তাহেরন নেছা প্রমুখ, উনিশ শতকে নারী জাগরণের পথিকৃৎ কয়েকজন বিশিষ্ট নারী প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। নারীশিক্ষা প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন কারী তাহেরন নেছা এবং রোকেয়া সম্পর্কিত আলোচনার পরিসর বা ব্যাপ্তি স্বল্প হলেও এর বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। এতে ব্যবহৃত তথ্যসূত্রগুলো বর্তমান গবেষণায় সামান্য হলেও ব্যবহারযোগ্য।

নবাব ফয়জুন্নেছা ও পূর্ববঙ্গের মুসলিম সমাজ (বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩) রওশন আরা বেগম রচিত একটি গ্রন্থ। ফয়জুন্নেছা চৌধুরাণী ছিলেন নবাব উপাধি প্রাপ্ত দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম ও একমাত্র নারী। তিনি কেবল একজন জমিদারই ছিলেন না, ছিলেন একজন সমাজ সেবক ও নারীশিক্ষার পথিকৃৎ। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাঙালি, বিশেষ করে মুসলিম সমাজের উন্নয়নে তাঁর নানামুখী কর্মতৎপরতা রওশন আরা বেগম প্রণীত গ্রন্থের মূল প্রতিপাদ্য। এতে নারী শিক্ষা প্রসারে এ মহিয়সী নারীর ভূমিকা পর্যালোচনা করতে গিয়ে লেখক প্রাসঙ্গিকভাবে সমকালীন মুসলিম সমাজে নারীশিক্ষার অবস্থা এবং সে বাস্তবতায় মুসলিম সমাজপতিদের অবস্থানও তুলে ধরেছেন। এ বিষয়টি বর্তমান গবেষণার ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক এবং এ অংশটি সহায়ক উৎস হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।

বাংলায় নারীশিক্ষা ও জাগরণে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের ভূমিকা ও অবদান সর্বাগ্রে স্মরণীয়। স্বরূপসন্ধানী, আত্মপ্রত্যয়ী মহিয়সী নারী রোকেয়ার নারী প্রগতি ও জাগরণের জন্য সংগ্রাম ও সাধনার পূর্ণাঙ্গ ইতিবৃত্ত গ্রন্থিত হয়েছে *রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন: জীবন ও সাহিত্যকর্ম* (বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৯) শিরোনামের একটি গ্রন্থে। গ্রন্থটির লেখক মোহাম্মদ শামসুল আলম। তিনটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত এ গ্রন্থটির প্রথম অধ্যায়ে উনিশ শতকের বাংলার নবজাগরণ ও নারীমুক্তি সম্পর্কে বাঙালি সমাজের ভাবনা প্রকাশ পেয়েছে। প্রসঙ্গত, লেখক বাঙালি সমাজে নারী পরিস্থিতি এবং নারীশিক্ষা ও নারীমুক্তি ভাবনা বিষয়ে বিশেষ আলোকপাত করেছেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রতিকুল পরিবেশে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন কর্তৃক নারীশিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে নানামুখী কার্যক্রমের সবিস্তার আলোচনা করা হয়েছে। শেষ অধ্যায়ে পিতৃতান্ত্রিক পরিবারে নানা কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ও অবরোধপ্রথার মধ্যে থেকে নারীদের জাগরণের প্রয়াসে রোকেয়ার সাহিত্যচর্চার বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। এটি জীবনীমূলক গ্রন্থ হলেও বাংলায় নারী জাগরণ বিশেষ করে নারীশিক্ষা প্রসারে ব্যক্তি উদ্যোগ সম্পর্কিত গবেষণার জন্য একটি অপরিহার্য উপাদান হিসেবে বিবেচনার দাবি রাখে। তবে এ কথাও সত্য যে, এটি বাংলায় নারীশিক্ষার প্রসারে সরকারি উদ্যোগ বহির্ভূত তথ্যের জন্য পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ নয়।

বাংলায় নারীশিক্ষার প্রসারে রোকেয়ার প্রয়াস সংক্রান্ত মূল্যবান তথ্যভাণ্ডার হিসেবে বিবেচনার দাবি রাখে এমন আরো কয়েকটি গ্রন্থের মধ্যে তাহ্‌মিনা আলম রচিত *বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন: চিন্তা চেতনার ধারা ও সমাজকর্ম* (বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৯২); আবদুল মান্নান সৈয়দ, *বেগম রোকেয়া*, (ঢাকা, ১৯৮৩); মোতাহার হোসেন সুফী, *বেগম রোকেয়া: জীবন ও সাহিত্য*, (ঢাকা, ১৯৮৬); শামসুন নাহার, রোকেয়া জীবনী (ঢাকা, ১৯৫৮); ফরিদা প্রধান সম্পাদিত, বেগম রোকেয়া ও নারীজাগরণ (ঢাকা, ২০০৫) এবং ইফতেখার রসুল জর্জম নালী মুক্তির পথিকৃৎ বেগম রোকেয়া, (ঢাকা, ২০১২) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। পরিপূর্ণভাবে সহায়ক না হলেও উল্লিখিত গ্রন্থসমূহ থেকে বর্তমান অভিসন্দর্ভ রচনায় কিছু সহায়ক উপকরণ গ্রহণ করা হয়েছে।

ঔপনিবেশিক বাংলার নারী (ঢাকা, ২০২৩) আরিফা সুলতানা রচিত একটি গ্রন্থ। এতে ঔপনিবেশিক যুগে বাঙালি নারীর আত্ম- শেকড়ের অনুসন্ধান প্রয়াস রয়েছে। ঔপনিবেশিক বাংলার নারী ইতিহাসের নানা প্রসঙ্গ আলোচনায় লেখক সমাজে নারীর অবস্থান এবং নারীশিক্ষার প্রসঙ্গটিও অবতারণা করেছেন। এতে 'উনিশ শতকে বাংলায় নারী শিক্ষা'; 'প্রবাসী পত্রিকায় নারী শিক্ষা প্রসঙ্গ: ১৯০১ -১৯৪৭' এবং 'ঔপনিবেশিক বাংলায় নারীশিক্ষা: পুরুষ ভাবনা' শিরোনামে নারীশিক্ষা বিষয়ে তিনটি অধ্যায় রয়েছে। এ গ্রন্থটিতে বর্তমান গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় ও সহায়ক কিছু তথ্যসূত্র রয়েছে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপনা করেন সারদা ঘোষ। তাঁর রচিত একটি গ্রন্থের শিরোনাম *নারীচেতনা ও সংগঠন: ঔপনিবেশিক বাংলা ১৮২৯-১৯২৫* (প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা,

২০১৩)। উনিশ শতকের ত্রিশের দশক থেকে বিশ শতকের বিশের দশক পর্যন্ত ঐতিহাসিক কালপর্বে বাংলার আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক জীবনে যে রূপান্তর ঘটেছিল, তাতে নিজেদের শামিল করার জন্য বাঙালি নারীরা ব্যক্তি প্রয়াসের সাথে সাথে সাংগঠনিকভাবে নিজেদের ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন। এমনই কতিপয় নারী সংগঠনের ইতিহাসকে কেন্দ্র করে বাংলায় নারীচেতনার বিকাশ সম্পর্কিত তথ্যনির্ভর আলোচনা স্থান পেয়েছে এ গ্রন্থটিতে। তিনটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত এ গ্রন্থটিতে নারীশিক্ষা প্রসঙ্গে কোনো স্বতন্ত্র অধ্যায় নেই। তবে বিভিন্ন নারী সংগঠন সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক আলোচনায় নারীশিক্ষা প্রসারে এদের কার্যক্রম স্থান পেয়েছে। বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত গ্রন্থটির আলোচ্যসীমা প্রসারিত হওয়ায় বর্তমান অভিসন্দর্ভটি প্রণয়নে এ গ্রন্থটি একটি সহায়ক তথ্য-উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

আধুনিকতার অভিমুখে বঙ্গনারী (কলকাতা ২০০৫) সুনীতা বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত একটি বিশ্লেষণধর্মী গবেষণা গ্রন্থ। গ্রন্থটির কালসীমা ১৮১৪ থেকে ১৮৭২ সাল পর্যন্ত। উনিশ শতকে নারীকে নতুনভাবে বিনির্মানের প্রয়াস দেখা যায় বাংলায়। বাঙালি সমাজ সংস্কারকগণ নতুন সমাজ কাঠামো নির্মাণের প্রয়োজনে সমাজের অর্ধেক অংশ নারীকে নতুন ভাবে গড়ে তোলায় প্রয়াসী হন। এর ফলে নারীদের মধ্যেও আত্মসচেতনতাবোধ জাগ্রত হয়। তাদের মধ্যে কতিপয় অগ্রণী নারী স্বজাতির মুক্তির পথ প্রশস্তকরণে এগিয়ে আসেন। এ গ্রন্থে লেখক সুনীতা বন্দ্যোপাধ্যায় এ সকল মহিয়সী নারীর ভূমিকা বিশ্লেষণ করে বাংলার সামাজিক ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করেছেন। বস্তুত সমকালীন বাংলার সমাজ জীবনের এক স্বচ্ছ চিত্র পাওয়া যায় আলোচ্য গ্রন্থে। ছয়টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত এ গ্রন্থটির পঞ্চম অধ্যায়ের শিরোনাম 'বাঙালি সমাজে স্ত্রীশিক্ষা'। বর্তমান অভিসন্দর্ভের জন্য এ অধ্যায়টি বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক। তবে সময়সীমা বিবেচনায় এ গ্রন্থের নারীশিক্ষা বিষয়ক অধ্যায়টি বর্তমান গবেষণাকর্মের খুব অল্প তথ্যের উৎস হিসেবে বিবেচ্য।

নারী বিষয়ক একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো Anowar Hossain এর *Muslim Women's Struggle for Freedom in Colonial Bengal 1873-1940* (Chittabarta Palit, Kolkata, 2008) গ্রন্থটি। এ গ্রন্থটি *স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার মুসলিম নারী ১৮৭৩-১৯৪০* (২০০৬) শিরোনামে বাংলায় অনূদিত হয়েছে। সাতটি অধ্যায়ে বিভক্ত এ গ্রন্থটিতে প্রাক-ইসলামি যুগ থেকে শুরু করে আধুনিক যুগ পর্যন্ত নারীর সামাজিক অবস্থা এবং নারী কেন্দ্রিক নানা সীমাবদ্ধতার কথা তুলে ধরা হয়েছে। উনিশ শতকের নবজাগরণের প্রভাবে বাঙালি নারীদের জেগে ওঠা, বিশেষ করে নারী শিক্ষা সম্পর্কে এতে আলোকপাত করা হয়েছে। এ গ্রন্থটির বিশেষত্ব হলো এখানে মুসলিম নারীদের শিক্ষা এবং পরিবর্তিত অবস্থায় অন্দরমহল থেকে রাজপথের রাজনীতি ও ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে তাদের অংশগ্রহণ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। মুসলিম নারীদের সম্পর্কে এরূপ স্বতন্ত্র অধ্যয়নের জন্য এ গ্রন্থটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

শাহিদা পারভীন রচিত *শামসুন নাহার মাহমুদ ও সমকালীন নারী সমাজের অগ্রগতি* (বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১২) গ্রন্থটিও নারী বিষয়ক অধ্যয়নের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উৎস। এ গ্রন্থে বাংলায় নারী জাগরণ ও আন্দোলনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ও নিরলসকর্মী শামসুন নাহার মাহমুদের জীবন, তাঁর নারীশিক্ষা ও নারী কল্যাণমূলক কার্যাবলী ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এটি একটি জীবনী গ্রন্থ হলেও বাংলায় নারী জাগরণ বিষয়ক গবেষণায় এ পুস্তকটির প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

ব্রিটিশ আমলে বাংলার মুসলিম শিক্ষা সমস্যা ও প্রসার (বাংলা একাডেমী, ঢাকা ২০০৮) মো. আবদুল্লাহ আল-মাসুম রচিত একটি পরিধিবহুল গ্রন্থ। গ্রন্থটির সময়কাল ১৮৭১ থেকে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত। গ্রন্থটিতে লেখক সমকালীন সরকারি ও বেসরকারি নির্ভরযোগ্য তথ্যসূত্র ব্যবহার করে ঔপনিবেশিক শাসনাধীন বাংলার মুসলিম শিক্ষার সমস্যা ও প্রসার সংক্রান্ত বিষয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করেছেন। ৮টি অধ্যায়ে বিভক্ত গ্রন্থটিতে সপ্তম অধ্যায়টি নারীশিক্ষা বিষয়ক। এ অধ্যায়ে লেখক তথ্য পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে তাঁর বর্ণিত সময়ে মুসলিম নারী শিক্ষার গতি-প্রকৃতি পর্যালোচনা করেছেন। তবে তাঁর আলোচনায় প্রাসঙ্গিকভাবে বেসরকারি ও ব্যক্তি উদ্যোগের কথা আসলেও তুলনামূলকভাবে নারীশিক্ষা প্রসারে সরকারি প্রচেষ্টার বর্ণনাই প্রাধান্য পেয়েছে। এতদসত্ত্বেও আলোচ্য গ্রন্থটি ঔপনিবেশিক বাংলায় নারীশিক্ষা, বিশেষ করে মুসলিম নারীশিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যভাণ্ডার। বর্তমান গবেষণায় এ গ্রন্থটিকেও একটি সহায়ক সূত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।

বাংলার মুসলিম সমাজে আধুনিক শিক্ষার অগ্রগতি (১৮৮৫-১৯২১) মো. আবদুল্লাহ আল-মাসুম রচিত আরেকটি গ্রন্থ। এ গ্রন্থটিও বাংলা একাডেমী, ঢাকা থেকে ২০০৭ সালে প্রকাশিত হয়েছে। এটি লেখকের এম.ফিল. গবেষণার পরিমার্জিত গ্রন্থরূপ। গ্রন্থটিতে ঔপনিবেশিক বাংলায় মুসলমানদের আধুনিক শিক্ষার অগ্রগতি এবং শিক্ষা বিষয়ক অন্যান্য প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। ৬টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত এ গ্রন্থটির ষষ্ঠ অধ্যায়টি নারীশিক্ষা বিষয়ক। তবে এতেও নারীশিক্ষা প্রসারে সরকারি উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা এবং এর ফলাফল আলোচনাই প্রাধান্য পেয়েছে। এতদবিষয়ে ব্যক্তি ও বেসরকারি প্রচেষ্টার যেটুকু আলোচনা রয়েছে তাও বর্তমান গবেষণাকর্মের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

অভিসন্দর্ভের অধ্যায় বিন্যাস

বাংলায় নারী শিক্ষার প্রসারে ব্যক্তি ও বেসরকারি উদ্যোগ ((১৮৪৯-১৯৪৭) শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি ভূমিকা ও উপসংহার ছাড়াও মোট সাতটি অধ্যায়ে বিভক্ত।

ভূমিকা: অভিসন্দর্ভের ভূমিকায় আলোচ্য গবেষণাকর্মের ক্ষেত্র ও পরিধি নির্ধারণসহ বিষয়বস্তু এবং গবেষণার যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। গবেষণা অভিসন্দর্ভ প্রণয়নে বিদ্যমান দ্বৈতায়িক সহায়ক তথ্য-উপাত্তেরও একটি পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন সংযোজন করা হয়েছে ভূমিকায়। প্রাসঙ্গিক কারণে এতে অভিসন্দর্ভের গঠন কাঠামো বা অধ্যায় বিন্যাসও স্থান পেয়েছে।

প্রথম অধ্যায়: অভিসন্দর্ভের প্রথম অধ্যায়ের শিরোনাম **' উনিশ শতকে বাংলায় নবজাগরণ ও নারীসমাজ'**। এ অধ্যায়ে উনিশ শতকে ঔপনিবেশিক বাংলায় নবজাগরণ এবং এর প্রভাবে নারী জাগরণ বিষয়ে নানা উদ্যোগ ও পদক্ষেপ সম্পর্কে আলোচনা ও পর্যালোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়: 'বাংলায় নারীশিক্ষার ঐতিহাসিক পটভূমি' শিরোনামে অভিসন্দর্ভের দ্বিতীয় অধ্যায়ে বাংলায় নারী শিক্ষার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। এ অধ্যায়ে প্রাচীন কাল থেকে উনিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত বাংলায় নারীশিক্ষার একটি লেখচিত্র অংকনের প্রয়াস নেয়া হয়েছে। এ অধ্যায়ের আলোচনার সূত্রপাত হয়েছে গুপ্ত যুগ থেকে এবং সমাপ্তি টানা হয়েছে উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলায় নারীশিক্ষা প্রসারে খ্রিস্টান মিশনারি উদ্যোগ বর্ণনার মাধ্যমে।

তৃতীয় অধ্যায়: অভিসন্দর্ভের তৃতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম **'উনিশ শতকের সংবাদ-সাময়িক পত্র ও সাহিত্যে নারীশিক্ষা প্রসঙ্গ'**। উনিশ শতকে নবজাগরণের সূত্র ধরে বাংলায় নারী সমাজের অবস্থার উন্নয়নে সমাজপতিদের তৎপরতা পরিলক্ষিত হয়। নারীমুক্তির অত্যাবশকীয় শর্ত হিসেবে তারা নারীশিক্ষার বিষয়ে আগ্রহী হন। তবে তখনো বৃহত্তর বাঙালি সমাজ নারীশিক্ষার বিপক্ষে ছিলেন। এমতাবস্থায় নারীশিক্ষার সমর্থক বাঙালি বুদ্ধিজীবী ও সমাজপতিগণ নারীশিক্ষার প্রতি জনমত তৈরির কর্মসূচি গ্রহণ করেন। তাঁরা নারীশিক্ষার পক্ষে জনমত তৈরি ও একটি মনস্তাত্ত্বিক পটভূমি বিনির্মাণের লক্ষ্যে বক্তৃতা-বিবৃতি ছাড়াও সমকালীন সংবাদ ও সাময়িকপত্রে নারীশিক্ষার পক্ষে প্রচারণা চালান। অনেকে আবার পুস্তক-পুস্তিকা রচনার মাধ্যমে নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ব্যাপারে বাঙালি সমাজকে সচেতন করার উদ্যোগ নেন। তৃতীয় অধ্যায়ে নারীশিক্ষার পক্ষে জনমত তৈরির এ প্রচেষ্টা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়: 'বাংলায় নারীশিক্ষা প্রসারে ব্যক্তি ও বেসরকারি সাংগঠনিক প্রয়াস (১৮৪৯-১৯০৫ খ্রি.)' অভিসন্দর্ভের চতুর্থ অধ্যায়ের শিরোনাম। খ্রিস্টান মিশনারিদের মাধ্যমে উনিশ শতকে বাংলায় নারীশিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম সূচনা হলেও এর সাফল্য ছিল সামান্যই। এ অবস্থায় বাংলায় নারীশিক্ষা প্রসারে শিক্ষিত ও প্রগতিশীল বাঙালিদের অনেকেই ব্যক্তিগতভাবে এবং বেসরকারি পর্যায়ে সাংগঠনিক উদ্যোগে নারীশিক্ষা

প্রসারে তৎপর হন। ১৮৪৯ সালে বেথুন স্কুল প্রতিষ্ঠা থেকে ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ পর্যন্ত সময়কালে ব্যক্তিগত ও সাংগঠনিক উদ্যোগে বাংলায় নারীশিক্ষা প্রসারের নানা দিক আলোচনা করা হয়েছে এ অধ্যায়টিতে।

পঞ্চম অধ্যায়ঃ অভিসন্দর্ভের এ অধ্যায়টির শিরোনাম **'উনিশ শতকে বাঙালি মুসলিম সমাজে নারীশিক্ষা প্রসারে বেসরকারি প্রয়াসঃ গতি-প্রকৃতি অনুসন্ধান'**। ঔপনিবেশিক যুগে অবিভক্ত বাংলার জনসংখ্যার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ছিল মুসলিম। কিন্তু সার্বিক বিবেচনায় এ সময় মুসলিম জনগোষ্ঠী তাদের প্রতিবেশি হিন্দু সমাজ অপেক্ষা পশ্চাদপদ ছিল। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে নারীশিক্ষায় হিন্দু সমাজ যতটা অগ্রসর হয়েছিল, মুসলিম সমাজ সে তুলনায় অনেকটাই পিছিয়ে ছিল। ব্যক্তি ও বেসরকারি উদ্যোগের বাইরেও সরকারি ব্যবস্থাপনায় প্রচলিত নারীশিক্ষার সুযোগ হিন্দুরা যতটুকু গ্রহণ করেছিল, মুসলমানরা তা পারেনি। ফলে নারীশিক্ষায় তারা অনেকটাই পশ্চাদপদ অবস্থায় ছিল। পঞ্চম অধ্যায়ে উনিশ শতকে নারীশিক্ষা প্রসারে বাঙালি মুসলিম সমাজের প্রচেষ্টা ও উদ্যোগের গতি-প্রকৃতি নির্ণয়ের চেষ্টা করা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ 'বাংলায় মুসলিম নারীশিক্ষার প্রসারে ব্যক্তি ও বেসরকারি প্রচেষ্টাঃ মধ্য বিশ শতক পর্যন্ত' শিরোনামে ষষ্ঠ অধ্যায়ে ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তিকাল পর্যন্ত মুসলিম সমাজে নারীশিক্ষা প্রসারে ব্যক্তি ও বেসরকারি উদ্যোগের নানা দিক আলোচনা করা হয়েছে।

সপ্তম অধ্যায়ঃ বাংলায় নারীশিক্ষা প্রসারে অমুসলিম ব্যক্তি ও সাংগঠনিক প্রয়াস (১৯০৫-১৯৪৭ খ্রি.) অভিসন্দর্ভের সপ্তম অধ্যায়ের শিরোনাম। এ অধ্যায়টি চতুর্থ অধ্যায়ের ধারাবাহিকতা। চতুর্থ অধ্যায়ে ১৮৪৯ সাল থেকে ১৯০৫ সাল পর্যন্ত নারীশিক্ষা প্রসারে অমুসলিম ব্যক্তি ও বেসরকারি প্রয়াস পর্যালোচনা করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত একই সম্প্রদায়ের নারীশিক্ষা প্রসারে ব্যক্তিগত ও বেসরকারি প্রচেষ্টার উপর আলোকপাত করা হয়েছে বর্তমান অধ্যায়ে।

উপসংহারঃ সপ্তম অধ্যায় শেষে রয়েছে উপসংহার। অভিসন্দর্ভের বিভিন্ন অধ্যায়ের মূল বক্তব্যের সার নির্যাস সম্পর্কিত বক্তব্য স্থান পেয়েছে উপসংহারে।

অভিসন্দর্ভের শেষদিকে একাধিক পরিশিষ্টে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোকচিত্রসহ কিছু দলিলাদি যুক্ত করা হয়েছে। সবশেষে রয়েছে এ গবেষণাকর্মে ব্যবহৃত সহায়ক তথ্য ও গ্রন্থপঞ্জির একটি তালিকা।

প্রথম অধ্যায়

উনিশ শতকে বাংলায় নবজাগরণ ও নারীসমাজ

বাংলায় নবজাগরণ বা নবজিজ্ঞাসা

বাংলার ইতিহাসে উনিশ শতক হলো একটি যুগসন্ধিক্ষণ। এ শতককে বাংলার নবজাগরণ বা নবজিজ্ঞাসার যুগ বলা হয়। এ কথা মোটামুটিভাবে স্বীকৃত যে, উনিশ শতকে বাংলায় এক নতুন যুগের সুচনা হয় এবং রাজনীতি, সমাজ, ধর্ম ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে ক্ষয়িষ্ণু ও রক্ষণশীল মনোভাবের বিরুদ্ধে এ যুগেই এক নবজাগরণের সূচনা হয়। অনেকে এ শতককে বাংলার ইতিহাসের 'রেনেসাঁ'র কালও বলে থাকেন। ফরাসি ভাষার রেনেসাঁ শব্দটির বাংলা একাধিক প্রতিশব্দ রয়েছে। তবে রেনেসাঁস অর্থে বাংলায় বহুল প্রচলিত শব্দটি হলো নবজাগরণ। ইউরোপে রেনেসাঁর উদ্ভব ঘটেছিল ইতালিতে পঞ্চদশ শতকে এবং পরে তা ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও জার্মানিসহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ে। রেনেসাঁসের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে আহমদ শরীফ বলেছেন-

> বহুকাল ধরে অবক্ষয়গ্রস্ত একটা দেশের কালের ও সমাজের কিছু শিক্ষিত মানুষ নতুন চিন্তায়- চেতনায় প্রবুদ্ধ হয়ে এতকালের জাতীয় জড়তার ও জীর্ণতার মধ্যে জীবনের ও জীবিকার নানা ক্ষেত্রে কথায়, কাজে, লেখায়, নতুন কিছু বলে, গড়ে, লিখে এবং এঁকে জনগণকে নতুন কিছু শিখিয়ে, জানিয়ে লোকমনে শক্তি, সাহস, আত্মপ্রত্যয় ও আশা জাগিয়ে এবং মাটির ও মানুষের প্রতি, স্বদেশের ও স্বভাষার প্রতি, জগতের ও জীবনের প্রতি মানুষের অনুরাগ বাড়িয়ে–এককথায় যা কিছু শ্রেয় সেসবের প্রতি সাধারণকে আকৃষ্ট করে– জাতীয় জীবনে যে উন্নয়ন ও উত্তরণ ঘটান তারই নাম রেনেসাঁস। সংজ্ঞাবদ্ধ করলে রেনেসাঁস মানে– জীবন ও জগৎজিজ্ঞাসা, অমিত কৌতূহল, সন্ধিৎসা, সিসৃক্ষা- নির্মিৎসা, উপচিকীর্ষা, শ্রেয়োচেতনা, মর্ত্যপ্রীতি, জীবনানুরাগ আর রূপতৃষ্ণা বা সৌন্দর্যচেতনা প্রভৃতির সামূহিক ও সামষ্টিক অভিব্যক্তি।[১]

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনাধীনে পাশ্চাত্য সভ্যতা, শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভাব জনজীবনকে বিশেষভাবে নাড়া দেয়। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনে পরিবর্তনের পাশাপাশি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনাচারণেও পরিবর্তন ঘটে। জীবনদৃষ্টিতে পরিবর্তন ও আত্মসচেতনতা বৃদ্ধির ফলে উনিশ শতকে এদেশের পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত একটি নব্য শ্রেণির মধ্যে নতুন জীবন জিজ্ঞাসার সূত্রপাত হয়। এজন্য উনিশ শতককে অনেকেই বলে থাকেন নবজিজ্ঞাসর যুগ।[২] বিপিনচন্দ্র পাল (১৮৫৬-১৯৩২) তাঁর আত্মজীবনী *Memories of My Life and Time* গ্রন্থে উনিশ শতকে বিবেচনা করেছেন বাংলার নবজাগরণের গৌরবময় কাল হিসেবে।[৩] গোলাম মুরশিদ লিখেছেন যে,

---

১. আহমদ শরীফ, *বাঙলা, বাঙালী ও বাঙালীত্ব*, অনন্যা, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ১৮৭

২. স্বপন বসু, *উনিশ শতকে বাংলায় নব চেতনা: উদ্ভব, বিকাশ ও পরিণতি*, পরিবর্ধিত সুবর্ণ সংস্করণ, সুবর্ণ, ঢাকা, ২০১১, পৃ. ১৭

৩. দ্রষ্টব্য, মুহম্মদ শামসুল আলম, রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন: জীবন ও সাহিত্যকর্ম, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৯, পৃ. ৮

খানিকটা নতুন সেক্যুলার মূল্যবোধের উন্মেষ ও বিকাশ, খানিকটা পাশ্চাত্যের জীবনধারার অনুকরণবশত এবং খানিকটা নগরায়ণজাত সচলতার ফলে উনিশ শতকের বাংলায় নানা ধরনের সামাজিক পরিবর্তন ও সমাজ-সংস্কারের প্রয়োজন অনিবার্য হয়ে পড়েছিল।[৪] এর মধ্য দিয়ে যে পরিবর্তনের সূচনা হয় একে বলা হয় বাংলার নবজাগরণ। বাংলার নবজাগরণের কালসীমা ধরা হয় উনিশ শতকের শেষ পর্যন্ত সময়কে। বাংলার নবজাগরণের পেছনে রয়েছে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনজাত কিছু প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া।

আঠারো শতকের শেষার্ধে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এখানকার আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থাতে আমূল পরিবর্তন ঘটতে থাকে। কার্ল মার্ক্স এর ভাষ্য মতে, ইংরেজ শাসন ভারতীয় সমাজের গোটা কাঠামোটিকেই ভেঙে দিয়েছিল। ব্রিটিশশাসিত হিন্দুস্তানকে তার সকল প্রাচীন ঐতিহ্য ও সমগ্র অতীত ইতিহাস থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছিল।[৫] বস্তুত ব্রিটিশ শাসনের অভিঘাতের ফলে বাংলার কৃষিনির্ভর অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থার স্থলে শিল্পনির্ভর অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। নতুন সমাজকাঠামোর ভিত্তিতে গড়ে ওঠে নতুন সামাজিক শ্রেণিবিন্যাস, বিকাশ ঘটে বণিক, মুৎসুদ্দি, দালাল, জমিব্যবসায়ী ও ক্ষুদ্র আকারের শিল্প বিনিয়োগকারী পুঁজিপতি শ্রেণির মতো এদেশীয় বুর্জোয়া শ্রেণির। পাশাপাশি এ সময়ে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণির উদ্ভব ঘটে। বলা হয় যে, ১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে বাংলায় একটি নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণির আবির্ভাব ঘটে। হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার ফলে পাশ্চাত্য শিক্ষার সঙ্গে প্রকৃত ইংরেজি শিক্ষার সূচনা হলে একটি শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশ আরম্ভ হয়।[৬] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বাঙালি এ নব্য মধ্যবিত্ত শ্রেণির উন্মেষ হয়েছিল মূলত বর্ণ হিন্দুদের মধ্য থেকে। নিম্নবর্ণের হিন্দু এমনকি মুসলিম সম্প্রদায় তখনো এ শ্রেণিতে ঠাঁই পায়নি। মধ্যবিত্ত শ্রেণিতে মুসলিম সমাজের অন্তর্ভুক্তি শুরু হয় উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে। যা'হোক মধ্যবিত্ত শ্রেণির আবির্ভাব বাংলার সামাজিক ইতিহাসে এক নতুন দিগন্তের দ্বার উন্মুক্ত করে। ইংরেজ প্রবর্তিত পশ্চিমা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত এ শ্রেণির মধ্যে একই সঙ্গে পাশ্চাত্য যুক্তিবাদ ও উদার দৃষ্টিভঙ্গির সংমিশ্রণ ঘটায় তারা আত্মসমীক্ষার পথে পা বাড়ান। উনিশ শতকে বাংলার নবজিজ্ঞাসার ধারক ও বাহক বলা যায় এ শিক্ষিত-মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী শ্রেণিকে।

পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞান লাভের ফলে এদেশে ইংরেজি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির মন ক্রমেই নিজেদের ঐতিহ্যমূল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে থাকে। হিন্দু সমাজের চিরাচরিত আচার-ব্যবস্থা, রীতিনীতি, প্রথা, সংস্কার, ঐতিহ্য ইত্যাদির প্রতি ক্রমেই তাদের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসহীনতা দেখা দেয়। হিন্দুধর্মের

৪. গোলম মুরশিদ, *সমাজ সংস্কার আন্দোলন ও বাংলা নাটক*, বাংলা একাডেসউ, ঢাকা, ১৯৮৪, পৃ. ৪

৫. দ্রষ্টব্য, ছবি বসু, *বাংলার নারী আন্দোলন*, ছবি বসুর রচনা সংকলন, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃ. ২৭১

৬. আরিফা সুলতানা, *ঔপনিবেশিক বাংলার নারী*, অবসর, ঢাকা, ২০২৩, পৃ. ৪

প্রতিও তাদের উদাসীনতা, কোনো কোনো ক্ষেত্রে উপেক্ষা প্রকাশ পেতে থাকে।[৭] এর অনিবার্য ফল হিসেবে পাশ্চাত্য ভাবধারা, জীবনদর্শন, রাজনীতি, মূল্যবোধ ও মানসিকতার সাথে দেশি ঐতিহ্যের সংঘাত ও সমন্বয় প্রয়াস শুরু হয়। স্বপন বসু উনিশ শতকে বাংলার এ নবজিজ্ঞাসা বা নবজাগরণের সূচনাপর্বে তিনটি দৃশ্যমান পরিবর্তনকে চিহ্নিত করেছেন। প্রথমত, এ সময়ে বাঙালিজীবন পুরোপুরি দৈবনির্ভরতা কাটিয়ে কিছুটা মানবমুখী হয়ে ওঠে এবং মানুষ কিছুটা নিজের উপর বিশ্বাস ফিরে পায়। দ্বিতীয়ত, অদৃষ্টবাদী বাঙালির জীবনে যুক্তিবাদ স্বল্পমাত্রায় হলেও প্রবেশাধিকার পায়। ফলে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালি হয়ে ওঠে ইহমুখী, আর একই সঙ্গে অদৃষ্টের উপর নির্ভর না করে সে তার নিজের ভাগ্য নির্মাণে ব্রতী হয়। তৃতীয়ত, এই সময়ে সমাজে কিছুটা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য স্বীকৃত হয়, যার বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

সমগ্র উনিশ শতক ধরে বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণি হিন্দুধর্ম ও সমাজের বিভিন্ন সংস্কার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বাংলায় উনিশ শতকের নব জাগরণের যুগে সংস্কার আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণি। তবে ইংরেজি শিক্ষিত নন, সংস্কৃত বিদ্যালয়ে শিক্ষিত এরকম সংস্কৃতজ্ঞ বাঙালি পণ্ডিতদের মধ্যেও কেউ কেউ প্রগতিশীল সামাজিক আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে যেমন- গৌরশঙ্কর তর্কবাগীশ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রমুখের নামোল্লেখযোগ্য। পাশ্চাত্যভাব শুধু যে ইংরেজি বিদ্যালয়ের সীমানার মধ্যে আবদ্ধ ছিল তা নয়, তার বাইরে অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও এর প্রভাব পড়েছিল। নতুন জীবনদর্শন ও সামাজিক আদর্শ তাই বাংলার পাশ্চাত্যপন্থি ও সংস্কৃতপন্থি উভয় শ্রেণির শিক্ষিতদের অনুপ্রাণিত করেছিল।

১. ১ প্রাক-নবজাগরণ যুগে বাংলায় নারীর অবস্থা

ইতিহাস বিশ্লেষণে দেখা যায়, যে উনিশ শতকে বাংলার নবজাগরণ বা নবজিজ্ঞাসার যুগে সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে প্রাধান্য নারী প্রশ্নটি বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। যে কারণে উনিশ শতককে অনেকে ‘নারীযুগ’ হিসেবেও অভিহিত করেন। রাধা কুমার তাঁর *History of Doing* গ্রন্থে বলেন, “The nineteenth century could well be called an age of women, for all over the world their rights and wrongs, their ‘nature’, capacities and potential were the subjects of heated discussion.”[৮] নবজাগরণের যুগে নারীকে ভোগ্যবস্তু হিসেবে না দেখে স্বতন্ত্র ব্যক্তি হিসেবে মর্যাদা দেবার চর্চা শুরু হয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, সভ্যতার ঊষালগ্নে নারী-পুরুষের মধ্যে বৈষম্যমুক্ত সমক্ষমতা সম্পর্কের পরিবেশ বিরাজমান ছিল বলে সমাজতত্ত্ববিদগণ মনে করেন। কিন্তু পরবর্তীতে নানামুখী সামাজিক বিরূপ পরিস্থিতিতে অবস্থার

---

৭. বিনয় ঘোষ, *বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা (১৮০০-১৯০০)*, বুক ক্লাব, কলকাতা, ১৯৬৮, পৃ. ১৮৩

৮. Radha Kumar, *History of Doing: An Ilustrated Account of Movement for Women’s Rights and Feminism In India, 1800-1990,* New delhi, 2002, p. 7

পরিবর্তন ঘটে। সম্পদ ও সম্পত্তিতে ব্যক্তি মালিকানার চিন্তা, পতিত্ব ও পিতৃপরিচয় নির্ভর পারিবারিক ও সামাজিক ধারার বিকাশের প্রেক্ষাপটে নারী ও পুরুষের মধ্যে সাম্যর সম্পর্ক ক্রমশ শিথিল হতে থাকে এবং তাদের মধ্যকার বৈষম্যমূলক অবস্থা শক্তভিত্তি লাভ করে। পরবর্তী সময়ে জ্ঞাতি সম্পর্ক, সমাজ-সংস্কৃতি, ধর্ম ও রাষ্ট্রশক্তি নারী পুরুষের অসম সম্পর্ককে শুধু লালন করেনি, বরং নারীর উপর পুরুষের শাসন ও শ্রেষ্ঠত্বকে স্বীকৃতি দেয়। এমনকি কালের পরিক্রমায় নারীর উপর পুরুষের নির্যাতন ও অত্যাচার সমাজের চোখে অনেকটাই স্বাভাবিক এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে শাস্ত্রসিদ্ধ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। অনেক দেশে এমনকি ভারতবর্ষে দীর্ঘদিন এ ধারণা প্রতিষ্ঠিত থাকে যে, সর্বগুণে গুণান্বিত নারীও অধম পুরুষের চাইতে হীন। এরূপ সমাজ বাস্তবতায় নারী জাতি কেবল ভোগ্য ও সন্তান উৎপাদকে পরিণত হয়। আলোচ্য বাংলা অঞ্চলেও দীর্ঘকাল ধরে নারী সমাজ এরূপ অধঃপতিত অবস্থার মধ্যে নিপতিত ছিল।

বঙ্গ-ভারতে নারী জাতির অবদমনের সময়কাল হিসেবে ঐতিহাসিকগণ আর্য-অনার্য সংমিশ্রণের যুগকে নির্দেশ করেন। তাঁদের মধ্যে আর্য সম্ভ্রান্ত পুরুষ কর্তৃক অনার্য নারীদের বিবাহ করার ফলে নারীদের সামাজিক অবস্থানের ক্রমঅধোগতি শুরু হয়। আর্য সমাজ অনার্য নারীদের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের অধিকার কেড়ে নেয়াসহ অনেক সামাজিক ও মানবিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করে। বাল্য বিবাহকে পূণ্যের কাজ আখ্যা দিয়ে এর ব্যাপক প্রচলন ঘটানো হয়। বাল্য বিবাহের প্রত্যক্ষ বিষময় ফল হিসেবে নারীশিক্ষার দ্বার সংকোচিত হয়। এ সময় বিধবা নারীদের পুনর্বিবাহ করার অধিকার রহিত করা হয়। পুরুষদের জন্য বহু বিবাহ প্রথার প্রচলন করা হয়। সতী দাহ ও সহমরণ প্রথার মতো অমানবিক-নিষ্ঠুর প্রথারও উদ্ভব ঘটে আলোচ্য সময়ে।

বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর নারীজাতির অবস্থার ক্রম পরিবর্তন ঘটে। মুসলিম শাসনামলে নারী তাঁর মানবিক অধিকার লাভ করে। তবে নারীসমাজ মানবিক পরিচয় লাভ করলেও সাধারণভাবে সমাজ বা রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে তো নয়ই, এমনকি পারিবারিক জীবনেও নারী তাঁর যথাযথ অবস্থান তৈরি করতে পারেনি। ফলে আঠারো শতকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন প্রতিষ্ঠাকালে বাংলায় সাধারণভাবে দেখলে নারীরা অধিকার বঞ্চিতও মানবেতর জীবন যাপনকার তে পরিণত হয়েছিল। কঠোর পর্দা বা অবরোধ প্রথার মধ্যে থাকা বাধ্যতামূলক হওয়ায় এ সময় নারীদের গৃহের বাইরে জনপরিমণ্ডলে কোনো কার্যক্রমে অংশ গ্রহণের সুযোগ ছিল না। বাল্য বিবাহের ব্যাপক প্রচলনের ফলে নারীরা অকাল বৈধব্য বরণসহ নানামুখী সমস্যার সম্মুখীন হতো। বিধবাবিবাহ নিষিদ্ধ থাকায় পিত্রালয়ে বিধবা নারীদের আশ্রিতা বা একরকমের দাসিত্বের জীবন যাপন করতে হতো। কুলীন প্রথা এবং সতীদাহের মতো অমানবিক ও পৈশাচিক প্রথার শিকার হতেন নারীরা। শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত রেখে নারীদের অজ্ঞতার অন্ধকারে মানবেতর জীবন যাপনে বাধ্য করা হতো।[৯] এক কথায় বলতে গেলে, এসময় পুরুষ প্রধান বাঙালি সমাজে নারীকে কেবল সন্তান উৎপাদন ও স্বামী সেবা করার যন্ত্র হিসেবে

৯. রেজিনা বেগম, *রাজনৈতিক আন্দোলনে নারী*, ১৯০৫-৪৭, বেঙ্গল পাবলিকেশন্স লিমিটেড, ঢাকা, ২০১৬, পৃ. ৬২-৬৩

বিবেচনা করা হতো। শত সহস্র বছর ধরে এরূপ সামাজিক কূ-রীতি প্রচলিত ছিল বলে সকলেই এমনকি নারীরাও একে স্বাভাবিক বলে ধরে নিয়েছিল।

১.২ বাংলায় নবজাগরণ ও নারীসমাজ

উনিশ শতকে ইউরোপে নারী জাগরণ শুরু হয়। এর প্রভাব বঙ্গ-ভারতীয় সমাজেও অনুভূত হয়। পাশ্চাত্য শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণি নিজেদের সমাজে নারীদের অধঃপতিত দুর্দশা দেখতে পান। নব চেতনার অধিকারী প্রগতিশীল সমাজ সংস্কারকগণ কন্যা-জায়া-জননীরূপী নারীদের ধর্মীয় ও সামাজিকভাবে অবদমিত রূপটি সবিস্ময়ে লক্ষ করেন। ধর্মীয় অনুশাসন ও সামাজিক রীতি-ঐতিহ্যের নামে পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা কর্তৃক মানুষ হিসেবে নারীদের জন্মগত অধিকার হরণ এবং নানা রকম নিষ্ঠুর ও নির্মম নিয়মবিধির নামে নারীদের ক্ষত-বিক্ষত করা দেখে তারা ব্যথিত বোধ করেন। পাশ্চাত্য উদারতা ও যুক্তিবাদী ভাবনায় সমৃদ্ধ বাঙালি নব্য প্রগতিশীল মানুষরা নবজাগরণ প্রসূত নতুন ভাবনার দ্বারা ভাবিত হয়ে উপলব্ধি করেছিলেন যে, নারীদের এরকম সামাজিক অবস্থান এবং পরিণতির মূলে আছে এদেশের পিতৃতান্ত্রিক সমাজে দীর্ঘকাল ধরে প্রচলিত বিভিন্ন কু-প্রথা এবং সামাজিক ও শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধ। তাদের মনে বাঙালি সমাজে প্রচলিত সতীদাহপ্রথার যৌক্তিকতা, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, নারীদের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করে রাখা প্রভৃতি বিষয়ে নানা জিজ্ঞাসা দেখা গেল। আর এসব ভাবনা-চিন্তার ফসল হিসেবে উনিশ শতকে এদেশে কতগুলি সমাজ-সংস্কার আন্দোলন সংঘটিত হয়েছিল। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য সমাজ-সংস্কার ছিল সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদ আন্দোলন, বিধবাবিবাহ প্রবর্তন আন্দোলন, বহুবিবাহ বিরোধী আন্দোলন, বাল্যবিবাহ নিরোধ আন্দোলন এবং নারীশিক্ষা প্রসার আন্দোলন। বস্তুত নারীদের অধঃপতিত ও হীন অবস্থা থেকে উদ্ধার এবং তাঁদের মুক্তির উপায় অবলম্বনে সমাজ সংস্কারকগণ এগিয়ে আসায় উনিশ শতকের বাংলার নবজাগরণ যুগের সংস্কার আন্দোলনের মূখ্য ধারা নারীজাতির অবস্থা উন্নয়নের প্রচেষ্টার দিকে ধাবিত হয়। এ কাজে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩ খ্রি.), ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১ খ্রি.) ও মহর্ষি রাজা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫ খ্রি.) প্রমুখ সমাজ সংস্কারকগণ। নতুন যুগ ও নতুন আদর্শের ভিত্তিতে সমাজ গড়ে তোলার জন্য তারা যে কাজ করে গেছেন তার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল নারীর বিরুদ্ধে পরিচালিত সামাজিক নিপীড়ন বন্ধ করা ও নারীকে শিক্ষিত করে আত্মনির্ভরশীল হতে সাহায্য করা। উনিশ শতকের বাংলার নবজাগরণের সাথে নারী জাগরণের সর্ম্পক এভাবেই অবিচ্ছেদ্য হয়ে ওঠে।[১০]

উনিশ শতকের বাংলায় নবজাগরণের প্রথম চালক পুরুষ ছিলেন রাজা রামমোহন রায়। তাঁকে প্রাজ্ঞ ও সমাজ সচেতন মনীষীদের পুরোগামী বলা যায়। রামমোহন রায়ের আবির্ভাবের সঙ্গে বাংলায় নবযুগের সূচনার সম্পর্ক

১০. মালেকা বেগম, *বাংলার নারী আন্দোলন*, দ্যা ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ১৩।

ঘনিষ্ঠ। চিন্তায়, চেতনায় ও মননে নিজ যুগের চাইতে অগ্রসরমাণ রামমোহন রায় একাই সংগ্রাম করেছেন জীবনভর। সমাজের চলতি ধ্যানধারণা, নারী নিপীড়নের জন্য চলতি সমস্ত রীতিনীতির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে তিনি হয়েছিলেন নারীসমাজের বন্ধু এবং রক্ষাকর্তা। রামমোহন রায় অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। বাংলা, আরবি, পারসি, ইংরেজি ও সংস্কৃত ভাষায় পারদর্শী এবং জেরেসি, বেন্থাম, রবার্ট ওয়েন, লক, হিউম, ভলটেয়ার, ভলনি ও পেইন দ্বারা প্রভাবিত ছিল তাঁর যুক্তিবাদ, সমাজ ও মানবকল্যাণমুখী চেতনা। জেমস মিল রচিত *History of British India* (১৮১৮) এবং মেরি উলস্টনক্রাফট রচিত *Vindication of the Rights of Women* (১৭৯২) গ্রন্থ দুটি তিনি গভীরভাবে পাঠ করেছিলেন এবং এর প্রভাবে রামমোহন রায় বাংলার নারীদের জন্য ভাবতে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন বলে অনেকে মনে করেন।

সামাজিক আচার-আচরণ ও বিধি-নিষেধের মধ্য দিয়ে নারীসমাজের মর্যাদাহীনতা প্রকাশিত হতে দেখে রাজা রামমোহন রায় প্রতিবাদী হয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "একই সঙ্গে রান্না করতে পারে, শয্যাসঙ্গিনী হতে পারে এবং বিশ্বস্ততার সঙ্গে ঘরের রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারে এরূপ উপযোগী জন্তু ব্যতীত মহিলাদের আর কিছু বলে বিবেচনা করা হয় না।"[১১] নারীজাতির হীন অবস্থার জন্য তিনি পুরুষসমাজকে দায়ী করে বলেন, "স্ত্রীলোকের শারীরিক পরাক্রম পুরুষ হইতে প্রায় ন্যূন হয়, ইহাতে পুরুষেরা তাহাদিগকে আপনা হইতে দুর্ব্বল জানিয়া যে যে উত্তম পদবীর প্রাপ্তিতে তাহারা স্বভাবতঃ যোগ্যা ছিল, তাহা হইতে উহাদিগকে পূর্ব্বাপর বঞ্চিত করিয়া আসিতেছেন; পরে কহেন যে, স্বভাবতঃ তাহারা সেই পদ প্রাপ্তির যোগ্যা নহে।"[১২] নারী বিশ্বাসঘাতক বলে শাস্ত্রে যে কথা রয়েছে সে বিষয়ে রামমোহন রায় বলেছেন, "এ দোষ পুরুষে অধিক কি নারীতে অধিক উভয়ের চরিত্র দৃষ্টি করিলে বিদিত হইবেক।"[১৩] নারীর হেয় সামাজিক অবস্থানের প্রসঙ্গে তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে বলেন, "একজন নারী একাধারে রাধুনি, শয্যাসঙ্গিনী এবং বিশ্বস্ত গৃহরক্ষী মাত্র।" বাংলার পচনশীল কৌলিন্য প্রথা জর্জরিত পারিবারিক পরিবেশে নারীর অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন, নারীর সহ্যশক্তির মূলে আছে ধর্মভীতি। অসহায় নারীর সহিষ্ণুতার সুযোগে সমাজ নারীর প্রতি পশুসুলভ ব্যবহার করে বলেও তিনি মনে করতেন।

রাজা রামমোহন রায় সমাজকে শুধু দোষারোপ করেই তিনি চুপ থাকেননি। নারী সমাজের অধঃপতিত অবস্থার মূল কারণ খোঁজ করে তিনি তা নির্মূলের চেষ্টা করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি ব্যক্তি প্রয়াসকে সামষ্টিক রূপ দেয়ার জন্য 'আত্মীয় সভা' এবং 'ব্রাহ্মসমাজ' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বস্তুত এসব সংগঠনের মাধ্যমে তিনি সামাজিক অনাচার ও ধর্মীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে ব্যাপক জনমত তৈরির চেষ্টা করেন।

---

১১. উদ্ধৃতি, গোলাম মুরশিদ, *নারী প্রগতি: আধুনিকতার অভিঘাতে বঙ্গরমণী*, নয়া উদ্যোগ, কলকাতা, ২০০১, পৃ. ২১

১২. উদ্ধৃতি, শ্রী প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, *বাংলার নারী জাগরণ*, সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ, কলকাতা, ১৩৫২ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৭

১৩. রামমোহন রায়, *প্রবর্তক নিবর্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ*, উদ্ধৃতি মালেকা বেগম, পূর্বোক্ত পৃ. ১৪

নারী জাগরণে রামমোহন রায়ের বলিষ্ঠ ভূমিকার একটি অংশ হচ্ছে সতীদাহ প্রথা বন্ধে সাফল্য অর্জন। যদিও ব্যক্তিগত দুঃখবোধ থেকেই সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে এগিয়ে এসেছিলেন, তবু সমাজ সংস্কারে তাঁর দৃঢ়চেতা মন সক্রিয় ছিল বলেই সতীদাহের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় আইন প্রণয়ন করার জন্য তাঁর আন্দোলন সমাজে প্রসারিত হয় এবং সাফল্য লাভ করে। জানা যায় যে, ১৮১৮ সাল থেকে রামমোহন সতীদাহ প্রথা বন্ধ করার জন্যে সক্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। যদিও রামমোহনের পূর্বে এদেশের কিছু প্রগতিশীল মানুষ, খ্রিস্টান মিশনারি, কিছু ইংরেজ ব্যক্তিবর্গ অশাস্ত্রীয় সতীদাহ প্রথার নিন্দা ও বিরোধিতা করেছিলেন। অবশ্য তাঁরা এ প্রথার বিরুদ্ধে কোন আন্দোলন গড়ে তুলতে পারেননি। তাই তাঁদের চিন্তা-ভাবনাকে ব্রিটিশ সরকার প্রাধান্য দেয়নি। কেননা ব্রিটিশ সরকার হিন্দু সমাজের কোন প্রথায় আঘাত হেনে অসন্তোষ সৃষ্টি করতে চায়নি নির্বিঘ্নে শাসনকার্য পরিচালনার জন্যে। এ অবস্থায় সতীদাহপ্রথা নিষিদ্ধ করার জন্যে আন্দোলন গড়ে তুলেন রামমোহন রায়। রামমোহন এক্ষেত্রে প্রথমেই সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ করার জন্যে ব্রিটিশ সরকারের কাছে কোন আবেদন করলেন না। বরং তিনি এই প্রথার ভয়াবহতা ও নিষ্ঠুরতা সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করে তুলতে চাইলেন। সে জন্যে তিনি ব্যক্তিগতভাবে কলকাতার বিভিন্ন শ্মশানে গিয়ে সতীপ্রথা যে অশাস্ত্রীয় এবং অনৈতিক তা বিধবা নারীদের বুঝিয়ে তাদের সতী হওয়া থেকে বিরত করতে চেষ্টা করতেন। আবার রামমোহন রায় তাঁর প্রতিষ্ঠিত আত্মীয় সভা-র সভ্যদের সঙ্গে সতীদাহ প্রথার নিষ্ঠুরতা নিয়ে অনেক আলোচনা করেছেন এবং এ প্রথা যে অশাস্ত্রীয় তা বৃহত্তর জনগণের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্যে তিনি কয়েকটি পুস্তিকা রচনা করে তা বিনামূল্যে মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন।[১৪] এভাবে রামমোহন রায় পরিকল্পনামাফিক সতীদাহপ্রথাকে বন্ধ করার জন্যে এদেশের জনগণকে সতীপ্রথার অশাস্ত্রীয়তা ও নিষ্ঠুরতা সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে চেয়েছিলেন-যাতে এদেশের জনগণই সচেতন হয়ে এ প্রথা নিষিদ্ধ করে।

শুধু প্রতিবাদলিপি, আবেদন-নিবেদন পেশ ও পুস্তিকা লেখা ইত্যাদিতেই রাজা রামমোহন দায়িত্ব সীমাবদ্ধ রাখেননি, তিনি তাঁর সহযোগী বন্ধুদের নিয়ে সতীদাহের ঘটনাকে প্রতিহত করার জন্য একটি কমিটি গঠন করেছিলেন। এ কমিটির কাজ ছিল ঘটনাস্থলে হাজির হওয়া, সতীদাহ বন্ধ করার উদ্যোগ নেয়া, দাহ থেকে বিধবাদের রক্ষা করা, আইনের প্রয়োগ বাস্তবায়িত করা। এমনকি রামমোহন রায় নিজেই শ্মশান ঘাটে যেতেন, বোঝাতে চেষ্টা করতেন ও সতীদাহ বন্ধ করতেন। এজন্য বহুবার তাঁকে স্বার্থান্বেষী মানুষের হাতে গঞ্জনা-লাঞ্ছনা ভোগ করতে হলেও তিনি তাঁর প্রতিজ্ঞায় স্থির ছিলেন ।

রামমোহন রায়ের অব্যাহত প্রয়াস সতীদাহ ও সহমরণের মতো সামাজিক কু-প্রথাটি নির্মূলে ব্রিটিশ সরকারকে উৎসাহিত করেছিল। এ অবস্থায় কোম্পানি সরকারের গভর্নর জেনারেল উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক ১৮২৯ সালের ৪

১৪. রাজা রামমোহন রায় রচিত পুস্তিকাগুলো ছিল: *সহমরণ বিষয় প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ* (১৮১৮), *সমহরণ বিষয় প্রবর্তক ও নিবতর্কের দ্বিতীয় সম্বাদ* (১৮১৯), সহমরণ বিষয় (১৮২৯)।

ডিসেম্বর সতীদাহ প্রথাকে আনুষ্ঠানিকভাবে বাতিল ঘোষণা করেন।[১৫] সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ করে সরকারের জারিকৃত আইনের মুখবন্ধে এর অশাস্ত্রীয়কতা সম্পর্কে রামমোহনের দেয়া যুক্তি ও বক্তব্যগুলো লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল।[১৬] ব্রিটিশ সরকারের সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধকরণ আইনের ফলে বাঙালি হিন্দু সমাজে মিশ্রপ্রতিক্রিয়া দেখা যায়। রাজা রামমোহন রায় ভারতীয়দের মধ্যে সর্বপ্রথম তাঁর সমর্থকদের নিয়ে সতীদাহ প্রথা নিরোধক আইন প্রণয়নের জন্যে বেন্টিঙ্ককে অভিনন্দন ও সংবর্ধনা জানান। অন্যদিকে হিন্দু রক্ষণশীল সমাজ তা কিছুতেই মেনে নিতে পারল না। এমনকি, সতীদাহ আইন প্রণয়নের পরেও রাজা রাধাকান্ত দেব, গোপীমোহন দেব, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখরা রক্ষণশীল সমাজের পক্ষ থেকে সতীদাহ বিরোধী আইন প্রত্যাহারের জন্যে সতীপ্রথার সমর্থক অনেকের স্বাক্ষর সম্বলিত দুটি আবেদনপত্র উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের কাছে পেশ করেন। কিন্তু উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক সতীপ্রথা বিরোধী আইন প্রত্যাহার করতে অসম্মত হলে হিন্দুধর্ম এবং হিন্দুধর্মের যাবতীয় প্রথাকে টিকিয়ে রাখার জন্যে রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের পক্ষ থেকে রাধাকান্ত দেবের নেতৃত্বে গঠিত 'ধর্মসভা' নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ সভার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সতীপ্রথা বিরোধী আইন প্রত্যাহারের জন্যে ইংল্যান্ডের প্রিভি কাউন্সিলে আবেদন করা। এ ধর্মসভা-র উদ্যোগে রক্ষণশীল হিন্দুরা বহুজনের স্বাক্ষর সম্বলিত একটি আবেদন পত্র ইংল্যান্ডে পাঠায়। রামমোহন রায় পাল্টা আবেদন নিয়ে ইংল্যান্ডে যান। তিনি হাউজ অব কমন্সেও সরকারের প্রণীত আইনের পক্ষে তাঁর জোরালো অবস্থান ব্যক্ত করেন। উভয় পক্ষের বক্তব্য ও আবেদন বিবেচনা করে ১৮৩২ সালে ১২ জুলাই প্রিভি কাউন্সিল এক রায়ে সতীদাহ প্রথা বন্ধের জন্য প্রণীত আইনটির পক্ষেই সিদ্ধান্ত প্রদান করে। এভাবেই শেষপর্যন্ত রক্ষণশীলদের শেষ চেষ্টা ব্যর্থ হয়।[১৭] এরপর রক্ষণশীলরা এ বিষয়ে তাদের পরাজয় স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়। ফলে ধীরে ধীরে সতীদাহের সংখ্যা যেমন কমতে থাকে, তেমনি রক্ষণশীলদের পক্ষ থেকেও আর এ বিষয়ে কোন প্রতিক্রিয়া দেখা যায় না।

সতীদাহের মতো নিষ্ঠুর ও অমানবিক প্রথার বিরুদ্ধে জনমত তৈরি করে বাঙালি সমাজকে নাড়া দেয়া, এ প্রথার বিরুদ্ধে আইন পাশ হলে প্রকাশ্যে তার সমর্থনে এগিয়ে আসা এবং আইনটি বলবৎকরণে উদ্যোগী হয়ে রাজা রামমোহন রায় উনিশ শতকে বাংলার নারীমুক্তি জাগরণে এক বলিষ্ঠ পথিকৃতের ভূমিকায় নিজেকে প্রতিস্থাপন করতে সক্ষম হন। স্বপন বসু এ গৌরব রামমোহনের যথার্থই প্রাপ্য বলে উল্লেখ করেছেন।[১৮]

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ আইনটি ছিল উনিশ শতকে নারীমুক্তি ও তাদের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য গৃহীত প্রথম বলিষ্ঠ ও কার্যকর পদক্ষেপ। এ আইন বাঙালি হিন্দুসমাজের বিধবা নারীদের বেঁচে থাকার

---

১৫. সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ করে প্রণীত আইনটির অফিসিয়াল নাম ছিল *The Bengal Sati Regulation or Regulation XVII, A. D. 1829 of the Bengal Code*।

১৬. মালেকা বেগম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৬

১৭. তুফান রায়, 'আত্মকথায় উনিশ শতকের সংস্কৃতি ও নারী: নারী আত্মকথা কেন্দ্রিক সমীক্ষা', অপ্রকাশিত পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ২০২০, পৃ. ১৫

১৮. স্বপন বসু, *উনিশ শতকে বাংলায় নবচেতনা*, সুবর্ণ, ঢাকা , ২০১১, পৃ. ১৩১

মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতি দেয়। বিধবা নারীরা ধর্ম ও সামাজিক রীতির নামে প্রচলিত একটি চরম অমানবিক ও নিষ্ঠুর প্রথার হাত থেকে রক্ষা পায়।

অসুস্থ অবস্থায় ১৮৩৩-এর ১৮ ফেব্রুয়ারি রাজা রামমোহন রায় মারা যান। রামমোহন রায়ের পরিকল্পনা ছিল সমাজের অন্যান্য সংস্কারমূলক আন্দোলনের পাশাপাশি নারী প্রগতির জন্য তিনি আরো কিছু কাজ করবেন। সতীদাহ প্রথা বন্ধের আন্দোলনেই তাঁর ২১ বছর পরিশ্রম করতে হয়েছে, বিধবা বিয়ে চালু করা, বাল্যবিয়ে বন্ধ করা, স্ত্রী শিক্ষা চালু করার যে পরিকল্পনা ও লক্ষ্য তাঁর ছিল তা পূরণ করার সময় তিনি পাননি। তবে ১৮১৫ সালে আত্মীয়সভা নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন এবং সেই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কৌলীন্য প্রথা, কন্যা বিক্রি, পণপ্রথা, জাতিভেদ প্রভৃতির বিরুদ্ধে লড়াই-সংগ্রাম করেছেন। সে সময় হিন্দু মেয়েদের সম্পত্তিতে অধিকারহীনতার প্রতিবাদে তাঁরা বহু আন্দোলন করেছিলেন।

রামমোহন রায়ের মৃত্যুর পর তাঁর ভাবশীষ্যরা তাঁর পরিচালিত নারীমুক্তি আন্দোলনকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যান। তাঁর অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করেন। এ প্রসঙ্গে দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর প্রমুখের নামোল্লেখ করা যায়। এ প্রসঙ্গে ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীর কথাও উল্লেখের দাবি রাখে।[১৯] বাংলায় ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীর নেতা হিন্দু কলেজের অধ্যাপক হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও একজন সমাজ সংস্কারক ছিলেন। তিনি রামমোহনের নারীমুক্তি ও প্রগতিমূলক প্রচেষ্টাগুলোকে অগ্রসর করে নেয়ার ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিয়েছেন। ডিরোজিও সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন। নির্যাতনের হাত থেকে বাঁচার ক্ষেত্রে তিনি স্পষ্টত রামমোহনের যুগ থেকে ভিন্ন এবং নতুন পথের সন্ধান দিয়েছেন। "তিনি বলেছেন, শিক্ষার সাহায্যেই মেয়েরা নির্যাতনের হাত থেকে মুক্তি পাবে।"[২০] ইয়ং বেঙ্গল কর্তৃক ১৮২৮ এবং ১৮৪৩ সালের মধ্যে বেশ কিছু সাময়িকী প্রকাশ করে। এসব পত্র-পত্রিকার মধ্যে ছিল *Parthenon, Hesperus*,জ্ঞানান্বেষণ, *Enquirer, Hindu Pioneer, Quill* এবং *The Bengal Spectator*। *পার্থেনন*-এ বন্দিনী নারীদের মুক্তির আকাঙ্খার লক্ষ্যে নারীশিক্ষা বিষয়ে বক্তব্যের প্রচার দেখা যায়। ইয়ং বেঙ্গল কর্তৃক প্রকাশিত পত্রিকাসমূহের মধ্যে সম্ভবত *বেঙ্গল স্পেক্টেটর* ছিল সর্বশেষ। ১৮৪২ সাল থেকে প্রকাশিত এ প্রগতিবাদী মাসিক পত্রিকাটি সামসাময়িক সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাবলির ওপর বিভিন্ন লেখা প্রকাশ করে। এমনকি নারীশিক্ষা তথা হিন্দু বিধবাদের পুনর্বিবাহ বিষয়ক আলোচনাও এতে স্থান পায়। ইয়ং বেঙ্গল দলের

১৯. 'ইয়ং বেঙ্গল' হিন্দু কলেজের ছাত্রদেরকে সামসাময়িক কলকাতা সমাজ কর্তৃক প্রদত্ত সামাজিক বুদ্ধিবাদী একটি অভিধা বিশেষ। ইয়ং বেঙ্গলের সভ্যরা ছিলেন হিন্দু কলেজ-এর মুক্তবুদ্ধি যুক্তিবাদী শিক্ষক হেনরী লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও-র অনুসারী। ডিরোজিও এর প্রভাবে তারা জীবন ও সমাজ-প্রক্রিয়ার প্রতি যুক্তিসিদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছিলেন। জ্ঞানানুরাগী হয়ে যে কোন অন্ধবিশ্বাস পরিত্যাগ করতে দীক্ষা নিয়েছিলেন ইয়ং বেঙ্গলের সভ্যরা। হিন্দু কলেজের একদল বুদ্ধিদীপ্ত ছাত্র যারা এর সদস্য ছিলেন, তাদের মধ্যে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, মাধবচন্দ্র মল্লিক, রামতনু লাহিড়ী, মহেশচন্দ্র ঘোষ, শিবচন্দ্র দেব, হরচন্দ্র ঘোষ, রাধানাথ শিকদার, গোবিন্দচন্দ্র বসাক, অমৃতলাল মিত্র উল্লেখযোগ্য। এঁরা সবাই ছিলেন মুক্ত চিন্তা দ্বারা উজ্জীবিত। হিন্দু সমাজের বিদ্যমান সামাজিক ও ধর্মীয় কাঠামো এঁদেরকে বিদ্রোহী করে তুলেছিল।

২০. মঞ্জু চট্টোপ্যাধায়, 'নারী মুক্তির সেকাল-একাল', *সাপ্তাহিক দেশ*, ৫৫ বর্ষ ২০ সংখ্যা, ১৯৮৮, পৃ. ৭৭

অন্যতম সদস্য জরিপ বিভাগের কর্মচারী রাধানাথ শিকদার (১৮১৩-১৮৭০) চাকুরি শেষে বাংলা এসে বসবাস করেন। এখানে তিনি প্যারীচাঁদ মিত্রের সহযোগিতায় *মাসিকপত্র* নামে একটি পত্রিকা বের করেন। সরল চলতি কথায় ঘরের মেয়েদের লেখাপড়ার ব্যবস্থা করা হয় এই কাগজের মাধ্যমে।

নারীসমাজের প্রতি যে সব নিপীড়ন, নানাবিধ প্রথার মধ্যে দিয়ে বা সামাজিক ও ধর্মীয় বিধি নিষেধের নামে প্রচলিত ছিল, যেমন সতীদাহ, বিধবা বিবাহের অপ্রচলন, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, মেয়েদের লেখাপড়া শিখতে না দেয়া ইত্যাদির বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়েছিল ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠী *পার্থেনন*, *জ্ঞানেন্বেষণ* ও *এনকোয়েরের* পাতায় তারা এসব সামাজিক কু-প্রথার বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন। ইয়ং বেঙ্গলের 'অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন' ও 'সাধারণ জ্ঞানোপর্জিকা সভা'য় স্ত্রীশিক্ষার আবশ্যকতাসহ নারীমুক্তি ও জাগরণের নানা বিষয় আলোচিত হতো।

পুনশ্চ উল্লেখ্য যে, উনিশ শতকে বাংলার নবজাগরণের প্রভাবে সংঘটিত প্রথম সমাজ-সংস্কার আন্দোলন- সতীদাহ প্রথা নিরোধ আন্দোলনের সাফল্য সেকালের সমাজ-সংস্কারকদের বাড়তি প্রেরণার জোগান দিয়েছিল। তাই সতীদাহ আন্দোলনের সমাপ্তিতে এদেশের সমাজ-সংস্কার আন্দোলন ঝিমিয়ে পড়েনি, বরং আমরা দেখি সেসময় ইউরোপীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে এদেশের প্রগতিশীল মানুষরা একের পর এক সমাজ-সংস্কার আন্দোলন সংঘটিত করেছেন। এ পর্যায়ে আরেকটি উল্লেখযোগ্য সামাজিক ব্যাধি বিধবাবিবাহ প্রচলন আন্দোলনের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা যায়। প্রাচীন ভারতের বিভিন্ন পুরাণ ও শাস্ত্রে বিধবাবিবাহের উল্লেখ রয়েছে। এ থেকে আমরা অনুমান করতে পারি যে, প্রাচীন ভারতে বিধবাবিবাহের প্রচলন ছিল। তবে এদেশে মুসলমান আমল থেকে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের মধ্যে বিধবা বিবাহ নিন্দনীয় হয়ে ওঠে এবং পরবর্তীকালে সমগ্র হিন্দু সমাজে বিধবা বিবাহ নিষিদ্ধ হয়ে যায়।

বাঙালি সমাজে বিধবাবিবাহ প্রচলনের ব্যাপারে রামমোহন রায় জোরালোভাবে কিছু বলেননি, বরং বিধবাবিবাহ অপেক্ষা ব্রহ্মচর্য অবলম্বনকে তিনি সমর্থন করেন। রামমোহনের আত্মীয় সভায় 'যুবতী স্ত্রীর স্বামীর মরণান্তর' ব্রহ্মচর্যে কালক্ষেপ কর্তব্য' বলে ঘোষিত হয়েছিল।[২১] এ বিষয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকর ভূমিকা পালন করেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। অবশ্য উনিশ শতকের ত্রিশের দশকেই বিষয়টি নিয়ে বাঙালি সমাজে আলোচনা শুরু হয়। এমনকি বিদ্যাসাগরের পূর্বে ঊনিশ শতকের চল্লিশের দশকে মতিলাল শীল, হলধর মল্লিক প্রমুখ প্রগতিশীল ব্যক্তিরা বিধবাবিবাহ প্রচলনের জন্যে উৎসাহিত হয়ে উঠেছিলেন। তবে তাঁদের ব্যক্তিগত প্রয়াস শেষপর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছিল। এছাড়া এসময় *বেঙ্গল হরকরা, ক্যালকাটা কুরিয়র, সমাচার দর্পণ* প্রভৃতি পত্রিকায় বিধবাবিবাহ প্রচলনের পক্ষে লেখালেখি শুরু হয়েছিল। উল্লেখ্য যে, সংবাদপত্রে বিধবাবিবাহ প্রচলনের পক্ষে লেখালেখি

---

২১. স্বপন বসু, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৩২

জনমানুষের মাঝে তড়িৎ গতিতে ছড়িয়ে পড়ে এবং সাধারণ মানুষ বিধবাবিবাহের যৌক্তিকতা বিষয়ে ভাবনা-চিন্তা করার অবকাশ পায়। পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনায় নিয়ে হিন্দু রক্ষণশীল সমাজপতিরাও তৎপর হয়ে ওঠেন এবং তাঁরা নিজেদের অবস্থানের পক্ষে জনমত বহাল রাখার জন্য প্রকাশ করেন *সমাচার চন্দ্রিকা* পত্রিকা। এ পত্রিকায় রক্ষণশীল সমাজ প্রগতিশীলদের এবং বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা বিধবাবিবাহ প্রচলনে যেসব প্রস্তাব উত্থাপন করেছিল সেসবের বিরোধিতা করতে থাকে। প্রগতিবাদী ইয়ং বেঙ্গলের সদস্যরা রক্ষণশীলদের সমালোচনা করে এবং বিধবাবিবাহ প্রচলনের পক্ষে প্রচারণা চালায়। বেঙ্গল স্পেক্টেটর পত্রিকায় এসমর্কিত ইয়ং বেঙ্গলের অবস্থান ব্যক্ত হয়। বিধবাবিবাহ প্রচলনের পক্ষে-বিপক্ষে যখন বাঙালি সমাজ দ্বিধা বিভক্ত সে সময় এর শিকার বিধবা নারীরা বিধবাবিবাহ প্রচলনের পক্ষে দাবি জানান। এমনকি ১৮৩৫ সালে শান্তিপুর নিবাসী কয়েকজন পৌঢ়া কুলীন কন্যা সমাচার দর্পন পত্রিকার সম্পাদকের কাছে একটি পত্র লিখে ব্রাক্ষ্মণ কায়স্থ সমাজে বিধবাবিবাহ প্রচলন এবং পুরুষদের উপপত্নী নিরোধ আইন প্রণয়নের দাবি করেন।[২২] উনিশ শতকীয় সমাজ বাস্তবতা বিবেচনা করলে এটি ছিল নিঃসন্দেহে একটি দুঃসাহসী ও প্রাগ্রসর পদক্ষেপ।

উনিশ শতকের মধ্যভাগে পটলডাঙার শ্যামাচরণ দাস নিজের বালবিধবা কন্যার বিবাহ দেবার জন্য ভট্টাচার্য মহাশয়দের কাছে ব্যবস্থাপ্রার্থী হলে কাশীনাথ তর্কালঙ্কার, ভবশঙ্কর বিদ্যারত্ন, রামতনু তর্কসিদ্ধান্ত, ঠাকুরদাস চূড়ামণি, মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ প্রভৃতি স্মার্ত পণ্ডিতরা মিলিত হয়ে বিধবাবিবাহের বৈধতা স্বীকার করে এক ব্যবস্থাপত্র দেন। এই ব্যবস্থাপত্র সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ স্বহস্তে লেখেন।[২৩] তবে বিধবাবিবাহ প্রচলন আন্দোলনে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ভূমিকাই ছিল সব থেকে কার্যকরী। বিধবাবিবাহ নিয়ে প্রগতিশীলদের সঙ্গে রক্ষণশীলদের তর্ক-বিতর্ক থেকে বিদ্যাসাগর বুঝতে পেরেছিলেন যে, প্রথমেই যদি আইন করে বিধবাবিবাহ প্রচলন করার চেষ্টা করা হয় তাহলে রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ তা কিছুতেই মেনে নেবে না। কেননা এর সাথে শাস্ত্রীয় বিধানের প্রশ্ন জড়িত ছিল। এ অবস্থায় বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত কিনা তা প্রতিপন্ন করার জন্যে বিদ্যাসাগর গভীর অধ্যয়নের দ্বারা বিভিন্ন শাস্ত্র অনুসন্ধান শুরু করেন। এতদবিষয়ে বিস্তারিত অনুসন্ধান শেষে তিনি *বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতবিষয়ক প্রস্তাব* (১৮৫৫খ্রি.) নামক একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। বিদ্যাসাগর উপলব্ধি করেছিলেন সাধারণ মানুষের পক্ষে সংস্কৃত ভাষায় লেখা কলিযুগের ধর্মশাস্ত্র *পরাশর সংহিতা* পড়া ও বোঝা সম্ভব নয়। তাই তিনি বিধবাবিবাহ বিষয়ে *পরাশর সংহিতায়* কি নির্দেশ আছে সেকথা জনসাধারণকে বোঝানোর জন্যে জনসাধারণের উপযোগী করে সহজ-সরল বাংলা ভাষায় উপর্যুক্ত গ্রন্থটি প্রণয়ন করেন। এ গ্রন্থে তিনি *পরাশর সংহিতা*-র চতুর্থ অধ্যায় থেকে উদ্ধৃতি ও তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে দেখালেন যে, কলিযুগে তথা বর্তমান সময়ে বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত। তাঁর ভাষায়-

২২. *সমাচার দর্পন*, ১৪ মার্চ ১৮৩৫; স্বপন বসু, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৩২

২৩. স্বপন বসু, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৩৪

"নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে॥

স্বামী অনুদ্দেশ হইলে, মরিলে, ক্লীব স্থির হইলে, সংসারধর্ম পরিত্যাগ করিলে,
অথবা পতিত হইলে, স্ত্রীদিগের পুনর্বার বিবাহ করা শাস্ত্রবিহিত।.....
পরাশর কলিযুগের বিধবাদিগের পক্ষে তিন বিধি দিতেছেন, বিবাহ, ব্রহ্মচর্য,
সহগমন। তন্মধ্যে, রাজকীয় আদেশক্রমে, সহগমনের প্রথা রহিত হইয়া গিয়াছে।
এক্ষণে বিধবাদিগের দুই মাত্র পথ আছে বিবাহ ও ব্রহ্মচর্য; ইচ্ছা হয় বিবাহ
করিবেক, ইচ্ছা হয় ব্রহ্মচর্য করিবেক। কলিযুগে, ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করিয়া, দেহযাত্রা
নির্বাহ করা বিধবাদিগের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। এই নিমিত্তই,
লোকহিতৈষী ভগবান্ পরাশর সর্বপ্রথম বিবাহেরই বিধি দিয়াছেন। সে যাহা হউক,
স্বামীর অনুদ্দেশ প্রভৃতি পাঁচ প্রকার বৈগুণ্য ঘটিলে, স্ত্রীলোকের পক্ষে বিবাহের
স্পষ্ট বিধি প্রদর্শিত হওয়াতে, কলিযুগে, সেই সেই অবস্থায়, বিধবার পুনর্বার
বিবাহ করা শাস্ত্রসম্মত কর্তব্য কর্ম বলিয়া অবধারিত হইতেছে।"[২৪]

ভ্রূণহত্যাজনিত পাপের মতো ঘটনা নিবারণের জন্যে বিধবাবিবাহের প্রচলনের প্রয়োজন আছে কিনা তা বিবেচনার দায়িত্ব জনসাধারণের উপরে অর্পণ করে *বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব* নামে দ্বিতীয় আরেকটি পুস্তক রচনা করেন বিদ্যাসাগর। এ গ্রন্থে তিনি লিখেন,

> দুর্ভাগ্যক্রমে যাহারা অল্প বয়সে বিধবা হয়, তাহারা যাবজ্জীবনে যে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করে, এবং বিধবাবিবাহের প্রথা প্রচলিত না থাকাতে ব্যভিচারদোষের ও ভ্রূণহত্যাপাপের স্রোত যে উত্তরোত্তর প্রবল হইয়া উঠিতেছে, ইহা, বোধ করি, চক্ষুকর্ণ বিশিষ্ট ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন। অতএব, হে পাঠক মহাশয়বর্গ। আপনারা, অন্ততঃ কিয়ৎ ক্ষণের নিমিত্ত, স্থির চিত্তে বিবেচনা করিয়া বলুন, এমন স্থলে, দেশাচারের দাস হইয়া, শাস্ত্রের বিধিতে উপেক্ষা প্রদর্শনপূর্ব্বক, বিধবাবিবাহের প্রথা প্রচলিত না করিয়া, হতভাগা বিধবাদিগকে যাবজ্জীবন অস বৈধব্যযন্ত্রণানলে দগ্ধ করা, এবং ব্যভিচারদোষের ও ভ্রূণহত্যাপাপের স্রোত উত্তরোত্তর প্রবল হইতে দেওয়া উচিত; অথবা দেশাচারের অনুগত না হইয়া, শাস্ত্রের বিধি অবলম্বনপূর্ব্বক, বিধবাবিবাহের প্রথা প্রচলিত করিয়া, হতভাগা বিধবাদিগের অসহ্য বৈধব্যযন্ত্রণা নিরাকরণ এবং ব্যভিচারদোষের ও ভ্রূণহত্যাপাপের স্রোত নিবারণ করা উচিত। এ উভয় পক্ষের মধ্যে কোন পক্ষ অবলম্বন করা শ্রেয়ঃকল্প, স্থির চিত্তে বিবেচনা করিয়া আপনারাই তাহার মীমাংসা করুন।[২৫]

বিদ্যাসাগর উপর্যুক্ত গ্রন্থ প্রণয়ন করে একদিকে যেমন বিধবাবিবাহ বিষয়ে রক্ষণশীলদের বিরোধিতার উত্তর দিয়েছেন, অন্যদিকে তেমনি জনসাধারণের মনে বিধবাবিবাহ সম্পর্কে যে ভ্রান্ত ধারণাগুলো ছিল তা দূর করতে চেষ্টা করেছেন। বিদ্যাসাগরের এ প্রয়াসের মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। নবজাগরণে উদ্বুদ্ধ প্রগতিবাদী বাঙালি সমাজ তাঁকে সমর্থন জানিয়ে বিধবাবিবাহ প্রচলনের পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেন। অন্যদিকে বাংলার রক্ষণশীলদের আজন্মলালিত সংস্কারে আঘাত লাগায় তারাও চুপ করে বসে থাকেনি। বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ বিষয়ে পূর্বোক্ত

---

২৪. সুবোধ চক্রবর্তী (সম্পা), *বিদ্যাসাগর রচনাবলী* (অখন্ড সংস্করণ), কামিনী প্রকাশনালয়, কলকাতা, ১৪১৬ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৫৭৩
২৫. সুবোধ চক্রবর্তী (সম্পা), *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬৮১-৬৮২

গ্রন্থটি প্রকাশিত হওয়ার পর রাধাকান্ত দেব, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখরা এর বিরোধিতা শুরু করেন। এসময়ে বিধবাবিবাহ বিষয়ে বিদ্যাসাগরের মতকে অর্থাৎ বিধবাবিবাহ যে শাস্ত্রসম্মত তা ভুল প্রমাণিত করার জন্যে অনেকগুলো প্রতিবাদ পুস্তক লেখা হয়েছিল। এসব গ্রন্থে বিদ্যাসাগরকে ব্যঙ্গ ও কটূক্তি করা হয়েছিল এবং অনেক সময় শাস্ত্রের ভুল ব্যাখ্যা করে তাঁরা সাধারণ মানুষকে বোঝাতে চেয়েছিলেন যে বিধবাবিবাহ শাস্ত্রনিষিদ্ধ। রক্ষণশীলদের এরূপ প্রচারণায় সাধারণ মানুষ বিভ্রান্ত হয়েছিল। এ অবস্থায় বিদ্যসাগর বিধবাবিবাহ বিষয়ে বিরোধীদের ভ্রান্ত যুক্তিগুলেঅকে খণ্ডন করার জন্যে লিখলেন বিধবাবিবাহ সংক্রান্ত তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থ। আনন্দমোহন বসু ও কয়েকজন ইংরেজি শিক্ষিত সুহৃদের সহায়তায় ১৮৫৫ সালে তিনি গ্রন্থটির ইংরেজি অনুবাদ করে *Marriage of Hindu Widow* নামে প্রকাশ করেন। এ গ্রন্থে তিনি বিরোধীদের যুক্তিগুলো খণ্ডন করে পুনরায় প্রমাণ করে দেখান যে, বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত। অবশ্য রক্ষণশীলরা এবারেও বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ সংক্রান্ত দ্বিতীয় গ্রন্থের বিরুদ্ধে কয়েকটি প্রতিবাদী গ্রন্থ রচনা করেন। তবে এতে বিশেষ সুবিধা হয়নি। *তত্ত্ববোধিনী*, *সম্বাদ ভাস্বর এবং মাসিক পত্রিকা* বিদ্যাসাগরের আন্দোলনের সমর্থনে এগিয়ে আসে। ফলে কেবল শিক্ষিত ও প্রগতিশীলরাই নন, এবারে সাধারণ মানুষও বিদ্যাসাগরের মত গ্রহণ করেন। এসময় পুরুষের পাশাপাশি অনেক নারীও বিদ্যাসাগরের এই আন্দোলনকে স্বাগত জানায়। এমনকি, কয়েকজন নারী এক সভায় মিলিত হয়ে বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত, বিদ্যাসাগরের এ মতের প্রতি সহমত ব্যক্ত করেন। সে সময়কার একটি প্রভাবশালী দৈনিক *মর্নিং ক্রনিকাল* জানায়, সম্ভ্রান্ত হিন্দু নারীদের একটি বড় অংশ বিধবাবিবাহ বিধিবদ্ধ হবার অপেক্ষায় অধীরভাবে প্রতীক্ষা করছেন এবং এ-বিষয়ে অগ্রণীর ভূমিকা নেবার জন্য প্রতিদিন তাঁরা ঈশ্বরচন্দ্রকে আশীর্বাদ করছেন।[২৬] এসময় ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীও বিদ্যাসাগরের এ আন্দোলনকে সমর্থন ও সহযোগিতা করে। এভাবে বিদ্যাসাগর অক্লান্ত পরিশ্রমে বিধবাবিবাহ আন্দোলনকে বৃহত্তর জনসমাজে ছড়িয়ে দিয়ে তাকে দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন।

বিধবাবিবাহ প্রচলন করার জন্যে গ্রন্থ প্রণয়ন করে তা শাস্ত্রসম্মত প্রতিপন্ন করা এবং এর সপক্ষে জনমত তৈরির পর বিদ্যাসাগর ও তার সহযোগীরা এ বিষয়ে আইন প্রণয়নের উদ্যোগ নেন। কারণ তিনি মনে করেন যে, সতীদাহের বিরুদ্ধে প্রণীত আইনের মতো বিধবাবিবাহের পক্ষে সরকারি আইন হলে রক্ষণশীল ধর্মগুরু ও সমাজপতিরা বিধবাবিবাহকে মেনে নিতে বাধ্য হবে। তাই বিধবাবিবাহ আইন পাশের জন্য তিনি একটি আবেদনপত্র রচনা করেন এবং ১৮৫৫ সালের ৪ অক্টোবর ৯৮৭ জনের স্বাক্ষর সম্বলিত আবেদনপত্রটি তিনি ভারত সরকারের বিবেচনার জন্য পাঠান। আবেদনপত্রটিতে এ নীতিবিরুদ্ধ নিষ্ঠুর দেশাচারকে অশাস্ত্রীয় ও সামাজিক অকল্যাণের কারণ বলা হয়। আবেদনকারীদের মতে বিধবাবিবাহ বিবেকবিরুদ্ধও নয়; তাই তারা ব্যবস্থাপক

২৬. Meeting of the Hindu Widows, *The Morning Chronicle*, 28 May 1855; স্বপন বসু, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৪০

সভার কাছে বিধবাবিবাহের বৈধতা স্বীকার করে আইন প্রণয়ন ও প্রচারের অনুরোধ করেন।[২৭] উল্লেখ্য যে, বিদ্যাসাগরের আবেদনপত্রটি জমা দেয়ার পর এ বিষয়ে বাংলা ও বাংলার বাইরে থেকে পক্ষ বিপক্ষে আরো বেশ কিছু আবেদনপত্র সরকারের কাছে জমা দেয়া হয়।[২৮]

আবেদনপত্র পাবার পর ব্যবস্থাপক সভায় পেশ করার জন্য এ সভার অন্যতম সদস্য জে. পি. গ্রান্ট বিধবাবিবাহ আইনের পাণ্ডুলিপির একটি খসড়া প্রস্তুত করেন। স্যার জেমস কলভিল ও পি. ডাব্লিউ লিগেট তা সমর্থন করেন। ব্যবস্থাপক সভায় খসড়া আইনের উপর বিস্তারিত আলোচনার পর পরিমার্জনপূর্বক ১৮৫৬ সালের ১৯ জুলাই তা চূড়ান্ত অনুমোদন দেয়া হয়। ২৬ জুলাই গভর্নর জেনারেলের সম্মতি স্বাক্ষরের মাধ্যমে ঐতিহাসিক বিধবাবিবাহ আইন কার্যকর হয়।

রক্ষণশীল সমাজ যখন ব্রিটিশ সরকারের কাছে প্রতিবাদপত্র প্রেরণ করেও বিধবাবিবাহ আইনকে ঠেকাতে পারল না তখন তারা ভিন্ন পন্থা নিল। কেউ যাতে বিধবা বিবাহ করতে না পারে সেজন্য রক্ষণশীল সমাজ বিধবাবিবাহ করলে একঘরে করে দেয়াসহ সামাজিক নানাবিদ শাস্তি আরোপের কথা ঘোষণা করেন। তাই বিধবাবিবাহ আইন পাশ হলেও সমাজপতিদের ঘোষিত শাস্তির ভয়ে একদিকে যেমন কেউ বিধবা বিবাহ করার সাহস পায়নি, তেমনি কেউ নিজের বিধবা কন্যাকে বিয়ে দেয়ারও সাহস করেনি। এরূপ পরিস্থিতিতে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নিজে অক্লান্ত চেষ্টা করে বিধবাবিবাহের ব্যবস্থা করতে শুরু করেন। বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টায় প্রথম বিধবা বিবাহ অনুষ্ঠিত হয় ১৮৫৬ সালের ৭ ডিসেম্বর। এ বিবাহ হয়েছিল শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্নের সঙ্গে বালবিধবা কালীমতী দেবীর। বিবাহ আসরে প্রায় ৮০০ গণ্যমান্য লোক উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও বিদ্যাসাগরের উদ্যোগ ও প্রচেষ্টায় আরো কয়েকটি বিধবাবিবাহ সম্পন্ন হয়েছিল। তবে বিদ্যাসাগরের এই প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করার জন্যে রক্ষণশীলরা তৎপর হয়ে ওঠেন। যারা বিধবাবিবাহ করতো তাদের একঘরে করার পাশাপাশি নানারকম সামাজিক অত্যাচার শুরু করে। বিধবাবিবাহকারীরা সামাজিক অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে অনেকসময় প্রায়শ্চিত্ত করতে বাধ্য হতো। এছাড়া যারা বিধবাবিবাহ অনুষ্ঠানে যোগ দিত তাদেরও নানাভাবে সামাজিক অত্যাচার করতো রক্ষণশীল সমাজ।[২৯]

হিন্দু পেট্রিয়ট ও *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা* বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ দান প্রচেষ্টাকে সমর্থন ও স্বাগত জানায়। *হিন্দু পেট্রিয়ট* বিধবাবিবাহের বিরুদ্ধে রক্ষণশীলদের প্রচেষ্টাকে প্রতিহত করতে শিক্ষিত বাঙালিদের ঐক্যবদ্ধ হবার

২৭. আবেদনপত্রের প্রথম স্বাক্ষরটি ছিল উত্তরপাড়ার জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের এবং শেষটি বিদ্যাসাগরের। এছাড়া অন্যান্যদের মধ্যে তারানাথ তর্কবাচস্পতি, শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, অযোধ্যানাথ পাকড়াশি, গোবিন্দচন্দ্র সেন, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামচন্দ্র বসু, রাধামাধব মিত্র, সূর্যকুমার চট্টোপাধ্যায়, কেদারনাথ দত্ত, রাজীবলোচন শর্মা, রাজনারায়ণ বসু, হরচন্দ্র দত্ত প্রমুখ বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গ এতে স্বাক্ষর করেছিলেন। স্বপন বসু, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৪০

২৮. এ সংক্রান্ত বিশদ তথ্যের জন্য দ্রষ্টব্য স্বপন বসু, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪১-১৪৩

২৯. তুফান রায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২০

আহ্বান জানায়।[৩০] তবে রক্ষণশীলদের অপতৎপরতার কারণে বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ প্রচলনের প্রকৃত উদ্দেশ্য অনেকাংশেই ব্যর্থ হয়েছিল। এতে বিদ্যাসাগর পরবর্তীকালে মর্মাহত হন। এ প্রসঙ্গে বিনয় ঘোষ মন্তব্য করেছেন–

> বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ আন্দোলন বোধহয় উনিশ শতকের সবচেয়ে বড় সমাজসংস্কার আন্দোলন, যা শহরের গণ্ডি ছাড়িয়ে গ্রাম্যসমাজে পর্যন্ত খানিকটা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল, এবং বাংলাদেশ ছাড়িয়ে সর্বভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু ১৮৫৬ সালে বিধবাবিবাহ আইন বিধিবদ্ধ হবার পর উনিশ শতকের শেষ পর্যন্ত কয়েকটিমাত্র বিধবাবিবাহ অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং তার অধিকাংশই বিদ্যাসাগরের নিজের উদ্যম ও অর্থব্যয়ে অথবা তাঁর একান্ত ভক্তদের প্রচেষ্টায়। তাও দেখা গেছে বিধবাবিবাহ যাঁরা করতে অগ্রণী হয়েছেন, তাদের মধ্যে অনেকে সাময়িক অর্থলোভে শঠতার আশ্রয় নিয়েছেন, কোনো আদর্শপ্রীতির জন্য বিবাহ করেন নি। বিদ্যাসাগর নিজেও তা বুঝতে পেরে শেষজীবনে হতাশায় মোহ্যমান হয়ে পড়েছিলেন। [৩১]

বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ আন্দোলন জনমতকে আলোড়িত করলেও শেষপর্যন্ত সমাজ তা গ্রহণ করেনি। কেননা বালবিধবা নারীদেরই বিবাহের প্রয়োজন ছিল সবচেয়ে বেশি এবং কৌলীন্যপ্রথার ফলে সাধারণত কুলীনদের ঘরেই বালবিধবা নারীর সংখ্যা ছিল বেশি। তাই বিধবাবিবাহের সমস্যাটি অন্যান্য বর্ণের নারীদের তুলনায় মূলত কুলীন নারীদের মধ্যেই মারাত্মক আকার ধারণ করেছিল। কেউ কেউ মনে করেন বিধবাবিবাহ বৃহত্তর নারীসমাজের জন্য সমস্যা না হওয়ায় বিধবাবিবাহ নিয়ে সাধারণ মানুষ ভাবনা-চিন্তা করার প্রয়োজন বোধ করেনি। আবার অনেক শিক্ষিত মানুষও আজন্মলালিত সংস্কারবশত বিধবাবিবাহের চাইতে বিধবাদের ব্রাহ্মচর্য পালনকেই শ্রেয় বলে মনে করেছিলেন। বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ আন্দোলন ব্যর্থ হওয়ার পেছনে আরেকটি কারণ ছিল সেকালের পটভূমিতে বিধবা নারীকে বিয়ে করার মতো উদারমনস্ক পুরুষের সংখ্যার অভাব। যারা এ ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন তারাও আবার রক্ষণশীলদের একঘরে করে ফেলার ভয়ে বিধবা বিবাহ করতে সাহসী হননি। তাই এ বিষয়ে বিদ্যাসাগরের উদ্যোগ এবং সরকার কর্তৃক বিধবাবিবাহ আইন প্রণয়নের পরও বিধবাবিবাহ করতে কিংবা অন্যকে বিধবাবিবাহ করার জন্যে উৎসাহিত করতে বাঙালি হিন্দু সমাজপতিগণ এগিয়ে আসেননি। এ প্রসঙ্গে বিনয় ঘোষ বলেছেন-“বিধবাবিবাহ হিন্দুসমাজ গ্রহণ তো করেইনি, শিক্ষিত উচ্চসমাজে যাঁরা আদর্শের দিক থেকে একদা তা সমর্থন করেছিলেন, তাঁরাও কার্যক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করতে পারেননি।”[৩২] এভাবেই মহৎ উদ্দেশ্যে পরিচালিত বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ আন্দোলন অনেকটাই ব্যর্থ হয়ে যায়।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ আন্দোলন সে সময়ের প্রেক্ষাপটে পুরোপুরি সফল না হলেও এক্ষেত্রে তাঁর যে যুক্তি, নিষ্ঠা, পরিশ্রমী মানসিকতা, উদারতা, ভালোবাসা প্রকাশিত হয়েছে, তার গুরুত্ব কোনোভাবে উপেক্ষনীয় নয়। বিদ্যাসাগরের পূর্বে এদেশের কিছু প্রগতিশীল ব্যক্তি বিধবাবিবাহ বিষয়ে আগ্রহী হয়ে উঠলেও তা স্বল্পসংখ্যক

---

৩০. *The Hindo Patriot*, 26 February, 1857

৩১. বিনয় ঘোষ, *বাংলার নবজাগৃতি*, প্রকাশ ভবন, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৬২

৩২. বিনয় ঘোষ, *বাংলার নবজাগৃতি*, পৃ. ১৬২

মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল এবং রক্ষণশীলদের বিরোধিতায় তাঁদের প্রয়াস শুরুতেই বিনষ্ট হয়ে যায়। আবার বিদ্যাসাগরের পূর্বে ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠী বিধবাবিবাহ বিষয়ে আলোচনা করলেও তাঁদের প্রয়াস মুষ্টিমেয় কিছু ইংরেজি শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল- দেশের বৃহত্তর জনগণের সঙ্গে তাঁদের কোন যোগাযোগ ছিল না। এছাড়া ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠী জ্ঞানান্বেষণ এবং বেঙ্গল স্পেক্টেটর পত্রিকা দুটিতে বিধবাবিবাহের সপক্ষে যেসব যুক্তি ও আলোচনা প্রকাশ করতো তাও সকলের কাছে পৌঁছাত না। কেননা পত্রিকা দুটির প্রচার সংখ্যা সীমিত ছিল। এক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের কৃতিত্ব এখানে যে, তিনি তাঁর প্রণীত গ্রন্থের মাধ্যমে মানুষকে বুঝাতে সক্ষম হন বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত। আর এভাবে বিধবাবিবাহ বিষয়ে জনমত গড়ে তুলে তিনি সর্বপ্রথম বিধবাবিবাহ আন্দোলনকে দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন। তাছাড়া বিদ্যাসাগর হৃদয় দিয়ে বিধবাদের দুরবস্থা উপলব্ধি করে বিধবাবিবাহ প্রচলনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা হয়েছিলেন। বিধবা নারীদের দুঃখ-কষ্ট এবং বঞ্চনা তাঁকে ব্যথিত করেছিল। আর তাই তিনি নারীদের উদ্দেশ্যে বলেন, "হে অবলাগণ! তোমরা কি পাপে ভারতবর্ষে আসিয়া জন্মগ্রহণ কর, বলিতে পারি না।" বিদ্যাসাগরের উচ্চারিত উপর্যুক্ত বাক্যে তাঁর মনের যে আকুতি, যে হৃদয়বৃত্তি প্রকাশিত হয়েছে, তার তুলনা বিরল। রমাকান্ত চক্রবর্তী যথার্থই বলেছেন, "অপ্রাপ্তবয়স্কা 'বিধবা'দের দেখে বিদ্যাসাগর যে অশ্রু বর্ষণ করেছিলেন, তার উৎস ছিল তাঁর হৃদয়, কোন বৈদেশিক মতবাদ নয়।"[৩৩]

বস্তুত বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ আন্দোলন তাৎক্ষণিকভাবে সুফল বয়ে না আনলেও বাঙালি বিশেষ করে হিন্দু নারীদের জীবনের উপর এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব অস্বীকার করার অবকাশ নেই। এ আন্দোলন সাধারণ মানুষের মনে যে আলোড়ন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল এটি নিস্ফল হয়েছে এমনটি বলা সঙ্গত নয়। এ আন্দোলন বাঙালি নারীদের মনেও মুক্তির আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করেছিল। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে নিজেদের কণ্ঠকে উচ্চকিত করার সাহস যোগিয়েছিল। এখানেই বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ আন্দোলনের গুরুত্ব।

বিধবাবিবাহ আন্দোলন আশানুরূপ সফল না হলেও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কিন্তু সমাজ-সংস্কারে আগ্রহ হারাননি। বিধবাবিবাহ আন্দোলনের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তিনি উপলব্ধি করেন যে, এদেশে বালবিধবাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে মূলত কৌলীন্যপ্রথা প্রভাবে কুলীন ব্রাহ্মণদের বহুবিবাহ প্রচলিত থাকার কারণে। তিনি বুঝতে পারেন যে, এদেশে কৌলিন্যপ্রথা ও বহুবিবাহ নিষিদ্ধ না হলে সমাজে বিধবাদের সমস্যার সমাধান হবে না। কারণ এ প্রথাটি বাঙালি সমাজে নারী নিপীড়নের অন্যতম হাতিয়ার ছিল। তাই বিদ্যাসাগর এ পর্যায়ে কৌলীন্যপ্রথা বহুবিবাহ নিষিদ্ধ করার জন্যে আন্দোলনে মনোনিবেশ করেন।

৩৩. স্বপন বসু ও চৌধুরী ইন্দ্রজিৎ (সম্পা.), *উনিশ শতকের বাঙালিজীবন ও সংস্কৃতি*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০০৩, পৃ. ১৬১

প্রাচীনকালেও এদেশের পিতৃতান্ত্রিক সমাজে শর্তসাপেক্ষে পুরুষের বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল। মনুসংহিতা-য় মনু পুরুষের পুনর্বার বিবাহের শর্ত দিয়ে লিখেছেন- কোন নারী যদি শুধু কন্যাসন্তানই জন্ম দেয়, তবে তার স্বামী এগারো বছর অপেক্ষা করে পুত্রসন্তান কামনায় পুনর্বার বিয়ে পরতে পারবে, স্ত্রী বন্ধ্যা হলে তার স্বামী পুনরায় বিয়ে করতে পারবে, আবার কোন স্ত্রী যদি স্বামীকে খুশি করতে না পারে তাহলে তার স্বামী পুনর্বার বিয়ে করতে পারবে। এক্ষেত্রে মনু পুরুষের পুনর্বার বিয়ে করার ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত নিচু বর্ণের নারীকে বিয়ে করার বিধান দিয়েছেন। অর্থাৎ মনুর বিধান অনুযায়ী পুরুষ উপর্যুক্ত কারণগুলো ছাড়া ইচ্ছেমতো একাধিক বিয়ে করতে পারে না। কিন্তু পরবর্তীকালে দ্বাদশ শতকে সেন শাসনামলে বাংলায় কৌলীন্যপ্রথার[৩৪] উদ্ভব ও বিকাশের ফলে বিশেষত পনেররো শতকে দেববীবর ঘটক কুলীন ব্রাহ্মণদের চারিত্রিক দোশষ অনুসারে ৩৬ টি ভাগ বা 'মেল' এ বিভক্ত করেন। দেবীবর বিধান দেন যে, বিবাহ সম্পর্ক কেবল নির্দিষ্ট মেল-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। মেলবন্ধনের মাধ্যমে বিবাহ সম্বন্ধকে সীমাবদ্ধ গণ্ডির ভেতর নির্দিষ্ট করে দেয়ার ফলে কুলীন ব্রাহ্মণদের মধ্যে বহুবিবাহ প্রথা মারাত্মক আকার ধারণ করে। কুলীন ব্রাহ্মণেরা অনেকেই কুলীন নারীর কুল উদ্ধারের নামে অনেক টাকা বরপণের লোভে শতাধিক সবর্ণ বিয়ে করতেও পিছপা হতো না। এভাবে উনিশ শতকে অনেক কুলীন ব্রাহ্মণ বিবাহ ব্যবসায়ী হয়ে ওঠেছিল।[৩৫] সামাজিক নিন্দা ও নিয়মের নিগঢ়ে পড়ে কুল উদ্ধারের নামে বিবাহ ব্যবসায়ী কুলীন পাত্রের সঙ্গে, এমনকি উপযুক্ত কুলীন পাত্র না পেলে কখনো কখনো মৃত্যুপথযাত্রী বৃদ্ধ কুলীন পাত্রের সঙ্গেও অভিভাবকগণ নিজেদের বালিকা কন্যাকে বিয়ে দিতে দ্বিধাবোধ করতেন না।[৩৬] আর কুলীন ব্রাহ্মণেরা যেহেতু তাদের বিবাহিতা স্ত্রীদের ভরণ- পোষণের দায়িত্ব নিতো না, সেহেতু কুলীন নারীদের আজীবন স্বামীসঙ্গ ব্যতিরেকে পরের আশ্রয়ে ঘৃর্ণা-অপমান-তাচ্ছিল্য সহ্য করে জীবন-যাপন করতে হতো। আবার অনেক সময় বালিকা কুলীন নারীদের মৃত্যুপথযাত্রী মুমূর্ষু কুলীন পাত্রের সঙ্গে বিয়ে হওয়ার অবধারিত বৈধব্যের শিকার হতে হতো নিতান্ত

৩৪. কৌলিন্য হলো "হিন্দু কুল ও বর্ণ সমীকরণ আইন" যা রাজা বল্লাল সেন দ্বারা ১১৫৮-৬৯ সনে সেন সাম্রাজ্যে প্রবর্তিত হয়। সেন শাসন পরবর্তী সময়ে এটি 'প্রথা' হিসেবে রূপলাভ করে। সেন শাসন পরবর্তী সময়ে এটি "প্রথা" হিসেবে রূপলাভ করে। কুলীন অর্থ হলো উত্তম পরিবার বা সমভ্রান্ত বংশজাত। সম্মানলাভার্থে প্রজারা সৎপথে চলবে, এই উদ্দেশ্যে বাংলার সেন বংশের রাজা বল্লালসেন কৌলিন্যপ্রথা সৃষ্টি করেছিলেন। এ প্রথার অবিশ্যম্ভাবী এক পরিণাম ছিল সমাজে বহু বিবাহ প্রথার প্রচলন। এতদবিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য দ্রষ্টব্যঃ *To the Secretary to the Government of Bengal, General Department*, Brunch (Education. Mise) Bundle No-03, List No-19. January 1867-May 1868, Bangladesh National Archives; গীতশ্রী বন্দনা সেনগুপ্ত, *স্পন্দিত অন্তর্লোক-আত্মচরিতে নারী প্রগতির ধারা*, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৯; আরিফা সুলতানা, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১২-১৪

৩৫. কন্যা দায়গ্রস্থ অসহায় অভিভাবকদের কাছ থেকে বরবেশী কুলীন ব্রাহ্মণরা কত উপায়ে কত রকমের অর্থগ্রহণ করতেন, তার বর্ণনার জন্য দ্রষ্টব্য, আরিফা সুলতানা, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৩-১৫

৩৬ জানা যায় যে, অকুলীন পাত্রে কন্যাদান দেশাচার বিরুদ্ধ হওয়ায় অসচ্ছল কুলীন কন্যার পিতা বৃদ্ধ বা যৌবনোত্তীর্ণ বহুবিবাহকারী কুলীনপাত্রের সন্ধানে থাকতেন। সন্ধান করে এমন পাত্র জোগাড় করতে পারলে পরিবারস্থ সবকটি বা যতগুলো সম্ভব অনূঢ়া কন্যাকে একযোগে একপাত্রে দান করতে প্রস্তুত ছিলেন। এতে চার মাস বয়সী থেকে সত্তর বছর বয়স্ক পাত্রীর যেমন একযোগে সমর্পণের ঘটনা ঘটতো তেমনি ফুফু ভাতিজিকেও একপাত্রে সমর্পিত হতে হতো। তাছাড়া পাত্রের অভাবে অনেক কুলীন কন্যাকে যেমন চিরকুমারী থাকতে হতো, তেমনি সাত বছরের ছেলের ঘাড়েও ত্রিশ থেকে ষাট বছর পর্যন্ত বিভিন্ন বয়সের আট নয়টি স্ত্রী চাপিয়ে দেয়া হতো। এমনকি উপযুক্ত পাত্র না পেয়ে গাছের সাথে ব্রাহ্মণ কন্যাদের বিয়ে দেয়ার প্রথাও তখন প্রচলিত ছিল। মাহমুদ শামসুল হক, *বাঙালি নারী: হাজার বছরের বাঙালি নারী*, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা, ২০০০, পৃ. ১৪৫

বাল্যকালেই। এভাবে উনিশ শতকে এদেশে কৌলীন্যপ্রথার ফলে বালবিধবা নারীর সংখ্যা মারাত্মক আকার ধারন করে। এ কৌলীন্যপ্রথার ফলে কুলীন কন্যারা স্বামীসঙ্গ ব্যতিরেকে, কিংবা বাল্যকালে বিধবা হওয়ার ফলে অনেক সময়ই জৈবিক তাড়নায় ব্যভিচারে লিপ্ত হতো- ফলস্বরূপ ভ্রণহত্যার মতো মহাপাপ কুলীন নারীদের মধ্যে বৃদ্ধি পেয়েছিল। এর প্রমাণ পাওয়া যায় সেকালের সংবাদপত্রলোতে। উদাহরণ স্বরূপ *সমাচার দর্পণ* পত্রিকায় প্রকাশিত জনৈক ব্যক্তির একটি পত্রের উদ্ধৃতি দেয়া যায়:

> ধর্ম্মলোপের বিষয় যৎকিঞ্চিৎ বিদিত করিতে সঙ্কুচিত হইয়া লিখিতেছি যে এক ব্যক্তি হইতে বহু স্ত্রীর মনোভিলাষ কোনরূপেই পূর্ণ হইতে পারে না ইহাতে ঐ কুলীনের স্ত্রী প্রায়ই পরপুরুষরতা হইয়া জারজ সন্তান উৎপন্ন করিতেছে এবং পূর্ব্বোক্ত অবিবাহিতা স্ত্রীরা যৌবনযন্ত্রণায় কাতরা হইয়া পরাসক্তাতে তাহারদের গর্ভ হইতেছে। যদ্যপিও কুলে জলাঞ্জলি দিয়া এই কর্ম করে কিন্তু ঐ সকল সন্তান রাখিলে কুল সমূলে বিনাশ পায় প্রযুক্ত ঐ পঞ্চাম ষষ্ঠ অষ্টমমাসীয় জীবদিগকে অস্ত্রাঘাতে অথবা অন্য কোন উপায়ান্তরে নষ্ট করে যাহাতে ভ্রূণহত্যা মহাপাতক উৎপত্তি হইতেছে।[৩৭]

এভাবে কৌলীন্যপ্রথার ফলে কুলীন ব্রাহ্মণদের বহুবিবাহের কারণে কুলীন নারীদের একদিকে যেমন আজীবন পরের আশ্রয়ে তাচ্ছিল্য, অপমান সহ্য করতে হতো, অন্যদিকে জৈবিক তাড়নার অনেকেই ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে ভ্রূণ হত্যার মতো মহাপাপে পতিত হতো। সুতরাং আলোচনা করে দেখা গেল উনিশ শতকে এদেশের পতিতান্ত্রিক সমাজে পুরুষের বহুবিবাহের ফলে নারীর দুর্দশা মূলত কুলীন নারীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কেননা উনিশ শতকে এদেশের রক্ষণশীল সমাজে অকুলীনরা একাধিক বিয়ে করতে পারলেও এর জন্য যে সব শর্তপূরণ করতে হতো, তারপর অনেকের পক্ষে বহুবিবাহ করা সম্ভব হতো না। এমতাবস্থায় বাঙালি নারীদের মুক্তির জন্য বহুবিবাহ নিরোধ আন্দোলনটি করতে হয়েছিল কৌলিন্যপ্রথার বিরুদ্ধেও। স্বাভাবিকভাবেই এ সময় যারা বহুবিবাহের বিরুদ্ধে মতামত প্রকাশ করেছিলেন তাঁরা সকলেই কৌলীন্যপ্রথাকে আক্রমণ করেছেন এবং যুক্তি দিয়ে কৌলীন্যপ্রথার অনিষ্টকারিতা ও এটি যে অশাস্ত্রীয়, তা বোঝাতে চেয়েছেন।

রামমোহন রায় তাঁর সমাজ সংস্কার আন্দোলন কার্যক্রমে সতীদাহ সমস্যার সাথে প্রসঙ্গক্রমে বহুবিবাহ সমস্যার কথাও তুলে ধরেছেন। তিনি কুলীন ব্রাহ্মণদের বহুবিবাহের ফলে কুলীন নারীদের দুরবস্থার চিত্র তুলে ধরেছেন *সহমরণ বিষয় প্রবর্তক ও নিবর্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ* (১৮১৯ খ্রি.) নামক তাঁর গ্রন্থে। তিনি কৌলীন্যপ্রথার অবসান ঘটিয়ে কুলীন নারীদের দুরবস্থা মোচনের জন্যে ব্রিটিশ সরকারের কাছে সুপারিশ করেছিলেন যে, যদি এক স্ত্রী বর্তমানে কেউ দ্বিতীয় বিবাহ করতে চায়, তাহলে তাকে শাস্ত্র নির্দেশিত শর্ত অনুযায়ী করতে হবে এবং এ বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারীর অনুমতি নিতে হবে। এভাবে বিদ্যাসাগরের বহুপূর্বেই রামমোহন রায় এদেশের বহুবিবাহ সমস্যার সমাধানের কথা ভেবেছিলেন। আবার ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীও বহুবিবাহ সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছে। তারা কুলীন ব্রাহ্মণদের বহুবিবাহের সমালোচনা করে বিভিন্ন সভা-সমিতি ও পত্র-পত্রিকায় এ বিষয়ে

৩৭. দ্রষ্টব্য *সমাচার দর্পন*, কলকাতা, ৪ জুলাই, ১৮৩৫

আলোকপাত করেছিলেন। ইয়ং বেঙ্গল নেতা রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় তাদের *এনকোয়ারার* পত্রিকায় একটি নিবন্ধে বিবাহ ব্যবসায়ী কুলীন ব্রাহ্মণদের সমালোচনা করেছিলেন। ইয়ং বেঙ্গল এর অন্যতম মুখপত্র *জ্ঞানান্বেষণ* ১৮৩৬ সালে ২ জন বিবাহ ব্যবসায়ী কুলীন ব্রাহ্মণের নাম, পরিচয়সহ তাদের বিবাহ সংখ্যা প্রকাশ করে এর বিপক্ষে জনদৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেছিল। ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীর পাশাপাশি খ্রিস্টান মিশনারিরাও কুলীন ব্রাহ্মণদের বহুবিবাহের বিরোধিতা করেছিলেন। মিশনারিদের পক্ষ থেকে ক্লডিয়াস বুকানন কৌলীনাপ্রথার ফলে কুলীন নারীদের দুরবস্থার কথা আলোচনা করেছিলেন।[৩৮]

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বহুবিবাহের কুফল সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করার জন্য *সমাচার দর্পণ*, *রিফর্মার*, *ইন্ডিয়া গেজেট*, *হিন্দু হিতৈষিণী*, *সম্বাদ কৌমুদী*, *বিদ্যাদর্শন* এবং *ক্যালকাটা খ্রিস্টান অবজার্ভার*সহ কয়েকটি সংবাদপত্র তৎপরতা চালিয়েছিল। পত্রিকাগুলো এ প্রথাটির সমালোচনাসহ একে অশাস্ত্রীয় এবং নারীজাতির জন্য চরম অনিষ্টকর বলে উল্লেখ করে। এমনকি এসব পত্রিকায় সম্পাদকীয় নিবন্ধের মাধ্যমে এ ঘৃণ্য প্রথাটি নিবারণে সরকারি হস্তক্ষেপও কামনা করা হয়েছিল। তবে এ মতের বিপক্ষেও রক্ষণশীলদের মুখপত্র হিসেবে পরিচিত সমাচার চন্দ্রিকাসহ কোনো কোনো পত্রিকা সোচ্চার হয়েছিল। তাদের মধ্যে কৌলিন্য প্রথা এবং বহুবিবাহ প্রথা নিয়ে বাদানুবাদ হয়েছিল। তবে এ দুটি প্রথার বিরুদ্ধে সেকালের বহু পত্র-পত্রিকা মতামত প্রকাশ করে জনমত গড়ে তুলে বহুবিবাহ বিরোধী আন্দোলনকে অনেকটাই জোড়ালো করেছিল।[৩৯] ফল হিসেবে দেখা যায় যে, ১৮৫৫ থেকে ১৮৫৭ সালের মধ্যে এ প্রথার বিরুদ্ধে প্রায় পঁচিশ হাজার স্বাক্ষর সংবলিত একশ সাতাশটি আবেদনপত্র বাংলার বিভিন্ন স্থান থেকে সরকারের কাছে প্রেরিত হয়।[৪০] বাঙালি সমাজের সচেতন অংশ এ সামাজিক কু-প্রথার বিরুদ্ধে তাদের প্রয়াস অব্যাহত রাখেন। কেউ কেউ লেখনীর মাধ্যমে, আবার কেউবা সংঘবদ্ধ আন্দোলনের মাধ্যমে প্রথাটির অবসানের চেষ্টা করেন। রক্ষণশীল হিন্দুদের প্রতিষ্ঠান 'সনাতন ধর্মরক্ষিণী সভা' সতীদাহের পক্ষে থাকলেও কৌলিন্যপ্রথার বিরুদ্ধে তৎপর ছিল। এছাড়াও ফরিদপুরের 'বহুবিবাহ ও কন্যাপণ নিবারণী সভা', বরিশাল রায়েরকাঠি গ্রামের এবং ঢাকা-বিক্রমপুরের কয়েকটি গ্রামীণ প্রতিষ্ঠান প্রথাটির অবসানকল্পে নানাভাবে প্রয়াস চালায়। এ সময় ব্যক্তি বিশেষের একক প্রচেষ্টাও যথেষ্ট কার্যকর ছিল। পূর্ববাংলার রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় বাস্তব দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য তার পুত্র-কন্যাদের কুলীন বিবাহ প্রথা ভেঙে ভগ্নকুলীন ও ভিন্ন মেলভুক্ত পরিবারে বিয়ে দেন। তবে এর বিপরীতে রক্ষণশীলরাও যে তৎপর ছিলেন এমন প্রমাণও পাওয়া যায়। সংখ্যায় কম হলেও এ সময় বহুবিবাহের পক্ষে সরকারের কাছে তাদেরও আবেদন করতে দেখা যায়।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, কৌলিন্যপ্রথা উদ্ভূত বহুবিবাহ বিরোধী আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তিনি ভেবেছিলেন রক্ষণশীল সমাজের বিরোধিতা ও অত্যাচারে বিধবাবিবাহ

---

৩৮. তুফান রায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৬

৩৯. দ্রষ্টব্য স্বপন বসু, *উনিশ শতকে বাংলায় নবচেতনা*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৫২-১৫৪

৪০. আরিফা সুলতানা, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৬

আইন প্রণয়নের পরেও যেহেতু বিধবা নারীর বিয়ে দেয়া সম্ভব হচ্ছিল না, সেহেতু বিধবা নারীর দুঃখ-কষ্ট দূর করার একটা উপায় হচ্ছে কৌলীন্যপ্রথার উচ্ছেদ ঘটনো। এই কৌলীন্যপ্রথার ফলে এদেশের কুলীন নারীরা যে বিবাহিত হয়েও আজীবন পরের আশ্রয়ে ও অনুগ্রহে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য-অপমান সহ্য করে জীবন-যাপন করে এবং কখনো কখনো জৈবিক তাড়নায় ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, সে বিষয়েও বিদ্যাসাগর আলোকপাত করেছেন তাঁর বহুবিবাহ সংক্রান্ত প্রথম গ্রন্থ *বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব* (১৮৭১ খ্রি.)-এ। এ গ্রন্থে বিদ্যাসাগর বহুবিবাহ প্রথাকে এদেশের নারীদের দুরবস্থা ও অনিষ্টের মূল বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি আরও বলেছেন, এ বিষয়ে বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ বহুবিবাহের কুফল সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠেছেন এবং তাঁরা সকলেই এই প্রথা রদ করার পক্ষে। তাঁর ভাষায়,

> ---যৎ সমুদায় আলোচনা করিয়া দেখিলে, হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায় । ফলতঃ, এতমূলক অত্যাচার এত অধিক ও এত অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে যে, যাঁহাদের কিঞ্চিন্মাত্র হিতাহিতবোধ ও সদসদ্বিবেকশক্তি আছে, তাদৃশ ব্যক্তিমাত্রেই এই প্রথার বিষম বিদ্বেষী হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহাদের আন্তরিক ইচ্ছা, এই প্রথা এই দণ্ডে রহিত হইয়া যায়।”[৪১]

কিন্তু এ সময় রক্ষণশীলরা দাবি করেছিল যে, বর্তমানে কুলীনদের মধ্যে বহুবিবাহের সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে বলে আইন করে আর বহুবিবাহ নিষিদ্ধ করার প্রয়োজন নেই। মূলত রক্ষণশীলদের এসব কু-যুক্তির উত্তর দিতে গিয়েই বিদ্যাসাগর *বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব* নামক গ্রন্থটি লিখেন। এ গ্রন্থে তিনি রক্ষণশীলদের মতকে ভুল প্রমাণিত করার জন্য সেসময় হুগলি জেলার ১৩৩ জন কুলীন ব্রাহ্মণের নাম, বাসস্থানসহ তাঁদের বহুবিবাহের সংখ্যা উল্লেখ করে যে, তালিকা দিয়েছেন তাতে দেখা যায় যে, অনেকেই অর্ধশতাধিক বিয়ে করেছেন। তিনি বর্ধমান, নবদ্বীপ, যশোর, বরিশাল ও ঢাকা জেলাতেও যে, এ সংখ্যা কম নয়, বরং ক্ষেত্রবিশেষে তদপেক্ষা বেশি। রক্ষণশীলরা বহুবিবাহপ্রথাকে শাস্ত্রসম্মত বলে যে দাবি করেছি, বিদ্যাসাগর তাঁর গ্রন্থে এ বিষয়েও জবাব দেন। হিন্দু রক্ষণশীলদের যাবতীয় আচার-আচরণ, রীতি-নীতি, প্রথা নিয়ন্ত্রিত হয় যে শাস্ত্রের দ্বারা সেই মনুসংহিতা-র বচন উদ্ধৃত করে দেখিয়েছেন যে, বিনাকারণে একাধিক বিয়ে করা এবং একাধিক সবর্ণ বিয়ে করা মনুসংহিতা অনুসারে নিষিদ্ধ।[৪২]

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁর বহুবিবাহ সংক্রান্ত প্রথম পুস্তকে বহুবিবাহ শাস্ত্রনিষিদ্ধ প্রমাণ করায় রক্ষণশীলরা অসন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে আক্রমণ করেছিলেন এবং তাঁরা দেখাতে চেয়েছিলেন যে, অবশ্যই বহুবিবাহ শাস্ত্রসম্মত। বিদ্যাসাগর বিরোধীদের আক্রমণের উত্তর দিয়ে পুনরায় বহুবিবাহকে শাস্ত্রনিষিদ্ধ বলে পুনরায় প্রমাণ করে লিখেন তাঁর বহুবিবাহ সংক্রান্ত দ্বিতীয় পুস্তক *বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিৎ কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার* (১৮৭৩খ্রি.) নামক আরেকটি গ্রন্থ। এভাবে রক্ষণশীলদের সঙ্গে বাকযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে এবং বহুবিবাহের কুফল সম্পর্কে জনমত গড়ে তুলে বিদ্যাসাগর বহুবিবাহ আন্দোলনকে একটা শক্তভিত্তি দিয়েছিলেন। এ বিষয়ে অনেক প্রগতিমনস্ক ব্যক্তি তাঁকে

৪১. সুবোধ চক্রবর্তী (সম্পা), *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬৮৮

৪২. সুবোধ চক্রবর্তী (সম্পা), *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭৪৮

সমর্থন জানান। আইন করে বহুবিবাহপ্রথা নিষিদ্ধ করার জন্যে বিদ্যাসাগর নিজে এবং তাঁকে অনুসরণ করে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে সরকারের কাছে আবেদনপত্র পাঠানো হয়। বস্তুত, বিদ্যাসাগরের আন্দোলনের ফলেই এদেশের অনেক প্রগতিশীল মানুষ বহুবিবাহের কুফল সম্পর্কে সচেতন হয়ে বহুবিবাহ আইন করে নিষিদ্ধ করার জন্য ব্রিটিশ সরকারের কাছে বিভিন্ন প্রস্তাব ও একের পর এক আবেদনপত্র পাঠিয়েছিলেন।[৪৩] এদেশবাসীর কাছ থেকে বহুবিবাহ উচ্ছেদকল্পে এরকম পরপর আবেদন আসতে দেখে *দ্যা মর্নিং ক্রনিকাল* পত্রিকা মন্তব্য করেছিল য়ে, "এরকম কোনো আইন হলে তা কৌলীন্যপ্রথার শেষশয্যা রচনা করবে এবং তা হবে সভ্যতার পক্ষে হিতকর। এর ফলে উন্নতির পথের সবচেয়ে বড় বাধাটি হবে অপসারিত এবং হাজারো দুঃখের উৎসমুখটি হবে রুদ্ধ।"[৪৪] *সম্বাদ ভাস্বর* পত্রিকা এ বিষয়ে একটি সম্পাদকীয় নিবন্ধ রচনা করে আশা প্রকাশ করেছিল যে, 'বহুবিবাহ নিবারণে রাজবিধান হবেই হবে, ইহাতে সন্দেহ নেই।'[৪৫] রক্ষণশীল সমাজের বিরোধিতা সত্ত্বেও বহুবিবাহ রদ করার পক্ষে অনেকগুলো আবেনপত্র পেয়ে জে পি গ্রান্ট রাজা রামমোহন রায়ের পুত্র রমাপ্রসাদ রায়ের সহায়তায় বহুবিবাহ নিষিদ্ধ করতে বিল প্রস্তুত করলেও, নানা কারণে তা শেষপর্যন্ত আইনে পরিণত হয়নি।[৪৬] তবে বহুবিবাহ বিরোধী আইন প্রণীত না হলেও বহুবিবাহ আন্দোলনকে পুরোপুরি ব্যর্থ বলা যায় না। বিভিন্ন প্রগতিশীল ব্যক্তিবর্গ, সাময়িক পত্রে বহুবিবাহের কুফল সম্পর্কে যেসব আলোচনা হয়েছে তা একেবারে ব্যর্থ হয়নি। কেননা বহুবিবাহ আন্দোলনের ফলে দেশীয় মানুষদের মনে বহুবিবাহের কুফল সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে ওঠে। এমনকি নারী সমাজের পক্ষ থেকেও উনিশ শতকের শেষদিকে কৌলিন্যপ্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হতে দেখা যায়। কাশিম বাজারের রাণী স্বর্ণময়ী দেবী ও জানবাজারের রাণী রাসমণি দাসী সরকারের কাছে প্রেরিত বহুবিবাহ নিবারণী আবেদনপত্রে স্বাক্ষরদান করেছিলেন। কৈলাশবাসিনী দেবী তাঁর *হিন্দু মহিলাগণের হীনাবস্থা* গ্রন্থে বহুবিবাহ এবং এর কুফল সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করেন। কৌলিন্য কত অর্থহীন ও ঠুনকো এবং কুলীন বহুবিবাহের ফলে বালবৈধব্য, বাল্যবিয়ে এবং বৃদ্ধের সঙ্গে তরুণীর বিবাহ কীভাবে প্রশ্রয় পায় এবং তা কত দুঃখজনক ঘটনার জন্ম দেয়, সে বিষয়ে তিনি বিস্তারিত বিবরণ দেন। ক্ষীরোদা মিত্র, সারদা দেবী, যোগীন্দ্রমোহিনী বসু প্রমুখও কুলীন বহুবিবাহের বিরুদ্ধে তাদের মতামত ব্যক্ত করেন।[৪৭] বহুবিবাহের বিরুদ্ধে দীর্ঘকালব্যাপী প্রচারিত এসব প্রচরণা যে কুলীন নারীদের উদ্দীপ্ত করেছিল তার কিছু প্রমাণ পাওয়া যায়। ১৮৭০

৪৩. স্বপন বসু তাঁর গ্রন্থে ৩০ টি আবেদনপত্র প্রেরণকারীদের পরিচয় উল্লেখ করেছেন। এরমধ্যে জানবাজারের রাণী রাসমণি দেবী এবং কাশিমবাজারের রাণী স্বর্ণময়ী দাসী নাম রয়েছে। দ্রষ্টব্য স্বপন বসু, *উনিশ শতকে বাংলায় নবচেতনা*, পৃ. ১৫৯-১৬০

৪৪. 'Polygamy', *The Morning Chronicle,* i March, 1855

৪৫. *সম্বাদ ভাস্বর*, ২৫ নভেম্বর, ১৮৫৬

৪৬. কেননা এসময় ভারতে সিপাহী বিদ্রোহ শুরু হওয়ায় ব্রিটিশ সরকার তা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে এবং এরকম পরিস্থিতিতে দেশীয় মানুষদের মনে অসন্তোষ সৃষ্টি হতে পারে ভেবে ব্রিটিশ সরকার এদেশে প্রচলিত কোন প্রথায় হস্তক্ষেপ করতে চায়নি। এছাড়া ১৮৫৮ সালে মহারাণী ভিক্টোরিয়া ভারত শাসনের দায়িত্বভার নিজের হাতে তুলে নিয়ে ঘোষণা করেছিলেন যে, ব্রিটিশ সরকার ভারতীয়দের ধর্মীয় আচার-আচরণ ও প্রথা প্রভৃতিতে হস্তক্ষেপ করবে না। তাই আইন করে বহুবিবাহ নিষিদ্ধ করার সব ব্যবস্থা ঠিক থাকলেও ব্রিটিশ সরকার আর বহুবিবাহ নিষিদ্ধ আইন প্রণয়ন করেনি।

৪৭. গোলাম মুরশিদ, *সংকোচের বিহ্বলতা: আধুনিকতার অভিঘাতে বঙ্গরমণীর প্রতিক্রিয়া*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ. ১৬১-১৬২

সালে কৃষ্ণমণি নামক এক কুলীন স্ত্রী তার স্বামী লক্ষ্মীনারায়ণের বিরুদ্ধে খোরপোশের মামলা করে জয় লাভ করেন। কিন্তু দারিদ্র হেতু তা দিতে না পারায় লক্ষ্মীনারায়ণ জেলে যেতে বাধ্য হয়। হৈমবতী নামে একজন কুলীন স্ত্রী ১৮৭৬ সালে অনুরূপ মামলায় জয়ী হন। ললিতমোহিনী নামে আর এক কুলীন স্ত্রীও মামলায় জয়ী হয়ে স্বামীর কাছে প্রচুর অর্থ দাবি করেন। তবে সবচেয়ে চমকপ্রদ ঘটনার জন্ম দেন ঢাকার বিধুমুখী। ১৮৭০ সালে তার পিতৃব্যরা বহুবিবাহকারী এক কুলীনের সঙ্গে বিধুমুখীর বিয়ে ঠিক করলে মাতুলদের সহায়তায় তিনি কলকাতায় পালিয়ে যান। সেখানে তিনি লেখাপড়া শিখে পরে এক শিক্ষিত ও উচ্চপদস্থ যুবককে বিয়ে করেন। উনিশ শতকের শেষ নাগাদ লক্ষ্য করা যায়, বহুবিবাহ বিরোধী বিভিন্ন প্রচারণা, বাস্তব দৃষ্টান্ত স্থাপন এবং সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সমাজ সচেতনতা বৃদ্ধি পাওয়ায় বহুবিবাহ প্রথা ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে এবং কিছু কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া অবশেষে প্রায় অপ্রচলিত হয়ে ওঠে।

ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণি নির্বিশেষে যে প্রথাটি উনিশ শতকে বাংলায় প্রচলিত ছিল সেটি হলো বাল্যবিবাহ। অন্যান্য কুপ্রথার মতো এটিও বাংলার সমাজজীবনকে পর্যুদস্ত করে তুলেছিল। বস্তুত বাল্যবিবাহও স্বতঃসিদ্ধভাবে বাঙালি নারীর সামাজিক দুর্গতির সমস্ত মূল কারণগুলোকে ধারণ করেছিল। শিক্ষাহীনতা, অবরোধ, অকাল বৈধব্য ইত্যাদির প্রাথমিক উৎস ছিল বাল্যবিবাহ।

বাল্যবিবাহের সাথেও শাস্ত্রীয় বিধানযুক্ত ছিল। তথ্যসূত্র মতে, হিন্দু সমাজের বিভিন্ন শাস্ত্রকার নারীর বিয়ের বয়স বিভিন্নভাবে নির্ধারিত করেছেন। অবশ্য সবাই নারীর রজস্বলা হবার পূর্বেই বিয়ে দেয়ার বিধান দিয়েছেন। এর অন্যথায় কন্যার পরিবার নরকে যাবে, নতুবা ভ্রূণহত্যাকারী হিসেবে শাস্তিপ্রাপ্ত হবে- এ ছিল শাস্ত্রকারদের বিধান।[৪৮] জানা যায়, স্মৃতিশাস্ত্রকার রঘুনন্দন হিন্দুদের মধ্যে বাল্যবিয়েকে অনিবার্য প্রথায় পরিণত করেছিলেন। এর ফলে সকল ধর্মের বেশিরভাগ বাঙালি মেয়ের কৈশোরপর্ব বলে কোনো সময় ছিল না। বয়সের পর্বান্তরের উচ্ছ্বাস-আনন্দ-স্বপ্নময়তা প্রকাশিত হওয়ার কিংবা মানসিক উৎকর্ষ বৃদ্ধিকারী বিভিন্ন গুণের অনুশীলনের কোনো সুযোগ ছিল না। বিয়ের মাধ্যমে শিশু বধূদের মনোদৈহিক বিকাশের আগেই ভয়াবহ এক বাস্তবতার সম্মুখীন হতে হতো। অকাল যৌনতা ও অকাল সংসার পক্বতা তাকে গৃহকর্ম পালনের একটি অতি প্রয়োজনীয় যন্ত্রে পরিণত করে তুলত। বাল্যবিবাহের সবচেয়ে অভিশপ্ত দিক হচ্ছে প্রসূতি ও সন্তানের অকাল মৃত্যু এবং উভয়ের অপুষ্টি জনিত ভগ্নস্বাস্থ্য ও রোগগ্রস্ততা। হিন্দু বাল্যবিবাহের আরেক করুণ পরিণতি ছিল বাল-বৈধব্য। অনেকে খেলার বয়স পার না হতেই বিধবা সেজে ক্রমাগত অবদমনে জর্জরিত হতে হতে পার করে দিতেন পুরো যৌবন। কেউ-বিমর্ষতাজনিত অসুখে ভুগতেন আজীবন, কেউ হতেন উন্মাদ, কারও হতো যৌনপদস্খলন, কেউ বা বেছে নিতেন

৪৮. এরূপ শাস্ত্রীয় বিধানের বাল্যবিবাহ সেকালের বাঙালিসমাজে অতি প্রচলিত হয়ে পড়েছিল। ১০/১২ বছরের ছেলের সঙ্গে ৪/৫ বছরের মেয়ের বিয়ে হওয়াটা ছিল নিতান্ত স্বাভাবিক ঘটনা। অনেক সময় মেয়ের মুখে কথা ফোটার আগেই তাকে পাত্রস্থ করা হতো। কোলে করে বা ধামায় বসিয়ে পাত্রীকে বিবাহসভায় এনে সম্প্রদান করা হচ্ছে–এমন খবর উনিশ শতকের পত্রিকার পাতা ওলটালেই চোখে পড়ে।

স্বেচ্ছামৃত্যুর পথ। বালবিধবার অস্বাভাবিক সংখ্যাবৃদ্ধি উনিশ শতকে আর একটি সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি করেছিল। অগণিত বিধবার মাতৃহীনতা উচ্চবর্ণের হিন্দুসমাজে বিশেষত ব্রাহ্মণ সমাজের সংখ্যাগত অস্তিত্বকে বিপন্ন করে তুলেছিল।[৪৯]

উপর্যুক্ত বাস্তবতায় বহুবিবাহের মতো বাল্যবিবাহের অপকারিতা সম্পর্কে উনিশ শতকের প্রথমদিকেই শিক্ষিত বাঙালিসমাজ সচেতন হয়ে ওঠেন। বাল্যবিবাহের ফলে যে স্ত্রীশিক্ষার এক প্রধান অন্তরায়, বাল্যবিবাহের ফলে যে দেহ শক্তিহীন এবং এ বিবাহজাত সন্তান যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে 'দুর্বল ও বীর্যহীন' হয়, তা উনিশ শতকের প্রথমদিকেই বাঙালিসমাজের সচেতন মানুষজন উপলব্ধি করতে আরম্ভ করেছিলেন এবং এ কারণেই এ প্রথার বিরুদ্ধে মতামত প্রকাশে তাঁরা কুণ্ঠাবোধ করেননি। বাল্যবিবাহ সম্পর্কে প্রথম সচেতন বিরোধিতা দেখা যায় ইয়ং বেঙ্গলের মধ্যে। অবশ্য এর আগে রামমোহন রায়ের আত্মীয় সভায় বাল্যবিয়ে নিয়ে আলাপ-আলোচনার উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে এর বিরুদ্ধে তিনি কোনো আন্দোলন বা জোরালো মত দিয়েছেন এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না। বিষয়টির অপকারিতা নিয়ে ইয়ং বেঙ্গল তাদের সভাসমিতিতে আলোচনা করতেন। ১৮৩৯-এর জানুয়ারি মাসে কলকাতা সংস্কৃত কলেজে অনুষ্ঠিত 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা'র একটি অধিবেশনে মহেশচন্দ্র দেব এদেশের মেয়েদের অবস্থা নিয়ে 'A sketch of the condition of the Hindoo women' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রবন্ধটিতে তিনি বাঙালিসমাজে নারীদের অবস্থার এক করুণ চিত্র তুলে ধরার পাশাপাশি বাল্যবিবাহের কুফলের কথা বর্ণনা করেন। তাঁর মতে, 'That absurd and pernicious system of early marriage amongst the Hindoos is another mighty evil to which the unfortunate women of this country are exposed.' ১০/১২ বছরের কমবয়সী কোনও মেয়ের বিয়ে দেওয়া উচিত নয় বলে তিনি এই এ মতপ্রকাশ করেন।[৫০] সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভায় মহেশচন্দ্রের এই প্রবন্ধ পাঠের বছর তিনেক মহাতঙ্গের অকৃত্রিম শুভার্থী ডেভিড হেয়ারের মৃত্যু হয়। হেয়ারের স্মৃতিরক্ষাকল্পে ছাত্র ও অনুরাগীরা একটি হেয়ার প্রাইজ ফান্ড গড়ে তোলেন। এই ফান্ডের পক্ষ থেকে ১৮৪৭ বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা আহ্বান করা হয়। এই প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হন হিন্দু কলেজের ছাত্র সীতানাথ ঘোষ।[৫১]

ইয়ং বেঙ্গলরা তাদের জ্ঞানোপার্জিকা সভায় বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা জানালেও সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থা অবলম্বন করে আন্দোলন গড়ে তুলতে পারেননি। উনিশ শতকের মাঝামাঝি বাল্যবিবাহের যৌক্তিকতা নিয়ে পত্র-পত্রিকায় আলাপ-আলোচনা শুরু হয়। *বেঙ্গল স্পেক্টেটর*, *বিদ্যাদর্শন*, *জগবন্ধু*, *তত্ত্ববোধিনী*, *বামাবোধিনী*, *সোমপ্রকাশ* *মিত্রপ্রকাশ*, *সুলভ সমাচার*, *ভারত সংস্কারক*, *আনাঙ্কুর*, *নবপ্রবন্ধ*, *গ্রামবার্তা প্রকাশিকা*, *অমৃতবাজার* এবং

৪৯. গোলাম মুরশিদ, *সংকোচের বিহ্বলতা*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৬২-১৬৩
৫০. স্বপন বসু, *উনিশ শতকে বাংলায় নবচেতনা*, পৃ. ১৬১
৫১ . *সংবাদ প্রভাকর* , ১২ এপ্রিল, ১৯৪৮

বঙ্গমহিলা ইত্যাদি পত্রিকা বাল্যবিবাবহ বিরোধী রচনা প্রকাশ করে জনমতকে প্রভাবিত করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে। অন্যদিকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র সেন, অক্ষয়কুমার দত্ত, রামদয়াল চক্রবর্তী, সীতানাথ ঘোষ প্রমুখ প্রগতিশীল ব্যক্তিবর্গ ব্যক্তিগতভাবে কিংবা সভা-সমিতির মাধ্যমে এর বিরুদ্ধে জনমত গঠনে অগ্রসর হন।[৫২] তবে ষাটের দশক থেকে ব্রাহ্মসমাজের নেতৃত্বে এই আন্দোলন গতি লাভ করে এবং দূরবর্তী অঞ্চলসমূহেও বাল্যবিয়ের বিপক্ষে জনমত গড়ে উঠতে থাকে। বাল্যবিবাহের কুফল থেকে বাঙালিসমাজকে মুক্তি দিতে পূর্ববাংলার একদল সংস্কারকও তৎপর হয়ে ওঠেন। তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন ব্রাহ্ম মতাবলম্বী। এদের উদ্যোগে ঢাকায় একটি 'বাল্যবিবাহ নিবারণী সভা' প্রতিষ্ঠিত হয়। ঢাকা কলেজের অধ্যাপক সোমনাথ মুখোপাধ্যায় এর সভাপতির দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। এ প্রথার কুফল দেখিয়ে তিনি 'বাল্যবিবাহ' নামে একটি পুস্তিকাও রচনা করেন।[৫৩] ঢাকার বাল্যবিবাহ নিবারণী সভার প্রাণপুরুষ ছিলেন নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়। ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় বাল্যবিবাহের মতো একটি কুপ্রথার অবসানের জন্য সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেছিলেন। তাঁর প্রচেষ্টায় বাল্যবিবাহ নিবারণী সভার সভ্যরা একটি নির্দিষ্ট বয়সের আগে কেউ বিয়ে করবেন না বলে অঙ্গীকার করেন। সভার কাজকর্মের পরিচয় বৃহত্তর জগতে ছড়িয়ে দেবার ও এ প্রথার বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলার জন্য ১৮৭৩-এর এপ্রিল মাসে 'মহাপাপ বাল্যবিবাহ' নামে বাল্যবিবাহ নিবারণী সভার একটি মুখপত্র প্রকাশ করা হয় এবং এর সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়। পত্রিকার প্রথম সংখ্যাটি প্রকাশিত হলে এ প্রয়াসকে অভিনন্দন জানিয়ে সেকালের বিখ্যাত সংবাদপত্র *সুলভ সমাচার* লিখেছিল:

> ঢাকা নগরে 'বাল্যবিবাহ নিবারণী' নামে একটি সভা হইয়াছে। ইহার কয়েকজন সভ্য প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন ২১ বৎসর বয়ক্রম না হইলে বিবাহ করিবেন না। এবং তাহারা চোদ্দ বৎসর বয়সের কম কোন বালিকার পাণিগ্রহণ করিবেন না। পুরুষের ২৪ এবং স্ত্রীর ১৬ বৎসর বয়স বিবাহের জন্য নির্ধারিত হইয়াছে। উক্ত সভা হইতে 'মহাপাপ বাল্যবিবাহ' নামক এক পয়সা মূল্যের একখানি মাসিক পত্রিকাও বাহির হইতেছে, তাহার প্রথম খণ্ড আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। যুবা সভ্যদিগের উৎসাহের কথা শুনিয়া আমরা পরমাহ্লাদিত হইলাম। স্থায়ী উৎসাহের সহিত যদি ইহারা কার্য্য করিতে পারেন, তাহা হইলে সমাজ সংস্কার বিষয়ে কলিকাতাকে তাহারা পশ্চাতে ফেলিয়া যাইতে পারিবেন।[৫৪]

শুধু পুরুষগণই নন, শিক্ষিত নারীদের একাংশের মধ্যেও এ বিষয়ে সচেতনতা পরিলক্ষিত হয়। কৈলাসবাসিনী দেবী, শ্যামাসুন্দরী দেবী, জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, কৃষ্ণভাবিনী দাস, সরলাদেবী, নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী এবং মানকুমারী বসুসহ বহু নারী বাল্যবিবাহের নিন্দা করে গ্রন্থ, প্রবন্ধ ইত্যাদি রচনা করেন। বাল্যবিবাহের বিরোধিতাকারীগণ একে সামাজিক অধঃপতনের কারণ বলে অভিহিত করেছিলেন। কেউ কেউ বাল্যবিবাহকে ব্যভিচার বলেছিলেন কেউবা একে অসভ্য দেশের রীতি বলে মনে করেছিলেন। দেশের দারিদ্র বৃদ্ধির কারণ হিসেবেও অনেকে

৫২. এদের মধ্যে ১৮৭১-এ রামদয়াল চক্রবর্তী পুরুলিয়ায় প্রদত্ত একটি বক্তৃতায় বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে ভুলতে যুব সম্প্রদায়কে আহ্বান জানান। তাঁর বক্তৃতাটি এই বছরই গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

৫৩. স্বপন বসু, *উনিশ শতকে বাংলায় নবচেতনা*, পৃ. ১৬২

৫৪. উদ্ধৃত, স্বপন বসু, *উনিশ শতকে বাংলায় নবচেতনা*, পৃ. ১৬৩

বাল্যবিয়েকে দায়ী করেছিলেন।[৫৫] যেভাবেই বর্ণিত হোক না কেন এর মাধ্যমে নারীজাতির প্রতি তাদের মমত্ববোধের প্রকাশ ঘটেছিল। অবশ্য একথা মনে করার কোনো কারণ নেই যে, বাল্যবিবাহের পক্ষে এসব উদ্যোগ ব্যাপক সংখ্যক মানুষকে সচেতন করে তুলেছিল। প্রকৃতপক্ষে উনিশ শতকের শেষ দশক পর্যন্ত শিক্ষিত ও রক্ষণশীল হিন্দুদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই বাল্যবিবাহের পক্ষে অনড় অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন। এ বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যাবে ১৮৯১ সালের ৯ জানুয়ারি কাউন্সিলে উপস্থাপিত 'সহবাস সম্মতি বিল' এর প্রতি ভারতীয়দের তীব্র বিরোধিতার নমুনা থেকে।

উনিশ শতকের চল্লিশের দশক থেকে বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে বক্তব্য উপস্থাপিত হলেও ব্রিটিশ সরকার ভারতীয়দের ধর্ম ও সামাজিক বিষয়াদিতে হস্তক্ষেপ না করার নীতি থেকে এ ব্যাপারে তেমন কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি। কেবলমাত্র ১৮৬০ সালে ভারতীয় দণ্ডবিধিতে ৩৭৫ নং ধারা সংযোজন করে সহবাসের সর্বনিম্ন বয়স ধার্য করা হয় দশ বছর। এতে যেসব বিবাহিত মেয়ের বয়স দশ হয়নি তাদের সঙ্গে সহবাস পাশবিক অত্যাচার বলে গণ্য হয়।[৫৬] ১৮৮৯ সালে স্বামী সহবাসের কারণে দশ বছর অতিক্রান্ত ফুলমণির মৃত্যু হলে সরকার সহবাসসম্মতি বিল প্রণয়ন করে সম্মতির বয়স দশ থেকে বারোতে উন্নীত করার সুপারিশ করে। এই বিলকে কেন্দ্র করে বাল্যবিবাবাহের পক্ষীয় ও বিপক্ষীয়দের মধ্য তীব্র বিতর্কের সৃষ্টি হয়। বাল্যবিবাহের পক্ষীয়গণ একে ধর্মীয় শাস্ত্রের বিধান উল্লেখ করে বিলটি নাকচের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়। তাদের মতে, সামাজিক শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য বাল্যবিবাহের প্রয়োজন আছে। বাল্যবিবাহ দেশে ব্যভিচার রোধ করছে বলেও তারা মত প্রকাশ করেন। ১৮৯০ সালে কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় তাঁর *বৌবাবু* প্রহসনে লিখেন যে, 'কিশোরীর বদলে যুবতী বিয়ে করা বারবণিতাকে ঘরে আনার সামিল। কেননা প্রাপ্তবয়স্কা হইলে কন্যা দূষিত হইতে বাধ্য।'[৫৭] বাস্তবিকপক্ষে নারীর প্রতি চরম অবহেলা ও অসম্মানজনক মনোভাব থেকেই যে, তিনি এ মন্তব্য করেছিলেন, তা বলা বাহুল্য।

এ সময় মুসলিম সমাজও বাল্যবিবাহ প্রশ্নে দুভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এমনকি নারীসমাজের এক ক্ষুদ্রঅংশ অপ্রাপ্ত বয়স্ক মেয়েদের স্বার্থরক্ষাকারীরাও এ বিলের বিরোধিতা করেন।[৫৮] শাস্ত্রীয় বিধান ও আচারের দোহাই দিয়ে অল্প কয়েকজন নারী জমিদার বিলটির বিরোধিতা করলেও ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে ভুক্তভোগী নারীসমাজের পক্ষ থেকে বিলটির প্রতি উল্লেখযোগ্য সমর্থন ব্যক্ত করা হয়। ১৮৯১ সালের ১৯ মার্চ সহবাস সম্মতির বয়স ১০ এর পরিবর্তে

---

৫৫. আরিফা সুলতানা, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৯

৫৬. মালেকা বেগম ও সৈয়দ আজিজুল হক, *আমি নারী: তিনশ বছরের বাঙালি নারীর ইতিহাস*, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ৫৮

৫৭. উদ্ধৃত, আরিফা সুলতানা, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২০

৫৮. এদের মধ্যে ছিলেন দীঘাপতিয়ার রাণী ভবসুন্দরী, কাশিমবাজারের রাণী স্বর্ণময়ী দেবী, সিয়ারসোলের রাণী হরসুন্দরী এবং মুর্শিদাবাদের রাণী আন্নাকালী দেবী।

১২ বছর নির্ধারণ করে সরকার আইন প্রণয়ন করে। এ সহবাসসম্মতি আইনটি *The Act X of 1891* নামে পরিচিত। এ আইনে বলা হয় এর লঙ্ঘন ধর্ষণ হিসাবে গণ্য করা হবে এবং তা ফৌজদারি বিচারাধীন হবে।

সহবাসসম্মতি আইনটি বাঙালি নারীদের জন্য ছিল মন্দের ভালো। অনেকে মনে করেন যে, এ আইন প্রণীত হলেও এর মাধ্যমে নারীজাতির খুববেশি উপকার সাধিত হয়নি। কারণ বাস্তবিকপক্ষে বারো বছরের কিশোরীর শরীর মন কিছুই সংসার করার উপযুক্ত হয় ওঠে না। তাছাড়া সমাজের একটি ক্ষুদ্র, শিক্ষিত ও সচেতন অংশ ছাড়া বাদবাকি অংশের মধ্যে বিশ শতকেও বাল্যবিবাহের প্রচলন অব্যাহত থাকতে দেখা যায়। অবশ্য পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ১৯২৯ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর ব্রিটিশ সরকার ভারতীয়দের জন্য একটি বিবাহ সংক্রান্ত আইন পাশ করে। এ আইনটির অফিসিয়াল নাম ছিল *The Child Marriage Restraint Act*। তবে এটি এ আইনের পৃষ্ঠপোষক ভারতীয় শিক্ষাবিদ, বিচারক ও রাজনীতিবিদ হার্বিলাস সারদা (১৮৬৭-১৯৫৫) এর নামানুসারে *Sarda Act* নামে সমধিক পরিচিত। এ আইনে পুরুষের জন্য বিবাহের বয়স ২১ এবং নারীদের ১৮ নির্ধারণ করা হয়। ১৯৩০ সালের ১ এপ্রিল আইনটি কার্যকর করা হয়। সুতরাং বলা যায় যে, উনিশ শতকের বাংলায় নবজাগরণের যুগে বাল্যবিবাহ বিরোধ আন্দোলন একে বারে নিস্ফল হয়নি।

অবরোধ প্রথা ছিল উনিশ শতকের আর একটি সামাজিক বিধি, যা নারীর স্বাভাবিক বিকাশের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত সমাজে অত্যন্ত কঠোরভাবে এ প্রথা পালন করা হতো। হিন্দু সমাজে বিয়ের পূর্বে নারীর পর্দার ব্যাপারে কড়াকড়ি না থাকলেও মুসলিম সমাজে পাঁচ বছরের মেয়ের জন্যও কঠোর পর্দাব্যবস্থা চালু ছিল। তবে হিন্দু সমাজে বিয়ের পর বালিকা বধূর জন্য তা অপরিহার্য ছিল। বাঙালি নারীদের মধ্যে প্রথম আত্মজীবনী লেখক রাসসুন্দরী দাসীর (১৮০৯-১৯০০) জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে এ অবরোধ প্রথার স্বরূপ উপলব্ধি করা যায়। তাঁর ভাষ্য মতে,

> বিশেষত তখন মেয়েদের এ প্রকার নিয়ম ছিল, যে বৌ হইবে সে হাতখানেক ঘোমটা দিয়া ঘরের মধ্যে কাজ করিবে, আর কাহারো সঙ্গে কথা কহিবে না, তাহা হইলেই সে ভালো বউ হইল। সেকালে এখনকার মতো চিকন কাপড় ছিল না, মোটা মোটা কাপড় ছিল। আমি সেই কাপড় পরিয়া বুক পর্যন্ত ঘোমটা দিয়া ঐ সকল কাজ করিতাম। আর যে সকল লোক ছিল, কাহারও সঙ্গে কথা কহিতাম না। সে কাপড়ের মধ্য হইতে বাহিরে দৃষ্টি হইত না। যেন কলুর বলদের মতো দুইটি চক্ষু ঢাকা থাকিতো। আপনার পায়ের পাতা ভিন্ন অন্য কোনো দিকে দৃষ্টি চলিত না।[৫৯]

এ রকম অসহনীয় বোবাজীবন বাঙালি নারীর জন্য কতদূর পীড়াদায়ক ছিল তা সহজেই অনুমেয়। শুধু গ্রামে নয় শহরেও অবরোধ প্রথার কঠোরতা কম ছিল না। উনিশ শতকের চল্লিশের দশকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মা সারদা দেবীকে গঙ্গাস্নান করতে হতো পালকির মধ্যে বসে। তাও তিনি বাড়ির বাইরে যাবার অনুমতি পেয়েছিলেন। এমন অনেক পরিবার ছিল সেখানে মেয়েদের ঘরের চার দেয়ালের বাইরে বেরুনোর অনুমতি ছিল না। বারান্দা বা

৫৯. রাসসুন্দরী দাসী, *আমার জীবন*, কলেজ স্ট্রিট পাবলিকেশন প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৩৫৯ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২৯

উঠোনে সঙ্গোপনে একটু সময় বেরুতে পারলেও তারা অপার স্বাধীনতার আনন্দ উপলব্ধি করতেন। উনিশ শতকের পঞ্চাশের দশক থেকে শিক্ষিত পরিবারের অবরোধ মোচনের পালা শুরু হয়। মূলত নারীশিক্ষার প্রচলনের সুবাদে অবরোধ প্রথার কঠোরতা হ্রাস পেতে থাকে। তবে অপরাপর প্রথার মতো এ প্রথার নিরসনেও অগ্রণী ভূমিকা পালন করে ব্রাহ্মসমাজ ও বাঙালি খ্রিস্টান পরিবারসমূহ। ক্রমে রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের একাংশের বিরোধিতা উপেক্ষা করে ঐতিহ্যিক হিন্দুদের মধ্যে নিজ পরিবারের নারীদের অবরোধ মোচনে এগিয়ে আসতে দেখা যায়। ফলে উনিশ শতকের শেষ চতুর্থাংশে বাংলার হিন্দু সমাজে অবরোধের কঠোরতা অনেকাংশেই শিথিল হয়ে পড়ে।

উনিশ শতকে এদেশের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ নারীকেন্দ্রিক সমাজ-সংস্কার আন্দোলন ছিল নরীশিক্ষা প্রসার আন্দোলন। উনিশ শতকের পূর্ব পর্যন্ত এদেশের নারীদের শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত করে রাখা হয়েছিল। পরে উনিশ শতকে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে এদেশের কিছু প্রগতিশীল ব্যক্তি নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন। এরপর উনিশ শতকে একের পর এক বিভিন্ন ব্যক্তিগত, প্রাতিষ্ঠানিক এবং সরকারি উদ্যোগে নানা বিরোধিতার মধ্য দিয়েও নারীশিক্ষার উন্মেষ ও বিকাশ ত্বরান্বিত হয়। বাঙালি নারীমুক্তি ও নারীর আত্মোন্নয়নের অন্যতম প্রধান নিয়ামক এ স্ত্রীশিক্ষা তথা নারীশিক্ষার প্রসারে ব্যক্তি ও বেসরকারি প্রয়াস বর্তমান গবেষণাকর্মের মূল উপজীব্য হওয়ায় অভিসন্দর্ভের পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। তাই এ পর্যায়ে এতদবিষয়ে আলোচনা বিস্তৃতির অবকাশ নেই।

উপর্যুক্ত আলোচনায় পরিশেষে বলা যায় যে, বাংলার ইতিহাসে উনিশ শতক একটি তাৎপর্যপূর্ণ কাল। এ শতককে বাংলার নবজাগরণ বা নবজিজ্ঞাসার যুগ বলা হয়। এ কথা মোটামুটিভাবে স্বীকৃত যে, উনিশ শতকে বাংলায় এক নতুন যুগের সুচনা হয় এবং রাজনীতি, সমাজ, ধর্ম ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে ক্ষয়িষ্ণু ও রক্ষণশীল মনোভাবের বিরুদ্ধে এ যুগেই এক নবজাগরণের সূচনা হয়। নবজাগরণের এ যুগের অন্যতম অনুসঙ্গ ছিল নারীজাতির মুক্তি ও তাদের ভাগোন্নয়ন। উল্লেখ্য যে, উনিশ শতকে নবজাগরণের পূর্বে বাংলার নারীদের দুরবস্থা নিয়ে বলতে গেলে সেরকম কোন ভাবনা-চিন্তা হয়নি। উনিশ শতকের বিভিন্ন রচনা থেকে সমাজে নারী-মর্যাদার যে চিত্রটি পাওয়া যায় তার কিয়দাংশ বর্তমান অধ্যায়ে আলোকপাত করা হয়েছে। তথ্যসূত্র থেকে দেখা যায় যে, সে সময় বাঙালি সমাজে কন্যাসন্তানকে মনে করা হতো অমঙ্গল ও দুর্দশার প্রতীক, অন্যদিকে পুত্র সন্তান বিবেচিত হতো পারিবারিক ধন- সম্পদ হিসেবে। ধনী পিতার গৃহে হিন্দু কন্যার এক কপর্দকেরও ব্যবস্থা ছিল না। পুত্রসন্তানের জন্ম দিতে না পারলে পরিবারে স্ত্রীর মর্যাদা বজায় থাকতো না। স্বামী পুনরায় বিয়ে করতেন। এছাড়াও সমাজে এমন সব প্রথা ও সামাজিক বিধি নিষেধ প্রচলিত ছিল–যা নারীদের পশ্চাৎপদ, নিরক্ষর, পরনির্ভর, অসহায় ও নিস্পেষিত করে রেখেছিল। বস্তুত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের একটি উক্তি থেকে উনিশ শতকে বাঙালি নারীর প্রকৃত

অবস্থা অনুধাবন করা যায়। তিনি লিখেছিলেন, "হে অবলাগণ, তোমরা কি পাপে ভারতবর্ষে আসিয়া জন্মগ্রহণ কর বলিতে পারি না।" তার এ উক্তি উনিশ শতকের বাঙালি নারীর দুর্দশার চিত্রই তুলে ধরে। কিন্তু উনিশ শতকে নবজাগরণের প্রভাবে অবস্থার পরিবর্তন শুরু হয়। বাংলার প্রগতিশীল সমাজ নেতাগণ এ শতকে যেসব সমাজ-সংস্কার আন্দোলন শুরু করেছিলেন , সেগুলোর অধিকাংশই ছিল নারী কেন্দ্রিক। অর্থাৎ উনিশ শতক থেকেই এদেশে নারী ভাবনার তথা নারীদের দুর্দশা থেকে মুক্ত করার জন্যে ব্যাপকভাবে ভাবনা-চিন্তা শুরু হয়েছিল। তারই ফলশ্রুতিতে উনিশ শতকে এদেশে একের পর এক নারীকেন্দ্রিক সমাজ-সংস্কার আন্দোলন সংঘটিত হয়েছিল। কিন্তু যেসব লোকাচার, দেশাচার এবং শাস্ত্রীয় বিধান যুগ যুগ ধরে বংশপরম্পরায় নারী-পুরুষের মনকে যেভাবে কুসংস্কারাচ্ছন্ন করে তাদেরকে যুক্তিহীন নির্বোধ করে রেখেছিল সংস্কারকদের প্রয়াস সত্ত্বেও সেখান থেকে তাদের পুরোপুরি মুক্ত করা সম্ভব হয়নি। তাই শত বছরের প্রয়াস সত্ত্বেও নারীর প্রতি পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হয়নি এবং বাঙালি সমাজে নারীকে সম্পূর্ণরূপে মর্যাদাপূর্ণ অবস্থানে পৌঁছে দেয়াও সম্ভব হয়নি। তবে একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, এসময় সমাজ-সংস্কার আন্দোলনগুলো পুরোপুরি সফল না হলেও এগুলোর মধ্য দিয়ে নারীকে মুক্ত করার যে প্রাথমিক সোপান রচিত হয়েছিল, তার ওপর ভিত্তি করেই পরবর্তীকালে নারীরা অন্ধকার থেকে আলোর দিশা খুঁজে পেয়েছিলেন। তাই উনিশ শতকের পিতৃতান্ত্রিক রক্ষণশীল সমাজের প্রেক্ষাপটে নারী ভাবনার উন্মেষে এই সমাজ-সংস্কার আন্দোলনগুলোর গুরুত্ব উপেক্ষণীয় নয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে উনিশ মতকে নবজাগরণের যুগে বাংলায় নারীমুক্তি আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন পাশ্চাত্য শিক্ষায় আলোকপ্রাপ্ত বাঙালি হিন্দু পুরুষ সমাজ সংস্কারকগণ। উনিশ শতকের শেষ দিকে কিছু মহিয়সী নারীও তাদের সাথে হাত মিলিয়েছিলেন। তাদের সংস্কারের মূল লক্ষ্য ছিল স্বসমাজের নারীদের অবস্থার উন্নয়ন। এর দ্বারা মুসলিম নারীদের উপকৃত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল খুবই কম। উল্লেখ্য যে, মুসলমান সমাজে উনিশ শতকের প্রথমার্ধে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার না ঘটায় তাদের মধ্যে হিন্দুদের মতো শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব ঘটেনি। ফলে শিক্ষিত হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণি যখন পাশ্চাত্যের উদারনৈতিক প্রভাবে নিজ সমাজের অবহেলিত নারীর দুর্দশা মোচনে অগ্রসর হয়েছিল এবং সমাজ সংস্কার আন্দোলন গড়ে তুলেছিল মুসলমানদের উপস্থিতি ছিল সেখানে বলতে গেলে শূন্যের কোঠায়। তবে ১৮৭০ সালের পর মুসলমানদের মধ্যে ক্রমশ শিক্ষার প্রসার ঘটতে থাকলে এ শতকের শেষদিকে তাদের মধ্যেও একটি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশ ঘটতে থাকে এবং এরাও স্বীয় সমাজের নারীর উন্নতি সাধনে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। তবে তাদের কার্যক্রম মূলত স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। এ প্রয়াসও এত সীমিত গণ্ডির মধ্যে ছিল যে বৃহত্তর মুসলিম সমাজে তা কিছুমাত্র আলোড়ন জাগাতে সমর্থ হয়নি। অবশ্য উনিশ শতকে হিন্দু সমাজে যেসব কুপ্রথা ও কুসংস্কার প্রচলিত ছিল মুসলিম সমাজে তার কোনো কোনোটির অস্তিত্বও ছিল না। যেমন সতীদাহ প্রথা, কৌলিন্যপ্রথা, বিধবার চির বৈধব্য ইত্যাদি। তাছাড়া ধর্মীয় ও পারিবারিকভাবে হিন্দুদের চেয়ে মুসলমান নারীরা কিছু বেশি অধিকার ভোগ করতেন। তারা পিতা ও স্বামীর

সম্পত্তির অংশভাগী ছিল। স্বামীর সঙ্গে সৌহার্দ্য স্থাপিত না হলে তাকে তালাক দেবার অধিকারও মুসলিম নারীর ছিল। তবে হিন্দু সমাজের মতোই বহুবিবাহ এবং পর্দা প্রথা মুসলিম নারীর জন্য অবধারিত ছিল। মুসলিম সমাজে পর্দা প্রথার কঠোরতা নারীর যাবতীয় স্বাধীনতাই হরণ করে নিয়েছিল। তবে এটা শুধু উচ্চবিত্তদের সমস্যা ছিল। নিম্নবিত্তদের মধ্যে পর্দার বাড়াবাড়ি ছিল না বলেই অনুমিত হয়। এ প্রসঙ্গে মনে রাখা ভালো যে ইসলাম ধর্মে মানুষে মানুষে বৈষম্য অনুমোদিত না হলেও উনিশ শতকে বাংলায় কৌলিন্য প্রথার মতো মুসলিম সমাজেও অভিজাত শ্রেণির সৃষ্টি হয়। আতরাফ বা নিম্ন শ্রেণির সঙ্গে এদের বৈবাহিক সম্পর্ক সচরাচর প্রচলিত ছিল না। তবে বিদ্যা ও বিত্তের অধিকারী হতে পারলে আতরাফরাও অভিজাত শ্রেণির মর্যাদা পেতেন। হিন্দু কুলীনদের মতো শতবিবাহ না করলেও মুসলমান অভিজাত ও অনভিজাত উভয় অংশেই শাস্ত্রসম্মতভাবে বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল। অনেক সময় চার স্ত্রী রাখার শাস্ত্রীয় বিধান লঙ্ঘন করে কেউ কেউ এর বেশি স্ত্রীও ঘরে আনতো। তবে কুলীনদের মতো স্ত্রীরা বাপের বাড়িতে থাকতো না। তারা স্বামী গৃহেই থাকতো এবং দাম্পত্য অধিকার বা গ্রাসাচ্ছাদন থেকে হিন্দু কুলীন কন্যার মতো সাধারণত বঞ্চিত হতেন না। তবে বহুবিবাহ প্রথাকে কুনীতি বিবেচনা করে উনিশ শতকের শেষ ভাগে মুসলিম চিন্তাবিদগণ সমাজে প্রচলিত বহুবিবাহের বিরুদ্ধে সরব প্রতিবাদ জানাতে থাকেন। ময়মনসিংহ জেলার সাব ডেপুটি নওশের আলী খাঁ ইউসুফ জয়ী তার *বঙ্গীয় মুসলমান* গ্রন্থে (১৮৯০) বহুবিবাহের বিরুদ্ধে তীব্রমত প্রকাশ করেন।

ইংরেজি শিক্ষিত নব্য মুসলিম সমাজের উল্লেখযোগ্য পুরুষ ইসমাইল হোসেন সিরাজী বাঙালি মুসলিম নারী জীবনের নানা দুঃখ, দুর্দশা ও অভাব-অভিযোগ বিষয়ে সচেতন ছিলেন। তিনিও বাল্যবিয়ে ও বহুবিবাহের তীব্র বিরোধিতা করেন। মুসলিম সমাজে বিধবা বিবাহ নিষিদ্ধ না থাকলেও হিন্দু সমাজের প্রভাবে বিধবা বিবাহের প্রচলন ছিল না বললেই চলে। সৈয়দ আহমদ বেরিলভীর সমাজ সংস্কার আন্দোলন বা ওয়াহাবী আন্দোলন বিধবা বিবাহের উপর জোর দিয়েছিল। এমনকি তিনি বিধবা বিবাহ বাধ্যতামূলক করার পক্ষেও মত দিয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও উনিশ শতকের শেষে মুসলিম সমাজে যে এর যথেষ্ট প্রচলন হয়নি, যশোরের সাহিত্যিক মুনসী মেহেরউল্লা (১৮৬১-১৯০৭) রচিত *বিধবা গঞ্জনা ও বিষাদভাণ্ডার* (১৮৯৭) গ্রন্থটি তার উল্লেখযোগ্য প্রমাণ। এখানে তিনি হিন্দু বিধবাদের পুনর্বিবাহের যেমন সুপারিশ করেন তেমনি মুসলমান সমাজেও এর অপ্রচলনের নিন্দা করেন। ৭০ শতাব্দীর শেষ দিকে হিন্দু সংস্কারকদের সাথে সাথে মুসলমান সমাজেরও এক ক্ষুদ্র অংশ বাল্যবিয়ের বিরুদ্ধে সংগঠিত হতে শুরু করে। অবশ্য হিন্দু রক্ষণশীলদের মত মুসলমান সমাজেরও এক উল্লেখযোগ্য অংশ বাল্যবিয়ের পক্ষে অনড় থাকেন। এদের মধ্যে ছিল জমিদার, উকিল ও তালুকদার শ্রেণির লোক। এমনকি কবি কায়কোবাদও বাল্য বিবাহ বিরোধী ১৮৯১ সালের সহবাস সম্মতি বিলের বিপক্ষে এক দীর্ঘ কবিতা লেখেন।

তথ্যসূত্র বিশ্লেষণে বলা যায় হিন্দু সমাজের চেয়ে মুসলিম সমাজে নারী নিগ্রহের উপকরণ তুলনামূলকভাবে কম থাকলেও অবরোধ প্রথা, শিক্ষাহীনতা, বাল্যবিয়ে, বহুবিবাহ, বৈধব্য গঞ্জনা ইত্যাদি হতে উদ্ভূত সমস্যায় মুসলিম নারীরাও ভোগান্তির মধ্যে ছিলেন। প্রতিবেশি সমাজের অনুকরণে বাঙালি মুসলিম মধ্যবিত্ত পুরুষরা এ থেকে নিজেদের নারীসমাজকে মুক্ত করার অল্পবিস্তর চেষ্টা করেছেন। আরো লক্ষ্যণীয় যে, মুসলিম সমাজে সংখ্যায় কম হলেও দু'একজন নারীও এ বিষয়ে অবদান রেখেছেন। এ প্রসঙ্গে নবাব ফয়জুন্নেছা চৌধুরাণী, করিমুন্নেছা বেগম, রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ মহিয়ষী নারীগণ নিজ সম্প্রদায়ের নারীদের জাগরণ ও মুক্তিতে বিশেষ অবদান রাখেন। অভিসন্দর্ভের অন্যত্র এ প্রসঙ্গে আলোকপাত করা হবে।

পরিশেষে বলা যায় যে, উনিশত বাস্তবিক অর্থে বাংলার ইতিহাসে এক যুগসন্ধিক্ষণ কাল। এ সময় নবজাগরণ প্রসূত সমাজ-সংস্কার আন্দোলনগুলোর মাধ্যমে বাঙালি নারীদের নিয়ে যে ভাবনা-চিন্তার সূত্রপাত হয়েছিল, তাই পরবর্তীকালে বিস্তৃত হয়ে নারীর জাগৃতি, নারীমুক্তি ও নারী স্বাধীনতার পথকে অনেকটাই প্রশস্ত করেছিল। এখানেই এসব আন্দোলন ও সংস্কারের সার্থকতা।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলায় নারীশিক্ষা: ঐতিহাসিক পটভূমি

বাংলায় নারীশিক্ষা প্রসারে ব্যক্তি ও বেসরকারি প্রয়াস বিষয়ক গবেষণার মূল আলোচনার পূর্বে প্রাসঙ্গিকভাবে বাংলার নারীশিক্ষার ঐতিহাসিক পটভূমি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করা প্রয়োজন। এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, মানব সভ্যতার বিকাশে পুরুষের পাশাপাশি নারী জাতিও ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছে। এজন্যই কবি কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে "বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণকর অর্ধেক তার করিয়াছে নারী অর্ধেক তার নর।" কবির এ উক্তিতে নারী জাতির ভূমিকার স্বীকৃতি আছে সত্য, তবে পুরুষশাসিত সমাজ সবসময় নারীর কৃতি-কর্ম, এমনকি তাদের মানবিক অধিকারেরও স্বীকৃতি দেয়নি। বঙ্গ-ভারতে নারী জাতির অবস্থা ছিল আরো অধঃপতিত। ভারতীয় সমাজে নারীকে সবসময়ই পুরুষের আজ্ঞাধীন হিসেবে দেখা হতো। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁর 'বহু বিবাহ' নামক রচনায় উল্লেখ করেছেন "ভারতবর্ষে স্ত্রীজাতির প্রতি পুরুষজাতি যেরূপ নৃশংসতা, স্বার্থপরতা, অবিমৃশ্যকারিতা প্রদর্শন করে, তা তুলনাহীন।" নারীদের সম্পর্কে পুরুষদের ভাবনা ছিল স্ত্রীজাতি অপেক্ষাকৃত দুর্বল ও সামাজিক নিয়মেই পুরুষ জাতির নিতান্ত অধীন। কিছু ব্যতিক্রম হয়তো ছিল, তবে সাধারণভাবে ভারতীয় তথা বাঙালি সমাজে পুরুষদের চোখে নারীরা ছিল গৃহকর্মে উপযুক্ত ক্রীতদাসী তুল্য। এমনকি মেয়েদের মানসিক শক্তি সম্পর্কেও পুরুষদের প্রবল অবজ্ঞার মনোভাব ছিল। এরূপ বাস্তবতায় এদেশে নারীশিক্ষার যে বিশেষ প্রচলন ছিল না এ কথা বলা বাহুল্য। অথচ মানুষের মৌলিক অধিকারগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো শিক্ষা। শিক্ষা মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিকে বিকশিত করে, নিজের অস্তিত্বকে উপলব্ধি করতে শেখায়। শিক্ষা মানব সম্পদ উন্নয়নেও একটি অত্যাবশ্যকীয় উপাদান। পুরুষ ও নারী মিলেই মানব সমাজ। কিন্তু যুগে যুগে পুরুষ প্রধান সমাজে নারীকে শিক্ষার মতো মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখা হয়েছে। এর পেছনে ছিল নারীকে পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ রেখে তাদের অধিকারবোধহীন, সচেতনতাবোধহীন নির্জীব প্রাণীতে রূপান্তরিত করে রাখার সচেতন প্রয়াস। উনিশ শতকের বাংলার নবজাগরণের যুগে নবতর পরিস্থিতিতে বাঙালি সমাজপতিগণ নারীমুক্তির উপায় হিসেবে তাদের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। ফলে এ শতকের সূচনা থেকেই বাংলায় নারীশিক্ষার ব্যাপারে পুরুষ সমাজেও আগ্রহ দেখা যায়। ফলে নারী শিক্ষার প্রসারে সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি ব্যক্তি ও বেসরকারি সাংগঠনিক

উদ্যোগ গতিবেগ লাভ করে। আলোচ্য অধ্যায়ে উনিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত বাংলায় নারী শিক্ষার ঐতিহাসিক পটভূমি সম্পর্কে আলোকপাতের প্রয়াস নেয়া হয়েছে।

২.১: বাংলায় নারীশিক্ষা: প্রাক-মুসলিম যুগ

বস্তুত বৈদিক (১৭৫০-৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) পরবর্তী যুগে বা মহাভারতের যুগে বাংলা নামের ভূখন্ডের উল্লেখ পাওয়া গেলেও গুপ্তযুগের (৩২০- ৫৫০ খ্রি.) পূর্বে বাংলার ধারাবাহিক ইতিহাস সংকলনের কোন উপাদান পাওয়া যায় না। মহাভারতে বাংলার কয়েকটি খণ্ড রাজ্যের উল্লেখ পাওয়া যায় বটে, কিন্তু এসব রাজ্যের শাসনপ্রণালী ও জীবনপদ্ধতি ইত্যাদি সম্পর্কে তেমন কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। খ্রিস্টিয় চতুর্থ শতকের সূচনায় বালায় গুপ্ত শাসন সম্প্রসারিত হয়। গুপ্তযুগে বাংলার রাজনৈতিক শাসনব্যবস্থা ও সামাজিক জীবন সম্পর্কে ঐতিহাসিক বিবরণ পাওয়া গেলেও সে যুগের নারীশিক্ষা সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না। অবশ্য এ সময় শাসনকার্যে নারীদের অংশ গ্রহণের কিছু তথ্য পাওয়া যায়। এ সময় কতিপয় সুশিক্ষিত নারীর কথাও জানা যায়। তবে তাঁরা যে সমাজের কোনো সাধারণ নারী ছিলেন না, তা বলা বাহুল্য। বস্তুত তাঁরা সকলেই ছিলেন সমাজের উচ্চ অভিজাত শ্রেণির প্রতিনিধি। গুপ্ত শাসনামলে ছেলে মেয়েদের একত্রে লেখা পড়া করার কথাও ঐতিহাসিক তথ্যসূত্রে উল্লেখ রয়েছে।[১] তবে এই সহশিক্ষা কার্যক্রম আলোচ্য বাংলা অঞ্চলের দৃষ্টান্ত কি-না তা নিশ্চিত করে বলার মতো ঐতিহাসিক তথ্য প্রমাণ নেই।

পালযুগের ন্যায় সেন শাসনামলেও (১০৭০-১২৩০ খ্রিস্টাব্দ) বাংলায় নারীশিক্ষার কোনো প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজন হয়েছিল বলে ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায় না। তবে এ যুগেও উচ্চশ্রেণির অভিজাতদের মধ্যে নানা গুণেগুনান্বিতা, বিদুষী ও প্রতিভাবান বেশ কয়েকজন নারীর পরিচয় পাওয়া যায়। পদ্মীনি, বিদ্যুৎপ্রভা, শশীকলা, পদ্মাবতী প্রমুখ ছিলেন এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। অবশ্য এ কয়েকজন নারীর দৃষ্টান্ত দিয়ে সামগ্রিক সমাজের মূল্যায়ন করা সম্ভব নয়। বস্তুত এরা ছিলেন সমাজের ব্যতিক্রম উদাহরণ। এর বাইরে সাধারণ নারী সমাজ তো বটেই এমনকি অভিজাত পরিবারের নারীরাও শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত ছিলেন। অভিজাত পরিবারের নারীদের কিছুটা সামাজিক মর্যাদা থাকলেও এক্ষেত্রে সাধারণ নারীদের অবস্থা ছিল করুণ। তারা কেবল শিক্ষার আলো থেকেই বঞ্চিত ছিলেন না, বরং পূর্ববতী অন্য যে কোনো যুগের তুলনায় তারা অনেক বেশি নিপীড়িত ও শৃঙ্খলিত ছিলেন বলে জানা যায়।[২] তবে এরাও কোনো সাধারণ নারী ছিলেন না। এরা ছিলেন উচ্চ অভিজাত ও রাজপরিবারের সদস্য।

পালযুগের ন্যায় সেন শাসনামলেও (১০৭০-১২৩০ খ্রিস্টাব্দ) বাংলায় নারীশিক্ষার কোনো প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজন হয়েছিল বলে ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায় না। তবে এ যুগেও উচ্চশ্রেণির অভিজাতদের মধ্যে

১. শ্যামলী আকবর, সৈয়দা তাহমিনা আখতার ও জাহানারা আরা বেগম, নারীশিক্ষা: উদ্ভব ও বিকাশ, ঢাকা ১৪০৫ বাং, পৃ: ১৮
২. ঐ, পৃ. ২৩

নানা গুণেগুনান্বিতা, বিদুষী ও প্রতিভাবান বেশ কয়েকজন নারীর পরিচয় পাওয়া যায়। পদ্মীনি, বিদ্যুৎপ্রভা, শশীকলা, পদ্মাবতী প্রমুখ ছিলেন এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। অবশ্য এ কয়েকজন নারীর দৃষ্টান্ত দিয়ে সামগ্রিক সমাজের মূল্যায়ন করা সম্ভব নয়। বস্তুত এরা ছিলেন সমাজের ব্যতিক্রমি উদাহরণ। এর বাইরে সাধারণ নারী সমাজ তো বটেই এমনকি অভিজাত পরিবারের নারীরাও শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত ছিলেন। অভিজাত পরিবারের নারীদের কিছুটা সামাজিক মর্যাদা থাকলেও এক্ষেত্রে সাধারণ নারীদের অবস্থা ছিল করুণ। তারা কেবল শিক্ষার আলো থেকেই বঞ্চিত ছিলেন না, বরং পূর্ববতী অন্য যে কোনো যুগের তুলনায় তারা অনেক বেশি নিপীড়িত ও শৃঙ্খলিত ছিলেন বলে জানা যায়।[৩]

২.২: বাংলায় নারীশিক্ষা: মুসলিম শাসনামল

সেন শাসনের ধ্বংসস্তুপের উপর বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। মুসলিম বাংলায় নারীশিক্ষা প্রতিষ্ঠানিক রূপলাভ করে। ধর্মীয় নীতি নির্দেশের কারণেই সম্ভবত মুসলিম সমাজ নারীশিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে। তবে এ সময় নারীশিক্ষা প্রাথমিক পর্যায়ের একটি বিশেষ স্তর পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। মক্তবে মুসলমান ছেলে- মেয়েরা একই সঙ্গে পড়াশোনা করতো। প্রাথামিক স্তরে ছেলে-মেয়েদের এ সহশিক্ষার কথা এডামের রির্পোটেও উল্লেখ করা হয়েছে।

মুসলিম শাসনামলে প্রাথমিক স্তরে নারীশিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা থাকলেও তাদের জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার কোন নিয়মিত পদ্ধতি ছিল না। পর্দা প্রথার কারণে মাধ্যমিক ও উচ্চপর্যায়ে সাধারণভাবে প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভ করা ছিল মেয়েদের জন্য অসম্ভব। তবে শিক্ষিত ও বিদ্যোৎসাহী শাসকবর্গ, অভিজাত সম্প্রদায়ও অবস্থাসম্পন্ন পরিবারে 'অন্তঃপুর বা গৃহ শিক্ষার' ব্যবস্থা ছিল। রাজপরিবার বা সম্পন্ন পরিবারের লোকেরা নিজ গৃহে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও শিক্ষক রাখার মাধ্যমে নিজ কন্যাদের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতেন।[৪] এটি ছিল একটি বিশেষ ধরনের ব্যবস্থা। এর ফলে নারীদের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা শাসকবর্গ এবং অভিজাত শ্রেণির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। সমসাময়িক ঐতিহাসিক বিবরণী থেকে এ সময়কার কতিপয় সুশিক্ষিতা সংস্কৃতিবান মহিয়সী মুসলিম নারীর পরিচয় পওয়া যায়। এদের মধ্যে সুবাদার ইব্রাহিম খান ফতেহজঙ্গের স্ত্রী রোকাইয়া বেগম, শায়েস্তা খানের কন্যা পরিবিবি (প্রকৃত নাম ইরান দুখত), নবাব মুর্শিদকুলি খানের স্ত্রী শরফুন্নেসা বেগম, নবাব সুজাউদ্দীন খানের স্ত্রী ও নবাব মুর্শিদকুলি খানের কন্যা জিন্নাতুন্নেসা, জিন্নাতুন্নেসার কন্যা নাফিসা বেগম ও দুরদানা বেগম, নবাব আলীবর্দী খানের কন্যা মেহরুন্নেসা (ঘসেটি বেগম

---

৩. শ্যামলী আকবর ও অন্যান্য, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৯

৪. এম.এ. রহিম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, ১ম খন্ড (১২০৩-১৫৭৬) মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান (অনু.) বাংলা একাডেমি, ঢাকা, পুনঃ মূদ্রণ, ১৯৯৫, পৃ: ১৭৯

নামে সমধিক পরিচিত) ও আমিনা বেগম এবং নবাব মীর জাফর আলী খানের স্ত্রী মুন্নী বেগম প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।[৫] এদের মধ্যে কেউ কেউ তাদের শিক্ষা ও প্রতিভা গুণে ইতিহাসে খ্যাতি লাভ করেন এবং রাজনীতিতে যুক্ত হয়ে সাফল্যের পরিচয় দেন।

মুসলিম শাসনামলে কেবল মুসলিম নয় হিন্দু নারীরাও শিক্ষা লাভের সুযোগ পেয়েছিলেন। তবে এ শিক্ষা যে প্রাথমিক পর্যায়ের ছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তথ্যসূত্র থেকে জানা যায় যে, প্রাথমিক পর্যায়ে হিন্দু মেয়েরা ছেলেদের সাথে একত্রে টুলে পড়াশুনা করতে পারতো। দয়ারামের *সারদামঙ্গল* গ্রন্থ এবং রাসসুন্দরীর আত্মচরিত্রে ছেলে- মেয়েদের একত্রে পাঠশালায় যাওয়ার বিবরণ পাওয়া যায়। এ ছাড়াও ময়মনসিংহ ও পূর্ববঙ্গগীতিকাতে প্রতিফলিত সমাজচিত্রে ছেলে-মেয়েদের একত্রে টোলে লেখাপড়া করার কথা পাওয়া যায়। এসময় নিম্নবঙ্গীয় পরিবারের মেয়েদের পড়াশুনা করার কিছু তথ্যও পাওয়া যায়। ব্যাধনারী ফুল্লুরা, খুল্লনা, বিপুলা ও রাজদেবী প্রমুখের হিন্দু ধর্মশাস্ত্রের উপর যথেষ্ট জ্ঞান ছিল।[৬] মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা না থাকলেও হিন্দু সমাজেও উচ্চশিক্ষিতা মহিলা ছিলেন। রামপ্রসাদের *বিদ্যাসুন্দর* এবং ভারতচন্দ্রের *অন্নদামঙ্গল* কাব্যে বিদ্যাবতী নারীর উল্লেখ রয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কবি চন্ডিদাসের প্রেয়সী রামী, শ্রী চৈতন্যের শিষ্যা মাধবী, কবি বংশী দাসের কন্যা চন্দ্রাবতী, খনা, প্রিয়ম্বদা দেবী, আনন্দময়ী দেবী, বেজয়ন্তী দেবী প্রমুখের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। এরা সবাই সুশিক্ষিতা ও সংস্কৃতিবান নারী হিসেবে সুপরিচিত।[৭] এমনকি উনিশ শতকের প্রথমার্ধেও বর্ধমানের ব্রাহ্মণকন্যা হটী বিদ্যালঙ্কার, বৈষ্ণবকন্যা রূপমঞ্জুরী, ফরিদপুরের জনৈক ব্রাহ্মণের স্ত্রী শ্যামাসুন্দরী এবং উলা গ্রামের শরণ সিদ্ধান্ত ভট্টাচার্যের দুই কন্যা প্রমুখ কিছু শিক্ষিত নারীর কথা বলা যায়। এরা সকলেই ব্যাকরণ ও ন্যায়শাস্ত্রেরও সুপণ্ডিত ছিলেন।[৮]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বাংলার হিন্দু মুসলিম সমাজের উপরোক্ত কতিপয় বিদুষী মহিলার কথা জানা গেলেও বস্তত আঠার শতকের শেষ দিকেও বাংলায় নারীশিক্ষার খুব বেশি প্রচলন ছিল এ কথা বলার সুযোগ নেই। সীমিত পরিসরে সম্ভ্রান্ত ঘরে মেয়েদের শিক্ষাদান ব্যবস্থা প্রচলিত থাকলেও সাধারণভাবে গৃহস্থ ঘরে মেয়েদের লেখাপড়া এক প্রকার উঠেই গিয়েছিল।[৯] উইলিয়াম এডামের বাংলার শিক্ষা সংক্রান্ত ১৮৩৫ ও ১৮৩৮ সালের রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, কয়েকজন বিধবা জমিদার ও জমিদার কন্যা ছাড়া তখনকার বাংলার সকল নারীই প্রায় অশিক্ষিত ছিলেন। এডামের ভাষ্য মতে, মহিলা জমিদারগণ লেখাপড়া শিখতেন জমিদারির হিসাব রাখার

---

৫. শ্যামলী আকবর ও অন্যান্য, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬০-৬৫

৬. গীতশ্রীবন্দনা, *স্পন্দিত অন্তর্লোক আত্মচরিতে নারীপ্রগতির ধারা*, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃ. ৯১২

৭. রমেশচন্দ্র মজুমদার (সম্পা:) *বাংলাদেশের ইতিহাস*, ২য় খন্ড, (মধ্যযুগ), কলিকাতা, চতুর্থ সংস্করণ, ১৯৮৭, পৃ. ৬৭

৮. দীনেশ চন্দ্র সেন, *বৃহৎবঙ্গ*, ২য় খন্ড, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯০, পৃ. ৯১২

৯. রমেশচন্দ্র মজুমদার (সম্পা:) *বাংলাদেশের ইতিহাস*, ২য় খন্ড, পৃ. ৩০০

উদ্দেশ্যে এবং সন্তানহীন বিধবারা শিখতেন ধর্মগ্রন্থ পড়ার উদ্দেশ্যে।[১০] রাজশাহী জেলার শিক্ষা সংক্রান্ত বিবরণী উপস্থাপনকালে এডাম সেখানকার নারীশিক্ষার এক ভয়াবহ ও করুণ চিত্র তুলে ধরেন। রাণী ভবানীর মতো শিক্ষানুরাগী ও বিচক্ষণ জমিদারের কর্তৃত্বাধীন এলাকার ৫ থেকে ১৪ বছরের সমস্ত মেয়েরাই অশিক্ষিত ছিলেন বলে উইলিয়াম এডাম উল্লেখ করেছেন। এমনকি অভিভাবকরা তাদের মেয়েদের শিক্ষাদানের কথা বিবেচনাও করতেন না বলে এডামের তথ্য থেকে জানা যায়।[১১]

বাংলার নারীশিক্ষার এ করুণ অবস্থা সম্পর্কে এডামের দেয়া উপর্যুক্ত বক্তব্যের যথার্থতা প্রমাণিত হয় যখন রাজা রামমোহন রায় ১৮১৯ সালে বাংলার শিক্ষিত নারীদের কথা বলতে গিয়ে কেবল লীলাবতী, ভানুমতী, কর্ণাট রাজের স্ত্রী, কালিদাসের স্ত্রী ও মৈত্রী প্রমুখের এবং প্রায় একই সময় গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার কেবল শিক্ষিত নারী হিসেবে রানী ভবানী, হটী বিদ্যালঙ্কার প্রমুখের নামোল্লেখ করেই থেমে যান।[১২]

২.৩: বাঙালিসমাজে নারীশিক্ষার পশ্চাদপদতার কারণ

আঠারো শতক অবধি বাংলায় নারীশিক্ষার এ পশ্চাদপদতার কারণ কী? এ বিষয়ে ইতিহাসবিদ সমাজতাত্ত্বিকগণ নানা কারণ নির্দেশ করেছেন। প্রথমত: তখন পর্যন্ত বাঙালি বিশেষ করে হিন্দু সমাজ নারীশিক্ষাকে শাস্ত্রবিরোধী বলে মনে করতেন। ১৮৪৯ সালের ২৯ মে সম্বাদ ভাস্বর পত্রিকায় প্রকাশিত একটি লেখায় এরূপ মনোভাবের কথা বলা হয়েছে। মদনমোহন তর্কালঙ্কারের ‘স্ত্রী শিক্ষা’ বিষয়ক একটি রচনায় এ বিষয়টি উল্লেখ রয়েছে।[১৩]

দ্বিতীয়ত: সেকালে বাঙালি সমাজে প্রচলিত অনেক কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসও নারীশিক্ষার বড় অন্তরায় ছিল। প্রচলিত ধারণা ছিল ‘লেখাপড়া করলে মেয়েরা বিধবা হবে’; ‘মেয়েরা কালির আঁচড় দিলেই গৃহে অলক্ষ্মী প্রবেশ করবে’; ‘লেখাপড়া করলে মেয়েরা অসতী হবে’; ‘বিদ্যালয়ে যাওয়ার সময়ে অথবা বিদ্যালয়ে পাঠাভ্যাসের সময় তাদের কৌমার্য অপহৃত হবে’ ইত্যাদি।[১৪] সমকালীন শিক্ষাবিষয়ক নথিপত্রেও এ ধরণের উদ্বেগের প্রকাশ রয়েছে- “পিতামাতারা মনে করেন, মেয়েরা যদি লিখতে পড়তে শেখে তবে তারা সাধারণ গৃহস্থালি কাজকে অবজ্ঞা করবে। ফলে মেয়েরা দুষ্ট হয়ে যাবে। যার অর্থ মেয়েরা উচ্ছৃঙ্খল হবে এবং বাবা মা

---

১০. William Adam, *Reports on the State of Education in Bengal of 1835 &1838* (ed.) by A Basu, Calcutta University, Calcutta, 1941, p. 187

১১. William Adam, *Reports on the State of Education in Bengal of 1835 &183*, p. 187

১২. রাজা রামমোহন রায়, *সহমরণ বিষয়ক*, পৃ.পৃ. ২০৫-২০৬; গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার, *স্ত্রী শিক্ষা বিধায়ক*, সম্পা. বজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, কলিকাতা, ১৩৪৪ বঙ্গাব্দ, পৃ.পৃ. ২৯-৩০

১৩. *সম্বাবাদ ভাস্বর*, ১৮৪৯ সালের ২৯ মে; মদনমোহন তর্কালঙ্কার ‘স্ত্রী শিক্ষা’, *সর্বশুভকরী পত্রিকা*, আশ্বিন, ১২৭২

১৪. গোলাম মুরশিদ, *সমাজ সংস্কার আন্দোলন ও বাংলা নাটক*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৪ পৃ.পৃ. ২৬২-২৬৩

কর্তৃক নির্বাচিত স্বামীকে গ্রহণ না করার প্রবণতা বাড়বে।”[১৫] ইংরেজি বিদ্যা শিক্ষা অর্জন করলে মেয়েরা ‘ইয়ং বেঙ্গল’-এর মতো উচ্ছৃঙ্খলা হবে এরূপ আশঙ্কার কারণেও অনেক অভিভাবক তাদের কন্যা সন্তানকে স্কুলে পাঠানোর ব্যাপারে উৎসাহ বোধ করতেন না।[১৬]

তৃতীয়ত: এছাড়াও বাঙালি সমাজে প্রচলিত বাল্য বিবাহ এবং অবরোধ বা পর্দা প্রথা ইত্যাদিও নারীশিক্ষা অপ্রচলনের অন্যতম কারণ ছিল। বস্তুত ধর্মসূত্রে, স্মৃতিতে এমন কি মহাভারতে বাল্য বিবাহের বিধি না থাকলেও মধ্যযুগে বাংলায় হিন্দু সমাজের মধ্যে বাল্য বিবাহের ব্যাপক প্রচলন ছিল। স্মার্থ পন্ডিত রঘুনন্দের বিধি অনুযায়ী সাত বছরের কন্যার বিবাহ দান খুবই প্রশংসনীয় কাজ ছিল। দশ বছরের অধিক বয়স্ক কন্যাকে বিবাহ না দিলে পিতা সমাজে নিন্দার পাত্রে পরিণত হতেন এবং এটা অমঙ্গলের কারণ বলেও বিবেচিত হতো।[১৭] *সোম প্রকাশ* পত্রিকার বিবরণ অনুযায়ী বাল্য বিবাহের কারণে মেয়েরা শিক্ষার প্রাথমিক স্তরই উত্তীর্ণ হতে পারতো না। অল্প স্বল্প পড়াশুনা করেই তাদেরকে শ্বশুরালয়ে চলে যেতে হত এবং সেখানে তারা গৃহস্থালী কাজে এমনভাবে জড়িয়ে, পড়তো যে, পূর্বে তারা যা কিছু শিখতো তাও ভুলে যেতো। [১৮]

পর্দা প্রথা ইসলামের একটি ধর্মীয় বিধান হলেও মধ্যযুগে বাংলার হিন্দু-মুসলিম উভয় সমাজের স্ত্রী লোকদের মধ্যেই এর প্রচলন ছিল। সমকালীন ইউরোপীয় পর্যটক ও সমসাময়িক ঐতিহাসিক গ্রন্থাদির বিবরণ মতে, গৃহাভ্যন্তরের বাইরে সামাজিক জীবনে মেয়েদের অংশগ্রহণ ছিল না বললেই চলে। বস্তুত নারীদের জন্য পর্দা বা আব্রুপ্রথা সমাজে আভিজাত্য ও সামাজিক শালীনতার প্রতীক বলেও গণ্য হতো। নারীদের বে-আব্রু হওয়াকে সমাজে অমর্যাদাকর ও নিন্দনীয় বলে বিবেচনা করা হতো। ব্রাহ্ম সমাজের যুবনেতা কেশবচন্দ্র তাঁর আর্চায পদে অভিষেক অনুষ্ঠানে সস্ত্রীক জোড়াসাকোয় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়িতে যাবার সিদ্ধান্ত নিলে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল, তা থেকে তৎকালীন অবরোধ প্রথার কঠোরতা সম্পর্কে অনুমান করা যায়।[১৯] সামাজিক বিরোধিতা ও নিন্দাবাদের ভয়ে সেকালের পর্দাপ্রথা বিরোধী প্রগতিমনস্ক ব্রাহ্মরাও স্ত্রী বা পরিবারের মহিলাদের নিয়ে প্রকাশ্য রাজপথে বা সভা সমিতিতে যেতে সাহস করতেন না। এমতাবস্থায় মেয়েদের স্কুলে পাঠানোর ব্যাপার ছিল অকল্পনীয়। বস্তুত সে সময় পুরুষদের ভয় ছিল শিক্ষা পর্দাপ্রথার সাথে দ্বন্দ্ব তৈরি করবে। কোম্পানি সরকারের একজন অফিসারের ভাষ্যমতে, “উচ্চবিত্তের ক্ষেত্রে স্কুল ব্যবস্থার মাধ্যমে অধিক সংখ্যক প্রাপ্ত বয়স্ক মেয়েকে একত্রিত করা অসম্ভব ছিল, পাছে তারা জনগণের দর্শনীয় বস্তুতে পরিণত হয়।”[২০]

---

১৫. *Progress of Education of India* 1892-93, Third Quinquennial Review, Darling & Sons, London, 1898, p. 277

১৬. অক্ষয় দত্ত, ‘বর্তমান ব্যবহার’, *তত্ত্বপ*, অক্টোবর-নভেম্বর, ১৮৪৯, পৃ. ৮৪

১৭. রমেশচন্দ্র মজুমদার (সম্পা:) *বাংলাদেশের ইতিহাস*, তৃতীয় খন্ড, (আধুনিক যুগ), কলিকাতা, ১৯৮১,পৃ: ৩৪৫

১৮. *সোম প্রকাশ*, ১৭ জৈষ্ঠ্য সংখ্যা, ১২৭২

১৯. বিনয় ঘোষ, *বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ*, ওরিয়েন্ট এন্ড লংম্যান, কলকাতা, ১৯৮৪, পৃ. ২২৬-২২৭

২০. উদ্বৃত, Y.B. Mathur, Note by E.C. Bailey, Secretariat of Indian Government, 22 June, 1867

চতুর্থত: নারীশিক্ষার ব্যাপার পুরুষ সমাজের ঔদাসীন্য তৎকালীন বাংলায় নারীশিক্ষার বড় অন্তরায় ছিল। সোম প্রকাশ পত্রিকার সম্পাদকীয় নিবন্ধমতে, "এ দেশের পুরুষরা অদ্যাপি ভাল করিয়া লেখা পড়া শিখিতে পারে নাই। সুতরাং যাহারা এদেশীয় অবলাগণের হর্ত্তাকর্তা বিধাতা, তাহারা যখন স্বয়ং সিদ্ধ হইতে পারিলেন না তখন অন্যকে কেমন করিয়া সিদ্ধ করিবেন?"[২১]

উল্লেখ্য যে, *সোম প্রকাশ* পত্রিকার নিবন্ধ নারীশিক্ষার ব্যাপারে ঔদাসীন্যের জন্য পুরুষদের অশিক্ষাকে দায়ী করা হয়েছে। এতে দ্বিমত করার কোন কারণ নেই। কিন্তু সাথে সাথে একথাও আমাদের মনে রাখতে হবে যে, সে সময়কার অনেক শিক্ষিত এমন কি ইংরেজি শিক্ষিত লোকও নারীশিক্ষার তীব্র বিরোধিতা করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ কাশীপ্রসাদ ঘোষের কথা বলা যায়। তিনি ছিলেন নব্য ইংরেজি শিক্ষিত একজন মানুষ। তবে তাঁর সম্পাদিত *The Hindu Intelligencer* পত্রিকা ছিল নারীশিক্ষাবিরোধীদের একটি মুখপত্র। কাশীপ্রসাদ ঘোষ নিজেও তাঁর পত্রিকায় নারীশিক্ষাবিরোধী প্রবন্ধ লিখতেন।[২২] শুধু *The Hindu Intelligencer* পত্রিকা নয় *Literary Chronicles* এবং *সমাচার চন্দ্রিকা* ইত্যাদি পত্রিকাও বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিল।[২৩] তাছাড়া মজার ব্যাপার এই যে, যে সকল শিক্ষিত ব্যক্তি নারীশিক্ষার বাহ্যত সমর্থক ছিলেন, বাস্তবে তাদের অনেকেই নিজ পরিবারের মেয়েদের স্কুলে পাঠানোর কথা চিন্তাও করতে পারেননি। এ প্রসঙ্গে রাধাকান্ত দেবের কথা বলা যায়। তৎকালীন কলকাতার হিন্দু সমাজের এই প্রধান নেতা বাংলায় পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেন। নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কেও তাঁর সচেতনতা ছিল প্রশ্নাতীত।[২৪] তবে তিনি এবং তাঁর মতো অনেকেই ভদ্র ঘরের মেয়েদের বিদ্যালয়ে প্রেরণ করা মোটেই সমর্থন করেননি। রাধাকান্ত দেব তাঁর নিজ পরিবারের মেয়েদের অন্তঃপুরেই শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। রাধাকান্ত দেব তাঁর পরিবারের মেয়েদের অন্তঃপুর শিক্ষার ব্যবস্থা করলেও অনেক শিক্ষিত সমাজপতি ঘরে পর্যন্ত মেয়েদের লেখাপড়া করাতে সম্মত ছিলেন না। বামাবোধিনী পত্রিকায় নারীশিক্ষা বিষয়ে বাংলার শিক্ষিত সমাজের এরূপ দ্বৈত নীতির কঠোর সমালোচনা করা হয়। বলা বাহুল্য যে, বাংলার শিক্ষিত সমাজ তার আদর্শ ও আচরণের এ বিরোধ দীর্ঘ কাল কাটিয়ে উঠতে পারেনি। ফলে বাংলার নারীশিক্ষার মন্থরগতিও প্রলম্বিত হয়।

পঞ্চমত: মেয়েদের জন্য প্রতিষ্ঠিত স্কুলসমূহে উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রীর অভাবকে অনেকেই আঠারো-উনিশ শতকের বাংলায় নারীশিক্ষার অধোগতির অন্যতম কারণ বলে চিহ্নিত করে থাকেন। বস্তুত পর্দা ও অবরোধ প্রথার কারণে পুরুষ শিক্ষকদের কাছে মেয়েদের লেখাপড়া শিখতে পাঠানোর ব্যাপারে অভিভাবকদের প্রবল আপত্তি

---

২১. *সোম প্রকাশ*, ২৯ মে, ১৮৬৫, রমেশ চন্দ্র মজুমদার, পূর্বোক্ত ৩য় খন্ড পৃ: ৩২৬

২২. বিনয় ঘোষ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২২৮

২৩. গোলাম মুরশিদ, *সমাজ সংস্কার আন্দোলন ও বাংলা নাটক*, পৃ. ২৬৪

২৪. এর বড় প্রমাণ হলো রাধাকান্ত দেব কর্তৃক গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কারকে *স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক* নামক গ্রন্থটি রচনায় অনুপ্রেরণা দান এবং কলকাতা স্কুল বুক সোসাইটির মাধ্যমে তা প্রকাশের ব্যবস্থাকরণ।

ছিল। স্কুলসমূহে ইউরোপীয় মহিলা শিক্ষায়িত্রী ছিলেন বটে, কিন্তু তাদের কাছে ও মেয়েদের পাঠাতে অভিভাবকগণ ভরসা পেতেন না। এমতাবস্থায় এ দেশীয় উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রীর অভাব নারীশিক্ষাপ্রসারে একটি বড় অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। বাংলার ছোট লাট William Gray কে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের লেখা একটি পত্রে এ বিষয়টি উল্লেখ রয়েছে।[২৫]

উপর্যুক্ত কারণসমূহ ছাড়াও নারীদের বিষয়ে পুরুষ সমাজের হীন ধারণা কথাও এ পসঙ্গে স্মর্তব্য। এদেশের পুরুষদের একটি সাধারণ ধারণা ছিল যে, নারীরা ক্ষীণ বুদ্ধি সম্পন্ন এবং তাদের আদপেই কোনো বোধ শক্তি নেই। কাজেই তাদেরকে লেখাপড়া করানো অসম্ভব।[২৬]

২.৪: নারীশিক্ষা সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি

উপর্যুক্ত প্রতিন্ধকতাসমূহ দূর করে নারীশিক্ষার প্রসার ঘটানোর কোন সরকারি কিংবা দেশীয় বেসরকারি উদ্যোগ উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশকের পূর্বে বাংলায় পরিলক্ষিত হয় না। উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশক হতে ইংরেজি শিক্ষা এবং পাশ্চাত্য প্রভাবে বাংলার শিক্ষিত সমাজের মানসিকতায় রূপান্তরের সূচনা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, আঠারো শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত ইউরোপ বিশেষ করে ইংল্যান্ডেই নারীশিক্ষা ছিল অপ্রতুল। তবে এ শতাব্দীর শেষভাগে এসে অবস্থার পরিবর্তন শুরু হয়। এ সময় থেকে নারীশিক্ষাএবং নারীদের সামগ্রিক অবস্থার উন্নয়নে ব্রিটিশ সমাজের একটি অংশ নানা তৎপরতা শুরু করেন। এ প্রসঙ্গে যাঁদের নাম অগ্রগণ্য তাঁরা হলেনঃ Marry Wollstonecraft (1759-1797), Marry Anne Radcliffe (1746-1810), Hannah More (1745-1833), Mary Berry (1763-1852), Marry Somerville (1780-1872), Caroline Norton (1808-1877), Mary Hay (1759-1843), Dr. John Gregory (1753-1821), Thomas Gisborne (1758-1846), William Thompson (1775-1833) এবং John Stuart Mill (1806-1873) প্রমুখ। ইংল্যান্ডের নারীমুক্তি আন্দোলনের এ সংবাদ বাংলায় Jeremy Bentham (1748-1832)- এর বন্ধু রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩) এবং Henry Louis Vivian Deroyio (1809–1831)-এর ছাত্র ইয়ং বেঙ্গলের সদস্যদের কাছে পৌঁছে গিয়েছিল। ফলে তাঁদের মধ্যে স্বদেশী নারী জাতির দুরবস্থা সমন্ধে জাতীয় চেতনার উন্মেষ ঘটে।

বাঙালি নারীদের দুর্দশা এবং হীন অবস্থা থেকে মুক্তির বিষয়ে উনিশ শতকের প্রথম সোচ্চার কণ্ঠ ছিলেন রাজা রামমোহন রায়। এ সময় রামমোহন রায় প্রতিষ্ঠিত আত্মীয় সভা'র[২৭] বৈঠকে নারী জাতির নানাবিধ সমস্যা

---

২৫. *বামাবোধিনী* পত্রিকা, ফাল্গুন সংখ্যা, ১২৭৪ বঙ্গাব্দ

২৬. গোলাম মুরশিদ, *সংকোচের বিহ্বলতা, আধুনিকতার অভিঘাতে বঙ্গরমণীর প্রতিক্রিয়া ১৮৪৯-১৯০৫*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ.পৃ. ১২-১৩

২৭. আত্মীয় সভা ছিল ভারতের একটি দার্শনিক আলোচনা কেন্দ্র। রাজা রামমোহন রায় ১৮১৫ সালে কলকাতায় এ সমিতি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সমিতির সদস্যরা রামমোহনের বাড়িতে নিয়মিত মিলিত হয়ে বিভিন্ন দার্শনিক বিষয়ে বিতর্ক ও আলোচনার অধিবেশন পরিচালনা করার মাধ্যমে অবাধ ও সম্মিলিত চিন্তাভাবনা এবং সামাজিক সংস্কার বিষয়ে প্রচারণা চালাতেন। আত্মীয়সভার

নিয়ে নিয়মিত আলোচনা হতো। রাজা রামমোহন রায় নারীদের 'প্রকৃতিপ্রদত্ত প্রশংসনীয় উৎকৃষ্ট গুণাবলী' অস্বীকার করায় বাঙালি হিন্দু সমাজের তীব্র সমালোচনা করেন।[২৮] তিনি আরো বলেন: "স্ত্রীলোকের বুদ্ধির পরীক্ষা কোনকালে লইয়াছেন যে, অনায়াসেই তাহারদিগরকে অল্পবুদ্ধি কহেন? ... আপনারা বিদ্যাশিক্ষা জ্ঞানোপদেশ স্ত্রীলোককে প্রায় দেন নাই, তবে তাহারা বুদ্ধিহীন হয় ইহা কিরূপে নিশ্চিত করেন?"[২৯]

সহমরণ বিষয়ক প্রবর্তক নিবর্তক সম্বাদসহ রামমোহন রায় যে সব পুস্তক-পুস্তিকা রচনা করেন এসবের মধ্যে প্রসঙ্গত তিনি নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথাটিও উপস্থাপন করেন। নারীসমাজ সম্পর্কে রামমোহন রায়ের চিন্তা প্রসূত আলাপ-আলোচনা ও তর্ক-বিতর্ক বাংলার নিস্তরঙ্গ সমাজের সচেতন জনস্তরে কিছুটা হলেও তরঙ্গ সৃষ্টি করে। ১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এ কলেজের ছাত্ররা এবং দ্বারকানাথ ঠাকুর ও প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রমুখ সচেতন শিক্ষিত ব্যক্তিদের অনেকে নারীজাতির দুরবস্থা সমন্ধে সচেতন হন এবং সাধারণ জীবনযাত্রা, সামাজিক মর্যাদা ও নারীদের প্রতি প্রথাগতভাবে যে সকল পীড়ন ও অত্যাচার সমাজে প্রচলিত ছিল তা দূরীকরণে উদ্যোগী হন।[৩০] রক্ষণশীল ও ঐতিহ্যশ্রায়ী হলেও রাজা রাধাকান্ত দেবও যে নারীশিক্ষার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন সে কথা ইতোমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁর অনুপ্রেরণা ও উৎসাহে গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার সংস্কৃত সাহিত্য ও শাস্ত্রগ্রন্থ থেকে নারীশিক্ষা বিষয়ে বহু নজীর সংগ্রহ করে স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক নামে একটি পুস্তক রচনা করেন। ইতোপূর্বে ভারতের উচ্চ শ্রেণির হিন্দুদের মধ্যে যে নারীশিক্ষার প্রচলন ছিল এ গ্রন্থে লেখক তা প্রমাণের চেষ্টা করেন।[৩১]

উনিশ শতকের বিশের দশকের শেষ দিকে ইংরেজ পণ্ডিত Henry Louis Vivian Deroyio-এর এ দেশীয় একদল ছাত্র 'ইয়ং বেঙ্গল' নামে পরিচিতি লাভ করেন। বিপ্লবী এ ইয়াং বেঙ্গল ছিল প্রচণ্ডভাবে পাশ্চাত্য প্রভাবিত। ডিরোজিও ছাড়াও নারীমুক্তির অগ্রদূত Marry Wollstonecraft (*Vindication of the Rights of Woman* গ্রন্থ প্রণেতা), ব্রিটিশ দার্শনিক Thomas Paine (1737-1809), Richard Carlile (1790–1843) এবং William Thompson প্রমুখের চিন্তা-চেতনা ইয়ং বেঙ্গলদের যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিল বলে মনে হয়। নতুন মূল্যবোধে বিশ্বাসী ইয়ং বেঙ্গল স্বদেশী নারীদের জন্য সোচ্চার কণ্ঠে সমান অধিকার দাবি করেন।[৩২] তারা ঘোষণা করেন ঈশ্বর পুরুষ ও নারীদের সমান করে সৃষ্টি করেছেন। তিনি এটা কখনো চাননি যে তাদের একদল অন্যদের অধীনে থাকবে। সুতরাং সকল বিষয়ে নারীদের পুরুষের সমকক্ষ বলে বিবেচনা করতে হবে।

সভাগুলোতে আলোচিত বিষয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল হিন্দু ধর্মে মূর্তি পূজার অসারতা, বর্ণ প্রথা এবং সতীদাহ প্রথা ও বহুবিবাহের কুফল, বিধবা বিবাহ প্রচলনের বাঞ্ছনীয়তা এবং নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি।

২৮. J C Ghose (ed.), *The English Works of Raja Rammohan Roy*, S. Roy, Calcutta, 1901, p. 177

২৯. রামমোহন রায়, *রামমোহন রায় গ্রন্থাবলী*, পৃ. ২০৫ উদ্ধৃতি গোলাম মুরশিদ, *সমাজ সংস্কার আন্দোলন ও বাংলা নাটক*, পৃ. ২৬০

৩০. রমেশ চন্দ্র মজুমদার, *পূর্বোক্ত*, ৩য় খন্ড, পৃ: ৩১৭

৩১. J.A.Richey: *Selection from Educational Records.* Part II, 1840-59, Calcatta, 1922, P. 36.

৩২. *জ্ঞানাণ্বেষণ*, উদ্ধৃতি গোলাম মুরশিদ, *সংকোচের বিহ্বলতা*, পৃ. ১৯

নারীমুক্তির উপায় হিসেবে ইয়াং বেঙ্গল তাদের শিক্ষার উপর বিশেষ জোর দিয়েছিল। ১৮৩০ এ প্রকাশিত ইয়ং বেঙ্গলের অন্যতম মুখপত্র *পার্থেনন* পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় এবং *জ্ঞানান্বেষন* ও *এনকুয়েরার*-এর পৃষ্ঠায় তারা নারীশিক্ষার সমর্থনে কলম ধরেছিলেন। ইয়ং বেঙ্গল পরিচালিত The Academic Association ও সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা'রও অন্যতম আলোচ্য বিষয় ছিল নারীশিক্ষা।[৩৩] নারীশিক্ষা বিস্তারে কেবল জনমত সৃষ্টির চেষ্টাই নয়, ইয়ং বেঙ্গলের সাথে সংশ্লিষ্ট অনেকে নিজ পরিবারের মেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থাও করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে শিবচন্দ্র দেবের কথা উল্লেখ করা যায়। তিনি তাঁর বালিকা পত্নীকে লেখাপড়া শেখান। ১৮৪৯ সালে বেথুন স্কুল প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি তাঁর কন্যাকে সেখানে ভর্তি করিয়েছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, সমকালীন বাংলার সামাজিক অবস্থার কথা বিবেচনা করলে ইয়ং বেঙ্গলের চিন্তা-চেতনাকে অনেক বেশি মাত্রায় বৈপ্লবিক ও প্রগতিশীল বলে মনে করার যথেষ্ট সঙ্গত কারণ আছে। ফলে তারা বাংলার ব্যাপক জনগোষ্ঠীর উপর তেমন কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারেননি। তাঁদের চিন্তাধারা অত্যন্ত বলিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও ইয়ং বেঙ্গলের আন্দোলন তাদের সীমিত গণ্ডির মধ্যেই আবদ্ধ ছিল।

নারীশিক্ষা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং এর প্রসারে কিছু বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিগত চেষ্টা সত্ত্বেও উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলার সাধারণ মানুষের মনে তো বটেই উচ্চশিক্ষিত শ্রেণির মন থেকেও নারীশিক্ষা বিষয়ে বদ্ধমূল কুসংস্কারগুলো নির্মূল করা সম্ভব হয়নি। তখনও সমাজে নারীশিক্ষা বিষয়ে ঘোরতর বিরোধিতা বিদ্যমান ছিল। এ ব্যাপারে সরকারি উদ্যোগের চিত্রও ছিল হতাশাব্যঞ্জক।

২.৫: বাংলায় নারীশিক্ষা প্রসারে মিশনারিদের উদ্যোগ

১৭৫৭ সালে পলাশির যুদ্ধ বঙ্গ-ভারতে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রাজনৈতিক শাসনের ভিত রচনা করে। ১৭৬৪ সালের বক্সার যুদ্ধের পর ১৭৬৫ সালে কোম্পানির দিউয়ানি লাভের ফলে বাংলায় একটি দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। ১৭৭২ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সরাসরি বাংলার শাসন কর্তৃত্ব গ্রহণ করে। তবে প্রথম অবস্থায় কোম্পানি সরকার বহুদিন পর্যন্ত বাংলা-ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থার দিকে নজর দেয়ার তেমন দায় অনুভব করেনি। পরবর্তীতে এ দেশীয় প্রশাসনে নিজেদের একদল সহযোগী তৈরির মানসে কোম্পানি সরকার কলকাতা মাদ্রাসা (১৭৮০), বারণসীর সংস্কৃত কলেজ (১৭৯১) এবং ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ (১৮০০) প্রতিষ্ঠা করলে ও প্রকৃতপক্ষে ১৮১৩ সালের পূর্বে কোম্পানি সরকার এ দেশীয় সাধারণ মানুষের শিক্ষার ব্যাপারে কোন কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। পরিবর্তিত বাস্তবতা বিবেচনা করে ১৮১৩ সালের সনদ আইনে কোম্পানি সরকার ভারতীয়দের শিক্ষার জন্য বার্ষিক এক লক্ষ টাকা ব্যয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। তবে এ সনদ আইনে নারীশিক্ষার জন্য কোনো অর্থ ব্যয়ের ব্যবস্থা রাখা হয়নি। নারীশিক্ষা বিষয়ে সরকারি সিদ্ধান্ত এবং

৩৩. স্বপন বসু, *উনিশ শতকে বাংলায় নবচেতনা*, সুবর্ণ, ঢাকা, ২০১১, পৃ. ১৬৬

উদ্যোগ গ্রহণ করতে আরো অনেক সময় লাগে। বস্তুত ব্রিটিশ ভারতে নারীশিক্ষা বিষয়ে সরকারি ইচ্ছার প্রথম আনুষ্ঠানিক ও আইনী উদ্যোগ দেখা যায় ১৮৫৪ সালের বিখ্যাত Wood Despatch- এ। তবে উডের ডেসপাসেও নারীশিক্ষার ব্যাপারে বেসরকারি উদ্যোগকেই বেশি উৎসাহ প্রদান করা হয়। চার্লস উড নারীশিক্ষার ব্যাপারে সরকারি দায়িত্ব বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত স্কুলসমূহে আর্থিক সহায়তা দানের মাধ্যমেই পালনের সুপারিশ করেন।[৩৪]

নারীশিক্ষার ব্যাপারে বাংলার সাধারণ মানুষ এমনকি ভদ্রলোক শ্রেণির নেতিবাচক অবস্থান এবং কোম্পানি সরকারের নির্লিপ্ততার পটভূমিতে ইউরোপীয় খ্রিস্টান মিশনারিরা প্রথম এদেশে নারীশিক্ষা প্রসারে এগিয়ে আসে। উনিশ শতকের সূচনালগ্নে এ ব্যাপারে তারা নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। স্মরণ করা প্রয়োজন যে, পনের শতকের রেনেসাঁস ও তৎপরবর্তী ভৌগোলিক আবিস্কারের ফলে সতের শতকে বিশ্ব বাণিজ্য বিপ্লব সংঘটিত হয়। এতে নিজ নিজ স্বার্থে ইউরোপীয় উদীয়মান জাতিসমূহের মধ্যে যে বাণিজ্যিক ও ঔপনিবেশিক প্রতিযোগিতা শুরু হয় তার সূত্র ধরে বাংলায় পর্তুগিজ, দিনেমার, ওলন্দাজ, ফরাসি ও ইংরেজ বণিকদের এদেশে আগমন ঘটে। ইউরোপ থেকে আগত এসব বাণিজ্যিক কোম্পানির সাথে খ্রিস্টান মিশনারিরাও এদেশে এসেছিলেন।[৩৫] খ্রিষ্টধর্ম প্রচারের মহানব্রত নিয়ে মিশনারিরা এদেশে আসেন সত্য, তবে ধর্মপ্রচারের স্বার্থেই তারা এদেশে স্থানীয় জনমানুষের মধ্যে সমাজসেবা ও শিক্ষা বিস্তারেরও উদ্যোগ নেন। এ লক্ষ্যে মিশনারিদের উদ্যোগে কলকাতা ও এর উপকণ্ঠে অনেকগুলো স্কুল স্থাপন করা হয়।

রাষ্ট্রক্ষমতা লাভের পূর্বে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি মিশনারিদের ধর্ম প্রচার ও শিক্ষা কার্যক্রমের উদার পৃষ্ঠপোষক ছিল। কিন্তু ১৭৬৫ সালের পর সম্ভবত রাজনৈতিক কারণে (হিন্দু মুসলিম উভয়ের তুষ্টি বিধান ও শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে) কোম্পানি সরকার মিশনারিদের প্রতি তাদের পৃষ্ঠপোষকতা ত্যাগ করে; সরকার ধর্মনিরপেক্ষ নীতির বাহক হিসাবে আত্মপরিচয় প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হয়। এ নিয়ে মিশনারিদের সাথে কোম্পানি সরকারের বিরোধ খোদ ইংল্যান্ডের রাজনৈতিক পরিমন্ডলেও আলোড়ন সৃষ্টি করে। এমতাবস্থায় ১৮১৩ সালে যে সনদ আইন প্রবর্তন করা হয়, তাতে কোম্পানি সরকারকে ভারতীয়দের ধর্মীয় ও নৈতিক

---

৩৪. শ্যামলী আকবর ও অন্যান্য, *পূর্বোক্ত* পৃ. ৭০

৩৫. খ্রিস্টান মিশনারি খ্রিস্টান ধর্ম প্রচারের কাজে নিয়োজিত সংগঠন। প্রধানত প্রোটেস্ট্যান্ট সম্প্রদায়ভুক্ত খ্রিস্টান মিশনারি উপনিবেশিক আমলে বাংলায় সক্রিয় থাকলেও তাঁদের সংযোগ স্থাপন শুরু হয় ষোলো শতকে। কথিত আছে যে, সেইন্ট টমাস ছিলেন প্রথম খ্রিস্টান ধর্মপ্রচারক যিনি ১৫৫০ খ্রিস্টাব্দে ভারতে আসেন এবং ১৫৫৮ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ মালাবার উপকূলে একদল লোককে খ্রিস্ট ধর্মে দীক্ষিত করেন। তখন থেকে সিরীয়, রোমান ক্যাথলিক ও বিশেষত জেসুইট সম্প্রদায়ের ধর্মপ্রচারকগণ নানা সময় ভারত সফর করেন। আঠারো শতকের শেষ দশকে ব্রিটিশ প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মপ্রচারকদের আগমনের সাথে সাথে বাংলায় খ্রিস্টান ধর্মপ্রচার কাজ একটি সংগঠিত আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে।

উন্নতি বিধানকল্পে তাদের শিক্ষার ব্যাপারে দায়িত্ব গ্রহণের নির্দেশ দেয়া হয়; একই সাথে খ্রিস্টান মিশনারিদেরকেও ধর্মপ্রচার এবং শিক্ষা বিস্তারে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের অনুমতি প্রদান করা হয়।[৩৬]

১৮১৩ সালে সনদ আইনের মাধ্যমে অনুমতি প্রাপ্তির পর মিশনারিরা বাংলায় পুনরায় তাদের কার্যক্রম শুরু করে। এ পর্যায়ে নারীশিক্ষার প্রসার তাদের কর্মসূচিতে বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে। এ বিষয়ে প্রাথমিক পর্যায়ে প্রধানত তাদের তিন ধরনের কার্যক্রম দেখা যায়। (ক) বাঙালি মেয়েদের জন্য সাধারণ দিবা স্কুল (Day School) প্রতিষ্ঠা (খ) অনাথ অসহায় বালিকাদের জন্য বোর্ডিং স্কুল (Boarding School) প্রতিষ্ঠা এবং (গ) উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির পরিবারে 'অন্তঃপুর বা জেনানা শিক্ষা' (Domestic Instruction) চালু করা।[৩৭]

বিভিন্ন তথ্যসূত্র থেকে জানা যায় যে, মিশনারিদের উদ্যোগে কলকাতায় প্রথম মেয়েদের আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ও বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম শুরু হয়েছিল ১৮১৯ সালের মাঝামাঝি সময়ে। অবশ্য এর পূর্বে ব্যক্তি উদ্যোগে কয়েকটি স্কুল পরিচালিত হতো বলে জানা যায়। ১৭৮২ সালে মেজর জেনারেল উইলিয়াম ক্রীক পেট্রিক (William Kirkpatrick) খিদিরপুরে Upper Orphan School নামে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। Lower Orphan School নামে অনুরূপ আরেকটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয় আলীপুরে। মিসেস অসবর্ণ (Mrs.Osbarn) ও শ্রীমতি কল (Mrs. Call) ছিলেন যথাক্রমে স্কুল দু'টির প্রধান শিক্ষয়িত্রী। বেঙ্গল আর্মির (the Bengal Army) মৃত অফিসার ও কর্মচারীদের[৩৮] অনাথ সন্তানদের শিক্ষা দানের উদ্দেশ্যে স্কুলগুলো প্রতিষ্ঠা করা হয় বটে, কিন্তু নিম্নবিত্ত পরিবারের কিছু বাঙালি মেয়ে এসব স্কুল পড়াশুনা করতো বলে তথ্যসূত্রে জানা যায়।[৩৯] ১৭৮৭ সালে কলকাতায় মেয়েদের জন্য একটি স্কুলে বালিকা শাখা খুলেছিলেন একজন সুইডশ মিশনারি। তবে এতে স্থানীয় বাঙালি মেয়েদের পড়াশুনার সুযোগ ছিল কী-না, এ বিষয়ে সুস্পষ্ট তথ্য পাওয়া যায় না।[৪০] ১৭৮৯ সালে Mrs. Savage কলকাতায় একটি গার্লস স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। ১৭৯২ সালে Mrs. Copeland নামে এক মিশনারি কলকাতায় আরেকটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এ বিদ্যালয়টিতে শিক্ষার্থীদের লেখা-পড়ার পাশাপাশি সূচিকর্ম শিক্ষা দেয়া হতো। ১৭৯৪ সালে 'Calcutta Free School'-এর উদ্যোগে জানবাজারে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ স্কুলে বাঙালি মেয়েদের পড়াশুনার ব্যবস্থা ছিল।[৪১]

উনিশ শতকের সূচনাতে বাংলায় নারীশিক্ষা বিষয়ে সুশৃঙ্খল উদ্যোগ গ্রহণ করেন মিশনারিরাই। এ ক্ষেত্রে J. Marshman এবং তাঁর স্ত্রী Mrs. Hanna Marshman পথনির্দেশকের ভূমিকা পালন করেন। তাঁরা এ দেশীয়

---

৩৬. শ্যামলী আকবর ও অন্যান্য, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭১

৩৭. J.A.Richey. *op. cit.* P. 42

৩৮. যেসব অফিসার ও কর্মচারী এদেশীয় মেয়ে বিয়ে করতেন অথবা তাদের সাথে একত্রে বাস করে সন্তান জমদানের পর যুদ্ধ অথবা অন্যকোন কারণে মারা যেতেন।

৩৯. তপতী বসু, 'বাঙালি মেয়েদের লেখাপড়া', শারদীয় *আনন্দবাজার পত্রিকা*, কলিকাতা, ১৩৯৮, পৃ. ২২৮

৪০. Amitabh Mukharjee, Reform and Regeneration in Bengal 1774-1823, Rabindra Bharati University, Calcutta, 1968, p. 15

৪১. তপতী বসু, *পূর্বোক্ত*, ২২৯

নারীদের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টিতে কাজ করেন। Mrs. Pearce এবং Mrs. Lawson নামক দুজন মিশনারি ১৮০৩ সালে কলকাতায় একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। প্রধানত ধর্মান্তরিত স্থানীয় বাঙালি খ্রিস্টান বালিকাদের শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যেই এ স্কুলটির প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল।[৪২] ১৮০৯ সালে শ্রীরামপুরের ব্যাপটিস্ট মিশনারিদের উদ্যোগে কলকাতার বেট বাজার স্ট্রিটে 'Benevolent Institution' নামক একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়। Mr. Penney নামক একজন মিশনারি পরবর্তী বিশ বছর যাবত এ স্কুলটির সার্বিক তত্ত্বাবধান করেন। এ স্কুলে একটি বালক শাখা ছিল যার তত্ত্বাবধায়ক ও সম্পাদক ছিলেন Mr. Evans। অন্যদিকে বালিকা শাখাটির সুপারিনটেন্ডেন্ট ছিলেন Mrs. Evans। স্কুলটির এ বালিকা শাখায় বাঙালি মেয়েরাও পড়াশুনা করতো বলে জানা যায়। স্কুলটির এ বালিকা শাখার ৭০জন ছাত্রীর মধ্যে কয়েকজন বাঙালি ছাত্রী ছিল।[৪৩] Benevolent Institution –এ মেয়েদের বানানসহ পড়তে, লিখতে শেখানো হতো। সাধারণ গণিত ও ব্যাকরণ শিক্ষাও তাদের পাঠ্যসূচিতে ছিল। তদুপরি যুগের চাহিদার কথা মনে রেখে এতে মেয়েদের সেলাই ও সূচিকর্মও শিক্ষা দেয়া হতো বলে উইলিয়াম এডামের তথ্য থেকে জানা যায়।[৪৪]

বাঙালি বালিকাদের মাতৃভাষায় শিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্যে মিশনারি Mrs. Hanna Marshman শ্রীরামপুর ও কলকাতায় একটি করে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন ১৮১৩ সালে। ১৮১৮ সালে মিশনারিদের উদ্যোগে জানবাজারে একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। Free School Institution নামক এ প্রতিষ্ঠানে মেয়েদেরকে লেখাপড়ার পাশাপাশি পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে প্রয়োজনীয় শিক্ষা দেয়া হতো। পতুর্গিজ মিশনারিদের উদ্যোগে কলকাতার ২ নং সুকিয়া'স লেনে প্রতিষ্ঠিত নিউ স্কুল নামক বালিকা বিদ্যালয়টিতে পর্তুগিজ মেয়েদের সাথে বাঙালি মেয়েরাও পড়াশুনা করতো। তবে এ প্রতিষ্ঠানেও খ্রিস্টধর্ম শিক্ষাকে বিশেষ প্রাধান্য দেয়ায় বাঙালি পরিবারে মেয়েরা এতে পাঠ গ্রহণে বিশেষ উৎসাহী ছিল না।

বাংলায় নারীশিক্ষার বিস্তারে শ্রীরামপুর ব্যাপ্টিস্ট মিশন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।[৪৫] ১৮১৭ সালের শ্রীরামপুর মিশনের *Native Schools* সংক্রান্ত প্রথম প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, এ মিশনের কার্যক্রমের মধ্যে স্থানীয় বালিকাদের শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থাকরণ ছিল অন্যতম। এ মিশনের উদ্যোগে ১৮০৯ সালে Benevolent Institution প্রতিষ্ঠার কথা ইতোমধ্যেই আলোচনা করা হয়েছে। এ মিশনের প্রধান উইলিয়াম

---

৪২. Firoj High Sarwar, 'Christian Missionaries and Female Education in Bengal during East India Company's Rule: a Discourse between Christianised Colonial Domination versus Women Emanci', *IOSR Journal Of Humanities And Social Science (JHSS)*, Volume 4, Issue 1 (Nov. - Dec. 2012), p. 39

৪৩. Joseph Foulkes Winks (ed.), *The Baptist Reporter & Tract Magazine*, Simpkin and Marshall, Londond, January, 1843, p.p. 327-328, full text available at https://books.google.com.bd/, Retrived, 12.10.2018

৪৪. William Adam, *Reports on the State of Education in Bengal of 1835*, Calcutta, 1935, p. 51

৪৫. শ্রীরামপুর মিশন এবং বঙ্গভারতে এর কার্যক্রম সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যের জন্য দ্রষ্টব্য E. Deniael. Potts, *British Baptist Missionaries in India (1793-1837): The History of Serampore Mission*, Cambridge University Press, 1967

কেরী এবং জন মার্শম্যান ও উইলিয়াম ওয়ার্ড যৌথ উদ্যোগে কলকাতায় একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।[৪৬] এ বিদ্যালয়ে ছাত্রীসংখ্যা ছিল ৪০ জন। তবে এ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য যে নিছক মেয়েদের বিদ্যা-শিক্ষা প্রদান ছিল না, তা বলা বাহুল্য। এর পিছনে খ্রিস্টধর্ম শিক্ষা প্রদান ও ধর্মান্তকরণ মূখ্য উদ্দেশ্য ছিল। ফলে এ বিদ্যালয়টি স্থানীয় বাঙালি শিক্ষার্থীদের বিশেষভাবে আকৃষ্ট করতে পারেনি। ১৮১২ সালে London Missionary Society[৪৭] -এর প্রতিনিধি হিসেবে মিশনারি Reverend Robert May বাংলায় আসেন। তিনি চুচুঁড়া ও এর আশপাশের অঞ্চলে নারীশিক্ষা প্রসারের ব্যাপারে উদ্বুদ্ধকরণমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করেন। অবশ্য এতে খুব বেশি উৎসাহব্যঞ্জক সাড়া পাওয়া যায়নি। ১৮১৮ সালে তিনি চুচুঁড়াতে একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। তবে এ স্কুলের জন্য ছাত্রী জোগাড় করা রীতিমতো দুরূহ ছিল। অনেক কষ্ট করে মাত্র আট জন ছাত্রী জোগাড় করে স্কুলটি চালু করা হয়। স্থানীয় ছাত্রীদের আকৃষ্ট করার জন্য স্কুলটিতে একজন বাঙালি শিক্ষিকাও নিয়োগ দেয়া হয়েছিল। তবে এতেও তেমন লাভ হয়নি। দুই বছর পর ছাত্রীসংখ্যা দাঁড়ায় মাত্র ১৩ জনে। স্বামীর অসুস্থতার কারণে বাঙালি শিক্ষিকা স্কুল ছেড়ে যাওয়ায় প্রয়োজনীয় ছাত্রীর অভাবে Reverend May প্রতিষ্ঠিত স্কুলটি বন্ধ হয়ে যায়।[৪৮] উল্লেখ্য যে, বাঙালি শিক্ষিকার স্কুল ছাড়ার পিছনে তাঁর স্বামীর অসুস্থতা না অন্য কোনো কারণ ছিল, সে ব্যাপারে সন্দেহ আছে। সামাজিক অপবাদ ও লোক সমালোচনার কারণেই তিনি স্কুল ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন বলে কোনো কোনো সূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।[৪৯] বাংলায় নারীশিক্ষা প্রসারে Reverend May এর প্রয়াস সফল না হলেও ততদিনে এ বিষয়ে অন্যান্য মিশনারিরা তৎপর হয়ে উঠেন।

উনিশ শতকের বিশের দশকে বাংলায় নারীশিক্ষা বিস্তারে বিশেষ উৎসাহী ভূমিকা পালন করে Calcutta Baptist Mission (১৮১৯ খ্রি.) এবং Church Missionary Society (১৯২৩ খ্রি.)। ১৮১৯ সালে কলকাতার কয়েকজন ব্যাপটিস্ট মিশনারি বাংলার নারীশিক্ষা বিষয়ক তাদের কর্মসূচি রূপায়নে স্বদেশি এ এদেশীয় জনসাধারণের কাছে সাহায্যের আবেদন জানায়। তাদের আবেদনে সাড়া দিয়ে কয়েকজন সহৃদয় ইংরেজ মহিলা এগিয়ে আসেন। তাদের সহযোগিতায় মিশনারি রেভারেন্ড ডব্লিউ এইচ পিয়ার্সের সভাপতিত্বে Calcutta Baptist Mission এর প্রচেষ্টায় ১৮১৯ সালে 'The Female Juvenil Socitey' নামে একটি

---

৪৬. J. C. Marshman, *Life and Times of Carey, Marshman and Ward: Embracing the History of the Serampore Mission.* vol.2, Longman Brown, London, 1859; প্রদীপ রায়, *বিদ্যাসাগর, সামাজিক ব্যক্তিত্ব*, বুক ট্রাস্ট, কলকাতা, ১৯৮৬, পৃ. ২৭

৪৭. এ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য আছে Richard Lovett, *The History of the London Missionary Society, 1795-1895,* Oxford University Press, London 1899

৪৮. M. A Larid, *Missionaries and Education in Bengal,* Oxford University Press, London, 1972, p. 134

৪৯. তপতী বসু, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২২৮

মহিলা সমিতি প্রতিষ্ঠা করা হয়।[৫০] মিশনারিদের স্ত্রী এবং ইংরেজ নারীগণ এ সমিতির সদস্য ছিলেন। এ সমিতির দু'টো উদ্দেশ্য ছিল (ক) বাঙালি মেয়েদের শিক্ষার জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠা করা এবং (খ) তাদের পড়াশুনার ব্যাপারে সার্বিক সহায়তা দান। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে ইংল্যান্ড থেকে মহিলারা এসে সমিতিতে যোগ দেয়। সোসাইটির তত্ত্বাবধানে কলকাতার নন্দনবাগান, গৌরিবাড়ি, জানবাজার ও চিৎপুর অঞ্চলে কয়েকটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছিল। যে সব ব্রিটিশ মহিলার আর্থিক সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতায় এই স্কুলগুলো প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তাদের জন্মস্থানের নামানুসারে এসব স্কুলের নামকরণ করা হয়েছিল 'জুভেনাইল স্কুল', 'লিভারপুল স্কুল', 'সালেম স্কুল' ও 'বার্মিংহাম স্কুল' ইত্যাদি।[৫১] এ সোসাইটির ৮ম বার্ষিক প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, The Female Juvenile Society of Calcutta-এর পরিচালনাধীনে বাংলায় তখন ২০ টি বালিকা বিদ্যালয় ছিল। এসব স্কুলে প্রায় দেড়শতাধিক বাঙালি মেয়ে পড়াশুনা করতেন। এসব ছাত্রীরা বিভিন্ন বর্ণের হিন্দু পরিবারভুক্ত ছিলেন। স্থানীয় বালিকাদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারে সহায়তা প্রদান এবং বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম জোরদার করার জন্য The Female Juvenile Society of Calcutta এর নাম পরিবর্তন করে Calcutta Baptist Female society রাখা হয়।[৫২]

১৮২২ সালে জুভেনাইল সোসাইটির উদ্যোগ ও অর্থায়নে গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার রচিত স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক পুস্তকটি প্রকাশ করা হয়। নারীশিক্ষা বিষয়ে সাধারণ জনগণকে সচেতন করে তোলাই ছিল এ পুস্তকটি প্রকাশের উদ্দেশ্য। পুস্তকটির অংশবিশেষ জুভেনাইল স্কুল সোসাইটি পরিচালিত বিদ্যালয়সমূহের পাঠ্যসূচিভুক্তও করা হয়েছিল।[৫৩] সোসাইটি পরিচালিত স্কুলগুলোতে মেয়েদের অবৈতনিক শিক্ষা দেয়া হতো। এসব স্কুলের শিক্ষার মাধ্যম ছিল বাংলা। বাংলা ভাষায় মেয়েদের বিভিন্ন বিষয়ে লিখন, পঠন ছাড়াও খ্রিষ্টধর্মের নানা বিষয় এসব স্কুলের পাঠ্য তালিকার অন্তর্ভূক্ত ছিল।

নারীশিক্ষা বিস্তারে কলকাতা ব্যাপটিস্ট মিশন এবং ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়েছিল। তবে এতদসত্ত্বেও এসব স্কুলের সাফল্য মোটেই সন্তোষজনক ছিল না। জানা যায় যে, জুভেনাইল সোসাইটি পরিচালিত বালিকা বিদ্যালয়সমূহে এ দেশীয় শিক্ষিকা না থাকা এবং তাদের পাঠ্য তালিকায় খ্রিষ্টধর্মকে প্রাধান্য দেয়ায় এদেশের উচ্চবর্ণের এবং অভিজাত হিন্দুরা তাদের কন্যাদের এ সব স্কুলে পাঠানো থেকে বিরত থাকেন। আর মুসলমানগণ তাদের মেয়েদের এসব স্কুলে পাঠানোর কথা তো তখনো বলতে গেলে কল্পনায়ও আনেনি। এমতাবস্থায় এ দেশীয় বাঙালি সমাজের বাগদী, বৈরাগী, বেদে এবং গনিকা ইত্যাদি নিম্নবর্ণের হিন্দু

---

৫০. এ সমিতিটির পুরো নাম ছিল: *The Female Juvenile Society for the Establishment and Support of Bengali Female School.* M A Liard, *op.cit,* p. 134

৫১. বিনয় ঘোষ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২২৮

৫২. *The Calcutta Christian Observer,* উদ্ধৃতি, Z Firoj High Sarwar, *op. cit.* P. 40

৫৩. সুখময় সেন গুপ্ত, *বঙ্গদেশ ইংরেজী শিক্ষা ও বাঙ্গালীর শিক্ষা চিন্তা*, কলিকাতা, ১৯৮৫,পৃ. ১৭

মেয়েরাই এসব স্কুলে পড়তে যেতো বলে জানা যায়।[৫৪] বস্তুত, নিম্নবর্ণীয় ও অসচ্ছল দরিদ্র পরিবারের মেয়েদের এসব মিশনারি পরিচালিত স্কুলে যাওয়ার পেছনে যতটা না পড়াশুনা শিখার আগ্রহ থাকতো তার চেয়ে বেশি আকর্ষণ থাকতো এসব স্কুলে গেলে কিছু আর্থিক সুবিধা পওয়ার।

১৮১৭ সালে 'The Calcutta School-Book Society' প্রতিষ্ঠা করা হয়।[৫৫] পাঠ্য পুস্তক রচনা ও প্রকাশনা এবং দেশের স্কুল ও মাদ্রাসাসমূহে তা সরবরাহের প্রাথমিক লক্ষ্য সামনে রেখে 'The Calcutta School-Book Society' প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। তবে সোসাইটির প্রথম বার্ষিক বিবরণী থেকে জানা যায় যে, নারীশিক্ষা কার্যক্রমও তাদের কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৮২০ সালে সোসাইটির প্রেসিডেন্ট জে এইচ হেরিংটন এবং শ্রীরামপুর মিশনের মিশনারি ও নারীশিক্ষাব্রতী উইলিয়াম ওয়ার্ড ইংল্যান্ডে বাংলার নারীদের অশিক্ষা এবং দুরবস্থার বিষয়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বক্তৃতা করেন। মিশনারি উইলিয়াম ওয়ার্ড ভারতে 'সতীদাহ', 'বাল্যবিবাহ', 'গঙ্গা-সাগরে শিশু কন্যা সন্তান বিসর্জন', ইত্যাদি প্রচলিত কুপ্রথার ফলে মেয়েরা কীভাবে নিগৃহিত হচ্ছে তার বর্ণনা দিয়ে বলেন যে, মেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থাকরণ ছাড়া তাদের এরূপ দুরবস্থা থেকে মুক্ত করা যাবে না। তিনি ভারতীয় নারীদের অবস্থার উন্নয়ন ও তাদের শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণে সেখানে যাবার জন্য ব্রিটিশ নারীদের প্রতি আহ্বান জানান। তাদের এ প্রয়াসে সাড়া দিয়ে Marry Anne Cooke নামক (পরবর্তীতে The Church Missionary Society of Calcutta এর পাদরি আইজাক উইলসনের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলে মেরী কুক মিসেস উইলসন নামে পরিচিতি লাভ করেন) এক সদাশয় ব্রিটিশ নারীশিক্ষাব্রতী কলকাতায় আসার আগ্রহ প্রকাশ করেন। ১৮২১ সালে লন্ডনের British Foreign School Society মেরী কুককে নারীশিক্ষা কার্যক্রমে সহায়তার জন্য বাংলায় পাঠায়।[৫৬] উল্লেখ্য যে, মেরী কুকের কলকাতায় আসার পেছনে Calcutta School-Book Society এর প্রেসিডেন্ট জে এইচ হেরিংটনের আগ্রহ ও ভূমিকা থাকলেও এখানে এসে তিনি স্কুল-বুক সোসাইটির কোনো সহযোগিতা বা আনুকূল্য পাননি। আইজাক উইলসন তাঁর স্ত্রী মেরী কুকের নারীশিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনায় বিশেষভাবে সহযোগিতা করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, মিসেস উইলসনকে বিশেষ সহযোগিতা না করলেও Calcutta School-Book Society তার কর্মসূচি মোতাবেক নারীশিক্ষা প্রসারে নিজস্ব প্রয়াস অব্যাহত রাখে। স্কুল-বুক সোসাইটি নারীশিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে কলকাতায় পাঁচটি বিদ্যালয় স্থাপন করেছিল। তন্মধ্যে আরপোলীতে David Hare প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়টি তাঁর নিজস্ব অর্থে পরিচালিত হতো।

---

৫৪. রমেশ চন্দ্র মজুমদার, *পূর্বোক্ত*, ৩য় খন্ড, পৃ. ৩২১

৫৫. কোম্পানি সরকার ও এ দেশীয় কতিপয় পণ্ডিত ব্যক্তির উদ্যোগে এ প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। সমিতির ব্যবস্থাপনা পরিষদের ২৪ জন সদস্যের মধ্যে ৮ জন এবং দু'জন সচিবের মধ্যে একজন ছিলেন এদেশীয়। এদের মধ্যে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রাজা রাধাকান্ত দেব, রামকমল সেন, তারিণীচরণ মিত্র, মৌলভী আমিনুল্লাহ এবং মৌলভী আবদুল ওয়াহিদ প্রমুখ ছিলেন অন্যতম।
*http/..banglapedia.org/index.php?title=Calcutta_School-Book_Soci*ety, retrieved, 19.10.2018

৫৬. Firoj High Sarwar, *op. cit.* p. 40

১৮২৪ সালে 'Ladies Society for Native female Education in Calcutta and its Vicinity' নামে একটি সংঘ প্রতিষ্ঠা করা হয়। 'Church Missionary Society'-এর সহায়তায় প্রতিষ্ঠিত এ সোসাইটি পরিচালনার জন্য ইতোমধ্যে কলকাতায় আগত ব্রিটিশ শিক্ষাব্রতী Marry Anne Cooke কে নিযুক্ত করা হয়। তিনি Church Missionary Society এর আর্থিক সহায়তায় এক বছরের মধ্যে কলকাতার বিভিন্ন স্থানে আটটি অবৈতনিক বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। বিদ্যালয়গুলো হল ঠনঠনিয়া স্কুল, মির্জাপুর স্কুল, শোভাবাজার স্কুল, কৃষ্ণবাজার স্কুল, শ্যামবাজার স্কুল, মল্লিকবাজার স্কুল এবং কুমোরটুলী স্কুল। গভর্নর জেনারেলের পত্নী Lady Armherst ও Mrs Ellerton ছিলেন মেরী কুকের পরিচালিত নারীশিক্ষা কার্যক্রমের প্রধান পৃষ্ঠপোষক। এ দেশীয় কতিপয় প্রগতিশীল বিত্তবান যেমন রাজা রাধাকান্ত দেব, রাজা বৈদ্যনাথ রায়, রাজা শিবকৃষ্ণ প্রমুখ মেরী কুকের পরিচালিত লেডিজ সোসাইটি ও স্কুলগুলোতে আর্থিক সহায়তা দিয়ে নারীশিক্ষা প্রসারে ভূমিকা পালন করেন। প্রসঙ্গত একটি কৌতূহল উদ্দীপক ঘটনার উল্লেখ করা প্রয়োজন। বিষয়টি হলো শ্যামবাজারে প্রতিষ্ঠিত মেরী কুকের স্কুলটি প্রতিষ্ঠায় একজন অজ্ঞাতনামা মুসলিম মহিলা বিশেষভাবে সহায়তা করেছিলেন। এ মহিলা বাড়ি বাড়ি ঘুরে ছাত্রী সংগ্রহের কাজ করতেন বলে প্রিসিলা চ্যাপম্যান উল্লেখ করেছেন।[৫৭] অজ্ঞাতনামা স্থানীয় এ মহিলার প্রচেষ্টায় মেরী কুকের শ্যামবাজার স্কুলে কিছু মুসলিম ছাত্রী ভর্তি হয়েছিল। লক্ষণীয় যে, শুধু শ্যামবাজার স্কুল নয় কলকাতার মির্জাপুর, এন্ট্যালি, জানবাজার প্রভৃতি এলাকার সাধারণ মুসলমানগণও নারীশিক্ষার ব্যাপারে ক্রমশ আগ্রহী হয়ে উঠে। মিশনারিদের স্কুল প্রতিষ্ঠায় মুসলমানদের সহযোগিতা, মিশনারি স্কুলে মুসলিম মেয়েদের পড়াশুনা নিঃসন্দেহে কৌতূহল উদ্দীপক ব্যাপার। কেননা উনিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত বাংলার মুসলিম পুরুষরাই যেখানে ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে তা গ্রহণে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছে, সেখানে মিশনারিদের প্রতিষ্ঠিত স্কুলে নিজেদের মেয়েদের পাঠানো, তাদের স্কুল প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করা বিস্ময়কর ব্যাপার বটে। বিস্ময়কর হলেও বিনয় ঘোষ এটাকে সত্য ঘটনা বলেই উল্লেখ করেছেন।

Church Missionary Society of Calcutta এর অঙ্গসংগঠন লেডিজ সোসাইটির উদ্যোগ ও মেরী অ্যান কুকের তত্ত্বাবধানে ১৮২৭ সালের মধ্যে কলকাতা ও আশেপাশের এলাকায় বালিকা বিদ্যালয়ের সংখ্যা দাঁড়ায় ৩০টিতে। এসব স্কুলে মোট ছাত্রী সংখ্যা ছিল ৬০০ জন।[৫৮] মেরী অ্যান কুকের পরিচালিত বালিকা বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের বার্ষিক পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ১৮২৩ সালে মির্জাপুর মিশন হাউজে বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের প্রথম এবং ১৮২৪ সালে পুরাতন চার্চের পোষাক ঘরে (Vestry Room) শিক্ষার্থীদের দ্বিতীয় সাধারণ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছিল।[৫৯]

---

৫৭. Priscilla Chapman, *op.cit.* p.80

৫৮. William Adam, *op.cit.* p. 51; Priscilla Chapman, *op.cit*, p.p.79-80

৫৯. J.A.Richey. *op. cit.* p. 42

মিসেস ম্যারী কুকের পরিচালনাধীন স্কুলগুলো কলকাতার চার দিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। এমতাবস্থায় Church Missionary Society কলকাতায় একটি কেন্দ্রীয় বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেয়। স্কুল প্রতিষ্ঠায় সরকারি অনুদান লাভে ব্যর্থ হলে লেডিজ সোসাইটি কলকাতা, বোম্বে ও লন্ডন থেকে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করেন। তবে রাজা বৈদ্যনাথ রায় তাঁর স্ত্রীর অনুরোধে ২০,০০০ হাজার টাকা অনুদান দেয়ায় লেডিজ সোসাইটির কেন্দ্রীয় বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রকল্পটি সফল হয়। Lady Amharst ১৮২৭ সালে কর্ণওয়ালিশ স্কোয়ারে Central Female School-এর ভিত্তি স্থাপন করেন। ১৮২৮ সালে ৫৮ জন ছাত্রী নিয়ে কেন্দ্রীয় বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়। বালিকা বিদ্যালয়গুলো পরিচালনার জন্য এদেশীয় উপযুক্ত মহিলা শিক্ষক তৈরির উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় বালিকা বিদ্যালয়ের সাথে লেডিজ সোসাইটি একটি Normal School প্রতিষ্ঠা করেছিল। তবে এ স্কুলে প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য কোনো অভিজাত পরিবারের নারী এগিয়ে আসেননি। বস্তুত বিধবা এবং স্বামী পরিত্যক্ত সাধারণ ঘরের নারীরাই এ কাজে এগিয়ে এসেছিলেন।[৬০]

অনাথ আশ্রম প্রতিষ্ঠা এবং এখানকার আশ্রিতা মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারেও মিসেস মেরী অ্যান কুকের ভূমিকা উল্লেখের দাবি রাখে। ধর্মান্তরিত হওয়া ছাড়াও অন্যান্য নানাবিদ কারণে দুর্দশাগ্রস্থ অনেক এতিম বালিকারা সাহায্যের প্রত্যাশায় মিসেস কুকের কাছে আশ্রয় নেয়। প্রিসিলা চ্যাপম্যান- এর বর্ণনা মতে, কেন্দ্রীয় বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার চার বছর পর মিসেস উইলসন ২০ জন এতিম বালিকা নিয়ে একটি অনাথ আশ্রম খোলেন। এখানে তাদের অন্ন-বস্ত্রসহ শিক্ষারও যথাযথ ব্যবস্থা করা হয়েছিল।[৬১] ১৮৩৩ সালে কলকাতার Scottish Church-এর মিসেস চার্লস কয়েকজন এতিম বালিকা সংগ্রহ করেন। তাঁর নিজস্ব অর্থে তিনি তাদের থাকা-খাওয়া ও পড়াশুনার ব্যবস্থা করা হয়। মিসেস চার্লস এর ভারত ত্যাগের পর এসব মেয়েদের Scottish Church-এর মিসেস ম্যাকডোনাল্ড এর তত্ত্বাবধানে দেয়া হয়। এ সময় ভারতীয় নারীদের শিক্ষার জন্য স্কটল্যান্ডে একটি Ladies Society প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৮৪০ সালে সোসাইটির প্রতিনিধি মিস লেং কলকাতায় এসে এতিম মেয়েদের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এতিম মেয়েদের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাওয়ায় মিস মেডিল নামে অপর এক মহিলা মিসেস লেং এর সহযোগী হিসাবে যোগ দেন। ১৮৪৩ সালে বাংলায় স্কটিশ মিশনের তৎপরতা বন্ধ হওয়ার পূর্বপর্যন্ত উপরোক্ত নারীদ্বয় বাংলায় এতিম বালিকাদের পড়াশুনা তত্ত্বাবধান করেন।[৬২]

কেন্দ্রীয় বালিকা বিদ্যালয়সহ খধফরবং ঝড়পরবঃু এর স্কুল গুলো খ্রিষ্টতত্ত্বের পঠন পাঠন আবশ্যিক ছিল। এছাড়াও বর্ণ পরিচয়, বানান, ইতিহাস, ভূগোল ও অন্যান্য বিষয়ের প্রাথমিক পুস্তক পাঠ্য তালিকার অন্তর্ভূক্ত

---

৬০. James Long, *Hand Book of Bengal Mission*, London 1848, উদ্ধৃতি, তপতী বসু, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৩১
৬১. J.A.Richey. *op. cit.,* p. 43
৬২. J.A.Richey. *op. cit.,* p. 43

ছিল। এসব স্কুলে মেয়েদের সেলাইয়ের কাজও শিখানো হত। সেলাইয়ের জন্য ছাত্রীদের কিছু পারিশ্রমিক দেয়ারও ব্যবস্থা ছিল।[৬৩]

১৮২৫ সালে জানুয়ারী মাসে কয়েকজন ইউরোপীয় মহিলা 'Calcutta Ladies Association for Native female Education' নামে একটি সমিতি গঠন করেন। এ সমিতি প্রতিষ্ঠার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল (১) Ladies Society-এর প্রস্তাবিত সেন্ট্রাল ফিমেল স্কুলের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করা এবং (২) যেসব অঞ্চলে লেডিজ সোসাইটির কোন বালিকা বিদ্যালয় নেই সেসব অঞ্চলে বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা।[৬৪] লেডিজ এসোসিয়েশনের উদ্দেশ্যদৃষ্টে একে লেডিজ সোসাইটির একটি সাহায্যকারী সমিতি বলে ধারণা হয়। মেরী অ্যান কুক এ সমিতিরও সভানেত্রী ছিলেন। এ প্রতিষ্ঠানটির পরিচালনাধীন বালিকা স্কুলের সংখ্যা ছিল ১০টি। এদের মধ্যে কয়েকটি স্কুল ছিল মুসলিম প্রধান এন্টালী ও জানবাজার এলাকায়। এসব স্কুল প্রতিষ্ঠায় এসোসিয়েশন স্থানীয় মুসলমানদের কাছ থেকে উৎসাহ ও সহযোগিতা লাভ করেছিল বলে তথ্যসূত্রে উল্লেখ পাওয়া যায়। আর এসব স্কুলের অধিকাংশ ছাত্রীই ছিল মুসলমান। তবে অল্প বয়সে এদের বিয়ে হয়ে যেতো বলে তারা বেশি দিন স্কুলে পড়াশুনা করতে পারতো না।[৬৫] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ১৮২২ সালে মিসেস উইলসন শ্যাম বাজারে সে বালিকা বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করেন, তাতে তিনি একজন মুসলিম মহিল সক্রিয় সহযোগিতা পেয়েছিলেন বলে জানা যায়। প্রথমে ১৮ জন ছাত্রী নিয়ে স্কুলটি যাত্রা শুরু করলে ও মুসলিম মহিলার প্রচেষ্টায় এ স্কুলের ছাত্রী সংখ্যা অচিরেই ৪৫ এ উন্নীত হয়।

১৮৩৬ সাল পর্যন্ত মেরী অ্যান কুক লেডিজ সোসাইটির দায়িত্ব পালন করেন। বাংলায় নারীশিক্ষা প্রসারে এ সুহৃদয় মহিয়ষীর আগ্রহ ও প্রচেষ্টা সত্যিই প্রশংসনীয়। মেরী অ্যান কুকের পর মিস টম্পসন (Miss Thompson) ও মিস হোয়াইট (Miss White) সেন্ট্রাল ফিমেল স্কুলের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তবে এক্ষেত্রে তারা পূর্বসূরী মেরী অ্যান কুকের মতো এতো বেশি কর্মোদ্যম ও কর্ম প্রয়াসের পরিচয় দিতে পারেননি। ফলে উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে লেডিজ সোসাইটির কার্যক্রম ক্রমশ সঙ্কোচিত হয়ে পড়ে। এমনকি সেন্ট্রাল ফিমেল স্কুল ছাড়া তাদের অন্যান্য প্রায় সব বালিকা বিদ্যালয়ই একে এক বন্ধ হয়ে যায়।

লেডিজ সোসাইটি পরিচালিত সেন্ট্রাল ফিমেল স্কুলের অনুকরণে Mrs. Sandy মির্জাপুরে Mrs. Hamption হাওড়াতে এবং Mrs. Alexander কুলনাতে একটি করে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। Circular Road Association মুসলমান মেয়েদের জন্যও একটি স্কুল স্থাপন করেছিল। এসব স্কুলে ছাত্রীসংখ্যা ছিল

---

৬৩. Priscilla Chapman, *op. cit.* P. 77

৬৪. সুখময় সেনগুপ্ত, *পূর্বোক্ত*, পৃ.১৮

৬৫. যোগেশচন্দ্র বাগাল, *বাংলার স্ত্রী শিক্ষা, ১৮০০-১৮৫৬*, বিশ্বভারতীয় গ্রন্থালয়, কলিকাতা, ১৩৫১ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৫

প্রায় তিন শতাধিক।[৬৬] উনিশ শতকের চল্লিশের দশকে London Missionary Society কলকাতার ঠনঠনিয়া রোড, ক্রীক রো (Creek Row) এবং মেন্দিবাগানে তিনটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করতো বলে জানা যায়। এসব স্কুলের পাঠ্যসূচিতেও খ্রিস্টধর্মতত্ত্ব, বর্ণ পরিচয়, লিখন, সাধারণ পাটিগণিত অন্তর্ভুক্ত ছিল। এর বাইরে এ বিদ্যালয়গুলোতে ছাত্রীদের সূচিকর্মও শিক্ষা দেয়া হতো।

কেবল কলকাতা বা পশ্চিমবঙ্গে নয়, মুসলিম প্রধান পূর্ববঙ্গেও মিশনারিরা নারীশিক্ষা কার্যক্রম চালু করেছিল। ১৮২৪ সালে ঢাকায় The Christian Femal School নামক একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। মিসেস চার্লস লিউনার্দ ছিলেন এ বিদ্যালয়ের পরিচালক।[৬৭] তাঁর বিবরণ মতে, এ সময় পূর্বে আরো বেশ কয়েকটি বারিকা বিদ্যালয় ছিল। প্রধানত Sreerampur Baptist Missionary Society এসব স্কুল পরিচালনা করতো। শ্রীরামপুর মিশনের পরিচালনায় শ্রীরামপুর ১৩টি, বীরভূমে ৭টি বালিকা বিদ্যালয় ছাড়া ও ঢাকা ও চট্রগ্রামে আরো কয়েকটি বালিকা স্কুল ছিল। ঢাকা ও চট্রগ্রামের বালিকা স্কুল গুলোতে ছাত্রী সংখ্যা ছিল যথাক্রমে মোট ১০০জন ও ৭৭জন। যশোরে শ্রীমতি লিগু নামের এক ব্রিটিশ মহিলা একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ বা কলকাতায় পরিচালিত মিশনারি স্কুলগুলোতে খ্রিস্টধর্ম যেমন পাঠ্যসূচির মূল বিষয় ছিল, তেমনি পূর্ববঙ্গেও। এর সাথে নীতি কথা, বানান ও হাতের লেখাও পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

বাংলায় নারীশিক্ষার এক চরম অধোগতির যুগে এর উন্নয়নে যখন কোনো সরকারি ও স্থানীয় বেসরকারি প্রয়াস প্রচেষ্টা দেখা যায়নি, সে সময় খ্রিস্টান মিশনারিদের বিভিন্ন সংগঠন[৬৮] এ কাজে ব্রতী হয়। উনিশ শতকের সূচনায় বাংলার নারীশিক্ষা ব্যাপারে মিশনারিরাই প্রথম উদ্যোগ গ্রহণ করে। এ ব্যাপারে তাদের উৎসাহ ও প্রচেষ্টা ছিল প্রশংসনীয়। তবে লক্ষণীয় যে, ক্ষেত্রবিশেষে নারীশিক্ষা বিষয়ে মিশনারি তৎপরতার সাথে স্থানীয় হিন্দু-মুসলমানদের কিছু সম্পৃক্ততা ঘটে, তবে এতদসত্ত্বেও নারীশিক্ষা বিষয়ে মিশনারিদের সাফল্য সম্পর্কে প্রশ্নের অবকাশ রয়েছে। প্রাপ্ত তথ্যাদি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, উনিশ শতকের প্রথমার্ধে মিশনারিদের নানামুখী তৎপরতা সত্ত্বেও নারীশিক্ষার বিশেষ প্রসার ঘটেনি। হিন্দু-মুসলিম অভিজাত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে মিশনারি তৎপরতা তেমন কোন সাড়া জাগাতে পরেনি। তৎকালীন অভিজাত সম্প্রদায় বিশেষ করে হিন্দু সমাজের উচ্চ বা মধ্যস্তরের লোকেরা যে নারীশিক্ষার ব্যাপারে একেবারে উদাসীন ছিলেন, তা কিন্তু নয়। কিন্তু বাংলায় মিশনারিদের তৎপরতাকে সাধারণভাবে হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ই সন্দেহের চোখে দেখতো। Syed Nurulah ও J. P. Naik এর বিবরণ মতে, শিক্ষাদান কর্মসূচি নয়, বরং ধর্মান্তরীতকরণই ছিল খ্রিস্টান

৬৬. Priscilla Chapman, *op. cit.* P.114

৬৭. সোনিয়া নিশাত আমিন, *বাঙালি মুসলিম নারীর আধুনিকায়ন*, অনু. পাপড়ীন নাহার, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০২, পৃ. ১১৯

৬৮. The Serampore Missionary Society; The London Missionary Society; The Church Missionary Society of Calcutta; The Calcutta Catholic Society; Calcutta Baptist Mission; The British and Foreign School Society; The Female Juvenile Society of Calcutta; The Benevolent Institution; The Ladies Society for Native female Education in Calcutta and its Vicinity এবং Scottish Church ইত্যাদি।

মিশনারিদের মূল অভিপ্রায়। এক্ষেত্রে তারা শিক্ষাদান কর্মসূচিকে একটি বাহন হিসাবে ব্যবহার করে মাত্র।[৬৯] মিশনারিদের পরিচালিত বিদ্যালয়সমূহের পাঠ্য তালিকার প্রতি নজর দিলেই তাদের ধর্মপ্রচারের অভিপ্রায় স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। যোগেশ চন্দ্রবাগালের ভাষ্যমতে, মিশনারিদের পরিচালিত বালিকা বিদ্যালয়সমূহের "পাঠ্য তালিকায় বাইবেল ও খ্রিস্টধর্ম সংক্রান্ত পুস্তক স্থান পাওয়া এবং এ সকল বিষয় পাঠ ও পরীক্ষা দেওয়া আবশ্যিক করায় হিন্দু প্রধানগণ মিশনারিদের প্রচেষ্টা থেকে সরে দাঁড়ান। উচ্চশ্রেণির দরিদ্র হিন্দুরাও তাদের কন্যাদের মিশনারি স্কুলে প্রেরণ থেকে বিরত থাকেন।"[৭০] তথ্যসূত্র থেকে জানা যায় যে, রাজা রাধাকান্ত দেব প্রমুখ নারীশিক্ষার সমর্থক হিন্দু ভদ্রলোকেরাও মিশনারি স্কুলে তাদের মেয়েদের পাঠাননি, বরং এর বিরোধিতা করেছেন। অনেকেই মিশনারি স্কুলে তাদের মেয়েদের পাঠানোকে অসম্মানজনক বলেও মনে করতেন।[৭১] শুধু তাই নয়, সম্ভ্রান্ত হিন্দু-মুসলিম সমাজ তখনো পর্দাপ্রথা ভেঙ্গে তাদের কন্যাদের বিদ্যালয়ে পাঠাতে আগ্রহী হয়নি। রমেশচন্দ্র মজুমদার সম্ভ্রান্ত হিন্দুদের মিশনারি স্কুলে, নিজ কন্যাদের পাঠানোর ক্ষেত্রে দুটো ঘোরতর বাধার কথা উল্লেখ করেছেন-(ক) ধর্ম শিক্ষার ভয় এবং (খ) এ সব স্কুলে নীচ জাতীয় ও গণিকার কন্যাদের সঙ্গে একত্রে বসে পড়ার ব্যবস্থা।[৭২]

নেতৃস্থানীয় বাঙালি ভদ্রলোকদের সহানুভূতির অভাব এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাদের বিরোধিতার কারণে মিশনারিদের নারীশিক্ষা কার্যক্রমের আবেদন মূখ্যত নিম্নশ্রেণির হিন্দুদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। মিশনারিদের পরিচালিত বিদ্যালয়সমূহে কেবল বাগদী, ব্যাধ, বৈরাগী প্রভৃতি নিম্ন জাতের হিন্দু এবং গণিকাদের মেয়েরাই পড়তে যেতো। জানা যায়, তারাও যে বিদ্যার্জনের মাধ্যমে নিজেদের জীবনমানের উন্নতির জন্য স্কুলে যেতো সবক্ষেত্রে তা নয়। এদের অনেকেই মিশনারি স্কুলে যেতো নগদ অর্থ প্রাপ্তিসহ অন্যান্য কিছু সুবিধা লাভের উদ্দেশ্যে।[৭৩] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, মিশনারিদের পরিচালিত স্কুলগুলো ছিল একান্তই প্রাথমিক পর্যায়ের। এসব স্কুলে মেয়েদের সামান্যই লেখাপড়ার সুযোগ ছিল। একদিকে শিক্ষার্থীর অভাব এবং অন্যদিকে বিদ্যালয়গুলো পরিচালনায় প্রয়োজনীয় অর্থ সংস্থান না হওয়ায় উনিশ শতকের চল্লিশের দশক থেকে মিশনারিদের প্রাতিষ্ঠানিক নারীশিক্ষার প্রয়াস ক্রমশ স্তিমিত হয়ে আসে।

সার্বিক সফলতা অর্জনে ব্যর্থ হলেও মিশনারিদের উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা একেবারে বিফল হয়নি। মিশনারি প্রচেষ্টায় নারীশিক্ষার ব্যাপারে বাঙালি সমাজে যেটুকু সাড়া পড়েছিল তার পরবর্তী সুফল কোনোভাবেই অস্বীকারের অবকাশ নেই। বস্তুত মিশনারিদের তৎপরতার ফলে বাংলায় নারীশিক্ষা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি

---

৬৯. Syed Nurullah & J.P.Naik, *op. cit.* p. 98

৭০. যোগেশ চন্দ্রবাগল, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫২

৭১. গোলাম মুরশিদ, *সংকোচের বিহ্বলতা*, পৃ. **২১**

৭২. রমেশ চন্দ্র মজুমদার, *পূর্বোক্ত*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩২১

৭৩. William Adam, *op.cit.* pp. 452-453

পায়। বাংলায় নারীশিক্ষার সমর্থক একটি নব্যশ্রেণির আবির্ভাব ঘটে। বাংলায় নারীশিক্ষা প্রসারে তারা উদ্যোগী হলে নারীশিক্ষা বিরোধী প্রাচীনপন্থীদের সাথে তাদের তর্কযুদ্ধের সূচনা হয়। সমকালীন সংবাদপত্র বিশেষ করে *সমাচার দর্পন*, *সমাচার চন্দ্রিকা*, *সংবাদ প্রভাকর*, *দ্যা রিফমর্স*, *সোমপ্রকাশ* ইত্যাদি পত্রিকায় নারীশিক্ষার সমর্থক ও বিরোধীদের বাদানুবাদ নিয়মিত প্রকাশিত হতে থাকে।[৭৪] এসব বিতর্কে নারীশিক্ষার স্বপক্ষীয়গণ যেমন নানা যুক্তির মাধ্যমে নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা প্রমাণের চেষ্টা করতেন, তেমনি বিপক্ষীয়গণ এর নেতিবাচক দিক সম্পর্কে নিজেদের বক্তব্য উপস্থাপন করতেন। বিপক্ষীয়দের কেউ কেউ মেয়েদের বিদ্যালয়ে গেলে দুঃশ্চরিত্রা হবার আশঙ্কা প্রকাশ করে এমন সব উক্তি করতেন যা শ্লীলতার পরিপন্থী বলে গণ্য হতো। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, হিন্দু সমাজের নের্তৃস্থানীয় অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি নারীশিক্ষার নৈতিক সমর্থক ছিলেন। তবে প্রকাশ্যে বালিকা বিদ্যালয়ের সার্থকতা সমন্ধে তাদের মনে সন্দেহ ছিল প্রবল। এদের মধ্যে শ্রী মতিলাল শীল, রাজা বৈদ্যনাথ রায় ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম উল্লেখ্যযোগ্য। বস্তুত এসব ব্যক্তিবর্গ দৃষ্টিভঙ্গিগত দিক থেকে ছিলেন পশ্চাৎপদ। তাই আধুনিক যুগের দৃষ্টিভঙ্গিতে নারীশিক্ষার উপযোগিতা স্বীকার করেননি। বরং এদেশের প্রাচীন ঐতিহ্যানুসারে অন্তঃপুর বা গৃহশিক্ষার গন্ডির মধ্যেই নীতিগতভাবে নারীশিক্ষার প্রতি সমর্থন দেন।

২.৬: নারীশিক্ষা প্রসারে দেশীয় জনসমাজের প্রচেষ্টা

নারীশিক্ষা বিষয়ে নানা রকম তর্ক-বির্তকের মধ্য দিয়ে মন্থরগতিতে হলেও এর অগ্রগতি অব্যাহত থাকে। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, মিশনারিরা নারীশিক্ষা সমন্ধে বাঙালি সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয় বটে, কিন্তু তারা একে একটি সামাজিক আন্দোলনে রূপ দিতে ব্যর্থ হয়। এক্ষেত্রে নারীশিক্ষাকে সামাজিক আন্দোলনে পরিণত করার কৃতিত্ব 'ইয়ং-বেঙ্গল দল-এর। এ সময় পাশ্চাত্য বিশ্বে কিছু সাড়া জাগানো আন্দোলন ও পুস্তক প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে দার্শনিক উইলিয়াম টমসনের। মানব জাতির অর্ধেক নারীর আবেদন, মানব জাতির অপর অর্ধেক পুরুষদের দুরহঙ্কারে বিরুদ্ধে এবং ক্রীতদাস প্রথা রহিতকরণ ও নারীপুরুষের সাম্য ও নারীর অবস্থা সম্পর্কে গ্লিমকে ভগ্নীদ্বয়ের পত্রাবলী ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। ১৮৩৭ সালে আমেরিকায় প্রথম দাসপ্রথা বিরোধী নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এসব ঘটনা ব্রিটেনের অন্যতম উপনিবেশ কলকাতাকেও স্পর্শ করে।[৭৫] বাংলার শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে শিক্ষিত স্ত্রী পাওয়ার ব্যাকুলতা সৃষ্টি হওয়ায় তারা নারীশিক্ষা বিষয়ে আগ্রহী হন।

---

৭৪. প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে বজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় সম্পাদিত *সংবাদপত্রে সেকালের কথা*, কলিকাতা, ১৩৫৯ বঙ্গাব্দ, শীর্ষক গ্রন্থে।

৭৫. শ্যামলী আকবর ও অন্যান্য, *পূর্বোক্ত*, পৃ: ৮০

রামগোপাল ঘোষ, কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায় প্রমুখ ইয়ংবেঙ্গল দলীয় মুখপাত্রগণ বাংলায় নারীশিক্ষাকে সমাজিক আন্দোলনে পরিণত করায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায় নারীশিক্ষা বিষয়ে একটি প্রবন্ধ রচনা করেন। ১৮৪০ সালে তাঁর এ প্রবন্ধটি গৌরমোহন আড্ডির Oriental Seminary'তে ছাত্রদের সামনে পাঠ করা হয় এবং ১৮৪১ সালে এটি *Native female Education* নামে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়। এতে লেখক হিন্দু মেয়েদের শিক্ষা-দীক্ষায় পশ্চাপদতার জন্য হিন্দুশাস্ত্রের নানা গোঁড়ামী এবং হিন্দু সমাজে প্রচলিত কুসংস্কার কে দায়ী করেন। তিনি সম্ভ্রান্ত হিন্দু নারীদের জন্য 'অন্তঃপুর শিক্ষা ব্যবস্থা' চালুর প্রস্তাব করেন। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, "ইউরোপীয় ও স্বদেশীয়দের সুপরিচালিত কোন সংস্থার তত্ত্বাবধানে যদি স্ত্রীশিক্ষার ব্যবস্থা করা হয় এবং শিক্ষা যদি হিন্দুদের গার্হস্থ্য ব্যবস্থায় বিপ্লবাত্মক পরিবর্তনের প্রচেষ্টা না হয় তা হলে স্ত্রী শিক্ষা ক্রমশ প্রসারিত হবে।"[৭৬]

১৮৪২ সালে ইয়ং বেঙ্গল নেতা রামগোপাল ঘোষ হিন্দু কলেজের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্রদের নারীশিক্ষা বিষয়ে প্রবন্ধ রচনার জন্য একটি স্বর্ণ ও একটি রৌপ্যপদক পুরষ্কার ঘোষণা করেন। প্রতিযোগিতায় মধুসুদন দত্ত ও ভূদেব মুখপাধ্যায় যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় পুরষ্কার লাভ করেন।[৭৭] এভাবে উনিশ শতকে চতুর্থ দশকেই বাংলায় নারীশিক্ষা আন্দোলন মিশনারিদের প্রচেষ্টার বাইরে ক্রমেই বৃহত্তর বাঙালি সমাজে বিস্তার লাভ করতে থাকে।

একটি বিষয় লক্ষ্যণীয় যে, বাংলার নারীশিক্ষা ব্যাপারে মিশনারিদের প্রচেষ্টা ছিল সংগঠিত। কিন্তু এ ব্যাপারে তখন পর্যন্ত বাঙালিদের প্রচেষ্টা ছিল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিচ্ছিন্ন ও ব্যক্তিগত পর্যায়ে সীমাবদ্ধ। এ সময় বাংলার একদল লোক উপলব্ধি করেন যে, বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা বা কেবল শুভেচ্ছা জোরে নারীশিক্ষা আন্দোলন সফল হবে না। এর জন্য প্রয়োজন সংগঠিত ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস। *বিদ্যাদর্শন* পত্রিকার নারীশিক্ষা বিষয়ক সম্পাদকীয় নিবন্ধে অক্ষয়কুমার দত্ত নারীশিক্ষা অনুরাগী ব্যক্তিবর্গকে সংঘবদ্ধ আন্দোলন পরিচালনা করার আহ্বান জানান। এ উদ্দেশ্যে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে দেশ হিতৈষী জনগণকে এর সাথে সম্পৃক্ত করার জন্যও তিনি দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের পরামর্শ দেন।[৭৮] ইতোপূর্বে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ও নারীশিক্ষা বিষয়ে সংগঠিত উদ্যোগের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেছিলেন। অবশ্য এসব আহবানে তাৎক্ষিণক ফলাফল আশাব্যাঞ্জক ছিল না। তবে সে সময়কার সমাজে এরূপ চিন্তার বিকাশ নিঃসন্দেহে ঐতিহাসিক গুরুত্ব বহন করে।

৭৬. J.C.Bagal. *Education in Eastern India.* PP.70-72

৭৭. *Hindu College Annual Report*, 1942

৭৮. *বিদ্যাদর্শন*, অগ্রাহয়ণ, ১৭৬৪ শকাব্দ, বিনয় ঘোষ, *পূর্বোক্ত* পৃঃ ২১৫-১৬

বাংলার নারীশিক্ষা বিষয়ে David Hare, এর উৎসাহও অবদান অপরিসীম। তিনি ছিলেন Ladies Society for Native female Education এর একজন বড় অর্থদাতা ১৮৪২ সালে তিনি মারা যান। তারা স্মরণ সভায় উপস্থিত প্রগতিশীল ব্যক্তিদের উদ্যোগে 'Hare Prise Fund' নামে একটি তহবিল গঠন করা হয়। এ ফান্ডের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল বাংলার নারীশিক্ষার প্রসার। এ লক্ষ্যে প্রথমে নারীশিক্ষা বিষয়ে উৎকৃষ্ট রচনার জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা করা হয়। অবশ্য পরবর্তীতে পুরস্কার প্রদানের পরিবর্তে ফান্ডের পক্ষ থেকে নারীশিক্ষা বিষয়ক পাঠ্যপুস্তক প্রকাশের ব্যবস্থা করা হয়।[৭৯]

'Bengal British India Society' নারীশিক্ষা ব্যাপারে আগ্রহী ছিল। ১৮৪৫ সালে Society এর নেতা রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ও তারাপদ চক্রবর্তী প্রমুখ নারীশিক্ষা বিষয়ে একটি পরিকল্পনা তৈরি করেন।[৮০] অবশ্য এ পরিকল্পনা সম্পর্কে বিস্তারিত তেমন কিছু জানা যায় না। উত্তরপাড়ার জমিদার জয়কৃষ্ণ ও রাজকৃষ্ণ একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা করেন। এজন্য ১৮৪৫ ও ১৮৪৯ সালে শিক্ষা সংসদের কাছে তারা সাহায্যের আবেদন জানান। কিন্তু সরকার তাদের সাহায্য করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে।

১৮৪৭ সালে বারাসাতে একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করা হয়। শিক্ষাবিদ প্যারীচরণ সরকার, কালীকৃষ্ণ মিত্র ও নবীন কৃষ্ণমিত্র প্রমুখ বারাসাতের কয়েকজন শিক্ষিত সমাজ হিতৈষী ব্যক্তি স্কুলটি প্রতিষ্ঠা করেন। এটি ছিল সম্ভ্রান্ত বাঙালিদের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত বাংলার প্রথম প্রকাশ্য বালিকা বিদ্যালয়। বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে এর প্রতিষ্ঠাতাদের বিপক্ষীয় প্রতিক্রিয়াশীলদের দ্বারা নানারূপ বাধা বিপত্তি ও লাঞ্চনা-গঞ্জনার শিকার হতে হয়। এমন কি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অপরাধে প্যারীচরণ সরকার ও নবীনকৃষ্ণসহ উদ্যোক্তা শুভানুধ্যায়ীদের সমাজচ্যুত করা হয়েছিল বলে প্যারীচরণের জীবনীকার নবকৃষ্ণ ঘোষের বর্ণনা থেকে জানা যায়।

বাংলার নারীশিক্ষার ইতিহাসে ১৮৪৯ সাল একটি বাঁক পরিবর্তনকারী বছর। এ বছর বড় লাটের আইন পরিষদের সদস্য এবং পদাধিকার বলে Council of Education-এর সভাপতি জন এলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন (J.E.D.Bethane) কলকাতার সিমুলিয়ার সুকিয়া ট্রীটে রাজা দক্ষিণা রঞ্জনের বাড়ীতে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। বিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তরে নাম হিসাবে Hindu female School কথাটি উৎকীর্ণ থাকলেও প্রথম দিকে এটি Calcutta Female School বা Native Female School নামেও পরিচিত ছিল। ১৮৫১ সালে বেথুনের মৃত্যুর পর স্কুলটির নামকরণ করা হয় Bethune School।[৮১] বস্তুত বেথুন স্কুল প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে বাংলায় নারীশিক্ষার নতুন দিগন্ত উন্মুক্ত হয়। আলোচ্য গবেষণার সূচনকাল নির্ধারণ করা হয়েছে এই

---

৭৯. Peary Chand Mitra, *A Biographical Sketch of David Hare.* Calcutta, 1877, P. 107-108

৮০. সুখময় সেনগুপ্ত, *পূর্বোক্ত*, পৃঃ ৩৯

৮১. রাধারামণ মিত্র, *কলিকাতায় বিদ্যাসাগর*, বাণী শিল্প, কলিকাতা, ১৯৭৭, পৃ. ১৪

১৮৪৯ সাল। অভিসন্দর্ভের পরবর্তী অধ্যায়সমূহে নারীশিক্ষা প্রসারে বেথুনের প্রয়াস থেকে পরবর্তী প্রায় শতাব্দীকাল বাংলায় নারীশিক্ষা প্রসারে বেসরকারি ও ব্যক্তিগত প্রয়াস সম্পর্কে অনুসন্ধান ও পর্যালোচনার প্রয়াস নেয়া হয়েছে।

শিক্ষা মানুষের অন্যতম মৌলিক অধিকার। ইহা মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিকে বিকাশিত করে, নিজের অস্তিত্বকে উপলব্ধি করতে শেখায়। নারী পুরুষ মিলেই মানব সমাজ। অন্যান্য মৌলিক অধিকারের ন্যায় শিক্ষা অর্জনের ব্যাপারেও নারী-পুরুষের অধিকার সমান। কিন্তু যুগযুগ ধরে পৃথিবীর সর্বত্রই নারীরা সকল বিষয়েই বৈষম্যের শিকার হয়েছে। পুরুষ প্রধান সমাজে নারীর শিক্ষা লাভের অধিকার চরমভাবে উপেক্ষিত হয়েছে। কখনো ধর্মের দোহাই দিয়ে, আবার কখনো বা সমাজপতিদের সৃষ্ট মনগড়া মতবাদ দিয়ে নারীকে বঞ্চিত করা হয়েছে শিক্ষার মৌলিক অধিকার থেকে। আলোচ্য বাংলায়ও এর কোন ব্যতিক্রম ঘটেনি। প্রাচীনকাল থেকে বাংলার নারী সমাজে প্রাতিষ্ঠানিক পুঁথিগত শিক্ষা অত্যন্ত মন্থর গতিতে নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হয়েছে।

আঠারো শতকের মধ্যভাগে বাংলায় ব্রিটিশ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। এর ফলে বাংলায় ইউরোপীয় রেনেসাঁর প্রভাবধন্য নবজীবন চেতনায় উদ্দীপ্ত বাঙালি মনীষার উদ্ভব ঘটে। এদের কারো কারো চেষ্টায় সতীদাহ প্রথা রদ, এবং বিধবাবিবাহ আইনবন্ধ হলেও তখনো সমাজে বাল্যবিবাহ ও বহু বিবাহের ন্যায় কুপ্রথা অক্ষুন্ন ছিল। লেখাপড়া শিখলে মেয়েরা 'দুশরিত্রা হবে, তাদের বৈধব্য সুনিশ্চিত' তখনো সমাজে এসব ছিল সাধারণ বিশ্বাস। এ অবস্থায় বাংলার নারী সমাজকে শিক্ষাদ্বারা আলোকিতকরণের কাজটি ছিল সত্যিই দুরূহ ব্যাপার।

উনিশ শতকের বাংলার উপর্যুক্ত বাস্তবতায় নারীশিক্ষা ব্যাপারে মিশনারিরা ছিল প্রথম উদ্যোক্তা। কিন্তু তাদের প্রয়াস কোন স্থায়ী সাফল্য লাভ করেনি। মিশনারিদের প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়সমূহে বাইবেল ও খ্রিষ্টধর্ম প্রচার প্রাধান্যতা পাওয়ায় নারীশিক্ষা বিষয়ে বাঙালিদের অনুদার মনোভাব এসময় কঠোর প্রতিরোধে পরিণত হয়। যোগেশ চন্দ্রবাগাল এর তথ্য মতে,

> পাঠ্য তালিকায় বাইবেল ও খ্রিষ্টধর্ম সংক্রান্ত পুস্তক স্থান পাওয়া এবং সকল বিষয় পাঠ ও পরীক্ষা দেওয়া আবশ্যিক করায় হিন্দু প্রধানগণ মিশনারীদের প্রচেষ্টা থেকে সরে দাঁড়ান। কেবল উচ্চশ্রেণীর নয়, দরিদ্র হিন্দুরাও তাদের কন্যাদের মিশনারী স্কুলে প্রেরণ থেকে বিরত থাকেন।[৮২]

নারীশিক্ষার অন্তরালে মিশনারিদের ধর্মপ্রচারের চেষ্টা মুসলমানদের নিকট আরো আগেই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তাই মিশনারিদের প্রচেষ্টা মুসলমান সমাজে গ্রহণীয় হয়নি। মিশনারিরাও পারত পক্ষে মুসলিমপ্রধান অঞ্চলে স্কুল প্রতিষ্ঠা থেকে বিরত থাকে। বস্তুত মিশনারিদের তৎপরতা কলকাতা ও তার আশেপাশেই সীমিত ছিল

---

৮২. যোগেশ চন্দ্র বাগল, *বাংলার স্ত্রী শিক্ষা*, পৃ: ৫২

এবং সেখানে কেবল নগণ্য সংখ্যক মুসলিম ছাত্রীই পড়াশুনা করে। তবে মিশনারিরা তাদের প্রচেষ্টা থেকে নিবৃত হয়নি। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে মিশনারিরাও নারীশিক্ষার ব্যাপারে তাদের কর্মকৌশল পরিবর্তন করে। প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষার পরিবর্তে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে মিশনারিরা বাংলায় 'জেনানা বা অন্তঃপুর শিক্ষা' কার্যক্রম পরিচালনায় মনযোগী হয়।

পুনশ্চ উল্লেখ্য যে, নারীশিক্ষা বিষয়ে মিশনারিদের তৎপরতা সবর্জন স্বীকৃত হয়নি, তবে তারা বাঙালি সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করে। এসময় বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় নারীশিক্ষা বিষয়ে বাদানুবাদ এবং সম্ভ্রান্ত ও নেতৃস্থানীয় অনেকের নারীশিক্ষার পক্ষে মত প্রকাশ ইত্যাদি মধ্যবিত্ত বাঙালির মন নারীশিক্ষার জন্য অনেকটা প্রস্তুত করে। উনিশ শতকে চতুর্থ দশকেই নারীশিক্ষা আন্দোলন মিশনারিদের প্রচেষ্টার বাইরে ক্রমেই বৃহত্তর বাঙালি সমাজে বিস্তার লাভ করে। নব্য শিক্ষিত ও নবজাগরণের মন্ত্রে উদ্দীপ্ত হিন্দুদের ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক উদ্যোগে বিভিন্ন স্থানে বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৪৯ সালে জন এলিয়ট বেথুন ও স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। তবে প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এসব স্কুল বাংলার মুসলমান মেয়েদের শিক্ষার দ্বার উন্মোচনে কোন ভূমিকা রাখতে পারেনি, যেমনটি পারেনি মিশনারিরা। ফলে সে সময় অবধি মুসলিম নারীসমাজ অশিক্ষার যে তিমিরে ছিল সে তিমিরেই থেকে যায়।

উনিশ শতকের সূচনাপর্বে বাংলায় নারীশিক্ষা প্রসারে মিশনারি প্রচেষ্টায় ছিল মূখ্য। মিশনারিদের প্রচেষ্টার সুফল সম্পর্কে মতপার্থক্য থাকলেও একথা স্বীকার করতেই হবে যে, নারীশিক্ষা ব্যাপারে মিশনারিদের তৎপরতা বাঙালি মানসপটে একটি নাড়া দিয়েছিল। নারীশিক্ষার প্রতি বাঙালির মনন জগত প্রস্তুতে মিশনারিদের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে এ কথা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। এ সময় নব্য ইংরেজি শিক্ষিত ও পাশ্চাত্য ভাবধারায় অনুপ্রাণিত কতিপয় মহৎপ্রাণ ব্যক্তি দুদর্শার কঠিন নিগড়ে নিষ্পেষিত বাংলার নারীসমাজের পরিত্রাণ প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেন। নারী মুক্তির অন্যতম উপায় শিক্ষা বিস্তারের প্রয়োজনীয়তাও তারা উপলদ্ধি করেন। কিন্তু নারীশিক্ষার বিরুদ্ধে দীর্ঘকালব্যাপী এত কুসংস্কার বংশ পরস্পরায় তাদের চেতনায় স্তূপীকৃত হয়েছিল যে, মাত্র কয়েক বছরের পুঁথিগত বিদ্যার জোরে হঠাৎ করে একে ঠেলে ফেলে দেয়া তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। তবে আস্তে আস্তে অবস্থার পরিবর্তন ঘটে এবং শতবাধা বিপত্তি অতিক্রম করে উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে নারীশিক্ষা প্রসঙ্গ একটি সামাজিক আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়। বাংলার নারীশিক্ষা বিস্তারের গতি ত্বরান্বিত হয়। ফলে "হাজার বছরের জড় বাঙালি নারীরা আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে নতুন আত্মপ্রত্যয় লাভ করে–যা তাদের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি করে ও স্বদেশের স্বাধীনতার জন্যও লড়তে শেখায়।"[৮৩]

---

৮৩. ফাল্গুনী অদিতি, 'নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট', *উন্নয়ন পদক্ষেপ*, ২য় সংখ্যা, এপ্রিল-জুন, পৃ. ১২

তৃতীয় অধ্যায়

উনিশ শতকের সংবাদ-সাময়িক পত্র ও সাহিত্যে নারীশিক্ষা প্রসঙ্গ

অভিসন্দর্ভের অন্যত্র আলোচনা করা হয়েছে যে, উনিশ শতকে বাংলায় সূচিত নবজাগরণের সূত্রে এদেশে নারীমুক্তি ভাবনা সমাজসংস্কারকদের মনে স্থান পায়। আর এ নারীমুক্তির প্রথম শর্ত হিসেবে তাঁরা নারীশিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করেন। পাশ্চাত্য উদারনীতি ও যুক্তিবাদের আলোয় সামাজিক মূল্যবোধগুলোকে পুনর্মূল্যায়নের সূত্রে নারীদের সামাজিক অবস্থা উন্নয়নের নিমিত্ত হিসেবে নারীশিক্ষাকে প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিবেচনায় নেয়া হয়। তবে পারিপার্শ্বিক নানা কারণে উনিশ শতকের তৃতীয় দশক পর্যন্ত নারীশিক্ষা প্রসারে সরকারি বা এদেশীয় স্থানীয় উদ্যোগ দেখা যায়নি। এ অবস্থায় বাংলায় নারীশিক্ষার প্রথম পর্বটির সূচনা করেন ইউরোপ হতে আগত খ্রিস্টান মিশনারীগণ। অভিসন্দর্ভের দ্বিতীয় অধ্যায়ে এতদবিষয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে। তবে মিশনারীদের নারীশিক্ষা প্রসারের পশ্চাতে খ্রিস্টীয় আদর্শ ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির গৌরব ও মহিমা প্রচার মুখ্য হওয়ায় তাঁদের প্রয়াস বৃহত্তর বাঙালি সমাজে তেমন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। বাংলায় নারীশিক্ষার এরূপ বাস্তব পরিস্থিতিতে নারীশিক্ষা বিস্তারে উনিশ শতকের প্রথমার্ধেই দেশীয় ব্যক্তি ও বেসরকারি পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক নারীশিক্ষার উদ্যোগ শুরু হয়। নারীশিক্ষার প্রসারে এদেশীয় শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীদের প্রয়াসের ফলে নারীশিক্ষা বিশেষ গতিবেগ লাভ করে। এ প্রসঙ্গে Geraldine Forbes যথার্থ বলেছেন যে:

> Efforts to provide education for Indian females had begun early in the nineteenth century, but these efforts met with little success until the idea of female education had gained respect amongst the intelligentsia.[১]

নারীশিক্ষা প্রসারে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় দেশীয় উদ্যোগ বাস্তবায়িত হয়। এর মধ্যে একটি হচ্ছে নারীশিক্ষার পক্ষে জনমত সৃষ্টি ও মনস্তাত্ত্বিক পটভূমি বিনির্মান। এটি যেমন ব্যক্তি উদ্যোগে করা হয়, তেমনি সাংগঠনিকভাবেও। তথ্য প্রমাণ থেকে দেখা যায় যে, উনিশ শতকের ত্রিশের দশক হতে বাঙালি সমাজ নেতাদের অনেকেই নারীশিক্ষার ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। বিদ্যমান সমাজ বাস্তবতা বিবেচনা করে তাঁরা নারীশিক্ষার পক্ষে জনমত তৈরি ও একটি মনস্তাত্ত্বিক পটভূমি বিনির্মান করাকে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করেন। এজন্য তাঁরা

---

১. Geraldine Forbes, *Women in Colonial India: Essays on Politics, Medicine and Historiography*, D C Publishers, New Delhi, 2005, p. 13

নারীশিক্ষার পক্ষে প্রচারণায় মনোনিবেশ করেন। এ কাজটি করার জন্য বক্তৃতা-বিবৃতি ছাড়াও সমকালীন সংবাদ ও সাময়িকপত্রে নারীশিক্ষার পক্ষে প্রচারণা চালানো হয়। অনেকে আবার পুস্তক-পুস্তিকা রচনার মাধ্যমে নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ব্যাপারে বাঙালি সমাজকে সচেতন করার উদ্যোগ নেন। উল্লেখ্য যে, তখনো বাঙালি সমাজে নারীশিক্ষা বিরোধীদের সংখ্যা কম ছিল না। নারীশিক্ষার সমর্থকগণ যখন এর সপক্ষে জনমত তৈরির জন্য সংবাদ পত্র ও সাহিত্য রচনার কাজে ব্রতী হন, তখন তাদের বিপরীত ধারায় নারীশিক্ষা বিরোধীরাও তাঁদের মতামত ব্যক্ত করার জন্য এ দু'টো মাধ্যমকে ব্যবহার করেন। ফলে উনিশ শতকে নারীশিক্ষা প্রসঙ্গে সংবাদ-সাময়িকপত্র ও সাহিত্যে বিতর্ক দেখা দেয়। তবে নারীশিক্ষার পক্ষে বাঙালি জনমত ক্রমশ সংগঠিত হতে থাকায় বিরোধী ধারার প্রচারণা ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ে। আলোচ্য অধ্যায়ে উনিশ শতকে, বিশেষ করে এ শতকের ত্রিশের দশক হতে সংবাদ-সাময়িকপত্র ও সাহিত্যে প্রতিফলিত নারীশিক্ষা প্রসঙ্গ সম্পর্কে আলোকপাত করার প্রয়াস থাকবে।

৩.১: সংবাদ-সাময়িকপত্রে নারীশিক্ষা প্রসঙ্গ

১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে রাজা রামমোহন রায় মারা যান। নারী জাতির ভাগ্যোন্নয়নে তাদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তারে প্রবল আগ্রহী হলেও নানা কারণে তিনি তাদের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পারেননি। তবে তাঁর প্রচেষ্টায় বাংলার নারী জাগরণ এবং এ জাগরণের অত্যাবশকীয় শর্ত হিসেবে নারীশিক্ষার প্রতি বাঙালি সমাজে এক ধরণের সচেতনতা তৈরি হয়েছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, রাজা রামমোহন রায়ের প্রচেষ্টায় ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ভদ্র হিন্দু ঘরের সন্তানদেরকে ইংরেজি ও ভারতীয় ভাষাসমূহ ছাড়াও ইউরোপ ও এশিয়ার সাহিত্য ও বিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষাদান ছিল এই কলেজ স্থাপনের প্রাথমিক উদ্দেশ্য।[২] বাংলার সমাজ ও সাংস্কৃতিক জীবনে কলেজটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ কলেজের শিক্ষার্থীরা বাংলায় নারীশিক্ষা প্রসারে এগিয়ে আসেন। তাঁরা নারীদের প্রতি প্রথাগত যে সকল নিপীড়ন ও অত্যাচার বাঙালি সমাজে প্রচলিত ছিল তা দূরীকরণেও উদ্যোগ নেন।[৩]

সভ্যতার ক্রমবিকাশ এবং মানবজীবনের যুগান্তকারী পরিবর্তন সূচনায় সংবাদপত্র একটি উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হিসেবে বিবেচিত হয়। সংবাদপত্র হলো একটি লিখিত প্রকাশনা যার মধ্যে চলমান ঘটনাপ্রবাহ স্থান পায়, তেমনি এতে থাকে তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ-নিবন্ধ ও সম্পাদকীয়। এসবের মধ্য দিয়ে সংবাদপত্রে একদিকে যেমন দেশীয় ও বৈশ্বিক জনমত বিধৃত হয়, তেমনি নতুন জনমত গঠনেও ভূমিকা রাখে। সংবাদপত্র যুক্তি ও তথ্যনির্ভর

২. ১৮৫৫ সাল পর্যন্ত কলেজটি কেবল হিন্দু শিক্ষার্থীদের জন্য উন্মুক্ত ছিল। তবে সকল ধর্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষার চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় হিন্দু কলেজকে সরকারি ব্যবস্থাধীন একটি ধর্ম নিরপেক্ষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করার দাবি জোরদার হয়। এরূপ পরিস্থিতিতে ১৮৫৫ সালে হিন্দু কলেজকে প্রেসিডেন্সি কলেজে রূপান্তরিত করে সকল ধর্ম-সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য এর দ্বার উন্মুক্ত করা হয়।

৩. রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, ৩য় খন্ড, (আধুনিক যুগ) জেনারেল প্রিন্টার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৭১ পৃ. ৩১৭

আলোচনা প্রকাশ করে পাঠকের নিজস্ব অভিমত গঠনে ভূমিকা রাখে। আধুনিক যুগে সংবাদপত্রকে বিবেচনা করা হয় সমাজ তথা গোটা বিশ্বের দর্পণ হিসেবে। পৃথিবীর অনেক সামাজিক ও রাজনৈতিক বিপ্লব সংগঠনে সাংবাদপত্র ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছে। সংবাদপত্রের এ ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও ভূমিকার জন্য একে বলা হয় "ফোর্থ স্টেট।"

পৃথিবীর ইতিহাসে সংবাদপত্রের যাত্রা কবে শুরু হয়েছে, তা নিশ্চিত করে বলা মুশকিল। তবে আঠারো শতকের শেষের দিকে মুদ্রণশিল্পের প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ভারতবর্ষে সংবাদপত্রের যাত্রা শুরু হয়। আগাস্টাস হিকি'র সম্পাদনায় ১৭৮০ সালে প্রথম প্রকাশিত হয় ইংরেজি সংবাদপত্র *Bengal Gazette* । পরে *India Gazette* , *Calcutta Gazette* প্রভৃতি ইংরেজি সংবাদপত্রের আত্মপ্রকাশ ঘটে। ১৮১৮ সালে এপ্রিল মাসে জন ক্লার্ক মার্শম্যান (১৭৮৪-১৮৭৭ খ্রি.) এর সম্পাদনায় শ্রীরামপুর মিশন থেকে প্রকাশিত হয় প্রথম বাংলা সাময়িকপত্র *দিগদর্শন*। একই বছরের মে মাসে এ মিশন থেকেই প্রকাশিত হয় বাংলা ভাষার প্রথম সাপ্তাহিক সংবাদপত্র *সমাচার দর্পণ*। ১৮২১ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয় *সম্বাদ কৌমুদী*। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত এ সাপ্তাহিক পত্রিকাটি মূলত সামাজিক ও হিন্দুধর্মীয় রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে উদার মনোভাব প্রচার ও প্রসারে লেখনী প্রকাশ করে। ১৮২২ সালের মাঝামাঝি সময়ে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক সংবাদপত্র *সমাচার চন্দ্রিকা*। এটিরও সম্পাদক ছিলেন ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৮৩১ সালে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় *সংবাদ প্রভাকর* পত্রিকা। ১৮৩৯ সালের ১৪ জুন *সংবাদ প্রভাকর* দৈনিক পত্রিকায় রূপান্তরিত হয়। এটি ছিল বাংলায় প্রকাশিত সর্বপ্রথম দৈনিক পত্রিকা। পত্রিকাটি বিশ শতকের প্রথমভাগে বেশ কয়েক বছর পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছিল। এ সব সংবাদ ও সাময়িক পত্র ছাড়াও বাংলা থেকে প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য সংবাদপত্র ছিল *পার্থেনন*, *জ্ঞাণান্বেষণ*, *এনকোয়ার*, *সমাচার চন্দ্রিকা*, *সম্বাদ ভাস্কর*, *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা*, *সর্ব্বশুভকরী পত্রিকা*, *বামাবোধিনী পত্রিকা*, *বিদ্যাদর্শন*, *নব্যভারত*, *মাসিক পত্রিকা*, *বঙ্গমহিলা*, *বঙ্গদর্শন*, *Hindu Intelligence* ইত্যাদি। এ সময় পূর্ব বাংলা থেকেও কিছু সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়েছিল এর মধ্যে অন্যতম ছিল *অবলাবান্ধব* পত্রিকা। এটি ছিল মুখ্যত নারী বিষয়ক পত্রিকা। এ ছাড়াও ১৮৬১ সালে প্রকাশিত হয় *ঢাকা প্রকাশ* পত্রিকা। সাপ্তাহিক এ পত্রিকাটিকে ঢাকা শহর থেকে প্রকাশিত প্রথম সংবাদপত্র হিসেবে গণ্য করা হয়। *ঢাকা প্রকাশ* পত্রিকার প্রথম সম্পাদক ছিলেন স্বনামধন্য কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার (১৮৩৪-১৯০৭ খ্রি.)। ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত এটি প্রকাশিত হয়েছিল। এসব সংবাদপত্র প্রকাশের মধ্যে দিয়ে বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসের এক নতুন অধ্যায় যুক্ত হয়।

নারীশিক্ষা প্রসারে মিশনারীদের প্রয়াস কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় সফল না হলেও এর এবং একইসাথে পাশ্চাত্য ভাবধারার প্রভাবজনিত কারণে উনিশ শতকের ত্রিশের দশকে এদেশীয় কতিপয় হিন্দু ভদ্রলোক[৪] নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা আন্তরিকভাবেই অনুভব করেছিলেন। তাই তাঁদের কেউ কেউ নারীশিক্ষার প্রসারে জনমত সৃষ্টি তথা একটি বৌদ্ধিক পটভূমি নির্মাণে সচেষ্ট হন। আগেই বলা হয়েছে যে, সংবাদপত্র হচ্ছে জনমত সৃষ্টির একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। উনিশ শতকে নারীশিক্ষার পক্ষে-বিপক্ষে বাঙালি বিদ্বৎসমাজে নানা তর্ক-বিতর্ক চলে। নারীশিক্ষার পক্ষ ও বিপক্ষ উভয় শিবিরই তাদের নিজ নিজ মতের পক্ষে জনমত সৃষ্টির লক্ষ্যে সংবাদপত্রকে ব্যবহার করেন। ফলে দেখা যায় যে গোটা উনিশ শতক জুড়েই সমকালীন সংবাদ ও সাময়িকপত্রে নারীশিক্ষার পক্ষে–বিপক্ষে অনেক প্রবন্ধ-নিবন্ধ ও সম্পাদকীয় প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে।

বাংলায় নারীশিক্ষা প্রসারে উদ্যোগী এদেশীয় ভদ্রলোকদের মধ্যে যাঁর নামটি সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য, তিনি হলেন রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩ খ্রি.)। তিনি ছিলেন একজন মহান ধর্মীয় ও সমাজ সংস্কারক এবং ধর্মীয়-সামাজিক পুনর্গঠন আন্দোলন ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি একজন নারী হিতৈষী সমাজপতি হিসেবেও সুপরিচত ছিলেন। রাজনারায়ণ বসুর ভাষ্য মতে, "রামমোহন রায় স্ত্রী জাতীর যেরূপ উকিল ছিলেন, এমন বোধ হয় সুবিখ্যাত মিল সাহেবও ছিলেন না।"[৫] বাঙালি সমাজে প্রচলিত অমানবিক সতীদাহ প্রথা নিবারণ, বহু বিবাহ প্রথা নিরোধ, বিধবা বিবাহ প্রথার প্রচলন, পণ প্রথা বন্ধ করা এবং হিন্দু নারীদের উত্তরাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে তিনি নেতৃত্ব দেন। এ কাজগুলো করতে গিয়ে তিনি উপলব্ধি করেন যে, বাঙালি নারীদের হীন ও সামাজিক দুরবস্থা থেকে মুক্ত করতে হলে অবশ্যই তাদের শিক্ষার আলো দ্বারা আলোকিত করতে হবে। তবে বাঙালি সমাজে তখন নারীশিক্ষার প্রতি যে বিরূপ মনোভাব ছিল, তা দূরীভূত করে নারীশিক্ষার প্রতি সচেতনতা বৃদ্ধি ও জনমত তৈরি করা প্রথম কাজ বলে তিনি মনে করেন। এ জন্যই প্রথমে তিনি নারীশিক্ষার পক্ষে জনমত সংগঠনে আত্মনিয়োগ করেন।

এ সময় পুরুষ প্রধান বাঙালি সমাজে নারীদের প্রকৃতি প্রদত্ত উৎকৃষ্ট ও প্রশংসনীয় গুণাবলি অস্বীকার করার একটি সাধারণ প্রবণতা ছিল। এমনকি নারীদের সবসময় অল্পবুদ্ধি হিসেবে প্রতিপন্ন করা হতো। আর এ অল্পবুদ্ধি হওয়ার কারণে তারা বিদ্যাশিক্ষা লাভে অনুপোযুক্ত বলে নারীশিক্ষা বিরোধীরা প্রচার করতেন। রাজা রামমোহন রায় বাঙালি সমাজের এরূপ সংকীর্ণ মনোভাবের তীব্র সমালোচক ছিলেন। তাঁর ভাষায়–

৪. ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের অভিঘাতে সামাজিক বিবর্তন ধারায় নবোত্থিত ইংরেজি শিক্ষিত শ্রেণি "ভদ্রলোক" নামে পরিচিত। উনিশ শতকের গোড়ার দিকে একটি সামাজিক শ্রেণি হিসেবে ভদ্রলোকদের বিকাশ লাভ শুরু হয় এবং এ শতকের মধ্যভাগে এসে ভদ্রলোক একটি সুসংহত সামাজিক শ্রেণিতে পরিণত হয়। ইংরেজি শিক্ষা, শহরে আবাস এবং সরকারি চাকুরি ইত্যাদি ভদ্রলোকের বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়ায়।

৫. শ্রী প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, *বাংলার নারী-জাগরণ*, পুনমুদ্রণ, সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ, কলকাতা, ১৯৯৭, পৃ. ২৩

স্ত্রী লোকের বুদ্ধির পরীক্ষা কোন কালে লইয়াছেন যে অনায়েসেই তাঁহাদিগকে অল্পবুদ্ধি কহেন? কারণ বিদ্যাশিক্ষা ও জ্ঞানশিক্ষা দিলে পরে ব্যক্তি যদি অনুভব ও গ্রহণ করিতে না পারে, তখন তাহাকে অল্পবুদ্ধি কহা সম্ভব হয়, আপনারা বিদ্যাশিক্ষা, জ্ঞানোপদেশ স্ত্রী লোককে প্রায় দেন নাই, তবে তাহারা বুদ্ধিহীন হয় ইহা কিরূপে নিশ্চিত করেন? বরঞ্চ লীলাবতী, ভানুমতী, কর্ণাটরাজ পত্নী, কালিদাসের পত্নী প্রভৃতি যাহাদিগকে বিদ্যাভ্যাস করাইয়াছিলেন, তাহারা সর্বশাস্ত্র পরায়ণারূপে বিখ্যাত আছেন। বিশেষতঃ বৃহদারণ্যক উপনিষদে ব্যক্তই প্রমাণ আছে যে, অতন্ত দূরুহ ব্রহ্মজ্ঞান তাহা যজ্ঞবল্ক আপন স্ত্রী মৈত্রেয়ীকে উপদেশ করিয়াছেন, মৈত্রেয়ীও তাহা গ্রহণপূর্ব্বক কৃতার্থ হয়েন।[৬]

নারীশিক্ষার সমর্থনে এদেশীয় সমাজ নায়কদের মধ্যে রাজা রামমোহনের পূর্বে আর কেউ এমনভাবে প্রাকাশ্য অবস্থান নিয়ে কথা বলেননি। সহমরণ বিষয়ক প্রবর্ত্তক নিবর্ত্তক সম্বাদসহ রামমোহন রায় যে সব পুস্তক-পুস্তিকা রচনা করেছিলেন, এসবের মধ্যে তিনি প্রাসঙ্গিকভাবে নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথাও বলেছিলেন।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ১৮২১ সালে *সম্বাদ কৌমুদী* নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। কলুটোলার দেওয়ান তারাচাঁদ দত্ত ও এবং সে সময়কার সুপরিচিত লেখক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (*নববাবু বিলাস*সহ বেশ কয়েকটি গ্রন্থের লেখক) যৌথভাবে এ পত্রিকাটি প্রকাশ করেন। রাজা রামমোহন রায় প্রকাশ্যে না হলেও পত্রিকাটি পরিচালনায় বিশেষ ভূমিকা রেখেছিলেন বলে জানা যায়। তিনি এ পত্রিকার একজন লেখক ছিলেন এবং সতীদাহ নিবারণ বিষয়সহ নারী সম্পর্কিত বেশ কয়েকটি নিবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন। পত্রিকাটিতে বিজ্ঞান, ইতিহাস, রাজনীতি, সমাজনীতি, সংবাদ ইত্যাদি বিবিধ বিষয় নিয়ে লেখা প্রকাশিত হতো। এতে স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তাও সম্পর্কেও একাধিক নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল।[৭]

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত পত্রিকার নাম ছিল *সংবাদ প্রভাকর*। ঈশ্বর গুপ্ত প্রথম জীবনে একজন রক্ষণশীল মানুষ এবং নারীশিক্ষা ও নারী প্রগতি বিরোধী ছিলেন। ফলে তাঁর সম্পাদিত *সংবাদ প্রভাকর* পত্রিকায় শুরুর দিকে নারীশিক্ষার বিরোধিতা করা হয়। ঈশ্বর গুপ্ত নিজে নারীশিক্ষার সমর্থকদের 'নিলর্জ্জ বাবু' বলে ব্যঙ্গ করেছিলেন। যারা নিজেদের কন্যা সন্তানকে বিদ্যালয়ে পাঠাবেন তারা তাদের 'বারঙ্গনা' করবেন- এরূপ আরো অনেক কুৎসিত মন্তব্য তিনি করেছিলেন। এরূপ একটি মন্তব্য ছিল নিম্নরূপ:

যদি কোন ২ বাবুরা আপন ২ বিবিরদিগকে গুণবতীকরণের নিমিত্তে গুরুমহাশয়ের নিকট প্রেরণ করেন তথাপি সে সকল বাবুদিগেরও আমরা নিষেধ করি না, বরঞ্চ আমরা এমত স্বীকার করি যে, যে পাঠশালায় ঐ বিবিরা পাঠার্থে গমন করিবেন আমরাও রাত্রিকালে বৈকালে অবাধে প্রতিদিন বারেক দুইবার যাইয়া গুণবতীদিগের গুণের পরীক্ষা লইব।[৮]

---

৬. রামমোহন রায়, *রামমোহন- গ্রন্থাবলী*, শ্রী বজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ও সজনীকান্ত দাস (সম্পা.), বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলকাতা, পৃ. ২০৫, উদ্ধৃতি গোলাম মুরশিদ, *সমাজ সংস্কার আন্দোলন ও বাংলা নাটক*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৮৪, পৃ. ২৬০; শ্রী প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ.পৃ ১৫-১৬

৭. দীপক সেনগুপ্ত, 'পুরানো সাময়িকী ও সংবাদপত্রঃ *সম্বাদ কৌমুদী*', *অবসর*, available at http://www.abasar.net/mag_bangla_samacharkoumudi.htm, retrived, 20.8. 2019

৮. 'স্ত্রী বিদ্যাভ্যাস', *সংবাদ প্রভাকর*, ২৩ জুলাই, ১৮৩১

তবে সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে ঈশ্বরগুপ্তেরও মনোভাব পরিবর্তিত হয় এবং তিনিও নারীশিক্ষার সমর্থক হয়ে ওঠেন। তাঁর পরিবর্তিত মনোভাবে পরিচয় পাওয়া যায় এ মন্তব্যে। তাঁর ভাষায়; "স্ত্রীলোকদের বিদ্যাশিক্ষা হইলে কত উপকার হয় তাহা অনির্বচনীয়, ধর্ম্মের উন্নতি এবং লৌকিককার্য্য উত্তমরূপে নির্ব্বাহ প্রভৃতি অসংখ্য উপকার হয়।"[৯] বেথুন স্কুল প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টাকে অভিনন্দন জানিয়ে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তাঁর একই পত্রিকায় লিখেন; "কামিনীরা পুরুষের অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে, বরং স্থিরতা, ধৈর্য্য প্রভৃতি গুণে শ্রেষ্ঠা হইতে পারে, অতএব তাহারা বিদ্যাশালিনী হইলে সাংসারিক লোকযাত্রা নির্ব্বাহ সূত্রে অতিশয় মঙ্গল হইবেক।"[১০]

ইংরেজ পণ্ডিত হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও (১৮০৯-১৮৩১ খ্রি.) কে বাঙালি নারী মুক্তির একজন দূত হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তিনি ছিলেন হিন্দু কলেজের তরুণ শিক্ষক। যুক্তিবাদী চিন্তাবিদ ডিরোজিও সমাজ সংস্কার বিষয়ে প্রথাগত চিন্তাধারার বিরোধী ছিলেন। তাঁর ভাবাদর্শের অনুসারী একদল বাঙালি তরুণ "ইয়ং বেঙ্গল" নামে পরিচিত। ইয়ং বেঙ্গল বা নব্য বঙ্গ দলের সদস্যদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮১৩-১৮৮৫ খ্রি.), রসিককৃষ্ণ মল্লিক (১৮১০-১৮৫৮ খ্রি.), দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় (১৮১৪-১৮৭৮ খ্রি.), রামগোপাল ঘোষ (১৮১৫-১৮৬৮ খ্রি.), মাধবচন্দ্র মল্লিক, রামতনু লাহিড়ী (১৮১৩-১৮৯৮ খ্রি.), মহেশচন্দ্র ঘোষ, শিবচন্দ্র দেব (১৮১১-১৮৯০ খ্রি.), হরচন্দ্র ঘোষ (১৮০৮-১৮৬৮ খ্রি.), রাধানাথ শিকদার, গোবিন্দচন্দ্র বসাক (১৮১৩-১৮৭০ খ্রি.), অমৃতলাল মিত্র, প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪-১৮৮৩ খ্রি.) প্রমুখ। এঁরা সবাই ছিলেন মুক্তচিন্তা দ্বারা উজ্জীবিত। হিন্দু সমাজের বিদ্যমান সামাজিক ও ধর্মীয় কাঠামো তাঁদেরকে বিদ্রোহী করে তুলেছিল। তাই তাঁরা এসব কুসংস্কারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। বাঙালি নারী সমাজের দুরবস্থার অবসান ঘটানোও তাঁদের কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইয়ং বেঙ্গল বাঙালি নারীর মুক্তির উপায় হিসেবে তাদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা করেছিল।[১১] এ সংগঠনটির মুখপত্র ছিল *পার্থেনন* পত্রিকা। ১৮৩০ সালে ডিরোজিও-এর সম্পাদনায় এটি প্রকাশিত হয়েছিল। এর প্রথম এবং একমাত্র সংখ্যাতে নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কিত একটি নিবন্ধ প্রকাশ করা হয়েছিল। ইয়ং বেঙ্গলদের আরেকটি মুখপত্র ছিল *জ্ঞানান্বেষণ। জ্ঞানান্বেষণ* ছিল একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা। ১৮৩২ সালে দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যয়ের সম্পাদনায় এটি প্রথম প্রকাশিত হয় এবং ১৮৪০ সাল পর্যন্ত চলে। এ পত্রিকাটিতেও নারীশিক্ষা এবং নারী স্বাধীনতা সম্পর্কে রচনা প্রকাশিত হতো। নারীশিক্ষার পক্ষে বাঙালি সমাজকে উদ্বুদ্ধকরণে বিশেষ ভূমিকা পালন

---

৯. 'স্ত্রীবিদ্যা', *সংবাদ প্রভাকর*, কলকাতা, ২৩ জুলাই, ১৮৪৯

১০. *সংবাদ প্রভাকর*, কলকাতা, ২৬ বৈশাখ, ১২৫৬ বঙ্গাব্দ

১১. *জ্ঞানান্বেষণ*, উদ্ধৃতি গোলাম মুরশিদ, *সংকোচের বিহ্বলতা*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৯

করেছিল ইয়ং বেঙ্গলদের আরেকটি পত্রিকা *এনকোয়ারও*।[১২] ইয়ং বেঙ্গল কর্তৃক প্রকাশিত পত্রিকাসমূহের মধ্যে সম্ভবত *বেঙ্গল স্পেকটেটর* ছিল সর্বশেষ। এটি ছিল একটি দ্বি-ভাষিক মাসিকপত্র এবং এর সম্পাদক ছিলেন প্যারীচাঁদ মিত্র। ১৮৪২ সাল থেকে প্রকাশিত এ প্রগতিবাদী মাসিক পত্রিকাটি সমসাময়িক সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাবলির উপর বিভিন্ন লেখা প্রকাশ করে। এমনকি এতে নারীশিক্ষা তথা হিন্দু বিধবাদের পুনর্বিবাহ বিষয়ক আলোচনাও স্থান পায়। ইয়ং বেঙ্গল পরিচালিত *The Academic Association* ও *The Society for the Acquisition of General Knowledge*- এরও অন্যতম কর্মসূচি ছিল নারীশিক্ষার প্রসার।[১৩] ১৮৩৯ সালে শেষোক্ত সংগঠনটির একটি সভায় মহেশচন্দ্র দেব 'A Sketch of the Condition of Hindoo Women, Awakening in Bengal' নামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। এতে তিনি নারীশিক্ষা ও নারী স্বাধীনতা সপক্ষে বলিষ্ঠ মত প্রকাশ করেছিলেন।[১৪]

ইয়ং বেঙ্গল গ্রুপের একজন নেতা ছিলেন রামগোপাল ঘোষ। একজন সফল ব্যবসায়ী, বাগ্মী ও একজন সমাজ সংস্কারক হিসেবে সুপরিচিত রামগোপাল ঘোষকে 'ভারতের ডেমোস্থেনেস' বলা হয়। নারীশিক্ষা বিষয়ে তাঁরও ছিল প্রবল আগ্রহ। নারীশিক্ষার বিষয়ে সচেতনতা ও আগ্রহবৃদ্ধির জন্য তিনি ১৮৪২ সালে এক প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার আহ্বান করেন। প্রতিযোগিতায় প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকারীর জন্য স্বর্ণ ও রৌপ্য পদক প্রদানের ঘোষণা দেয়া হয়। উক্ত প্রতিযোগিতা নারীশিক্ষা বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করে মধুসুদন দত্ত ও ভুদেব মুখোপাধ্যায় যথাক্রমে স্বর্ণ ও রৌপ্যপদক লাভ করেছিলেন।[১৫]

অক্ষয়কুমার (১৮২০-১৮৮৬ খ্রি.) দত্ত ছিলেন একজন শিক্ষাবিদ, সমাজসংস্কারক ও ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম কর্মীপুরুষ। ১৮৪২ সালের জুন মাসে প্রসন্নকুমার ঘোষের সহযোগিতায় অক্ষয়কুমার দত্ত *বিদ্যাদর্শন* নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। বাঙালি মননে বিজ্ঞান-মনস্কতা ও বিজ্ঞান-চেতনার উদ্রেক করা ছিল এ পত্রিকার প্রধান উদ্দেশ্য। তবে এ পত্রিকাটি বাঙালি সমাজে নারীশিক্ষা প্রসারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জন সচেতনতা তৈরিতে অবদান রেখেছিল। সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্ত 'হিন্দু স্ত্রীদিগের বিদ্যাশিক্ষা' নামে একটি নিবন্ধ লেখেন। *বিদ্যাদর্শন* পত্রিকার জুন, ১৮৪২ সংখ্যায় নিবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল।[১৬]

---

১২. *এনকোয়ার* পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৮৩১ সালে পত্রিকাটি প্রথম প্রকাশিত হয়।

১৩. প্রথমোক্ত সংগঠনটি ডিরোজিও-এর জীবদ্দশাতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আর দ্বিতীয় সংগঠনটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৩৮ সালে। তারাচাঁদ চক্রবর্তী ছিলেন এ সোসাইটির সভাপতি এবং প্যারীচাঁদ মিত্র ও রামতনু লাহিড়ী ছিলেন এর সম্পাদক।

১৪. Gautam Chatopadhyay (ed.), *Awakening in Bengal in early I 9th Century*, Progressive Publishers, Calcutta, I 905, p.90

১৫. যোগেশচন্দ্র বাগাল, *বাংলায় স্ত্রী শিক্ষা*, কলিকাতা, ১৩৫৭ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৩০-৩১

১৬. গোলাম মুরশিদ, *সমাজ সংস্কার আন্দোলন ও বাংলা নাটক*, পাদটীকা, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৬১

বিশ্বকবি রীবন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতৃদেব ছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮০১৭-১৯০৫ খ্রি.)। তিনি ছিলেন একজন ধর্মবেত্তা ও সমাজ সংস্কারক। রাজরামমোহন রায়ের মৃত্যুর পর তিনি ব্রাহ্মসমাজের নেতৃত্বভার গ্রহণ করেন। তিনি তত্ত্ববোধিনী সভা নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।[১৭] এর মুখপত্র ছিল *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা*। ১৮৪৩ সালে আগস্ট মাসে অক্ষয়কুমার দত্তের সম্পাদনায় এ পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। এ পত্রিকাটি ব্রাহ্ম ধর্মমত প্রচারের সাথে সাথে নারীশিক্ষাসহ বিভিন্ন সামাজিক সংস্কার সাধনের পক্ষেও জনমত সংগঠনে কাজ করে। সমকালে নারী জাতির দুরবস্থা, তাদের প্রতি পুরুষ সমাজের মনোভাব, অশিক্ষাজনিত কারণে তাদের নানা রকমের দুর্গতি সম্পর্কে অনেক প্রবন্ধ-নিবন্ধ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। এমন একটি প্রবন্ধের অংশবিশেষ প্রাসঙ্গিক কারণে উল্লেখ করা যেতে পারে। এতে উল্লেখ করা হয়েছিল–

> এতদ্দেশীয় মহিলাগণ চিরকাল অশিক্ষিত অবস্থায় থাকিয়া যে কি প্রকারহীনতা প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা একবার চিন্তা করিলে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। চিরজীবন অবরোধে রুদ্ধ থাকিয়া তাহারা সংসারের গতি কিছুই দেখিতে পায় না। শিক্ষা ও ধর্ম্মের উপদেশ কদাপি তাহাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতে পারে না। তাহাদের সকল আয়াস সকল যত্ন কেবল সামান্য গৃহ কর্ম্মেতেই পর্য্যবসিত হয়, সুতারং তাহাদের মনে স্ফুর্তি পায় না, সৎপ্রবৃত্তি সকল পরিচালিত হইতে পারে না, তাহাদের আত্মাও ক্রমে ক্রমে মৃতবৎ হইয়া যায়।[১৮]

পত্রিকাটির একই লেখায় আরও উল্লেখ করা হয়েছিল যে,

> স্ত্রী জাতি যে আমাদের ন্যায় আত্মাবিশিষ্ট আমাদের ন্যায় যে তাহাদেরও জ্ঞান ও ধর্ম্মেতে উন্নত অধিকার আছে, তাহা একবারও আমরা চিন্তা করি না। এক্ষণে আমাদের স্ত্রী জাতির যে প্রকার অবস্থা তাহাতে তাহাদের কোন প্রকারেই উন্নতি হইবার উপায় নাই।---- অনেকেই এতদ্দেশীয় নারীদের দুরবস্থা দেখিতেছেন কিন্তু তাহা মোচন করিবার নিমিত্ত কতজন অগ্রসর হইয়াছেন। কত ব্যক্তি এই বিষয়ে কত উপদেশ দিয়াছেন, কত বক্তৃতা ব্যয় করিয়াছেন, কিন্তু প্রকৃত মঙ্গল কার্য্যে কেহ প্রবৃত্ত হন নাই।[১৯]

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার চৈত্র, ১৮০২ শকাব্দ সংখ্যায় ‘স্ত্রীশিক্ষা’ শিরোনামে একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। এ নিবন্ধেও বাঙালি নারীদের শিক্ষাগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করা হয়। একই পত্রিকায় অক্ষয়কুমার দত্তের রচিত ‘মানবের সহিত বাহ্যবস্তুর সমন্ধ বিচার’ নামক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। এতে বাঙালি নারী সমাজের বিভিন্ন সমস্যা এবং এর প্রতিকারের উপায় বিষয়ক আলোচনা প্রসঙ্গে নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তার

---

১৭. দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর ধর্মচিন্তা ও ধর্মতত্ত্ব আলোচনার লক্ষ্যে ১৮৩৯ সালে ‘তত্ত্বরঞ্জিনী সভা’ নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তী সময়ে এটিই ‘তত্ত্ববোধিনী সভা’ নামে রূপান্তরিত হয়। এ সংগঠনটির সাথে ঠাকুর পরিবারের সদস্যরা ছাড়াও তৎকালীন বাংলার ইংরেজি শিক্ষিত, প্রগতিবাদী যুব সম্প্রদায়ের একটি বড় অংশ যুক্ত ছিলেন। দ্রষ্টব্য, অরুণা চট্টোপাধ্যায়, ‘নারী-শিক্ষা ও নারী স্বাধীনতা উন্মেষে সভা-সমিতি: ১৮৩৯-১৮৯৬’, *কলকাতা পুরশ্রী*, নবপর্যায় ১৩শ বর্ষ, দ্বিতীয়-চতুর্থ সংখ্যা, এপ্রিল ২০১৩, পৃ. ১২

১৮. *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা*, পঞ্চমকল্প চতুর্থভাগ ২২৯ সংখ্যা, ভাদ্র ১৭৮৪ শক, পৃ.৪৯

১৯. *ঐ*, পৃ. ৫০

প্রসঙ্গটিও গুরুত্বের সাথে স্থান পেয়েছিল।[২০] এরূপ আরো অনেক প্রবন্ধ-নিবন্ধের মাধ্যমে *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা* বাংলায় নারীশিক্ষা প্রসারে জনসচেতনতা তৈরির চেষ্টা করে।

স্কটল্যান্ডের অধিবাসী ডেভিড হেয়ার (১৭৭৫-১৮৪২ খ্রি.) একজন জনহিতৈষী হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন। ঘড়ি নির্মাতা হিসেবে নিজের ভাগ্য গড়ার উদ্দেশ্যে তিনি ভারতে আসেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে বাংলার সাধারণ মানুষের কল্যাণসাধনে নিজেকে উৎসর্গ করেন। রাজা রামমোহন রায় ও ডিরোজিও এর ঘনিষ্ঠ ডেভিড হেয়ার হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠায় বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। ইয়ং বেঙ্গলের একজন মিত্র হিসেবে হেয়ার তাদের সংগঠন *The Society for the Acquisition of General Knowledge* এর পৃষ্ঠপোষকতা দেন। কলকাতায় মেয়েদের জন্য বেশ কিছু অনানুষ্ঠানিক স্কুল স্থাপন করে হেয়ার নারীশিক্ষার পক্ষে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলেন।[২১] ১৮৪৪ সালের ১ জুন ডেভিড হেয়ারের মৃত্যুদিনে কলকাতায় একটি স্মরণ সভার আয়োজন করা হয়। এ সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক "হেয়ার প্রাইজ ফান্ড"খোলা হয়। রামগোপাল ঘোষ, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র, শিবচন্দ্র দেব ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ ছিলেন এ ফান্ডের পরিচালক। নারীশিক্ষা বিষয়ে উৎসাহ প্রদান ও সচেতনতা তৈরির লক্ষ্যে এতদবিষয়ে রচিত উৎকৃষ্ট রচনাবলীকে এ ফান্ড থেকে পুরস্কৃত করা হতো। ১৮৬৪ সাল পর্যন্ত এ পুরস্কার প্রদান অব্যাহত রাখা হয়েছিল। এ বছর এটি রহিত করা হয় এবং পুরস্কারের পরিবর্তে নারীদের উপযোগী গ্রন্থ রচনার কাজে ফান্ডের সহায়তা প্রদানের নীতি গ্রহণ করা হয়।[২২]

১৮৫০ সালে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১ খ্রি.) হিন্দু কলেজের প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের সহায়তায় 'সর্ব্বশুভকরী সভা' প্রতিষ্ঠা করেন। ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্ম প্রভাবিত অনেকেই এর সাথে যুক্ত ছিলেন। সমাজ সংস্কারমূলক এ সংগঠনটির মুখপত্র ছিল *সর্ব্বশুভকরী পত্রিকা*। মতিলাল চট্টোপাধ্যায় এ পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন। এ পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যায় (আশ্বিন, ১৭৭২ শকাব্দ) মদনমোহন তর্কালঙ্কার (১৮১৭-১৮৫৮ খ্রি.) এর "স্ত্রীশিক্ষা" নামে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ মুদ্রিত হয়েছিল।[২৩] উক্ত প্রবন্ধে তিনি নারীশিক্ষা বিষয়ে তৎকালীন হিন্দু সমাজের বিরোধিতার বিপক্ষে কথা বলেন এবং নারীশিক্ষার পক্ষে যৌক্তিকতা প্রতিপাদন করেন। তিনি লিখেন:

---

২০. *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা*, ১৮৫২; একই শিরোনামে তিনি আরো কয়েকটি প্রবন্ধ রচনা করেন এবং প্রবন্ধসমূহ একত্র করে পরবর্তীতে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা হয়। গ্রন্থের প্রতিটি প্রবন্ধেই নারী সমাজের বিবিধ প্রসঙ্গের সাথে তাদের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার উপরও বিশেষ জোর দেয়া হয়েছিল। আলোচ্য গ্রন্থটি সমকালীন বাঙালি বিদ্যৎসমাজে বিপুলভাবে সামাদৃত হয়োছল।

২১. সিরাজুল ইসলাম, 'হেয়ার, ডেভিড', *বাংলাপিডিয়া*, https://bn.banglapedia.org/index.php/ , ,retrived, 20.5.19

২২. যোগেশচন্দ্র বাগাল, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩২

২৩. মদনমোহন তর্কালঙ্কার ছিলেন একজন প্রখ্যাত কবি ও নারীশিক্ষার একনিষ্ঠ সমর্থক। বেথুন স্কুল প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি তাঁর দু'কন্যাকে সর্বপ্রথম এ স্কুলে ভর্তি করিয়েছিলেন।

> বিশ্বপিতা স্ত্রী ও পুরুষের কেবল আকারগত কিঞ্চিৎ ভেদ সংস্থাপন করিয়াছেন মাত্র। মানসিক শক্তি কিছু ন্যূনাধিকস্থাপন করেন নাই। অতএব বালকেরা যেরূপ শিখিতে পারে বালিকারা সেরূপ কেন না পারিবেক? বরং কেহ কেহ বোধ করেন শৈশবকালে বালক অপেক্ষা বালিকারা স্বভাবতঃ ধীর ও মৃদু হয়, এ নিমিত্ত অধিকও শিক্ষা করিতে পারে।[২৪]

Hindu Patriot ছিল একটি পাক্ষিক পত্রিকা। মধুসূদন রায়ের মালিকানায় এবং ব্যবস্থাপনা সম্পাদক গিরিশচন্দ্র ঘোষের সহযোগিতায় ১৮৫৩ সালের ৬ জানুয়ারি প্রথম প্রকাশিত হয়। প্যাট্রিয়ট পত্রিকায় নানা বিষয় সংবাদ ও নিবন্ধ প্রকাশিত হতো। তবে এ পত্রিকায় গুরুত্ব আরোপিত অন্যান্য প্রধান বিষয়গুলোর মধ্যে নারীশিক্ষা এবং হিন্দু বিধবাদের পুনর্বিবাহ ছিল অন্যতম। নারীশিক্ষা প্রসঙ্গে পত্রিকাটি সকলকে জন ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করার জন্য আহবান জানায়।[২৫] উল্লেখ্য যে, বেথুন স্কুল প্রতিষ্ঠা বাংলায় নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে একটি মাইলফলক অগ্রগতি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এ স্কুলটি প্রতিষ্ঠার ফলে বাঙালি সমাজে নারীশিক্ষার ব্যাপারে বিপুল আগ্রহ তৈরি হয়। অনেকেই তখন নারীশিক্ষার উপযোগিতা উপলব্ধি করতে পারেন। এসময় অরুণোদয়[২৬] নামক পত্রিকায় 'স্ত্রীবিদ্যা' নামক একটি নিবন্ধে নারীশিক্ষা ও বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পক্ষে মত প্রকাশ করা হয়। নিবন্ধে বলা হয়:

> হে নৃশংসগণ যদ্যপি তোমরা মঙ্গল আকাঙ্খায় উৎসুখ হইয়া থাক তবে স্ত্রীজাতির প্রতি প্রতিপক্ষতা পরিত্যাগ করিয়া পুরঃসর প্রতি পল্লিতে বালিকাগণের বিদ্যাশিক্ষার্থ বিদ্যালয় স্থাপনপূর্ব্বক ইংল্যান্ড দেশীয় নারীগণের ন্যায় নিজ ২ কন্যাগণকে তথায় প্রেরণপূর্ব্বক তাহাদিগকে বিদ্যারূপ সুরস রসালয়ের স্বাদ গ্রহণ করিতে অনুমতি কর।[২৭]

বেথুন স্কুল প্রতিষ্ঠা দ্বারা উৎসাহিত হয়ে দেশীয় নারীশিক্ষাবন্ধব মহৎপ্রাণ ব্যক্তি ও সংগঠন বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা শুরু করেন। সরকারের পক্ষ থেকেও নারীশিক্ষা প্রসারে পূর্বাপেক্ষা বেশি তৎপরতা দেখানো হয়। এসময় *শিক্ষাদর্পন* পত্রিকায় 'বালিকা বিদ্যালয়' নামে একটি রচনা প্রকাশিত হয়। এতে নারীশিক্ষার প্রসারে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। এ ব্যাপারে বেসরকারি ও সরকারি উদ্যোগের প্রশংসা করা হয় নিবন্ধটিতে। শুধু তাই নয়, বালিকা বিদ্যালয়গুলোতে যোগ্য শিক্ষক নিয়োগদানের ব্যাপারেও এতে পরামর্শ দেয়া হয়।[২৮] মেয়েদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা এবং এর জন্য বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার উন্নতির নানাবিদ সুপারিশ ও মতামত নিয়ে সমকালীন আরো অনেক পত্রিকায় প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। এর মধ্যে ১৮৭৩ সালের ২ জানুয়ারি *ভারত সংস্কার* পত্রিকায়

---

২৪. *সর্ব্বশুভকরী পত্রিকা*, দ্বিতীয় সংখ্যা, কলকাতা, আষাঢ়, ১৭৭২ শকাব্দ

২৫. অভিজিৎ দত্ত, 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট', *বাংলাপিডিয়া*, *https://bn.banglapedia.org/index.php/* _ , retrived10.6.2019

২৬. *অরুণোদয়* ছিল একটি পাক্ষিক পত্রিকা। ১৮৫৬ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত এ পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন লালবিহারী দে।

২৭. 'স্ত্রীবিদ্যা', *অরুণোদয়*, কলকাতা, ১৫ অক্টোবর, ১৮৫৭

২৮. 'বালিকা বিদ্যালয়', *শিক্ষাদর্পণ*, কলকাতা, আশ্বিন, ১২৭১ বঙ্গাব্দ

প্রকাশিত 'স্ত্রীশিক্ষার প্রতি গবর্ণমেন্ট ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তব্য' এবং *জ্ঞাণাঙ্কুর* প্রত্রিকার আশ্বিন ১২৮২ বঙ্গাব্দ সংখ্যায় প্রকাশি 'স্ত্রীশিক্ষা' শিরোনামের দু'টি প্রবন্ধের নাম উল্লেখযোগ্য।

উমেশচন্দ্র দত্ত ও কয়েকজন তরুণ ব্রাহ্মনেতা একত্র হয়ে ১৮৬৩ সালে 'বামাবোধিনী সভা' নামে যে সংগঠনটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এর মুখপত্র ছিল *বামাবোধিনী* পত্রিকা। শুরু থেকে উমেশচন্দ্র ৪৪ বছর এ মাসিক পত্রিকাটি সম্পাদনা করেন। পরে সুকুমার দত্ত, তারাকুমার কবিরত্ন ও অন্যরা পত্রিকাটির সম্পাদনা চালিয়ে যান। এটি ছিল একটি মাসিক বাংলা পত্রিকা। এ পত্রিকার পরিচালকমন্ডলী মনে করতেন নারী জাতিকে শিক্ষার আলোকে উদ্ভাসিত করতে না পারলে সমাজের উন্নতি ঘটতে পারে না, এই জন্য পত্রিকাটি নারীশিক্ষা প্রসারের উপর বিশেষ জোর দেয়। পত্রিকাটির শীর্ষদেশে "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"– এ শ্লোকটি মুদ্রিত থাকতো। দেবনাগরী অক্ষরে লিখিত শ্লোকটির নীচেই থাকত এর বঙ্গানুবাদ-"কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।"[২৯] নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও নারীশিক্ষার পাঠক্রম কি হওয়া উচিত ইত্যাদি বিষয়ে পত্রিকাটিতে অনেক নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। *বামাবোধিনী* পত্রিকার একটি বিশেষ গুরুত্ব হলো এ পত্রিকায় পুরুষদের পাশাপাশি নারী লেখকগণ প্রবন্ধ নিবন্ধ লিখেছেন। তাঁদের রচিত নিবন্ধগুলো বিষয়বস্তু ছিল বিচিত্র। বিচিত্র এসব বিষয়ের মধ্যে নারীশিক্ষা যে বিশেষগুরুত্ব পেয়েছিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না। পত্রিকাটির আশ্বিন, ১২৭২ বঙ্গাব্দ সংখ্যায় মধুমতী মুখোপাধ্যায় 'এদেশে স্ত্রীশিক্ষা সম্যক প্রচলিত হইলে কি কি উপকার হইতে পারে' শিরোনামের প্রবন্ধে যুক্তিসহকারে নারীশিক্ষার সুফল ও কুফল বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে, সংসারের গৃহকর্ম সুচারুরূপে পরিচালনা এবং সন্তানদের সুশিক্ষা ও উপযুক্ত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য হলেও মেয়েদের লেখাপড়া জানা প্রয়োজন। এমনকি সংসারের প্রয়োজনে শিক্ষিতা নারীগণ অর্থোপার্জন করেও সংসারে সহযোগিতা করতে পারেন। কামিনী দত্ত নামে একজন 'স্ত্রীশিক্ষা' নামক নিবন্ধে বিদ্যার্জন থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণে নারীদের পক্ষে ঈশ্বর প্রদত্ত সুবিধাগুলো পর্যন্ত ভোগ করা সম্ভব হচ্ছে না বলে আক্ষেপ করেছেন।[৩০] লেখাপড়ার সুযোগ বঞ্চিত হয়ে নারীরা যে পশুর জীবন যাপন করছেন এমন কথা বর্ণিত হয়েছে *বামাবোধিনী* পত্রিকায় প্রকাশিত 'এতদেশীয় স্ত্রীগণের বিদ্যাভাব' নামক প্রবন্ধে। নিবন্ধকারের ভাষায়, "আমরা বুঝি কেবল নীচ কর্ম্মের নিমিত্তই এদেশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলাম। নহিলে কেনইবা আমরা বিদ্যারসে বঞ্চিত থাকিব? কেনইবা পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষীর ন্যায় গৃহকারাবদ্ধ থাকিব? হায়! কি পরিতাপের বিষয়।"[৩১] নারীশিক্ষার প্রয়োজনীতা এবং এতে বাঙালি সমাজকে উদ্বুদ্ধ করণের উদ্দেশে বামাবোধিনী পত্রিকায় এরূপ

---

২৯. দীপক সেনগুপ্ত, 'পুরানো সাময়িকী ও সংবাদপত্রঃ বামাবোধিনী পত্রিকা', *অবসর*, কলকাতা, ১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫

৩০. *বামাবোধিনী পত্রিকা*, ভাদ্র, ১২৭৪ বঙ্গাব্দ

৩১. *বামাবোধিনী পত্রিকা*, জ্যৈষ্ঠ, ১২৭৫ বঙ্গাব্দ; রণজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, *উনিশ শতকে নারী মুক্তি আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য*, পুস্তক বিপনি, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃ. ১১৫

আরো অনেক নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। যেমন- নিস্তারিনী দেবী রচিত 'বিদ্যার সমান বন্ধু নাই' (মাঘ, ১২৭৮ বঙ্গাব্দ সংখ্যা) ও ' প্রাচীন ও আধুনিক স্ত্রীশিক্ষার প্রভেদ' (শ্রাবণ, ১২৯১ সংখ্যা), বারদাসুন্দরীর 'স্ত্রীলোকের বিদ্যাশিক্ষার আবশ্যকতা' (আষাঢ়, ১২৮২ বঙ্গাব্দ সংখ্যা), মহালনবিশজা রচিত 'স্ত্রীশিক্ষা' (আশ্বিন, ১২৮৩ বঙ্গাব্দ সংখ্যা), নলিনী সুন্দরী মিত্রের 'স্ত্রীশিক্ষা' (কার্ত্তিক, ১২৯৫ বঙ্গাব্দ), 'বিদ্যাবৃক্ষ' (সম্পাদকীয়, শ্রাবণ, ১২৮৪ বঙ্গাব্দ সংখ্যা), শ্রী কুলবালা দেবী রচিত হিন্দুরমনীর বিদ্যাশিক্ষা ও পরাধীনতা (জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৯ বঙ্গাব্দ সংখ্যা) ও 'স্ত্রীশিক্ষা' (অগ্রহায়ণ, ১২৯৯ বঙ্গাব্দ সংখ্যা) এবং 'স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি' (এপ্রিল, ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দ সংখ্যা) ইত্যাদি।[৩২]

নারী জাতির সার্বিক উন্নতি, বিশেষ করে তাদের মধ্যে শিক্ষা প্রসারের মহানব্রত নিয়ে আরেকটি পাক্ষিক পত্রিকা কাজ করেছিল– পত্রিকাটির নাম *অবলাবান্ধব*। ১৮৬৯ সালের মে মাসে দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় পূর্ব বাংলার ময়মনসিংহ থেকে এটি প্রথম প্রকাশিত হয়। ষষ্ঠবর্ষ থেকে এটি মাসিক পত্রিকায় পরিণত হয়। নারীশিক্ষার প্রসার ঘটানোই ছিল এ পত্রিকার মূললক্ষ্য। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষ্যমতে, "সংসারে স্ত্রীলোকের উপযোগিতা ও স্ত্রীশিক্ষার আলোচনা করাই এতৎ পত্রের উদ্দেশ্য।"[৩৩] পত্রিকাটির উদ্দেশ্য আরো বিশদভাবে বিবৃত হয়েছে *অমৃতবাজার পত্রিকার* একটি নিবন্ধে। এতে বলা হয়েছে:

> স্ত্রীজাতির প্রকৃত মঙ্গল কামনা করেন এমন লোকের সংখ্যা বঙ্গদেশে অতি অল্প আছে। কুলকামিনীদিগকে অবজ্ঞা করা অধিকাংশ লোকেরই প্রকৃতি ....এক্ষণে যে যে বিষয়ে প্রধান লক্ষ্য রাখিয়া অবলাবান্ধব প্রচারিত হইল তাহার উল্লেখ করা আবশ্যক। যাহাতে বঙ্গীয় স্ত্রী সমাজের অবস্থা ক্রমশঃ উন্নত হয়, তাহাদিগের জ্ঞান ও ধর্ম্মের বৃদ্ধি হয় আত্মকর্ত্তব্যব্যাবধারণের ক্ষমতা জন্মে, সামাজিক ও পারিবারিক সুখের বৃদ্ধি হয়.........আত্মার প্রকৃত উন্নতি হয় এবং বিদ্যা বিষয়ে সবিশেষ অনুরাগ জন্মে, তাহার নিয়ত চেষ্টা আলোচনা করিবার জন্যই অবলাবান্ধবের জন্ম হইল। ......অবলাবলীর রচনাবলী প্রকাশ করাও অবলাবান্ধবের এক কর্ত্তব্য পরিগণিত হইবে।[৩৪]

অর্থাভাবের দরুন ১৮৭৪ সালে জুলাই মাসে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। পাঁচ বছর পর ১৮৭৯ সালে এটি মাসিক পত্রিকারূপে প্রকাশিত হলেও বেশিদিন স্থায়ী হয়নি।

ব্রাহ্ম দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী (১৮৫৪-১৯২০ খ্রি.)-এর সম্পাদনায় প্রকাশিত হতো *ভারত সুহৃদ* পত্রিকা। পত্রিকাটির অগ্রহায়ণ ১২৮৩ বঙ্গাব্দ সংখ্যায় কলীপ্রসন্ন ঘোষ "স্ত্রীশিক্ষা" শিরোনামে একটি নিবন্ধে নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করেন। *নব্যভারত* ছিল একটি মাসিক পত্রিকা। ১২৯০ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসে পত্রিকাটির প্রথম খণ্ড ১ম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। এ পত্রিকাটিরও সম্পাদক ছিলেন দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী। নব্যভারত ছিল

---

৩২. দ্রষ্টব্য রণজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১০৯, ১১৩, ১১৪

৩৩. দীপক সেনগুপ্ত, 'পুরানো সাময়িকী ও সংবাদপত্র: অবলাবান্ধব পত্রিকা', *অবসর*, কলকাতা, ১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫

৩৪. উদ্ধৃতি, দীপক সেনগুপ্ত, 'পুরানো সাময়িকী ও সংবাদপত্র: অবলাবান্ধব পত্রিকা', *পূর্বোক্ত*

মুখ্যতঃ একটি প্রবন্ধ নির্ভর পত্রিকা। এতে সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, শিক্ষা, ধর্ম, রাজনীতি, পুরাতত্ত্ব, ভ্রমণ প্রভৃতি বিবিধ বিষয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হতো। এসব প্রবন্ধের অধিকাংশই ছিল চিন্তামূলক ও ভাবসমৃদ্ধ। নারীশিক্ষা বিষয়ে পত্রিকাটিতে প্রকাশিত প্রবন্ধের মধ্যে ছিল স্ত্রীজাতির উচ্চশিক্ষা, আর্য্যাবর্ত্তে বঙ্গমহিলা এবং ঈশানচন্দ্র বসু রচিত স্ত্রী-শিক্ষা বিবরণ ইত্যাদি।[৩৫] এরমধ্যে শেষোক্ত প্রবন্ধটিতে সমকালীন নারীশিক্ষার একটি চালচিত্র পাওয়া যায়।

উনিশ শতকে অবহেলিত নারী সমাজের অবস্থার উন্নতি ও মুক্তির লক্ষ্যে নিয়ে যেসব সংবাদপত্র কাজ করেছিল এর মধ্যে অন্যতম হলো *পরিচারিকা* পত্রিকা। ভারতীয় ব্রাহ্মসমাজের নেতা গিরিশচন্দ্রে ঘোষের উদ্যোগে ১৮৭৮ সালে এ পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। এর প্রথম সম্পাদক ছিলেন প্রতাপচন্দ্র মজুমদার। *পরিচারিকা* ছিল আধুনিকতায় বিশ্বাসী একটি প্রগতিশীল পত্রিকা। এতে নারী বিষয়ক বিভিন্ন প্রসঙ্গের সাথে নারীশিক্ষার বিষয়টিও গুরুত্বের সাথে আলোচিত হতো। এ পত্রিকাটিতে নারীশিক্ষা বিষয়ক যেসব প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো- 'প্রকৃত স্ত্রীশিক্ষা' (মাঘ, ১২৮৭ বঙ্গাব্দ সংখ্যা), 'স্ত্রীলোকদিগের ও পুরুষদিগের শিক্ষা' (ফাল্গুন, ১২৮৭ বঙ্গাব্দ সংখ্যা), 'স্ত্রীশিক্ষা প্রণালী' (বৈশাখ, ১২৮৯ বঙ্গাব্দ সংখ্যা), 'স্ত্রীলোকের শিক্ষা কিরূপ হওয়া উচিত?' (আশ্বিন, ১২৯৫ বঙ্গাব্দ সংখ্যা) এবং 'শিক্ষিতা বঙ্গমহিলা' (ভাদ্র, ১২৯৮ বঙ্গাব্দ সংখ্যা) ইত্যাদি। উনিশ শতকে প্রকাশিত আরো কিছু সাময়িকপত্রের নাম জানা যায়, যেসব সংবাদপত্রে প্রসঙ্গক্রমে নারীশিক্ষার বিষয় স্থান পেয়েছিল। এসব পত্রিকার মধ্যে মোক্ষদায়িনী মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত *বঙ্গমহিলা* (১৮৭০ খ্রি.), গিরিশচন্দ্র সেন সম্পাদিত *মহিলা* (১৮৯৫ খ্রি.), বনলতা দেবী সম্পাদিত সচিত্র মাসিক *অন্তঃপুর* (১৮৯৮ খ্রি.), দুর্গাদাস লাহিড়ী সম্পাদিত পাক্ষিক *অনুসন্ধান*, স্বর্ণকুমারী দেবী সম্পাদিত *ভারতী ও বালক* (১৮৮৬ খ্রি.), *তত্ত্বকৌমুদী* (১৮৭৮ খ্রি.) এবং যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত *আর্য্যদর্শন* (১৮৮১ খ্রি.) পত্রিকা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এ পত্রিকাগুলোতে নারীশিক্ষার সমর্থনে অনেক লেখা প্রকাশিত হয়েছিল।

নারীশিক্ষা প্রসারে নানামুখী তৎপরতা সত্ত্বেও উনিশ শতকের পঞ্চাশের দশকের শেষাবধি এ বিষয়ে কাঙ্ক্ষিতমাত্রার সাফল্য অর্জিত হয়নি। রক্ষণশীল গোঁড়া বাঙালি সমাজের তীব্র বিরোধিতা ও নারীশিক্ষার সমর্থকদের উপর নানা রকম নিপীড়ন নির্যাতনের কারণে নারীশিক্ষার বিশেষ করে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সন্তোষজনক বিস্তার ঘটেনি। এ অবস্থায় নারীদের জন্য যে বিশেষ শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা হয়, তার নাম 'অন্তঃপুর নারীশিক্ষা' (Home Education For Women) বা 'জেনানা শিক্ষা' ব্যবস্থা। এ শিক্ষা ব্যবস্থার মূল কথা ছিল সামাজিক বিঘ্ন বা অন্য কোনো কারণে নারীরা শিক্ষা লাভের জন্য ঘরের দুয়ার পেরুতে না পারলেও তারা নিজ গৃহে থেকে শিক্ষিত স্বামী, ভাই বা উপযুক্ত শিক্ষকের কাছে পাঠ গ্রহণ করবেন। বস্তুত বাড়িতে ব্যক্তিগতভাবে নারীদের এ পাঠগ্রহণ পদ্ধতিকেই অন্তঃপুর বা

৩৫. দীপক সেনগুপ্ত, 'পুরানো সাময়িকী ও সংবাদপত্র:নব্যভারত', *অবসর*, কলকাতা, ১৫ নভেম্বর, ২০১৬

জেনানা শিক্ষা বলা হয়। ব্রাহ্মসমাজ বিশেষ করে বামাবোধিনী সভা অন্তঃপুর শিক্ষা বিস্তারে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল। বামাবোধিনী সভার মুখপত্র *বামাবোধিনী পত্রিকা*তেও অন্তঃপুর শিক্ষার পক্ষে জনমত সৃষ্টির প্রচেষ্টা দেখা যায়। পত্রিকাটি নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে বাড়ির পুরুষদের দায়িত্ব গ্রহণেরও প্রস্তাব দেয়। *বামাবোধিনী পত্রিকা* নারীদের উৎসাহিত করার জন্য ভারতের খ্যাতনামা প্রাচীন বিদুষী মহিলা যেমন গার্গী, মৈত্রেয়ীর মত বিদুষী নারীদের আদর্শ তুলে ধরতেন এবং বলতেন যে, তারা যেমন নিজ নিজ চেষ্টায় জ্ঞানার্জনে ব্রতী ছিলেন, জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তারা যেভাবে পারদর্শিতা প্রদর্শন করেছিলেন সেভাবেই বাঙালি নারীদের শিক্ষা-দীক্ষায় এগিয়ে আসা দরকার। *বামাবোধিনী* পত্রিকার এ প্রয়াস বাঙালি নারীজাতিকে প্রবলভাবে প্রভাবিত করে।

তদানিন্তন বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির যশোর জেলার মাগুরার (বর্তমান বাংলাদেশ) ধনী ব্যবসায়ী হরিনারায়ণ ঘোষের পুত্র শিশির ঘোষ এবং মতিলাল ঘোষ ১৮৬৮ সালে *অমৃতবাজার* নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। এর প্রথম সম্পাদক ছিলেন মতিলাল ঘোষ। এ অমৃতবাজার পত্রিকাটিও নারীশিক্ষার সমর্থক ছিল। এতে 'অন্তঃপুর নারীশিক্ষা' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। এ প্রবন্ধে অন্তঃপুর শিক্ষা প্রসারে বামাবোধিনী সভার কার্যক্রমের প্রশংসা করা হয়। একইসাথে অন্তঃপুর শিক্ষা প্রসারে বামাবোধিনী সভার দৃষ্টান্ত অনুসরণে সকলের প্রতি আহ্বান জানায়।[৩৬] *বঙ্গমহিলা* পত্রিকার ভাদ্র ও আশ্বিন, ১২৮২ সংখ্যায় প্যারীচরণ সরকার 'স্ত্রীশিক্ষা' নামক প্রবন্ধেও অন্তঃপুর শিক্ষার পক্ষে মত দিয়েছেন। এতে বাল্যবিবাহের পরও যেন মেয়েদের শিক্ষা অব্যাহত থাকে সে বিষয়ে উপায় উদ্ভাবন ও যত্নবান হওয়ার জন্য পরামর্শ দেয়া হয়েছিল।

নারীশিক্ষার অগ্রগতির পাশাপাশি উনিশ শতক জুড়েই চলতে থাকে শিক্ষার স্তর ও পাঠক্রম নিয়ে বিতর্ক। উল্লেখ্য, উনিশ শতকের সত্তরের দশকের শেষদিকে বাঙালি নারীদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত হয়। তার আগে বেথুন স্কুলে কলেজ শাখা খোলা হয়। তবে বাঙালি নারীদের উচ্চশিক্ষা গ্রহণ সঙ্গত কী-না এ নিয়ে বিদ্বৎসমাজে বিতর্ক দেখা দেয়। নারীদের বিদ্যালয় শিক্ষার সমর্থন করলেও অনেকেই উচ্চশিক্ষা তথা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার বিরোধিতা করেন। এরূপ মতের প্রতিফলন দেখা যায় কাঙাল হরিনাথ সম্পাদিত *গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা* পত্রিকায় প্রকাশিত 'স্ত্রীজাতির উচ্চশিক্ষা' নামক প্রবন্ধে। এতে মেয়েদের উচ্চশিক্ষার বিরোধিতা করা হয়। এমনকি উচ্চশিক্ষা লাভের পর মেয়েরা পেশাগত জীবনে প্রবেশ করে অর্থ উপার্জন করবে–প্রবন্ধে তারও বিরোধিতা করা হয়। এতে বলা হয় যে, "আমরা স্ত্রীজাতির উচ্চশিক্ষা দ্বারা অর্থ উপার্জ্জনের প্রত্যাশা করি না। তাহারা যাহাতে জ্ঞানধর্ম্মে বিভুষিতা হইয়া নারী জাতির সৌন্দর্য সমাজে বিকীর্ণ করিতে পারেন তাহাই আমাদের একান্ত প্রার্থনীয়।"[৩৭] নারীশিক্ষার সমর্থক হিসেবে *তত্ত্ববোধিনী* পত্রিকার ভূমিকার কথা ইতোমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে সময়ের সাথে এ পত্রিকাটির দৃষ্টিভঙ্গিও কিছুটা পরিবর্তন হয় এবং নারীদের জন্য উচ্চশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা নেই বলে মত প্রকাশ করে। পত্রিকাটির চৈত্র, ১৮০২ শকাব্দ সংখ্যায় 'স্ত্রীশিক্ষা' নামে প্রকাশিত এক নিবন্ধে বলা

---

৩৬. *অমৃতবাজার*, কলকাতা, ২০ ফেব্রুয়ারি, ১৮৬৮
৩৭. *গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা*, কলকাতা, ৯ জুন, ১৯৭৭

হয় যে, "বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রণালী স্ত্রীলোকগণের পক্ষে কোনোক্রমেই উন্নতিকর ও শুভফলপ্রদ নহে।" কেবল পুরুষ নয় নারীদের কারো কারো লেখনিতেও বিশ্ববিদ্যালয় তথা উচ্চশিক্ষার বিরোধিতা দেখা যায়। *বামাবোধিনী* পত্রিকার, কার্তিক ১২৯৫ সংখ্যায় শ্রীমতী নলিনী সুন্দরী মিত্র 'স্ত্রীশিক্ষা' নামে প্রবন্ধে লিখেছেন:

> বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইলে বা অর্থ উপার্জন না করিলে কি স্ত্রীজীবন স্বার্থক হয় না? যাহাতে হিন্দু মহিলা হিন্দু থাকিয়া উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করিতে পারেন এবং সেই বিদ্যার প্রভাবে নিজ নিজ সন্তান পালন এবং গৃহকার্য্য সম্পাদন করিতে পারেন এবং তৎসঙ্গে সামান্য সামান্য মত প্রকাশ করিয়া পৃথিবীর অবস্থা বুঝিতে পারেন সেই চেষ্টা করা হিন্দুর কর্ত্তব্য।

তবে উচ্চশিক্ষার সমর্থনেও বাঙালি মানসের প্রতিফলন কোনো কোনো সংবাদপত্রে দেখা যায়। এক্ষেত্রে *অবলাবান্ধন* পত্রিকার দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যায়। এ পত্রিকাটির সম্পাদক দ্বারকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নারীদের জন্য উচ্চশিক্ষার একজন অকুণ্ঠ সমর্থক ছিলেন। তাঁর এ চিন্তারই সমর্থন রয়েছে *অবলাবান্ধব* পত্রিকার কার্তিক, ১২৮৫ বঙ্গাব্দ সংখ্যায় প্রকাশিত 'স্ত্রীজাতির উচ্চশিক্ষা' এবং ফাল্গুন ১২৮৫ বঙ্গাব্দ সংখ্যায় প্রকাশিত 'কয়েকটি কথা' শিরোনামের প্রবন্ধে। এ দু'টি প্রবন্ধে নারীশিক্ষার পাশাপাশি তাদের জন্য উচ্চশিক্ষার প্রয়োজনীয়তাকে সমর্থন করা হয়েছে।[৩৮]

নারীশিক্ষা সম্পর্কিত অন্য একটি বিতর্ক ছিল এর পাঠ্যসূচি কী হবে, সে সংক্রান্ত বিষয়ে। এ নিয়েও গোটা শতক জুড়েরই নারীশিক্ষার সমর্থকদের মধ্যে বিতর্ক চলেছে এবং সমকালীন সংবাদপত্রের পাতায় এ বিতর্ক স্থান পেয়েছে। নারীশিক্ষার সমর্থকদের মধ্যে অনেক খ্যাতিমান মানুষও নারীদের জন্য আধুনিক বিশেষ করে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেননি। কারণ তাঁদের ধারণা ছিল মেয়েরা আধুনিক শিক্ষা গ্রহণ করলে তাদের মধ্যে ধর্মের ব্যাপারে উদাসীনতা দেখা দিবে, গৃহকর্মে তাদের মন থাকবে না, তাঁরা মেমসাহিবী আচরণ করবে। যেহেতু মেয়েরা সারা জীবন গৃহকর্ম করবে তাই সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞান শিক্ষা অপেক্ষা তাদের গৃহকর্ম, ধর্ম ও সুনীতি শিক্ষা দেয়া অধিকতর প্রয়োজন। এ মনোভাবেরই প্রতিফলন দেখা যায় কুন্দমালা রচিত ও *বামাবোধিনী* পত্রিকায় প্রকাশিত 'বিদ্যা শিখিলে কি গৃহকর্ম্ম করিতে নাই' প্রবন্ধে। পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কারের কন্যা কুন্দমালা নিজে বেথুন স্কুলের ছাত্রী ছিলেন। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েও তিনি মেয়েদের লেখাপড়া শিখার পাশাপাশি গৃহকর্মেও মনোযোগী হতে উপদেশ দিয়েছেন আলোচ্য প্রবন্ধে। তাঁর ভাষায়, "আমি নিরন্তর তোমাদিগকে গৃহকর্ম্ম করিতে বলি না। তোমরা বাল্যকালে উত্তমরূপে বিদ্যাশিক্ষা ও শিল্পনৈপুন্য লাভ করিয়া, যৌবনে গৃহকর্ম্মে পারদর্শিনী হইয়া সুগৃহিনী পদবাচ্য হও, এ আমার অভিপ্রায়।"[৩৯] গার্হস্থ্য ধর্মপালন নারীর সবচেয়ে বড় দায়িত্ব। অতএব শিক্ষা লাভ যেন তাদের বিপথগামী না করে এটিই এ

---

৩৮. রণজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১১১

৩৯. উদ্ধৃতি রণজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১১৫

প্রবন্ধের মূলসুর। একইরকম কথা বলা হয়েছে *বান্ধব* পত্রিকায় প্রকাশিত শ্যামাসুন্দরী দেবীর 'প্রাচীন ও আধুনিক স্ত্রীশিক্ষার প্রভেদ' নামক নিবন্ধে। নারীশিক্ষা সম্পর্কে তিনি বলেছেন:

> আমার মতে কেবল বিদ্যাশিক্ষাকেই স্ত্রীশিক্ষা বলা যাইতে পারে না। বিদ্যা শিল্প, গৃহকার্য্য, সন্তানপালন, পিতামাতা, শ্বশুর স্বামী ইত্যাদির সেবা, অতিথিসৎকার-ইত্যাদি স্ত্রীলোকের সমস্ত শিক্ষণীয় বিষয়কেই স্ত্রীশিক্ষা বলা যাইতে পারে।[৪০]

আধুনিক নারীশিক্ষাকে তিনি বাঙালি সমাজের উপযোগী নয় বলে মনে করতেন। কারণ এ শিক্ষায় শিক্ষিত মেয়েদের জীবনাচার বাঙালির জীবনাচারের ঐতিহ্যের সাথে সামঞ্জস্যহীন হয়ে পড়ছে। তাই বাঙালি নারীদের সতর্ক করে তিনি বলেছেন:

> বাচা সকল, সীতা হও, সাবিত্রী হও, খনা হও, লীলাবতী হও, কিন্তু-বিবি সাজিও না। মিস কার্পেন্টারাদি মহামান্য ইংরেজ রমণীগণের ন্যায় চরিত্রশালী হও। সপুষ্ট হইব, কিন্তু কেবল বিবিদিগের বিলাসিতায় অনুকরণ শিখিলে প্রশংসা হইবে না।[৪১]

অন্তঃপুর পত্রিকায় শ্রীমতী কুলবালা দেবী রচিত 'স্ত্রীশিক্ষা' নামক একটি নিবন্ধেও নারীদের পাঠ্যক্রমে গার্হস্থ্যশিক্ষার উপর জোর দেয়া হয়েছে। নিবন্ধাকারের ভাষ্যমতে:

> নারীজাতির প্রকৃতিগত বিভিন্নতা ও কার্যক্ষেত্রের বিভিন্নতা অনুসারে শিক্ষাপ্রণালীও ভিন্ন থাকা উচিত। কারণ গার্হস্থ্যধর্ম পালনই নারী জাতির প্রধান কার্য্য। পুরুষোচিত শিক্ষায় রমণী যতই উন্নত হউক না কেন গার্হস্থ্যধর্মে অভিজ্ঞতা না থাকিলে সে শিক্ষা অপূর্ণ। সে শিক্ষায় রমণী কখনই সর্বাত্মক উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হইবে না।[৪২]

নারীশিক্ষার পাঠ্যক্রম সম্পর্কে পূর্বোক্ত মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় *মহিলা* পত্রিকার মাঘ, ১৩০৪ বঙ্গাব্দ সংখ্যায় প্রকাশিত 'নারীজাতির শিক্ষা কিরূপ হওয়া উচিৎ', *পরিচারিকা পত্রিকার* মাঘ, ১২৮৭ সংখ্যায় প্রকাশিত 'প্রকৃত স্ত্রীশিক্ষা', একই পত্রিকার ফাল্গুন, ১২৮৭ সংখ্যায় প্রকাশিত 'স্ত্রীলোক ও পুরুষদিগের শিক্ষাপ্রণালী একরূপ হওয়া উচিত কিনা?' এবং বৈশাখ, ১২৮৯ সংখ্যায় প্রকাশিত 'স্ত্রীশিক্ষা প্রণালী' প্রবন্ধে।[৪৩] বাংলা নারীশিক্ষা বিস্তারে ব্রাহ্মনেতা কেশবচন্দ্রের ভূমিকা প্রবাদতুল্য। কিন্তু তাঁর মতো ব্যক্তিও উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে পুরুষ ও নারীদের সমকক্ষতা স্বীকার করেননি। এমনকি তিনি নারীদের জন্য পুরোপুরি বিজ্ঞাননির্ভর আধুনিক শিক্ষাপ্রণালীও সমর্থন করেননি। এর প্রমাণ রয়েছে তাঁর প্রতিষ্ঠিত ভারত সংস্কার সভার কৃত নারীশিক্ষার পাঠ্যসূচিতে। বামা হিতৈষিণী সভার প্রথম সাম্বাৎসরিক সভায় সভাপতির ভাষণে তিনি বলেছিলেন যে, "স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে দেখা উচিৎ যে, প্রকৃতিসঙ্গত শিক্ষা হইতেছে কিনা? গৃহকর্ম সম্পাদন, পিতামাতার সেবা

৪০. *বান্ধব*, কলকাতা, ৫ম সংখ্যা , ১২৯১ বঙ্গাব্দ
৪১. *বান্ধব*, কলকাতা, ৫ম সংখ্যা, ১২৯১ বঙ্গাব্দ
৪২. কুলবালা দেবী, 'স্ত্রীশিক্ষা', *অন্তঃপুর*, কলকাতা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৫ বঙ্গাব্দ
৪৩. সারদা ঘোষ, *নারী চেতনা ও সংগঠন: ঔপনিবেশিক বাংলা ১৮২৯-১৯২৫*, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১৩, পৃ. ১০১-১০২

সন্তানপালন, পুরুষগণসহ সমুচিত ব্যবহার এসকল বিশেষরূপে শিক্ষা করা উচিত।"[৪৪] কেউ কেউ আবার নারীদের প্রচলিত শিক্ষাগ্রহণের পাশাপাশি যেন ধর্ম শিক্ষাও গ্রহণ করে সে বিষয়ে পরামর্শ দিয়েছেন। কারণ তাঁদের মতে, "ধর্ম্মহীন বিদ্যার সারত্ব নাই। যে বিদ্যা অসার বৃক্ষের ন্যায় সংসারের কুটিল কালচক্রের আঘাতে চূর্ণ হতে পারে।"[৪৫] একই মনোভাব দেখা যায় *গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা* পত্রিকার 'স্ত্রীজাতির উচ্চশিক্ষা' প্রবন্ধে। এতে বলা হয় যে, "যে কোন প্রকারের শিক্ষাই হউক, ধর্ম্মনীতি ও তৎসমুদায় শিক্ষার ভিত্তিমূল না করিলে আমরা কল্যাণ ও উন্নতির আশা করিতে পারি না বরং অবনতির আশঙ্কাই করিয়া থাকি।"[৪৬]

উনিশ শতকের বাঙালি সমাজ বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, পুরোহিত সমাজ যেমন ধর্মের মূলতত্ত্বকে আড়াল করে নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে নানা আচার অনুষ্ঠান ও কুসংস্কার চাপিয়ে দিয়ে সরল বিশ্বাসী সাধারণ মানুষকে যুগের পর যুগ ধরে বিভ্রান্ত করেছে; সমাজের নীতি নির্ধারকরাও তেমনি সমাজ অধঃপতনে যাবার দোহাই দিয়ে নারীশিক্ষা ও স্বাধীনতার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছে নিজেদের ভোগ বিলাসের রাস্তা প্রশস্ত করতে। এরূপ একটি পরিস্থিতিতে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ও পাশ্চাত্য ভাবধারায় উজ্জীবিত একদল যুক্তিবাদী মন ও উদার হৃদয়ের বাঙালি সমাজপতি নারী মুক্তির লক্ষ্যে তাদের শিক্ষার অনুকূলে অবস্থান গ্রহণ করেন। এ মহতী উদ্দেশ্যটি বাস্তবায়নের জন্য তাঁরা ব্যক্তিগতভাবে কখনো কখনো সাংগঠনিকভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করেন। বাঙালি জনমানসে নারীশিক্ষার অনুকূল পরিবেশ তৈরির লক্ষ্যে তাঁরা বক্তৃতা-বিবৃতির পাশাপাশি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা প্রকাশ এবং এতে লেখনীর মাধ্যমে বাঙালি সমাজে সচেতনতা সৃষ্টি ও জনমত গড়ে তোলেন। তবে নারীশিক্ষার বিপক্ষেও তখন কিছু সংবাত্রপত্রে লেখালেখি হয়েছিলো। আর এ কাজটি করেছিলেন সনাতন ধর্মের অনুসারী কয়েকজন রক্ষণশীল পত্রিকা সম্পাদক ও তাঁদের অনুসারীবৃন্দ। এদের মধ্যে *Hindu intelligencer* পত্রিকার সম্পাদক কাশীপ্রসাদ ঘোষ ছিলেন নেতৃস্থানীয়। তিনি মনে করতেন বালিকারা বিদ্যালয়ে গেলে সমাজে অনিষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে। তিনি তাঁর পত্রিকায় নারীশিক্ষার বিপক্ষে অনেক প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তাঁর মতো আরও অনেকেই নারীশিক্ষার বিপক্ষে মতামত দেন। এ বিপক্ষ মতামতের প্রতিনিধিত্ব করতো *সমাচার চন্দ্রিকা* ও *Literary Chronicle* ইত্যাদি পত্রিকা।[৪৭] তবে কাশীপ্রসাদ ঘোষসহ নারীশিক্ষা বিরোধীদের মতের জবাব সে সময় অনেকেই পত্রিকা মারফতই দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে *সম্বাদ ভাস্বর* পত্রিকার

---

৪৪. যোগেশচন্দ্র বাগাল, 'কেশবচন্দ্র সেন', *সাহিত্যসাধক চরিতমালা ৯ম খণ্ড*, কলকাতা, ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ, উদ্ধৃতি রণজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১০৭

৪৫. অনুজানন্দিনী রায়, 'মহিলাগণের বিদ্যাভাসের সহিত ধর্ম্ম শিক্ষার আবশ্যকতা', *বামাবোধিনী পত্রিকা*, কলকাতা, কার্ত্তিক, ১২৯০ বঙ্গাব্দ

৪৬. *গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা*, ৯ জুন ১৯৭৭

৪৭. গোলাম মুরশিদ, *সমাজ সংস্কার আন্দোলন ও বাংলা নাটক*, পৃ. ২৬৬

১৮৪৯ সালের মে সংখ্যায় গৌরীশঙ্করের প্রদত্ত একটি লেখার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা যায়। গৌরীশঙ্কর লিখেছিলেন:

> হিন্দু ইন্টেলিজেন্সার সম্পাদক মহোদয়কে জিজ্ঞাসা করি তিনি ইংরেজি ভাষায় সুশিক্ষিত হইয়াছেন তবে কি অভিপ্রায়ে হিন্দু স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাশিক্ষার বিপক্ষতা করেন, হিন্দু স্ত্রীলোকেরা কী তাঁহাকে কোনো বিষয়ে মনঃপীড়া দিয়েছেন---
> হে সম্পাদক মহাশয়, হিন্দু বালিকারা বিদ্যালয়ে যাইয়া বিদ্যাভ্যাস করিলে কি কি অনিষ্ট সম্ভাবনা আপনি একাধিক্রমে তাহা প্রকাশ করুন, আমরা মহাশয়ের প্রতি কথার উত্তর দিব, যদি উত্তর প্রদানে অশক্ত হই তবে আপনি জয়ী হইবেন---।[৪৮]

নারীশিক্ষা বিরোধী পূর্বোক্ত পত্রিকাসমূহের নারীশিক্ষার বিরোধিতা করে যে সব বক্তব্য প্রচার করা হতো তন্মধ্যে অন্যতম ছিল মেয়েরা বিদ্যাশিক্ষা করলে বিধবা হয়ে যায়। নারীশিক্ষা বিরোধীদের এ বক্তব্য ছিল একেবারেই ভিত্তিহীন ও ভ্রান্ত। তাঁদের এ ধারণার প্রতি কটাক্ষ করে দ্বারকানাথ রায় *সুলভ* পত্রিকায় স্যাটায়ার করে লিখেছিলেন:

> এ প্রশ্নে আমরা হাস্য সম্বরণ করিতে পারি না। কারণ বিদ্যায় কি মারাত্মক শক্তি আছে? বিদ্যা কি নরভোজী ব্যাঘ্র? যদিও বিদ্যার মারাত্মক শক্তি থাকে তবে যে ব্যক্তি বিদ্যাবান হয়, বিদ্যা তাহাকেই সংহার করিতে পারে। কিন্তু পত্নী পণ্ডিত হইলে যে পতির প্রাণবিয়োগ হয় এ কথা অতি চমৎকার।[৪৯]

সনাতন ধর্মের পুরোহিত ও রক্ষণশীল বুদ্ধিজীবীদের নারীশিক্ষার বিপক্ষে অবস্থান ও প্রচারণা নারীদের শিক্ষার আলো থেকে অন্ধকারে রাখতে পারেনি। রক্ষণশীলদের বিপরীত ধারায় আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ও পাশ্চাত্য ভাবধারায় উজ্জীবিত যুক্তিবাদী বাঙালিদের প্রচেষ্টা এবং সংবাদ ও সাময়িক পত্রের মাধ্যমে জনমত সৃষ্টির তাঁদের যে প্রয়াস তা সফল হয়।

৩.২: উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে নারীশিক্ষা প্রসঙ্গ

সাহিত্য হলো সমাজেরই প্রতিবিম্ব। উনিশ শতকে নারীশিক্ষাকে কেন্দ্র করে বাঙালি সমাজ মানসে যে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল, সমাজ মানসিকতায় যে টানাপোড়েন তৈরি হয়েছিল, এর প্রতিফলন দেখা যায় সমকালীন বাংলা সাহিত্যে। নারীশিক্ষার প্রতি জনমত সৃষ্টির লক্ষ্যে উনিশ শতকে কেবল সংবাদ ও সাময়িকপত্রেই লেখালেখি হয়নি, নারীশিক্ষার প্রতি বাঙালি সমাজকে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করার লক্ষ্যে বাংলা ভাষায় বেশ কিছু গ্রন্থও রচিত হয়েছিল। বিপরীত ধারায় নারীশিক্ষা বিরোধীগণও তাদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির হাতিয়ার হিসেবে কিছু সাহিত্যকর্ম রচনা করেছিলেন। এ পর্যায়ে উনিশ শতকে নারী সাহিত্যের পক্ষ বিপক্ষ মতের প্রতিফলন ঘটেছে এমন কিছু সাহিত্যকর্মের উপর আলোকপাত করা হবে।

---

৪৮. উদ্ধৃতি সুনীতা বন্দ্যোপাধ্যায়, *আধুনিকতার অভিমুখে বঙ্গনারী*, অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, কলকাতা, ২০০৫, পৃ. ১৩৪

৪৯. হাসনাত আসিফ কুশাল, 'স্ত্রীশিক্ষায় অগ্রণী যাঁরা', https://okkhorblog.com/, retrived, 14 August, 2019

নারীশিক্ষার সমর্থনে বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম সাহিত্য কীর্তিটির রচয়িতা ছিলেন পণ্ডিত গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার। পণ্ডিত গৌরমোহন ছিলেন নদীয়ার বজরাপুরের অধিবাসী এবং খ্যাতনামা পণ্ডিত জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের ভ্রাতুষ্পুত্র। তিনি কলকাতা বুক সোসাইটি ও কলকাতা স্কুল সোসাইটির সাথে যুক্ত ছিলেন। শেষোক্ত প্রতিষ্ঠানটিতে তিনি হেডপণ্ডিত হিসেবে কাজ করতেন। বাংলায় নারীশিক্ষা প্রসারের প্রথম উৎসাহী ব্যক্তিদের মধ্যে পণ্ডিত গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার অন্যতম ছিলেন। নারীশিক্ষার সপক্ষে সংস্কৃত সাহিত্য ও শাস্ত্রগ্রন্থ থেকে বহু দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে তিনি *স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক* নামে একটি পুস্তিকা রচনা করেন। কলকাতা ফিমেল জুভেনাইল সোসাইট কর্তৃক ১৮২২ সালে এ পুস্তিকাটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়।[৫০] লেখককে এ পুস্তিকাটি রচনার উপাদান সংগ্রহ ও প্রকাশনার কাজে সর্বোতভাবে সহায়তা করেছিলেন বিখ্যাত পণ্ডিত ও কলকাতার হিন্দু সমাজের বিশিষ্ট নেতা রাজা রাধাকান্ত দেব (১৭৮৪-১৮৬৭ খ্রি.)। পুস্তিকাটি দু'ভাগে বিভক্ত ছিল। প্রথমভাগে লেখক দু'জন নারীর কথোপকথনের মাধ্যমে নারীশিক্ষার সমর্থনে তাঁর বক্তব্য তোলে ধরেছেন। এতে নারীশিক্ষা যে হিন্দুদের শাস্ত্র বিরোধী নয় এ কথাও স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। প্রসঙ্গত লেখক নারীশিক্ষা প্রসারে মিশনারীদের প্রচেষ্টারও প্রশংসা করেছেন। সংসারধর্ম পালন করেও যে নারীদের পক্ষে শিক্ষা গ্রহণ করা সম্ভব দু'জন নারীর কথোপকথনের মধ্য দিয়ে লেখক তার ইঙ্গিত দিয়েছেন পুস্তিকাটিতে। নারীরা শিক্ষা গ্রহণ করলে বিধবা হবে- বাঙালি সমাজে প্রচলিত এরূপ ধারণার বিরুদ্ধে যুক্তি দেখাতে গিয়ে লেখক উল্লেখ করেছেন যে, "কোন শাস্ত্রে এমত লেখা নাই যে মেয়্যা মানুষ পড়িলে রাঁড় হয়। কেবল গতর শোগা মাগিরা কথার সৃষ্টি করিয়া তিলে তাল করিয়াছে।"[৫১]

ভারতীয় সমাজে যে নারীশিক্ষার প্রচলন ছিল *স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক* পুস্তিকাটির দ্বিতীয় ভাগে লেখক তা উল্লেখ করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি মৈত্রীয়, শকুন্তলা অনসূয়া, দ্রৌপদী, রুক্মিনী, লীলাবতী, রাণী ভবানী, হটি বিদ্যালঙ্কার ও শ্যামাসুন্দরী দেবী প্রমুখ কয়েকজন শিক্ষিত বিশিষ্ট নারীর দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছেন। নারীশিক্ষার সমর্থনে ধর্মশাস্ত্র মহানির্বাণতন্ত্রের কয়েকটি শ্লোকও এতে উল্লেখ করা হয়েছে। সবশেষে লেখক নারীশিক্ষার প্রসারে এগিয়ে আসার জন্য বাঙালি পুরুষ সমাজের প্রতি আহ্বান জানান। তাঁর ভাষায়-

> এইক্ষণে সকলের লোকের উচিত যে আপন ২ পরিজনের প্রতি কৃপাবলোকন করিয়া কোন বিদ্যাবতী স্ত্রীকে নিজ বাটিতে রাখিয়া তাহাদিগকে বিদ্যাশিক্ষা করাণ এবং যাহারা নির্ধন তাহারদিগকে যাবৎ বয়স্থা না হয়, তাবৎ পাঠশালায় পাঠান।[৫২]

৫০. *স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক* পুস্তিকাটির মোট তিনটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল। প্রথম সংস্করণে এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল মাত্র ১৪। কিন্তু তৃতীয় সংস্করণে এর পরিমার্জন ও কলেবর বৃদ্ধি করা হয় এবং তখন এর পৃষ্ঠা সংখ্যা দাঁড়ায় ৪৫-এ।

৫১. পণ্ডিত গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার, *স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক*, ৩য় সংস্করণ, ফিমেল, জুভেনাইল সোসাইটি, কলকাতা, ১৮২৪, পৃ. ৬

৫২. পণ্ডিত গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৪

পণ্ডিত গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কারের *স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক* গ্রন্থটি সে সময় বাঙালি সমাজে বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। মিশনারীদের পরিচালিত ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি তার পরিচালিত বালিকা বিদ্যালয়সমূহের পাঠ্য তালিকায় এ পুস্তিকাটি অন্তর্ভুক্ত করেছিল। পুস্তিকাটির হিন্দি ভাষায়ও একটি অনুবাদ প্রকাশ করা হয়েছিল।

নারীশিক্ষার সমর্থনে রচিত দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থটির নাম *ভারতবর্ষীয় স্ত্রীগণের বিদ্যাশিক্ষা।* গ্রন্থটির প্রণেতা তারাশঙ্কর তর্করত্ন এবং এর প্রথম প্রকাশকাল ১৮৫০ সাল।[৫৩] চার খণ্ডে বিভক্ত এ গ্রন্থে তৎকালে বাঙালি সমাজে নারীশিক্ষার বিপক্ষে প্রচলিত ধারণাসমূহের প্রতিবাদ রয়েছে। প্রথম খণ্ডে বিদ্যাশিক্ষার অভাবে বাঙালি নারীদের দুর্দশার চিত্র উপস্থাপন করা হয়েছে। বঙ্গ-ভারতে যে নারীশিক্ষার প্রাচীন ঐতিহ্য ছিল তা দ্বিতীয় খণ্ডের আলোচ্য বিষয়। প্রসঙ্গত এ খণ্ডে ভারতীয় অনেক শিক্ষিত নারীর দৃষ্টান্ত লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। নারীরা শিক্ষিত হলে এর উপকারিতা কি হবে তৃতীয় খণ্ডের মূল আলোচনায় তা স্থান পেয়েছে। প্রসঙ্গত বিধবা নারীদের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাও এতে নির্দেশ করা হয়েছে। লেখকের ভাষায়, "তাহাদিরগের ক্লেশনিবারণ ও ধর্ম্মাবলম্বন এ উভয়ের পথ কেবল বিদ্যা, বিদ্যাভাসে সতত চিত্ত রত থাকিলে সকল দুঃখ বিস্মৃত হওয়া যায় অন্যদিকে কখন মনঃ ধাবমান হয় না।"[৫৪] চতুর্থ খণ্ডে নারীশিক্ষার উপযোগী পদ্ধতি সম্পর্কে পরামর্শ দেয়া হয়েছে। লেখক নারীদের বিদ্যালয়ে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণের কথা যেমন বলেছেন, তেমনি তাঁদের জন্য নিজগৃহে স্বামী বা শিক্ষিত নারী শিক্ষকের কাছে অন্তঃপুর শিক্ষা গ্রহণেরও তাগিদ দিয়েছেন। তিনি পুরষদের শিক্ষিত স্ত্রী গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেছেন এবং বাবা-মা যেন তাদের কন্যাদের শিক্ষার প্রতি মনোযোগী হন সে জন্য বিয়ের পাত্রী নির্বাচনে তাদের শিক্ষার পরীক্ষা নেওয়ার জন্য পুরুষদের অনুরোধ করেছেন। পরিশেষে লেখক এদেশীয় অভিভাবকদের প্রতি একটি পরামর্শ দিয়ে গ্রন্থের ইতি টেনেছেন। লেখকের ভাষায়-"পিতামাতা স্বীয় পুত্রসন্তানদিগের বিদ্যানুশীলনে যেরূপ যত্নশীল হয়েন, তদ্রুপ কন্যাসন্তানদিগের প্রতি সদয় হইয়া বিদ্যারস প্রদান করিলে তাহারা ভাবি সুখের আশা হইতে বঞ্চিত হয় না।"[৫৫]

উনিশ শতকের একজন পরিচিত সাহিত্যিক ছিলেন দ্বারকানাথ রায়। চব্বিশ পরগণার অধিবাসী এ ব্রাহ্মণপণ্ডিত পেশায় ছিলেন একজন শিক্ষক। তিনি মাসিক *সুলভ* পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্বও পালন করেন। নারীশিক্ষার সমর্থক দ্বারকানাথ রায় *সুলভ* পত্রিকার ১২৬১ বঙ্গাব্দের পৌষ ও মাঘ সংখ্যায় 'স্ত্রীশিক্ষার আপত্তি খণ্ড ও ফল বর্ণনা' শিরোনামে নিবন্ধ প্রকাশ করেন। পরবর্তীতে ১৮৫৭ সালে তিনি উক্ত নিবন্ধটি সংশোধন, পরিমার্জন ও পরিবর্ধন করে *স্ত্রীশিক্ষা বিধান* নামে গ্রন্থ প্রকাশ করেন। নারীশিক্ষার প্রতি জনমত আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে লেখক

৫৩. জানা যায় যে, তারাশঙ্কর তর্করত্ন ' হিন্দু স্ত্রীলোকদের বিদ্যাশিক্ষা' নামে একটি প্রবন্ধ রচনা করে ১৮৪৮ সালে 'হেয়ার প্রাইজ ফান্ড' পুরস্কার লাভ করেছিলেন। পরবর্তীতে এ ফান্ডের অর্থানুকূল্যে ১৮৫০ সালে তাঁর প্রবন্ধটি পরিমার্জিতরূপে গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল জেমস লং এর আনুকূল্যে।

৫৪. তারাশঙ্কর তর্করত্ন, *ভারতবর্ষীয় স্ত্রীগণের বিদ্যাশিক্ষা*, কলকাতা, ১৮৫০, পৃ, ৩৪

৫৫. তারাশঙ্কর তর্করত্ন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪২, উদ্ধৃতি, রণজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৯৩

গ্রন্থটি বিনামূল্যে পাঠকদের মধ্যে বিতরণ করেছিলেন। দু'ভাগে বিভক্ত আলোচ্য *স্ত্রীশিক্ষা বিধান* গ্রন্থের প্রথম ভাগে লেখক যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে নারীশিক্ষা বিরোধীদের মতামত ও আপত্তি খণ্ডন করেন। রক্ষণশীলদের দৃষ্টি আকর্ষণের উদ্দেশ্যে লেখক নারীশিক্ষার সমর্থনে তাঁর মতামতের সপক্ষে ধর্মশাস্ত্রের উদ্ধৃতিও ব্যবহার করেছেন। দ্বিতীয় ভাগে লেখক নারীশিক্ষার আটটি সুফল বর্ণনা করেছেন। প্রসঙ্গত তিনি উল্লেখ করেছে যে, নারীরা বিদ্যার্জন করলে তারা উপার্জন করতে পারবে। আর এ উপার্জন দ্বারা তারা সংসারে সহযোগিতা করতে পারবে।[৫৬] অন্তঃপুর শিক্ষার গুরুত্ব তিনি অস্বীকার করেননি, তবে তিনি কন্যাসন্তানদের বিদ্যার্জনের জন্য বিদ্যালয়ে পাঠানোর উপরই বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। দ্বারকানাথের ভাষায়,"অতএব বালকদিগের ন্যায় তাহারদিগকেও পাঠশালায় প্রেরণ করা এবং গৃহমধ্যেও পিতা, ভ্রাতা, পতি প্রভৃতির সর্ব্বদাই উপদেশ দেওয়া কর্ত্তব্য। তবেই তাহারা বিদ্যবতী হইবার সম্ভাবনা।"[৫৭] আলোচ্য গ্রন্থটি তৎকালীন বাঙালি সুধী সমাজে সমাধৃত হয়েছিল। লালবিহারী দে সম্পাদিত *অরোণোদয়* পাক্ষিক পত্রিকায় এ গ্রন্থটি সম্পর্কে একটি প্রশংসামূলক লেখা প্রকাশিত হয়েছিল। এতে বলা হয় যে, "এই পুস্তক দেখিয়া আমরা আহ্লাদিত হইলাম, হায়! স্ত্রী শিক্ষার অভাবে আমাদের দেশে কি অমঙ্গল না ঘটিতেছে।"[৫৮]

পূর্ব বাংলার পাবনা জেলার অধিবাসী রামসুন্দর রায়। তিনি ১৮৫৯ সালে *স্ত্রী ধর্ম্মবিধায়ক নামে* একটি পুস্তক রচনা করেন। এটি মূলতঃ নারীদের জন্য শিক্ষামূলক ও তাদের পাঠোপযোগী একটি পুস্তক। তবে লেখক প্রসঙ্গক্রমে তাঁর এ পুস্তকটিতে বাঙালি সমাজে নারীশিক্ষার বিদ্যমান অবস্থা এবং নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথাও বর্ণনা করেছেন। বাঙালি সমাজে অভিভাবকদের মনোভাব বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন:

> তাহারা প্রাণাধিক তনয়কে বহুঅর্থ ব্যয় ও সমধিক পরিশ্রম স্বীকার করিয়া বিদ্যাশিক্ষা করিয়া থাকেন, কিন্তু তনয়াকে কেবল পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গদের ন্যায় গৃহপিঞ্জরে লুক্কায়িত রাখিয়াই সন্তুষ্ট হন। শিক্ষা দূরে থাকুক স্ত্রীশিক্ষার নামোল্লেখ হইলেই একেবারে খড়্গহস্ত হইয়া উঠেন।[৫৯]

রামসুন্দর রায় তাঁর গ্রন্থে বাংলায় নারীশিক্ষার প্রতিবন্ধক কারণসমূহের মধ্যে পুরুষদের নির্বুদ্ধিতা ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনোভাবকে অন্যতম কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে, শিক্ষা একজন নারীকে সুগৃহীনী ও উপযুক্ত জননী হতে সাহায্য করে। আর এ কারণেও পুরুষ সমাজকে নারীশিক্ষা বিষয়ে এগিয়ে আসা দরকার।

উনিশ শতকের ষাট ও সত্তরের দশকে বাঙালি সমাজে শিক্ষিত নারীর সংখ্যা খুব বেশি ছিল না। যে কয়জন শিক্ষিত নারীর পরিচয় তখন জানা যায়, তাদের মধ্যে কেউ কেউ তখন নারীশিক্ষার সমর্থনে গ্রন্থ ও প্রবন্ধাদি

---

৫৬. দ্বারকানাথ রায়, *স্ত্রীশিক্ষা বিধান*, কলকাতা, ১২৬৪ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৪
৫৭. ঐ, পৃ. ১৫
৫৮. উদ্ধৃতি রণজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৯৪
৫৯. রামসুন্দর রায়, *স্ত্রী ধর্ম্মবিধায়ক*, কলিকাতা, ১৮৭১ শকাব্দ, পৃ. ৫

রচনার কাজে ব্রতী হয়েছিলেন। এ রকমই একজন বিদুষী নারী ছিলেন বামাসুন্দরী দেবী। তিনি ছিলেন পাবনা জেলার হরিশচন্দ্র তলাপাত্রের স্ত্রী। তিনি *কি কি কুসংস্কার তিরোহিত হইলে এদেশের শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে* শিরোনামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। ১৮৬১ (বৈশাখ ১৭৮৩ শকাব্দ) সালে এ গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থটিতে বামাসুন্দরী দেবী বাঙালি সমাজে প্রচলিত বিধবা বিবাহ, বাল্য বিবাহ ও কৌলিন্যপ্রথা ইত্যাদির মতো সামাজিক সমস্যা এবং জাতিভেদ প্রথা নিয়ে তাঁর মত প্রকাশ করেছেন। প্রসঙ্গত এ গ্রন্থে তিনি নারীশিক্ষার সমর্থনে স্পষ্ট বক্তব্য রাখেন। মেয়েরা লেখাপড়া শিখলে দেশের মঙ্গল অবশ্যম্ভাবী বলে বামাসুন্দরী মনে করতেন। তিনি তাঁর রচনায় নারীশিক্ষার সুফলের উল্লেখ করে এর ব্যাপক ও কার্যকর প্রসার প্রত্যাশা করেছেন।[৬০]

হিন্দু অবলাকুলের বিদ্যাভ্যাস ও তাহার সমুন্নতি নারীশিক্ষা সম্পর্কে উনিশ শতকের নারীদের ভাবনা ও সমাজ মানসিকতার একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সম্বলিত গ্রন্থ। এ গ্রন্থটির রচয়িতা কৈলাসবাসিনী দেবী। তিনি ছিলেন কলকাতার বিখ্যাত পুস্তক ব্যবসায়ী দুর্গাচরণ গুপ্তের স্ত্রী।[৬১] বামাসুন্দরী দেবীর অল্পপরেই তাঁর সাহিত্য জগতে আবির্ভাব। তবে তাঁর রচনাসমূহে বামাসুন্দরী দেবীর রচনা অপেক্ষা বাঙালি নারীদের সামাজিক দুরবস্থার চিত্র ফুটে ওঠেছে। পূর্বোক্ত গ্রন্থটি ছাড়াও তিনি *হিন্দু মহিলাগণের হীনাবস্থা* (১৮৬৩ খ্রি.) নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এ গ্রন্থটিতেও লেখক শিক্ষার অভাবকেই হিন্দু নারীদের দুরবস্থার প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেন। তাঁর ভাষায়:

> নারীগণ যদি বিদ্যাশিক্ষা করিত এবং পিতামাতা যদ্যপি তাহাদিগকে উপদেশ দিতেন, তাহা হইলে তাহাদিগের আর এরূপ কষ্ট ভোগ করিতে হইত না। হা মাতঃ বঙ্গভূমি! কতদিনে তোমার এই দুঃখিনী কন্যাগণ বিদ্যাবতী ও গুণবতী হইবে, কতদিনে এই দীনভাবের অভাব হইয়া তাহাদিগের জ্ঞানভাবের আবির্ভাব হইবে এবং সেই জ্ঞানপ্রভাব তোমাকে প্রভাবিত করিবে।[৬২]

মেয়েরা শিক্ষা গ্রহণ করলে বিধবা হবে এবং সমাজে পতিত বলে গণ্য হবে-নারীশিক্ষা সম্পর্কে বাঙালি সমাজের এরূপ রক্ষণশীল ও অনুদার মনোভাবের তিনি জোরালো ভাষায় বিরোধিতা করেছেন। তিনি তদানিন্তন বাঙালি সমাজের কাছে প্রশ্ন রেখেছেন “বিদ্যার কী পতিঘাতিনী শক্তি আছে যে তদ্বারা নারীগণ

---

৬০. বামাসুন্দরী দেবী, *কি কি কুসংকার তিরোহিত হইলে এদেশের শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে*, কলিকাতা, ১৮৬১, পৃ. ১৭

৬১. দুর্গাচরণ গুপ্ত একজন শিক্ষিত মানুষ ছিলেন এবং তাঁর আগ্রহ ও সহযোগিতায় স্ত্রী কৈলাসবাসিনী দেবী লেখাপড়া শিখেছিলেন। আলোচ্য গ্রন্থটি ছাড়াও তিনি *বিশ্বশোভা* নামে একটি কাব্যগ্রন্থ ও *হিন্দু মহিলাগণের হীনাবস্থা* নামে আরো দু'টি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।

৬২. শ্রীমতী কৈলবাসিনী দেবী, *হিন্দু মহিলাগণের হীনাবস্থা*, কলিকাতা, ১৭৬৫ শকাব্দ, পৃ. ২

পতিরত্নে বঞ্চিতা হইবে?" অন্যত্র তিনি লিখেছেন, "বিদ্যা কি নিকৃষ্ট পদার্থ যে তৎসংস্পর্শে নারীগণ নিকৃষ্ট মার্গে পদার্পণ করিবে।"[৬৩]

কৈলাসবাসিনী দেবীর *হিন্দু অবলাকুলের বিদ্যাভ্যাস ও তাহার সমুন্নতি* গ্রন্থটি ১৮৬৫ সালে প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থে তিনি লেখাপড়া না করায় বাঙালি নারীরা 'দ্বিপদপশু'তে পরিণত হয়েছে বলে উল্লেখ করেন। নারীদের এ হীন অবস্থা ও দুর্দশা মোচনের প্রথম ও প্রধান পথ শিক্ষা বলে তিনি মনে করতেন। সংস্কৃত শাস্ত্রে নারী অধিকার নেই এবং মেয়েরা লেখাপড়া করলে গৃহলক্ষ্মী বিদূরিত হয়- আলোচ্য গ্রন্থে তিনি বাঙালি সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠের এরূপ মতের তীব্র বিরোধিতা করেন। পুরুষ সমাজের নারীশিক্ষার বিরোধিতার কারণ নির্দেশ করতে গিয়ে তিনি লিখেন:

> তাহারা বণিতাগণকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্তে রাখিবার অভিপ্রায়েই তাহারদিগকে বিদ্যারসের সুধাময় মাধুর্য আস্বাদন করাইতে ইচ্ছা করাইতেন না অথবা পাছে তাহারা বিদ্যাবলে শ্রেষ্ঠত্বলাভ করিয়া পুরুষগণকে অগ্রাহ্য করে কিংবা গৃহকার্যে উপেক্ষা করতঃ কেবল শাস্ত্রালাপেই রত থাকে ও অন্তঃপুর হইতে বহির্গতা হইতে ইচ্ছা করে অথবা পত্রদ্বারা আমন্ত্রণ করতঃ অন্যপুরুষকে বরণ করিতে অভিলাষী হয় এই প্রকার বিবিধ আশঙ্কায় শঙ্কিত হইয়া তাহারা স্ত্রীগণকে নিতান্ত নির্বোধ ও বিদ্যাভ্যাসে অশক্তা বলিয়া নির্দেশ করিতেন।[৬৪]

পুরুষ বিরোধিতা উপেক্ষা করে যে সকল নারী সামান্য লেখাপড়া করতেন, সমাজে তাদের কিভাবে তাচ্ছিল্য ও উপহাস করা হতো কৈলাসবাসিনী দেবী তাঁর গ্রন্থে সে কথাও উল্লেখ করেছেন। তিনি নারীশিক্ষায় সরকারি প্রয়াসের প্রশংসা করেছেন। একই সাথে বেথুন স্কুল প্রতিষ্ঠার ফলে নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে যে ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে এবং নারীশিক্ষার প্রতি পুরুষদের মনোভাব পরিবর্তন হচ্ছে সে কথাও বলেছেন। তাঁর ভাষায়, "যাহারা পূর্বে উক্তবিষয় শ্রবণ করিলে কর্ণবিবরে হস্তার্পন করিতেন তাহারাও এক্ষণে তাহার উন্নতিকল্পে মনোযোগী হইয়াছেন এবং আপনাপন বালিকাগণকে প্রকাশ্যরূপেই হউক অথবা গুপ্তভাবেই হউক বিদ্যাভ্যাসে নিযুক্ত করিয়াছেন।"[৬৫]

কৈলাসবাসিনী দেবী নারীশিক্ষার একজন প্রবল সমর্থক ছিলেন, তবে তাঁর মধ্যেও রক্ষণশীল মনোভাবের প্রকাশ পাওয়া যায়। নারীরা শিক্ষা গ্রহণ করবে, তবে সেটি বিদ্যালয়ে গিয়ে নয়, বরং তিনি নারীদের অন্তঃপুর শিক্ষা গ্রহণের পক্ষে মত দিয়েছেন। কারণ তিনি মনে করতেন যে, প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে পাঠ করলে মেয়েরা কিছুটা হলেও উচ্ছৃঙ্খল হয়ে ওঠে। প্রচলিত সামাজিক সংস্কার ও আচার-ব্যবহারের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করে। তাই তাঁর মত ছিল, "যতদিন পর্যন্ত না বালিকাগণের পাঠোপযোগী অন্তঃপুর তুল্য বিদ্যামন্দির প্রতিষ্ঠিত না

৬৩. শ্রীমতী কৈলবাসিনী দেবী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬৫

৬৪. শ্রীমতী কৈলবাসিনী দেবী, *হিন্দু অবলাকুলের বিদ্যাভ্যাস ও তাহার সমুন্নতি*, কলিকাতা, ১৭৮৭ শকাব্দ, পৃ. ১২

৬৫. শ্রীমতী কৈলবাসিনী দেবী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৪

হয়, তাহাদের বিদ্যালয়ে পাঠানো উচিত নয়।” শুধু তাই নয়, উনিশ শতকের ষাটের দশকে নারীশিক্ষার্থীদের জন্য প্রবর্তিত আধুনিক পাঠ্যক্রমের ব্যাপারেও তাঁর আপত্তি ছিল। তিনি মনে করতেন নতুন পাঠ্যসূচিতে শিক্ষা গ্রহণ করলে নারীরা গৃহকর্ম বিমুখ হয়ে পড়বে। তাই তাঁর পরামর্শ ছিল,“তাহাদের সাহিত্যশাস্ত্রের সাথে সংসারশাস্ত্রের উপদেশ দেওয়া সর্বোতভাবে বিধেয়।”[৬৬] শুধু কৈলাসবাসিনী দেবী নয়, সমকালে এরূপ মানসিকতা সম্পন্ন অনেক মানুষের পরিচয় পাওয়া যায়। যারা নারীশিক্ষার সমর্থক হলেও নারীদের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ব্যাপারে অনুদার মনোভাবাপন্ন ছিলেন।

উনিশ শতকে আরো কয়েকজন প্রগতিশীল সামাজিক চেতনাসম্পন্ন মানুষ নারীশিক্ষার সমর্থনে তাঁদের কলম ধরেছিলেন। এদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন ইয়ং বেঙ্গল দলের সদস্য প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪-১৮৮৩ খ্রি.)।[৬৭] তিনি বাঙালি নারীদের আধুনিক শিক্ষাদানের একজন সমর্থক ছিলেন। এজন্য সাংগঠনিক তৎপরতার পাশাপশি কলম হাতে তুলে নিয়েছিলেন। তিনি নারী বিষয়ক সাময়িকপত্র *মাসিক পত্রিকা*'র যুগ্ম-সম্পাদক ছিলেন।[৬৮] প্যারীচাঁদ মিত্র রচিত নারীশিক্ষা বিষয়ক একটি গ্রন্থের নাম *রামারঞ্জিকা*। ১৮৬০ সালে এ গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছিল। এ গ্রন্থটি ষোলটি অধ্যায়ে বিভক্ত এবং এতে লেখক হরিহর ও তাঁর স্ত্রী পদ্মাবতীর কথোপকথনের মধ্য দিয়ে বাঙালি সমাজে নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা বর্ণনা করেছেন। এতে এ দম্পতির কন্যাকে পড়াশুনা করানোর ব্যাপারে দু'জনের আলাপচারিতায় একদিকে যেমন পদ্মাবতীর জবানিতে সমকালীন বাঙালি সমাজের রক্ষণশীল অংশের নারীশিক্ষা বিদ্বেষী মনোভাব ও নারীশিক্ষার দোষ-ত্রুটি বর্ণিত হয়েছে। অন্যদিকে হরিহরের কথায় এসব রক্ষণশীলদের নারীশিক্ষা সম্পর্কিত বিরোধী মনোভাবের জবাব দেয়া হয়েছে। নিজ কন্যার পাঠদানের পক্ষে যুক্তি দিতে গিয়ে হরিহর তার স্ত্রীকে বলেছেন যে, “শিক্ষা দুই প্রকার-জ্ঞানকরী ও অর্থকরী। জ্ঞানকরী শিক্ষাতে সুবিবেচনা ও ধর্ম্মে মতি হয়। অর্থকরী শিক্ষা উপার্জ্জনের পথ।”[৬৯] প্যারীচাঁদ মিত্র রচিত অন্য একটি গ্রন্থের নাম *বামাতোষিনী*। ১৮৮১ সালে প্রকাশিত এ গ্রন্থটি ছিল তাঁর জীবনে রচিত সর্বশেষ গ্রন্থ। এটি মূলত একটি নারী বিষয়ক পাঠ্যপুস্তক। তবে এতেও গ্রন্থকার নীতিশিক্ষা ও গল্পের আকারে নারীশিক্ষার সমর্থনে বাঙালি মননকে সচেতন করতে চেয়েছেন।[৭০]

---

৬৬. উদ্ধৃতি রণজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৯৮

৬৭. প্যারীচাঁদ মিত্র ছিলেন বাংলা সাহিত্যের অন্যতম লেখক, সাংবাদিক, সংস্কৃতিসেবী, ব্যবসায়ী। তাঁর ছদ্মনাম ছিল টেকচাঁদ ঠাকুর। ‘আলালের ঘরের দুলাল’ তাঁর রচিত সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। ডেভিড হেয়ারের জীবনী গ্রন্থ *A Biographical Sketch of David Hare* (1877) সহ তিনি বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় আরো বেশ কিছু গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। পেশাগত জীবনে তিনি ছিলেন কলকাতা লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ান। তিনি ‘প্যারীচাঁদ মিত্র অ্যান্ড সন্স’ নামক বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী ছিলেন।

৬৮. *মাসিক পত্রিকা*'র আরেকজন সম্পাদক ছিলেন রাধানাথ শিকদার।

৬৯. প্যারীচাঁদ মিত্র, *রামারঞ্জিকা*, প্যারীচাঁদ মিত্র গ্রন্থাবলী, কলিকাতা, ১৩২০, পৃ. ২

৭০. রণজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১০২

উনিশ শতকের বাংলার আরেকজন প্রগতিবাদী মানুষ ছিলেন কালীপ্রসন্ন ঘোষ (১৮৪৩-১৯১০ খ্রি.)। তাঁর পৈত্রিক নিবাস ছিল পূর্ববঙ্গের বিক্রমপুর জেলায়। কালীপ্রসন্ন ঘোষ ছিলেন পূর্ববঙ্গীয় ব্রাহ্মসমাজের বিশিষ্ট নেতা। তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্যের জন্য তিনি ইংরেজ সরকার কর্তৃক 'রায় বাহাদুর' উপাধি প্রাপ্ত হয়েছিলেন। কালীপ্রসন্ন ঘোষ ধর্ম-দর্শন ও সমাজ বিষয়ে বেশকিছু মূল্যবান গ্রন্থ ও প্রবন্ধের রচয়িতা। তাঁর *নারীজাতি বিষয়ক প্রস্তাব* গ্রন্থটি এর মধ্যে অন্যতম। ১৮৬৯ সালে এ গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটির আলোচ্যসূচি সম্পর্কে ভূমিকায় লেখক নিজেই লিখেছেন, "নারীজাতির প্রকৃত শিক্ষা, স্বাধীনতা ও সামাজিক অবস্থান প্রভৃতি যেসমস্ত প্রশ্ন নারীজাতির শুভাশুভের সাথে বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে, আমরা সাধ্যমতো তাহার আলোচনা করিব।" নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা বলতে গিয়ে গ্রন্থকার লিখেছেন যে, "নারীজাতিকে অন্ন জলে বঞ্চিত করিয়া মৃত্যুমুখে নিক্ষেপ করা যদি পাপ হয়, শিক্ষালাভে বঞ্চিত করিয়া তাহাদিগকে দুঃখদুর্গতি ও পাপমুখে নিক্ষেপ করা তাহা অপেক্ষাও ভয়ানক পাপ।"[৭১] নারীদের জন্য পাঠক্রম কী হবে– কালীপ্রসন্ন ঘোষ তাঁর এ গ্রন্থে সে সম্পর্কে মত দিয়েছেন। তাঁর মতে, এ বিষয়ে নারীদের ব্যক্তিগত অভিরুচিই প্রধান। তবে নারীদের পাঠক্রমে ধর্মশিক্ষার পাশাপাশি আধুনিক বিজ্ঞান, শিল্প, সাহিত্য এমনকি সংগীত ও চিত্রকলা শিক্ষাকে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত বলে তিনি মনে করতেন।[৭২]

উনিশ শতকে বাঙালি নারী লেখকদের মধ্যে বসন্তকুমারী দাসী ছিলেন অন্যতম। তিনি ছিলেন রাজশাহীর নিম্ন আদালতের বিচারক মধুসূদন দত্তের কন্যা এবং বরিশালের জমিদার পরিবারের নরনারায়ণ চৌধুরীর স্ত্রী। তিনি ছিলেন মূলত একজন কবি। ১৮৭৫ (১২৮২ বঙ্গাব্দ) সালে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রবন্ধগ্রন্থ *যোষিদ্বিজ্ঞান*।[৭৩] এ গ্রন্থে বসন্তকুমারী দাসী নারীজাতি সম্পর্কি ২০টি বিষয়ে আলোচনা করেছেন। এসব বিষয়ের অন্যতম ছিল 'বিদ্যাশিক্ষার উপকারিতা।' এ গ্রন্থটিতে নারী স্বাধীনতা ও জাতিভেদসহ কিছু বিষয়ে বসন্তকুমারী দাসীর রক্ষণশীল মনোভাবের পরিচয় রয়েছে। তবে নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও এর উপকারিতা বিষয়ে তাঁর মনোভাব ছিল বাস্তবসম্মত ও ন্যায়ানুগ। কন্যাসন্তানদের শিক্ষার প্রদান প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন, "যদি সন্তানের ন্যায় সন্ততির দ্বারা সুখী হইতে জনকজননীর ইচ্ছা থাকে, তবে বালিকারদিগের শিক্ষাদান একান্ত কর্ত্তব্য। তরুবীজ রোপন করিয়া বারিসিঞ্চনাদি না করিলে তদ্বারা ফল লাভের প্রত্যাশা করাও ভ্রান্তির স্বর্গ।" তিনি বাঙালি নারীর দুর্দশার প্রধান কারণ হিসেবে তাদের শিক্ষার অভাবকে দায়ী করেছেন। তাঁর ভাষায়,

---

৭১. কালীপ্রসন্ন ঘোষ, *নারীজাতি বিষয়ক প্রস্তাব*, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা, ১২৭৬, পৃ. ৬০

৭২. রণজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১০৩

৭৩. বসন্তকুমারী দাসীর উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্মের মধ্যে রয়েছে: *কবিতা মঞ্জরী; বসন্তকুমারী; রোগাতুরা; বাসন্তিকা এবং বালিকা বিনোদ*।

"বর্ত্তমানকালে স্ত্রীজাতি যে মাকাল ফলের ন্যায় অতৃপ্তিকর কিংবা কিংশুক প্রসূনের ন্যায় অসুখকর ও অশুভকর হইয়াছে, তাহার কারণ মাত্র অবিদ্যা।"[৭৪]

কালীকচ্ছ সার্ব্বজনিক সভার স্ত্রীশিক্ষা বিভাগের সম্পাদিকা ছিলেন শ্রীমতি গুণময়ী সিংহ। তিনি *স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক আপত্তি খণ্ডন* নামে নারীশিক্ষার সমর্থনে একটি পুস্তিকা রচনা করেছিলেন। ১৮৮৪ সালে এটি কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। বর্তমানে এ গ্রন্থটি আর পাওয়া যায় না। তবে সমকালে *ভারতী ও বালক*[৭৫] এবং বামাবোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত পৃথক দু'টি পর্যালোচনা থেকে গুণময়ী সিংহের *স্ত্রী শিক্ষা বিষয়ক আপত্তি খণ্ডন* গ্রন্থটি সম্পর্কে জানা যায়। বামাবোধিনী পত্রিকায় এ গ্রন্থটি সম্পর্কে লিখেছিল, "স্ত্রীশিক্ষার প্রতি যাহাদিগের কুসংস্কার আছে, ইহা দ্বারা তাহাদের মনের অনেক ধন্ধ ঘুচিতে পারে।"[৭৬]

বামাবোধিনী পত্রিকায় গুণময়ী সিংহ *স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক আপত্তি খণ্ডন* গ্রন্থের উপর পর্যালোচনাটি অনেক সংক্ষিপ্ত ছিল। অন্যদিকে *ভারতী ও বালক* পত্রিকায় প্রকাশিত পর্যালোচনাটি ছিল কিছুটা বিস্তৃত। সে সময় বঙ্গীয় সমাজে নারীশিক্ষার বিরুদ্ধে প্রচলিত যে সব আপত্তির কারণে গুণময়ী সিংহ তাঁর গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন পত্রিকাটি সেগুলো উল্লেখ করে লিখে যে,

> কালীকচ্ছের কোন পণ্ডিত স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে কতকগুলি আপত্তি উত্থাপিত করায় কালীকচ্ছ সার্ব্বজনিক সভান্তর্গত স্ত্রীশিক্ষা বিভাগের সম্পাদিকা শ্রীমতী গুণময়ী– সেই আপত্তি সকল খণ্ডন করিয়া উপরোল্লেখিত পুস্তকখানি রচনা করিয়াছিল।
>
> পণ্ডিত মহাশয় যে আটটি আপত্তি উত্থাপন করিযাছেন, তাহার দারুণ গুরুত্ব পাঠকদিগকে অনুভব করাইবার জন্য আমরা নিচে সমস্তগুলিই উঠাইয়া দিলাম।
>
> ১ স্ত্রীলোকের আপত্তি বিদ্যাশিক্ষার আবশ্যক কি? শিখিলে অপকার কি? ২. স্ত্রীলোক লেখাপড়া শিখিলে অন্ধ হয়। ৩. স্ত্রীলোক লেখাপড়া শিখিলে বিধবা হয়। ৪. স্ত্রীলোকের লেখাপড়া শিখিলে সন্তান হয় না। ৫. স্ত্রীলোক শিক্ষিতা হইলে অবিনীতা, লজ্জাহীনা ও অকর্মণ্য হয়। ৬. লেখাপড়া করিয়া কি মেয়েরা চাকুরী করিবে না মহাজনী করিবে? ৭. মেয়ে লেখাপড়া না শিখিলে কি ক্ষতি আছে। ৮. বিদ্যাশিক্ষায় নারীগণের চরিত্রদোষ জন্মে।
>
> আপত্তিগুলির অধিকাংশই এমনতর যে একজন বালিকার মুখেও শাভো পায় না। পণ্ডিতের মুখে যে কিরূপ সাজে তাহা সকলেই বুঝিবেন। শ্রীমতী গুণময়ী যে আপত্তিগুলি অতি সহজেই খণ্ডন করিয়াছেন তাহা ইহার পর বলা বাহুল্য।[৭৭]

---

৭৪. বসন্তকুমারী দাসী, *যোষিদ্বিজ্ঞান*, বরিশাল, ১২৮২, পৃ, ৭ ও ১৭, উদ্ধৃতি রণজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১০৫

৭৫. *বালক* নামে ১২৯২ বঙ্গাব্দে জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ি থেকে জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর সম্পাদনায় একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এর কার্যাধ্যক্ষ ছিলেন। ১২৯৩ বঙ্গাব্দে কার্যাধ্যক্ষের পদ থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অবসর নিলে জ্ঞানদা নন্দিনীর পক্ষে একা পত্রিকা দেখাশোনা অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। এ কারণে পত্রিকাটিকে ভারতী পত্রিকার সাথে যুক্ত করা হয় এবং *ভারতী ও বালক* নাম দিয়ে ১২৯৩ বঙ্গাব্দে (১৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দ) এর প্রথম সংখ্যা প্রকাশ করা হয়েছিল।

৭৬. *বামাবোধিনী*, আষাঢ়, ১২৯১ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৯৮

৭৭. *ভারতীয় ও বালক*, আশ্বিন, ১২৯১, পৃ. ২৭৯

উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যের প্রভাবশালী লেখক ও সাহিত্যস্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪ খ্রি.) এর নারীশিক্ষা বিষয়ক মতামত পাওয়া যায় তাঁর *সাম্য* গ্রন্থে। মূলত *বঙ্গদর্শন*[৭৮] পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর 'তিনটি প্রস্তাব' ও 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধে অংশবিশেষ একত্র করে বঙ্কিমচন্দ্রের *সাম্য* গ্রন্থটি প্রকাশ করা হয়েছিল। এ গ্রন্থের পঞ্চম পরিচ্ছদের বিষয়বস্ত হলো নারী-পুরুষের সামাজিক বৈষম্য। আর এ বৈষম্যের কথা আলোচনা করতে গিয়েই বঙ্কিমচন্দ্র নারীশিক্ষা প্রসঙ্গটির অবতারণা করেছেন। পুত্র সন্তান ও কন্যা সন্তানের শিক্ষার ক্ষেত্রে এদেশের বাবা-মায়ের বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গির কথা তুলে ধরে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন, "যাঁহারা পুত্রটি এম এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইলে বিষপান করিতে ইচ্ছা করেন, তাহারাই কন্যাটি কথামালা সমাপ্ত করিলেই চরিতার্থ হন।"[৭৯] গৃহকর্মের অভিযোগে মেয়েদের বিদ্যালয়ে না পাঠানোর অজুহাতকেও বঙ্কিম খণ্ডন করেছেন তাঁর এ আলোচ্য গ্রন্থে। তাঁর ভাষায়:

> যাহাকে গৃহধর্ম্ম বলে, সাম্য থাকিলে স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই তাহাতে সমান ভাগ। একজন গৃহকর্ম্ম লইয়া বিদ্যাশিক্ষায় বঞ্চিত হইবে আরেকজন গৃহকর্ম্মের দুঃখে অব্যাহতি পাইয়া বিদ্যাশিক্ষায় নির্ব্বিঘ্ন হইবে, ইহা স্বভাব সঙ্গত হউক বা না হউক, সাম্যসঙ্গত নয়।[৮০]

এমনকি শিক্ষাকে নারীর সামাজিক বৈষম্য দূরীকরণের একমাত্র উপায় বলে বঙ্কিম মনে করতেন। তিনি লিখেছেন, "লোকে সুশিক্ষিত হইলে বিশেষত স্ত্রীগণ সুশিক্ষিতা হইলে তাহাতো অনায়েসেই গৃহমধ্যে গুপ্ত থাকিবার পদ্ধতি অতিক্রম করিতে পারিবে। শিক্ষা থাকিলেই অর্থোপার্জ্জনে নারীগণের ক্ষমতা জন্মিবে।"[৮১] নারীপুরুষ সুশিক্ষিত হয়ে কাজ করলে বিদেশীদের শোষণ থেকেও মুক্তি পাওয়া যাবে বলে বঙ্কিমচন্দ্র মনে করতেন।

আগেই বলা হয়েছে যে, উনিশ শতকে বাঙালি সমাজের এক বড় অংশ নারীশিক্ষা বিরোধী ছিলেন। এদের মতেরই প্রতিফলন দেখা যায় সমকালীন প্রবন্ধ সাহিত্যিকদের কারো কারো রচনায়। এ প্রসঙ্গে প্রথমেই আর্যমিশন কর্তৃক প্রকাশিত *স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা* নামক পুস্তকের কথা উল্লেখ করা যায়। গ্রন্থটির লেখকের নাম পরিচয় উল্লেখ নেই। আলোচ্য গ্রন্থে লেখক সমকালে বাংলায় প্রচলিত নারীশিক্ষা ও স্বাধীনতার বিরোধিতা করেছেন। লেখকের মতে, তখন প্রচলিত নারীশিক্ষার মধ্যে অনিষ্ট ছাড়া কোনো ভালো কিছু নেই। তাঁর মতে, প্রচলিত নারীশিক্ষা পদ্ধতিতে পুরুষ শিক্ষকদের কাছে মেয়েদের শিক্ষা গ্রহণের ফলে সমাজে অনাচারের বিস্তৃতি ঘটছে। লেখক আশঙ্কা প্রকাশ করেন যে, পুরুষ এমনকি বয়স্ক মেয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ইন্দ্রিয়াসক্তি থাকায়

---

৭৮. *বঙ্গদর্শন* উনিশ শতকে প্রকাশিত একটি বাংলা মাসিক সাহিত্যপত্রিকা। ১৮৭২ সালে সাহিত্যস্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪ খ্রি.) কর্তৃক এটি প্রথম প্রকাশিত হয়।

৭৯. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সাম্য, *বঙ্কিম রচনাবলী*, কলিকাতা, ১৩৯৭ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৪০০

৮০. ঐ, পৃ. ৪০৫

৮১. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সাম্য, *বঙ্কিম রচনাবলী*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪০৫

তারা শিক্ষার পরিবর্তে কুশিক্ষা প্রাপ্ত হতে পারেন।[৮২] লেখকের মতে, মেয়েদের বিবাহের পূর্বে কোনো প্রাতিষ্ঠানিক বা আনুষ্ঠানিক শিক্ষা দেবার প্রয়োজন নেই, বরং তাঁর ভাষায়:

> বালিকা নিজ মাতার নিকট গার্হস্থ্য ধর্ম্মের প্রয়োজনীয় যাবতীয় কর্ম্মশিক্ষা গ্রহণ করিবে। শরীরপালন, শিশুপালন, পতিভক্তি, পিতৃভক্তি, ভাই-ভগ্নীর প্রতি স্নেহ ও দয়া, সরলতা, স্থিরতা, মিষ্টভাষিতা, সহিষ্ণুতা, দৃঢ়তা, অপকটতা, সন্তুষ্টতা, পরদুঃখে কাতরতা, মিতব্যয়িতা, অতিথি সেবা, দেশসেবা এই সকল কার্য্য বালিকারা মাতার নিকট প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া অভ্যাস করিবেন।[৮৩]

লেখকের মতে মেয়েরা বাকি শিক্ষা তারা লাভ করবেন বিয়ের পর তাদের শ্বশুর-শ্বাশুড়ি ও স্বামীর কাছ থেকে। এজন্য তাদের বিদ্যালয় বা প্রচলিত শিক্ষা গ্রহণের প্রয়োজন নেই। শিক্ষিত হলে নারীরা অর্থ উপার্জন করতে পারবেন- আলোচ্য গ্রন্থের লেখক এ মতেরও তীব্র বিরোধী ছিলেন। অর্থ উপার্জনের জন্য নারীশিক্ষাকে তিনি অপমানজনক বলে মনে করতেন। তাঁর ভাষায়, "স্ত্রীজাতিকে যে অর্থাগমের জন্য অপরবিদ্যা শিক্ষা দিতে হইবে তাহা নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক। স্ত্রী জাতির দ্বারা অর্থাগমের প্রত্যাশা করা অত্যন্ত নীচ অন্তঃকরণের পরিচয় দেওয়া মাত্র।"[৮৪]

ঢাকা মেডিকেল স্কুলের সহকারী শিক্ষক ছিলেন কামাখ্যাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি *স্ত্রীশিক্ষা* নামক একটি গ্রন্থ রচনা করেন। ১৮৯৮ সালে এটি যখন প্রকাশিত হয়, তখন নারীশিক্ষার ব্যাপারে বাঙালি সমাজ অনেকাংশেই ইতিবাচক এবং নারীরা তখন বিদ্যালয়ের গণ্ডি পেরিয়ে কলেজ হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ শুরু করেছেন। এরূপ একটি পরিস্থিতিতে এ গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। তবে এ গ্রন্থটিও নারীশিক্ষা ও নারী স্বাধীনতা বিরোধী প্রাচীনপন্থী জনমতেরই প্রতিনিধিত্বকারী ছিল। লেখক এ গ্রন্থে প্রচলিত নারীশিক্ষা ও নারী স্বাধীনতার বিরোধিতা করেছেন। মনুসংহিতার উদ্ধৃতি এবং একজন চিকিৎসক হিসেবে নারীপুরুষের শারীরিক গঠনগত পার্থক্য উল্লেখ করে লেখক নারীকে পুরুষ অপেক্ষা নিকৃষ্ট বলে উল্লেখ করেছেন। বিয়ে করে স্বামীর পায়ে সমস্ত কিছু সমর্পণ এবং মা হিসেবে সন্তানের জন্য সবকিছু বিসর্জন-এটিই নারীর পরম ও মহিমান্বিত গুণ। এমনকি সহমরণে নিজের আত্মবিসর্জন দান এটিও নারীর জন্য পরম গৌরবের বিষয় বলে লেখক মতপ্রকাশ করেন। লেখকের মতে, বাংলায় প্রচলিত নারীশিক্ষায় অনেক দোষ-ত্রূটি রয়েছে এর মধ্যে প্রধান দোষ হলো:

> এই শিক্ষাতে ধর্ম্ম ও নীতিশিক্ষা কিছুই হয় না। ধর্ম্ম ও নীতিহীনা শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া, এদেশের যুবকগণের চরিত্র দিন দিন শোচনীয় হইয়া পড়িতেছে। যে প্রণালী শিক্ষাতে যুবকগণের চরিত্র খারাপ হইতেছে, সেই প্রণালীর শিক্ষায় রমনীদের হৃদয় উন্নত ও পবিত্র হইবে, যাঁহারা বলেন অথবা সেইরূপ শিক্ষায় প্রশ্রয় দেন তাঁহারা যে অত্যন্ত ভ্রমে তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই।[৮৫]

৮২, অজ্ঞাত লেখক, *স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা*, আর্য্যমিশন ইনিস্টিটিউট, কলিকাতা, পৃ. ১৩

৮৩. ঐ, পৃ. ২২

৮৪. অজ্ঞাত লেখক, *স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা*; উদ্ধৃতি রণজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১০৪

৮৫. কামাখ্যাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *স্ত্রীশিক্ষা*, কলিকাতা, ১৩০৪ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৬৬

বাংলায় নারী পুরুষদের জন্য প্রচলিত একই ধারা শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর ঘোরতর আপত্তি ছিল। তিনি মনে করতেন যে, নারী পুরুষের শিক্ষা স্বতন্ত্র হতে হবে। কারণ তা না হলে এ শিক্ষা দ্বারা সমাজ সংসারের কোনো উন্নতি হবে না। নারীশিক্ষা কিরূপ হওয়া উচিত, সে সম্পর্কেও তাঁর বক্তব্য রয়েছে আলোচ্য গ্রন্থে। তাঁর ভাষায়, "সন্তানপালন, গৃহস্থালি, গার্হস্থ্যশিল্প, পাকবিদ্যা এই সকল স্ত্রীলোকের সর্বপ্রধান শিক্ষার বিষয়। বর্ত্তমান প্রণালীর স্ত্রীশিক্ষাতে এসকল শিক্ষার অভাববশতঃ সমাজের অবস্থা নানাপ্রকারে শোচনীয় হইয়া পড়িতেছে।"[৮৬] তাঁর মতে, নারীদের জন্য এ অনিষ্টকর শিক্ষার মূলে আছে পুরুষরাই। তাই তিনি "স্ত্রীশিক্ষা স্ত্রীশিক্ষা করে আন্দোলন" করা পুরুষ এবং বিভিন্ন সভা-সংগঠনের তীব্র ভাষায় নিন্দা করেছেন। জেনেশুনেও শিক্ষিত ভদ্রলোকেরা কেন প্রচলিত ধারার নারীশিক্ষাকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন লেখক সে বিষয়ে প্রশ্ন রেখেছেন তাঁর গ্রন্থে। পরিশেষে তিনি এমন নারীশিক্ষা প্রবর্তন করা উচিত বলে মত প্রকাশ করেছেন, যাতে শিক্ষা লাভ করে নারী সীতা-সাবিত্রীর মতো নারী হতে পারেন। তাঁর ভাষায়:

> যে প্রণালীর শিক্ষা লাভ করিয়া ভারতের প্রতি নগরীর, প্রতি গ্রামের, প্রতি গৃহের অধিকাংশ রমণী দয়া, ধর্ম্ম, সতীত্ব, ক্ষমতা, বিনয় ও সহিষ্ণুতার পারাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, আমাদের বর্ত্তমান এ শোচনীয় অস্থায় সেই প্রণালীর শিক্ষাই ভারতরমণীগণকে প্রদান করা কর্ত্তব্য।[৮৭]

কামাখ্যাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় একজন চিকিৎসাশাস্ত্রবিদ ছিলেন। উচ্চশিক্ষিত মানুষ হয়ে উনিশ শতকের শেষপ্রান্তে এসে নারীশিক্ষা বিরোধী এমন একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এ থেকে বুঝা যায় যে, তখনো বাঙালি জনমানসে নারীশিক্ষা ও নারী স্বাধীনতার বিপক্ষ জনমত কতটা ক্রিয়াশীল ছিল।

বাংলা সাহিত্যের একটি বিশিষ্টধারা হলো উপন্যাস। প্রবন্ধ সাহিত্যের মতো বাংলা উপন্যাসেও উনিশ শতকের বাংলার সমাজ জীবনের অনেক অনুসঙ্গ স্থান পেয়েছে। পুনশ্চ উল্লেখ্য যে, উনিশ শতকের বাংলার সামাজিক আন্দোলনগুলোর মধ্যে নারীশিক্ষা ছিল অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আর ব্যাপকভাবে না হলেও এ বিষয়টি উনিশ শতকে রচিত কিছু উপন্যাসেও ঠাঁই করে নিয়েছে। এরূপ একটি উপন্যাসের নাম *আধ্যাত্মিকা*। এ উপন্যাসটির রচয়িতা নারীশিক্ষা আন্দোলনের অগ্রণী পুরুষ প্যারীচাঁদ মিত্র। ১৮৮২ সালে তাঁর এ উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়। এ উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র আধ্যাত্মিকা-হরদেব তর্কলঙ্কার দম্পতির কন্যা। আধ্যাত্মিকা একজন বিদুষী নারী। শিক্ষার সামাজিক ফল হলো মানবকল্যাণ সাধন। আর এ কাজটিই ছিল আধ্যাত্মিকার জীবনব্রত।[৮৮] লেখক এর মাধ্যমে একজন শিক্ষিত নারী দ্বারা কিভাবে সমাজের কল্যাণ সাধিত হতে পারে তা দেখানো চেষ্টা করেছেন।

---

৮৬. ঐ, পৃ. ৬২

৮৭. কামাখ্যাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৮৩

৮৮. রণজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১১৮

শিবনাথ শাস্ত্রীকে (১৮৪৭-১৯১৭ খ্রি.) উনিশ শতকের বাংলার নবযুগের একজন সার্থক প্রতিনিধি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ব্রাহ্মসমাজের প্রধান সারির নেতা শিবনাথ শাস্ত্রী কেবল একজন ধর্মপ্রচারক ও সমাজ সংস্কারক হিসেবেই সুপরিচিত ছিলেন না, তিনি একজন প্রভাবশালী সাহিত্যিকও ছিলেন। নারীশিক্ষা ও স্বাধীনতার তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ সমর্থক। নারীশিক্ষা প্রসারে তাঁর বহুমুখী কর্মকান্ড বর্তমান অভিসন্দর্ভের বিভিন্ন স্থানে স্থান পেয়েছে। শিবনাথ শাস্ত্রীর রচিত একটি উপন্যাস *মেজবউ*। ১৮৭৯ সালে প্রকাশিত এ উপন্যাসটির প্রধান চরিত্র প্রমদা। একটি সঙ্গতিসম্পন্ন পরিবারের মেজবউ তিনি। তিনি ছিলেন সুরুচিসম্পন্ন ও শিক্ষিতা নারী। তিনি পড়াশুনা ভালোবাসেন এবং অবসর সময়ে বইপত্র পড়েন এবং পরিচিতজনদের কাছে চিঠিপত্র লেখেন। এজন্য বাড়ির বধূমহলে কেউ কেউ তাঁর সমালোচনা করেন। তবে শেষ পর্যন্ত তাঁর এ কাজের জন্য তিনি সকলের বিশেষ করে তাঁর শ্বশুরের স্বীকৃতি পান।[৮৯] লেখক এ উপন্যাসের মাধ্যমে শিক্ষিত নারীদের সামাজিক মর্যাদা ও গুরুত্ব তোলে ধরেছেন। *যুগান্তর* শিবনাথ শাস্ত্রীর আরেকটি উপন্যাস। ১৮৮৫ সালে প্রকাশিত এ উন্যাসটিকে শিবনাথের শ্রেষ্ঠ কীর্তি বলে বিবেচনা করা হয়। ব্রাহ্মধর্ম ও সমাজের আদর্শবাদের পটভূমিকায় রচিত এ উপন্যাসটিতে শিবনাথ শাস্ত্রী একটি সুস্থ সমাজ গঠনের জন্য নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তাকে বিশেষভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। উপন্যাসের একটি চরিত্র অকাল বিধবা বিজয়া। তাঁর স্বামী ছিলেন একজন প্রগতিমনস্ক মানুষ। তিনি তাঁর স্ত্রীকে লেখাপড়া শিখিয়েছেন। তাঁদের কন্যা বিন্ধ্যবাসিনীকে বেথুন স্কুলে পাঠিয়েছেন। কিন্তু পিতার অকাল মৃত্যুর পর বিন্ধ্যবাসিনীর লেখাপড়ায় ছেদ পড়ে। বিজয়ার দাদা তর্কভূষন একজন রক্ষণশীল প্রাচীনপন্থী মানুষ। তিনি ছিলেন নারীশিক্ষার বিরোধী। কিন্তু তাঁর বিধবা বোন বিজয়া নারীশিক্ষার সপক্ষে যুক্তিতর্ক দিয়ে তাঁকে বুঝাতে সক্ষম হন। ফলে তর্কভূষণ তাঁর ভাগ্নিকে বালিকা বিদ্যালয়ে ভর্তি করেন। শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর এ উপন্যাসের মাধ্যমে একটি সনাতনপন্থী পরিবারের নারীশিক্ষা বিরোধী মনোভাবের পরিবর্তন এবং নারীশিক্ষার সপক্ষে স্বীকৃতি দানের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।[৯০] এখানেই এ উপন্যাসের একটি বিশিষ্টতা। শিবনাথের আরেকটি উপন্যাস *নয়নতারা* (১৮৯২ খ্রি)। এ উপন্যাসটিরও মূল উপজীব্য বিষয় নারীশিক্ষা। এ উপন্যাসের মূল চরিত্র নয়নতারা সমকালীন আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত নারী চরিত্রের এক উত্তম আদর্শ। তাঁর শিক্ষা, চারিত্রিক গুণ ও ব্যক্তিত্ব দ্বারা পারিবারিক সংকট উত্তরণে ভূমিকা পালন করেন। ইংরেজি শিক্ষিত হলেও নয়নতারা ঈশ্বরভক্তি ও সমকালীন সামাজিক আচার অস্বীকার না করে বরং এর সাথে সামাঞ্জস্য রেখে চলেছেন। বিদ্যার্জন করলে নারীদের ধর্মে অমতি হয় এবং সামাজিক সংস্কার প্রতিপালনে অস্বীস্কৃতি জানায়- রক্ষণশীলদের এরূপ মনোভাবের জবাব দিয়েছেন শিবনাথ শাস্ত্রী এ উপন্যাসের

৮৯. শিবনাথ শাস্ত্রী, *মেজবউ*, কলিকাতা, ১৮৭৯

৯০. রামদুলাল বসু, *বঙ্কিচন্দ্রের সমকালীন গৌণ ঔপন্যাসিকবৃন্দ,* গ্রন্থ বিকাশ, কলকাতা, ১৯৭৪, পৃ. ৭০

মাধ্যমে। এতে শিবনাথ শাস্ত্রী বাঙালি নারীর চরিত্র চিত্রণে এক নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করে সাহিত্য সমালোচকদের প্রশংসা অর্জন করেন।[৯১]

দুখানি ছবি ১২৯৫ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত একটি উপন্যাস এবং এর রচয়িতা চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৫৮-১৯১৬ খ্রি.)। উপন্যাসটির মূল উপজীব্য বিধবা বিবাহ হলেও এতে নারীশিক্ষা প্রসঙ্গও স্থান পেয়েছে। এ উপন্যাসের মূল চরিত্র প্রেমমালা রক্ষণশীল পরিবারের একজন মেয়ে। তবে তাঁর বাবা তাঁর জন্য অন্তঃপুর শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। বিনয়ভূষণের সাথে তাঁর বিয়ে হয়। স্বামী বিনয়ভূষণ স্ত্রী প্রেমমালার শিক্ষার অনুরাগী ছিলেন, তবে সেকালের অনেকের মত তিনিও শঙ্কার মধ্যে ছিলেন যে, পাছে শিক্ষিত হওয়ায় তাঁর স্ত্রী গৃহকর্মে অমনোযোগী হয়ে পড়ে। এ বিষয়ে তিনি তাঁর স্ত্রীকে সতর্কও করেছিলেন।[৯২] বস্তুত এটিই ছিল তখনকার অধিকাংশ বাঙালি পুরুষের মানসিকতা। স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবা প্রেমমালা পিত্রালয় সুধাহাটিতে ফিরে আসেন এবং ছোট ছোট মেয়েদের পাঠদানের জন্য একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর এ স্কুলে মেয়েদের গার্হস্থ্য জীবনের প্রয়োজনীয় শিক্ষাও প্রদান করা হতো।

উনিশ শতকে একজন অগ্রগণ্য মহিলা ঔপন্যাসিক ছিলেন স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৫-১৯৩২)। তিনি ছিলেন কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দিদি। তবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অগ্রজরূপেই তাঁর খ্যাতি সীমাবদ্ধ ছিল না। তিনি ছিলেন প্রথম বাঙালি নারী যাঁর বাংলা সাহিত্যের সর্বোতমুখী পথে স্বাচ্ছন্দ্য বিচরণ ছিল। প্রথম বাঙালি নারী ঔপন্যাসিকের মর্যাদার অধিকারী বহুমুখী প্রতিভাধর স্বর্ণকুমারী দেবী *ভারতী পত্রিকা*'র সম্পাদক ছিলেন।[৯৩] তিনি ১৮৮২ সালে *স্নেহলতা* বা *পালিতা* নামক একটি সামাজিক উপন্যাস রচনা করেন।[৯৪] *কাহাকে* শিরোনামেও তাঁর একটি সামাজিক উপন্যাস ছিল। এ উপন্যাসে স্বর্ণকুমারী দেবী সমকালীন বাংলার নারীশিক্ষা ও এর প্রতি সামাজিক মনোভাবের লেখচিত্র অংকন করেছেন। [৯৫]

নারীশিক্ষার প্রতি সমর্থন ও এর উপকারিতা যেমন উনিশ শতকে রচিত অনেক উপন্যাসের বিষয়বস্তু তেমনি, এসময় নারীশিক্ষা বিরোধী উপন্যাসও রচিত হয়েছিল। নারীশিক্ষা বিরোধী উপন্যাস রচয়িতাদের মধ্যে যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর নাম উল্লেখযোগ্য। *বঙ্গবাসী* পত্রিকার সম্পাদক যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু ছিলেন নারীশিক্ষার ঘোর বিরোধী। তাঁর রচিত *মডেল ভগিনী* ও *বাঙালী চরিত* উপন্যাসে তিনি নারীশিক্ষার প্রতি তীর্যক ভাষায় কটাক্ষ ও

---

৯১. রাজনারায়ণ বসু, *আত্মচরিত*, পি সি দাস, কলিকাতা, ১৩২১ বঙ্গাব্দ; রামদুলাল বসু, *পূর্বোক্ত*, ৭৮

৯২. চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *দুখানি ছবি*, কলিকাতা, ১৩০৫, পৃ. ৫১-৫২

৯৩. স্বর্ণকুমারী দেবী রচিত প্রথম উপন্যাসের নাম *দীপ নির্বাণ* । এ উপন্যাসটি ১৮৭৬ সালে প্রকাশিত হয়েছিল।

৯৪. প্রথমে তাঁর উপন্যাসটি *স্নেহলতা* নামে প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু একই শিরোনামে কুসুমকুমারী দেবীর একটি উপন্যাস প্রকাশিত হলে পরবর্তী মুদ্রণে স্বর্ণকুমারী দেবী তাঁর উপন্যাসের নাম পরিবর্তন করে *পালিতা* রাখেন। রণজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১২৩

৯৫. দ্রষ্টব্য রণজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১২৩-১২৫

ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করেছেন। *মডেল ভগিনি*র নায়িকা কমলিনী একজন শিক্ষিত আধুনিক মেয়ে। লেখক তাঁর জীবনযাত্রা, পোশাক-পরিচ্ছেদ ও অবাধ মেলাশোর কথা বলে তাঁর চারিত্রিক অবনতির কথা তুলে ধরেছেন। অন্নপুর্ণা নামক অন্য একটি নারী চরিত্র কিভাবে পড়াশুনা শিখে হিন্দু সমাজের সামাজিক ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানকে উপেক্ষা করছেন, তাও তিনি ব্যঙ্গাত্মক বর্ণনার মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন।[৯৬] নারীশিক্ষার প্রতি যোগেন্দ্রচন্দ্রের বিদ্বেষ প্রকাশ পেয়েছে তাঁর *বাঙালী চরিত* উপন্যাসেও। এ উপন্যাসের 'শিক্ষিত বাঙালিনী' শীর্ষক অধ্যায়ের প্রতিটি ছত্রেই এর প্রমাণ রয়েছে। নারীশিক্ষার প্রতি নিন্দা ও কটাক্ষ করে তিনি লিখেছেন:

> ম্লেচ্ছ অধিকারে 'স্ত্রীশিক্ষা' নাম্নী এক অভিনব সামগ্রী এদেশে আমাদানি হইয়াছে। এই 'স্ত্রীশিক্ষাই সর্ব্বনেশে জিনিস; তেঁতুলে কেউটের বিষ', কিন্তু ইহাই বাবুদের সখের সোহাগের সুভোগের পদার্থ। ইহা হলাহল সবিনী, কালনাগিনী, শিক্ষাই আজ রমনীকুলের সর্ব্বোত্তম ভূষণ;– ইহাই যেন হাতের নোয়া, সীথার সিন্দুর; ইহাই পতিভক্তি, পুত্রস্নেহ, গৃহকর্ম; ইহাই সংসারের সার সর্বস্ব। এই শিক্ষা না থাকিলে কন্যা কুৎসিতা, অসভ্যা, বিবাহের অযোগ্যা। বরং একদিন দশদিক উজ্জ্বলাকৃত, কহিনুর বিভুষিত স্বর্ণমুকুট হস্তে পাইয়াও দূরে নিক্ষেপ করিত পারি। তথাচ এই 'শিক্ষাটুকু' ছাড়িতে পারি না। অধিক কি? বরং বিধবা হইয়া বারমাস বাস করিব তথাপি এই শিক্ষা ছাড়িব না। এমন ঝোঁক, এমন স্নেহ, এমন উন্মত্ততা।[৯৭]

এ উপন্যাসে যোগেন্দ্রচন্দ্র একজন শিক্ষিত নারীর প্রাত্যহিক দিনলিপির কথা বর্ণনা করে দেখাতে চেষ্টা করেছেন যে, মেয়েরা শিক্ষিত হলে গৃহকর্মে উদাসীন হয়ে পড়ে এবং এতে সংসার উচ্ছন্নে যায়। শিক্ষিত নারীর শেষ পরিণতিও যে সুখকর হয় না, *মডেল ভগিনী* উপন্যাসের নায়িকা কমলিনীর জীবন চিত্রের মাধ্যমে তিনি তা প্রমাণের চেষ্টা করেছেন। যুগচাহিদা অনুযায়ী শিক্ষিত বাঙালি নব্যবাবুদের শিক্ষিত স্ত্রী গ্রহণের প্রবণতা এবং স্বামী কর্তৃক শিক্ষিত স্ত্রীর প্রশংসাকে তিনি ব্যঙ্গ ও শ্লেষাত্মক ভাষায় বর্ণনা করেছেন *বাঙালী চরিত* উপন্যাসে। পরিশেষে তিনি নারীশিক্ষাকে বলেছেন, "ইহা বড় সর্বনেশে শিক্ষা।"[৯৮]

শুধু যোগেশচন্দ্র বসু নয়, বাঙালি বিদ্বৎসমাজে এরূপ আরো অনেক মানুষ ছিলেন এবং তাঁদের কেউ কেউ নিজেদের সাহিত্যকর্মের মাধ্যমে নারীশিক্ষার বিরোধিতা করেছেন। এ প্রসঙ্গে বীরেশ্বর পাঁড়ের *অদ্ভুত স্বপ্ন* নামক রচনাটির কথা বলা যায়। ১২৯৫ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত এ উপন্যাসটিতেও নারীশিক্ষা বিষয়ে বিরূপ মনের পরিচয় রয়েছে। লেখক আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন নারী ও পুরুষকে একই শিক্ষা দিলে তাদের কর্মক্ষেত্র পরিবর্তিত হয়ে যাবে। নারী যাবে বাইরের কর্মক্ষেত্রে এবং পুরুষ থাকবে অন্তঃপরে।[৯৯]

---

৯৬. যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু, *মডেল ভগিনী*, যোগেন্দ্র রচনাবলী, কলিকাতা, ১৯৭৬; *সাহিত্যে যোগেন্দ্রচন্দ্র*, সপ্তমবার্ষিক স্মৃতি সভায় 'সাহিত্য সম্মিলন' কর্তৃক প্রকাশিত। কলকাতা, ১৩১৮ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৪২-৪৩

৯৭. যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু, *বাঙালী চরিত*, যোগেন্দ্র রচনাবলী, কলিকাতা, ১৯৭৬, পৃ. ১৩৯

৯৮. ঐ, পৃ. ১৪১

৯৯. রণজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১২৭

উপর্যুক্ত আলোচনায় দেখা যায় যে, উনিশ শতকে নারীশিক্ষাকে কেন্দ্র করে বাঙালি সমাজে যে তর্ক-বিতর্ক এবং দ্বিধাবিভক্তি দেখা দিয়েছিল সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মতো উপন্যাসেও এর প্রভাব পড়ে। তবে সুখের বিষয় হলো এ সময় নারীশিক্ষা বিরোধীদের তুলনায় এর সপক্ষ শক্তিই সংখ্যায় বেশি ছিল। ফলে বাঙালি মননে নারীশিক্ষা বিদ্বেষীরা আর ততটা প্রভাব ফেলতে পারেননি।

প্রবন্ধ ও উপন্যাস সাহিত্যের মতো উনিশ শতকে রচিত বাংলা নাটকেও নারীশিক্ষা প্রসঙ্গ স্থান পেয়েছে।[১০০] অবশ্য একথাও সত্য যে, উনিশ শতকে রচিত নাটকে নারীশিক্ষা প্রত্যক্ষ ও প্রধান উপজীব্য হিসেবে বিবেচিত হয়নি। বরং কিছু কিছু নাটক ও প্রহসনে অন্যান্য সামাজিক প্রসঙ্গের সাথে নারীশিক্ষার প্রসঙ্গ ওঠে এসেছে। যেমন তারকচন্দ্র চূড়ামনি রচিত *স্বপত্নী* নাটক। এতে অন্যান্য সামাজিক সমস্যার সাথে নাট্যকার নারীশিক্ষার প্রসঙ্গটিও টেনেছেন। মাইকেল মধুসূধন দত্তের (১৮২৪-১৮৭৩ খ্রি.) বিখ্যাত প্রহসন *একেই কি বলে সভ্যতা*। এতে তিনি শহরের ক্ষয়িষ্ণু সমাজচিত্র অঙ্কন করেছেন। এ নাটকের ভাষ্য মতে, জ্ঞানতরঙ্গিনী সভায় শহরের নব্য শিক্ষিতগণ মদ্যপ অবস্থায় মিলিত হয়। তাঁরা সেখানে মাতলামি করলেও নারীশিক্ষার কথা ভুলেনি। এ সভার সভাপতি নববাবু তাঁর অভিভাষণে সভ্যতার আবশ্যিক শর্ত হিসেবে অন্যান্য প্রসঙ্গের সাথে 'মেয়েদের এডুকেট' করার কথা বলেছেন।[১০১]

উনিশ শতকের একজন প্রখ্যাত নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র (১৮৩০-১৮৭৩ খ্রি.)। ১৮৬০ সালে রচিত *নীল দর্পন* তাঁর শ্রেষ্ঠ নাটক।[১০২] দীনবন্ধু মিত্র ছিলেন নারীশিক্ষার একজন সমর্থক। তাঁর *সধবার একাদশী* (১৮৬৬) ও *লীলাবতী* (১৮৬৭ খ্রি.) নাটকে নারীশিক্ষার প্রতি সমর্থন রয়েছে। নারীশিক্ষা প্রসঙ্গটি উত্থাপিত হয়েছে বিপিনমোহন সেনগুপ্তের *হিন্দুমহিলা* নাটক ও হরিশচন্দ্র দত্তের *ম্যাও ধরবে কে?*– নাটকেও। *হিন্দুমহিলা* নাটকে নায়িকা প্রমদা সম্পর্কে বলা হয়েছে, "বিদ্যাশিক্ষা দ্বারা স্বভাবকে যে কিরূপ নত করে বলা যায় না, ছোটবৌ আমাদের লেখাপড়া শিখিয়া দিন দিন সুশীলা ও নম্রমুখী হইতেছে।"[১০৩] শিক্ষিত মা যে সন্তান প্রতিপালনে অধিকতর সফল হন, এ জনপ্রিয় মতটি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা রয়েছে হরিশচন্দ্রের নাটকে। নারীশিক্ষা ও নারী স্বাধীনতাকে মূল বিষয়বস্তু করে রচিত অন্য কয়েকটি নাটক হলো অনুকূলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের *দেশাচার* (কলিকাতা, ১৮৭২ খ্রি.), অজ্ঞাতনামা লেখকের *মেয়ে মনস্টার মিটিং* (কলিকাতা, ১৮৭৪ খ্রি.) ও *ইহারই নাম চক্ষুদান* (কলিকাতা, ১৮৭৫)। নারীশিক্ষা প্রসঙ্গ প্রাসঙ্গিকভাবে এসেছে লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্তীর *কুলীনকন্যা*, দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *স্বর্ণলতা*, সুকুমারী দত্তের *অপূর্ব সতী* (কলিকাতা, ১৮৭৫ খ্রি.) এবং মনোমোহন

---

১০০. বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য গোলাম মুরশিদ, *সমাজ সংস্কার আন্দোলন ও বাংলা নাটক*, পৃ. ২৯২-৩০৬

১০১. মাইকেল মধুসূধন দত্ত, *একেই কি বলে সভ্যতা, পৃ. ২৪;* গোলাম মুরশিদ, *সমাজ সংস্কার আন্দোলন ও বাংলা নাটক, পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৯৪

১০২. সমকালের নীলচাষ ও নীলকর সাহেবদের প্রজাপীড়ন এবং শাসকশ্রেণির পক্ষপাতমূলক আচরণ নাটকটির বিষয়বস্তু। নাটকটি তৎকালীন বাঙালি সমাজে বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং বাঙালি কৃষকদের নীলবিদ্রোহে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

১০৩. বিপিনমোহ সেনগুপ্ত, *হিন্দুমহিলা*, কলকাতা, ১৮৬৮; রণজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১২৮

বসুর *নাগাশ্রমের অভিনয়* (কলিকাতা, ১৮৭৫ খ্রি.) ইত্যাদি নাটক-প্রহসনে। এসব নাটকে যে কেবল নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করা হয়েছে তা নয়, নারীশিক্ষা বিরোধী মনোভাবও প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে।[১০৪]

নারীশিক্ষার সমর্থনে যেমন নাটক প্রহসন লেখা হয়েছিল, তেমনি এর বিরোধী মানসিকতার চিত্র সম্বলিত নাটকও রচিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে কানাইলাল সেনের *কলিরদশা* (কলিকাতা, ১৮৭৫ খ্রি.) প্রহসনের কথা বলা যায়। এ প্রহসনে নারীশিক্ষা সম্পর্কে কটাক্ষ করে বলা হয়েছে যে, "বিশেষ স্ত্রীজাতি অবলা, এদের যে লেখাপড়া শিক্ষা দেওয়ার যে কত ফল ও উপকার তা এখন বেশ বুঝতে পাল্লেন। অধিকাংশ কেবল পেমপত্র লিখতে, আর অবশেষে সুবিজ্ঞ অভিনয় সংক্রান্ত মহাত্মাদেরও কতক কতক ব্যবহারে লাগ্‌চে।"[১০৫] *আক্কেলসেলামী* বা *উদ্ভট মিলন* অক্ষয়কুমার চক্রবর্তী রচিত প্রহসন। এটি মূলত নারী স্বাধীনতা বিরোধী রচনা। এতে নাট্যকার দেখাতে চেয়েছেন নারীশিক্ষা থেকেই নারী স্বাধীনতা ও অনাচারের জন্ম হয়েছে। ডিগ্রি নয়, একজন ভালো স্ত্রীর জন্য প্রয়োজন সাংসারিক জ্ঞান। তাই তথাকথিত নারীশিক্ষা সাংসারিক জীবনে অপ্রয়োজনীয়- এ ছিল অক্ষয়কুমারের *আক্কেল সেলামী* নাটকের মূল কথা।[১০৬] উনিশ শতকের একজন উল্লেখযোগ্য প্রহসনকার ও নাট্যাভিনেতা ছিলেন অমৃতলাল বসু (১৮৫৩-১৯২৯ খ্রি.)। হাস্যরসাত্মক নাট্যরচনার জন্য তিনি স্বদেশবাসীর কাছে 'রসরাজ' নামে পরিচিতি পেয়েছিলেন। *বৌমা* (১৮৯৭ খ্রি.) ও *তাজ্জব ব্যাপার* (১৮৯০ খ্রি.)সহ তাঁর রচিত কয়েকটি প্রহসনেও নারীশিক্ষাকে ব্যঙ্গাত্মকভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। একই চিত্র দেখ যায় হরদেব রচিত *শিক্ষিতা বৌ* প্রহসনে। নারীশিক্ষাকে ব্যঙ্গ করতে যেয়ে গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮৪৪-১৯১২ খ্রি.; তাঁর ছদ্মনাম ছিল মুকুটরচরণ মিত্র) তাঁর *পাঁচকনে* প্রহসনে উল্লেখ করেছেন, "Entrance পাশ না কল্লে কেউ কুটনা কুটতে পারে না, LA পাশ না কল্লে কেউ রাঁধতে পারে না; MA পাশ কল্লে খাওয়া খেতে যাও আর না যাও, কিন্তু তার আগে হাওয়া খেতেই হবে। বিলেত যাওয়া Compulsory."[১০৭]

উপর্যুক্ত আলোচনায় দেখা যায় যে, উনিশ শতকে নারীশিক্ষাকে কেন্দ্র করে বাঙালি সমাজের মতপার্থক্যের প্রতিচ্ছবি বাংলা নাটক ও প্রহসনেও প্রতিফলিত হয়েছে। নাট্যকারদের মধ্যে প্রভাবশালী ও খ্যাতিমানদের বেশির ভাগই তাঁদের সৃষ্টিকর্মের মধ্য দিয়ে নারীশিক্ষাকে সমর্থন এবং এ বিষয়ে বাঙালি সমাজকে উৎসাহিত

---

১০৪. গোলাম মুরশিদ, *সমাজ সংস্কার আন্দোলন ও বাংলা নাটক*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৯৪-২৯৫

১০৫. উদ্ধৃতি, জয়ন্ত গোস্বামী, *সমাজচিত্রে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা প্রহসন*, সাহিত্যশ্রী, কলিকাতা, ১৩৮১ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৯০৫

১০৬. জয়ন্ত গোস্বামী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৯৬২

১০৭. গিরিশচন্দ্র ঘোষ, *পাঁচকনে*, কলিকাতা, ১৮৯৬, পৃ. ৭

করেছেন। আবার কারো রচনায় আবহমান বাংলার সাধারণ মানুষের মনোভাব "মেয়েরা লেখাপড়া শিখলে তারা এবং সমাজ- সংসার রসাতলে যাবে"-এ চিন্তাও কাজ করেছে।

বাংলা সাহিত্যের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা হলো কাব্য সাহিত্য। তবে সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মতো উনিশ শতকের কাব্য সাহিত্যে নারীশিক্ষা প্রসঙ্গটি তেমন জোরালোভাবে উচ্চারিত হয়নি। নারীশিক্ষা প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে এমন কাব্য সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম। যে অল্প কয়কটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় এর মধ্যে অন্যতম গীতিকবি সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার (১৮৩৮-১৮৭৮ খ্রি.) রচিত *মহিলা কাব্য* গ্রন্থ। এটি তাঁর শ্রেষ্ঠ কাব্য গ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃত। কবির মৃত্যুর পর ১৮৮০ ও ১৮৮৩ সালে দু'খণ্ডে এ কাব্য গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছিল। কবি সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার এ কাব্য গ্রন্থে নারীকে জননী, জায়া এবং কন্যারূপে উপস্থাপন করেছেন। তিনি নারীশিক্ষার প্রকৃতি, শিক্ষা ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ বৈষম্য এবং নারীশিক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটি ও সীমাবদ্ধতাসহ নারীশিক্ষা সংক্রান্ত প্রায় প্রতিটি বিষয়ে বক্তব্য রেখেছেন তাঁর *মহিলা কাব্যে*। এ কাব্যে কবি সন্তানের সুশিক্ষার জন্য একজন শিক্ষিত মায়ের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন। কবির ভাষায়:

হেতু যদি স্ত্রী শিক্ষার
কিছু নাহি পাও আর
সন্তানের শিক্ষা হৃদে করহ স্মরণ

পুত্র সুপণ্ডিত হয়ে
পণ্ডিতে অমৃত কয়
সে সূধা ভুঞ্জিবে শুধু অধিকার তার
গুণবতী রমণী নিলয়ে আছে যার।[১০৮]

হিন্দু পরিবারের দুর্দশাগ্রস্থ কন্যাসন্তানদের অবস্থা এবং তাদের লেখাপড়ার ব্যাপারে অভিভাবকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে কবি উল্লেখ করেছেন:

গৃহী পেয়ে পরিতাপ
নারী বলে কি পাপ।
রে মূঢ়! কাতর কেন থাকিতে উপায়?
খেদ ছাড় যত্ন কর ললনা শিক্ষায়।[১০৯]

নারীশিক্ষা বিষয়ে তিনি বাঙালি হিন্দু সমাজের প্রতি পরামর্শ রেখেছিলেন তাঁর কাব্যে। যেমন-

ভ্রান্তিবোধ পরিহর
স্ত্রীশিক্ষায় যত্ন কর
হে হিন্দু! ধরায় তুমি বুদ্ধিমান
জায়া ভগ্নী কন্যাগণে
শিক্ষা দেহ সযতনে
সমাজ অশুভ সবে পাবে পরিত্রাণ।[১১০]

---

১০৮. সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, *মহিলা কাব্য*, ৫২ স্তবক, বজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত, কলিকাতা, ১৯৫৭
১০৯. ঐ, ৫৬ স্তবক

উনিশ শতকের শেষ দিকে এসেও যে নারীশিক্ষা প্রধানত নগরকেন্দ্রিকই রয়ে গেছে, এ বিষয়টিও কবির দৃষ্টি এড়ায়নি। তাই নারীশিক্ষাকে অর্থবহ করার জন্য প্রত্যন্ত গ্রামেও এর বিস্তার ঘটানোর পক্ষে তিনি সুপারিশ করেছেন। তাঁর ভাষায়:

নগরে স্ত্রীশিক্ষা হয়
তায় কিবা ফলোদয়
সৌধ শিরে দ্বীপ কিন্তু ভিতরে আন্ধার
গ্রামে গ্রামে বিচারিয়া
নারীদুঃখ দেখ গিয়া
যা ছিল আছে কোন প্রতিকার তার?[১১১]

উপর্যুক্ত কাব্য গ্রন্থটি ব্যতীত নারীশিক্ষা প্রসঙ্গ উল্লিখিত হয়েছে সমকালীন এমন আর কোনো কাব্য গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায় না। তবে ষাটের দশক থেকে অনেকেই বিশেষ করে নারীরা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় নারীশিক্ষা বিষয়ক কবিতা লিখেছেন। সংবাদপত্রে প্রকাশিত কবিতার মধ্যে নারীশিক্ষার পক্ষে-বিপক্ষে উভয় প্রকার কবিতাই দেখা যায়। *বামাবোধিনী* পত্রিকায় বর্ধমানের শ্রীমতী লক্ষ্মীমণির একটি কবিতা ছাপা হয়েছিল। এতে কবি নারীদের লেখাপড়া শিখার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন। কবির ভাষায়:

ওগো সব কুলবতী
হও সবে বিদ্যাবতী
বিদ্যাহার যত্নে পর গলে
বিদ্যা না থাকিলে পরে
অনাদরে প্রাণ যায় জ্বলে।[১১২]

অবোধবন্ধু যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ সম্পাদিত একটি মাসিক পত্রিকা। এ পত্রিকায় জনৈক জাহ্নবী দেবী 'বিদ্যা' নামে একটি সুদীর্ঘ কবিতা লিখেছিলেন। এতে কবি বিদ্যাকে এক অমূল্য সম্পদ হিসেবে আখ্যায়িত করে বালক-বালিকা নির্বিশেষে সকলেরই লেখাপড়া করার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন।

বিদ্যার সমান কি ধন আছে সংসারে
বিদ্যার গুণের কথা বর্ণিতে কে পারে?
বিদ্যাই সবার মূল কুবুদ্ধিনাশিনী
জ্ঞানময়ী বিদ্যাদেবী সুবুদ্ধিদায়িনী

বালক বালিকাগণ হয়ে একজন
যতনেতে বিদ্যাধনে কর উপার্জন।[১১৩]

শ্যামাসুন্দরী নামের জনৈক মহিলা গৃহপিঞ্জরে অবরুদ্ধ নারীদের মুক্তি এবং তাদের উন্নতির জন্য বিদ্যার্জন এবং তাদের লেখাপড়ার জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করতে সরকার ও সমাজপতিদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে একটি

---

১১০. সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, *পূর্বোক্ত*, ৭১ স্তবক

১১১. সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, *পূর্বোক্ত*, ৫৯ স্তবক

১১২. *বামাবোধিনী*, কলকাতা, কার্তিক, ১২৭৪ বঙ্গাব্দ

১১৩. *অবোধবন্ধু*, কলকাতা, বৈশাখ, ১২৭৫ বঙ্গাব্দ

কবিতা লিখেছিলেন। *বামাবোধিনী* পত্রিকায় এ কবিতাটি প্রকাশিত হয়েছিল। কবিতাটির কয়েকটি চরণ ছিল নিম্নরূপঃ

আর বঙ্গবালা চিরপরাধীনা
নাহি বিদ্যাবুদ্ধি বড় জ্ঞানহীনা
পশুর মতো আছে অনুক্ষণ
গৃহপিঞ্জরিতে পড়িয়ে;
তাদের উন্নতি করহে বিধান
রাজ্ঞীর সমীপে বলিয়ে
বালা বিদ্যালয় হউক সর্বত্র
বিদ্যা শিখে বালা হউক পবিত্র
সভ্য ভ্রাতৃগণ করিয়ে যতন
জ্ঞানবিদ্যা দান করিয়ে
বঙ্গবামাদের দুঃখের রজনী
দূর কর ত্বরা করিয়ে।[১১৪]

নারীশিক্ষা প্রসারের জন্য গ্রামাঞ্চলে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন অনেকেই। এ কথাটিই ওঠে এসেছে একজন নারীর লেখা কবিতায়। কবির ভাষায়ঃ

বিদ্যালয় স্থাপনেতে বহু ফলোদয়
বিদ্যালয় সহ স্থাপ ভেষজ আলয়
প্রতিজনপদে স্থাপ বামা বিদ্যালয়
সমসুখ অধিকারী সকলেই হয়।[১১৫]

আগেই বলা হয়েছে যে, নারীশিক্ষাকে উৎসাহিত করার জন্য কেবল এর সপক্ষে নয়, অনেকেই নারীশিক্ষার বিপক্ষেও কবিতা লিখেছেন। এমন একটি কবিতা দৃষ্টান্ত হলো ঈশ্বরগুপ্তের 'দুর্ভিক্ষ' কবিতা। *সংবাদ প্রভাকর* পত্রিকার সম্পাদক ঈশ্বরগুপ্ত (১৮১২-১৮৫৯ খ্রি.) প্রথম জীবনে নারীশিক্ষা বিরোধী ছিলেন। ১৮৪৯ সালে বেথুন স্কুল প্রতিষ্ঠার পর এ স্কুলে পড়া মেয়েদেরকে তিনি উচ্ছৃঙ্খল বলে কটাক্ষ করেছেন তাঁর দুর্ভিক্ষ কবিতায়। তাঁর ভাষায়ঃ

আগে মেয়েগুলো ছিল ভালো,
ব্রতধর্ম্ম কোর্ত্তো সবে
একা বেথুন এসে শেষ করেছে
আর কি তাদের তেমন পাবে।
যত ছুঁড়িগুলো তুড়ি মেরে
কেতাব হাতে নিচ্ছে যবে
তখন 'এ' 'বি' শিখে বিবি সেজে

---

১১৪. *বামাবোধিনী*, কলকাতা, বৈশাখ, ১২৮২

১১৫. *বামাবোধিনী*, চৈত্র, ১২৭২ বঙ্গাব্দ

বিলাতী বোল কবেই কবে।[১১৬]

নারীশিক্ষা লাভ করলে সংসার ধর্মে অনাসক্তি তৈরি হয়, সমাজ-সংসারে অনাসৃষ্টি দেখা দেয়–নারীশিক্ষা বিরোধীদের এরূপ মতেরও প্রকাশ রয়েছে অনেক কবিতায়।

উপর্যুক্ত আলোচনার উপসংহারে বলা যায় যে, বাংলার ইতিহাসে উনিশ শতক নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ। এ শতককে বাংলার ইতিহাসের যুগসন্ধিক্ষণও বলা হয়। ব্রিটিশ শাসনে বুর্জোয়া অর্থনীতি ও আধুনিক পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাবে উনিশ শতকে বাংলায় যে পরিবর্তনের সূচনা হয়, তাকে সাধারণভাবে 'নবজাগরণ' বলা হয়ে থাকে। এ নবজাগরণ যুগে বাংলায় যে সমাজ সংস্কারের সূচনা হয় তাঁর অন্যতম লক্ষ্য ছিল নারীমুক্তি। আর এ নারী মুক্তির প্রথম শর্ত হিসেবে তখনকার সমাজ নায়কেরা নারীশিক্ষার উপর গুরুত্বারোপ করেন। উল্লেখ্য যে, উনিশ শতকে বাংলায় নারীশিক্ষার প্রথম পর্বটির সূচনা হয় খ্রিস্টান মিশনারীদের দ্বারা। তবে তাঁদের নারীশিক্ষা বিস্তার পরিকল্পনায় বাঙালি নারীদের আত্মসত্তা বিকাশের কোনো তাগিদ ছিল না, ছিল এদেশে খ্রিস্টীয় আদর্শ ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির গৌরব ও মহিমা প্রচার। ফলে মিশনারীদের পরিচালিত নারীশিক্ষা বাঙালি সমাজে তেমন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। বাঙালি নারীদের অবস্থার এরূপ বাস্তব পরিস্থিতিতে নারীশিক্ষা বিস্তারে উনিশ শতকের প্রথমার্ধেই দেশীয় উদ্যোগ শুরু হয়। দেশীয় উদ্যোক্তারা নারীশিক্ষা প্রসারে নানাভাবে কাজ করেন। উনিশ শতকে বাংলায় বিদ্যমান নারীশিক্ষা বিরোধী সমাজ বাস্তবতায় প্রথমেই প্রয়োজন ছিল নারীশিক্ষার পক্ষে সচেতনতা বৃদ্ধি ও একটি অনকূল জনমত তৈরি। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য সংবাদপত্র ও সাহিত্যকে প্রধান অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করা হয়।

বলাবাহুল্য যে, জনমত সংগঠনে সংবাদপত্র একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে স্বীকৃত। উনিশ শতকে বাংলায় বেশ কিছু মাসিক, পাক্ষিক ও সাপ্তাহিক সংবাদ ও সাময়িক পত্র প্রকাশিত হয়েছিল। নারীশিক্ষার সমর্থকগণ জনমত সংগঠন ও নারীশিক্ষা প্রসারে এসব সংবাদ-সমায়িক পত্রে লেখালেখি করেছেন। প্রতিক্রিয়া হিসেবে নারীশিক্ষা বিরোধী রক্ষণশীল সমাজও নারীশিক্ষার বিপক্ষে জনমত সংগঠিত করার জন্য সংবাদপত্রকে অবলম্বন করেছেন। ফলে নারীশিক্ষার পক্ষে বিপক্ষে সংবাদপত্রে তর্ক-বিতর্ক হয়েছে। গোটা উনিশ শতক ধরেই কমবেশি তর্ক-বিতর্ক চলেছে। এসব তর্ক-বিতর্কের মধ্যে দিয়ে সমাজে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। নারীশিক্ষা বিরোধীদের রক্ষণশীল মনোভাবের বিপক্ষে প্রগতিবাদীদের নারীশিক্ষার পক্ষে যৌক্তিক অবস্থান ও ব্যাখ্যা বাঙালি সমাজকে ক্রমশ প্রভাবিত করতে সক্ষম হয়েছে। ফলে বাঙালি সমাজের রক্ষণশীলতা ক্রমশ দূরীভূত হয়ে প্রগতিশীল উদার ও মুক্ত চিন্তার প্রসার ঘটেছে। নারীকে কেবল পুরুষের অধীন সত্তা হিসেবে বিবেচনা না করে তাদের মানুষ হিসেবে বিবেচনা করার মনোবৃত্তি বাঙালি সমাজে ধীর গতিতে হলেও সঞ্চারিত

১১৬. ঈশ্বরগুপ্ত, 'দুর্ভিক্ষ', *ঈশ্বরগুপ্ত গ্রন্থাবলী*, বসুমতী সাহিত্য মন্দির সংস্করণ, কলকাতা, পৃ. ১৪

হয়েছে। এরূপ মনোভাব বাঙালি সমাজে নারীশিক্ষার সপক্ষে অনুকূল জনমত ও একটি বৌদ্ধিক পটভূমি বিনির্মানে ভূমিকা রেখেছিলো।

সাহিত্যকে বলা হয় সমাজের দর্পন। উনিশ শতককে বলা হয় বাঙালির মনোজগতের ভাঙ্গাগড়ার পর্ব। এ শতকে বাংলায় অনেক সামাজিক ও সংস্কার আন্দোলন হয়েছে। এসব আন্দোলনের মধ্যে নারীশিক্ষা আন্দোলন ছিল অন্যতম উল্লেখযোগ্য ঘটনা। নারীশিক্ষাকে কেন্দ্র করে বাঙালি সমাজ রীতিমতো উত্তাল হয়েছিলো। নারীশিক্ষা প্রয়োজন কী-না, নারীশিক্ষার প্রকৃতি কী হবে, পাঠ্যসূচিতে কী থাকবে ইত্যাদি নানা বিষয় নিয়ে বাঙালি সমাজ মুখরিত হয়ে ওঠেছিল। এরই প্রতিফলন দেখা যায় সমকালীন বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায়। নারীশিক্ষাকে কেন্দ্র করে প্রবন্ধসাহিত্য থেকে শুরু করে, উপন্যাস বা কথাসাহিত্য, নাটক-প্রহসন ও কাব্য সবকিছুই রচিত হয়েছে। প্রভাবশালী ও প্রতিষ্ঠিত লেখক-সাহিত্যিক থেকে শুরু করে সাধারণ নারী পর্যন্ত নারীশিক্ষার পক্ষে-বিপক্ষে লিখেছেন। সাহিত্যিক মানদন্ড বিচারে এসব লেখনীর সবগুলো উচ্চস্তরের ছিল এমনটা বলার কোনো অবকাশ নেই। তবে এসব লেখা নারীশিক্ষার মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে লেখকদের উদ্বেগ, সচেতনতা ও সম্পৃক্ততার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। এক কথায় বলতে গেলে গোটা উনিশ শতক জুড়ে নারীশিক্ষাকে কেন্দ্র করে বাঙালি সমাজের চিন্তাভাবনার একটি পূর্ণ প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠেছে উপরে বর্ণিত সাহিত্যকর্মে। এখানেই এ সাহিত্যের ঐতিহাসিক গুরুত্ব।

চতুর্থ অধ্যায়

বাংলায় নারীশিক্ষা প্রসারে ব্যক্তি ও বেসরকারি সাংগঠনিক প্রয়াস (১৮৪৯-১৯০৫ খ্রি.)

বর্তমান অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় নারীশিক্ষা প্রসারে ব্যক্তি ও বেসরকারি সাংগঠনিক প্রয়াস। এ অধ্যায়ের মূল আলোচনা শুরু হবে ১৮৪৯ সাল থেকে। উল্লেখ্য যে, বাংলায় নারীশিক্ষা প্রসারে এ বছরটিকে একটি মাইলফলক বছর হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কারণ এ বছরই বাংলায় নারীশিক্ষার প্রথম সার্থক প্রতিষ্ঠান বেথুন স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। স্কুলটি পরবর্তীতে সরকারি স্কুলে পরিণত হলেও এর যাত্রা শুরু হয়েছিল বেসরকারি ব্যক্তি উদ্যোগে। তদানিন্তন শিক্ষা সংসদের সভাপতি ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুনের উদ্যোগে এ স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত হলেও এ স্কুল প্রতিষ্ঠা এদেশীয় কয়েকজন মহৎপ্রাণ ব্যক্তিরও সংশ্লিষ্টতা ছিল। বেথুন স্কুল ছিল বাংলায় নারীশিক্ষার অগ্রগতির এক গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। এরপর নারীশিক্ষা ব্যাপারে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ ত্বরান্বিত হয়। উনিশ শতকের নারীশিক্ষা বিষয়ক আলোচনায় তাই ১৮৪৯ সালকে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। আর এ বিবেচনাতেই বর্তমান অধ্যায়ের আলোচনার সূচনা বছর হিসেবে ১৮৪৯ সালকে নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে প্রাসঙ্গিক কারণে আলোচনায় ১৮৪৯ পূর্ববর্তী ঘটনাকেও অন্তর্ভুক্ত করা হবে। অন্যদিকে ১৯০৫ সালও বাংলার ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এ বছর ব্রিটিশ সরকার বেঙ্গল প্রেসিডেন্সিকে দ্বিখণ্ডিত করে পূর্ববাংলা ও আসাম নামে একটি নতুন প্রদেশ সৃষ্টি করে। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুধু বাংলায় নয় ব্রিটিশ ভারতের রাজনীতিতেও আলোড়ন তৈরি হয়। অবিভক্ত বাংলার নারীশিক্ষার চালচিত্র উপস্থাপন যেহেতু এ অধ্যায়ের মূল উপজীব্য তাই ১৯০৫ সাল পর্যন্ত এ আলোচনা সম্প্রসারণ করা হয়েছে।

অভিসন্দর্ভের অন্যত্র আলোচনা করা হয়েছে যে, উনিশ শতকে বাংলায় নারীশিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম সূচনা হয়েছিল খ্রিস্টান মিশনারীদের মাধ্যমে। কিন্তু নানা কারণে তাদের এ প্রয়াস বেশি সফল হয়নি। এ অবস্থায় বাংলায় নারীশিক্ষা প্রসারে শিক্ষিত ও প্রগতিশীল বাঙালিদের অনেকেই ব্যক্তিগতভাবে এবং বেসরকারি পর্যায়ে সাংগঠনিক উদ্যোগে নারীশিক্ষা প্রসারে তৎপর হন। উল্লেখ্য যে, উনিশ শতকে বাংলার নবজাগরণের পটভূমিতে ইউরোপীয় ভাবাদর্শে উজ্জীবিত শিক্ষিত বাঙালিগণ ইউরোপের নারী মুক্তি আন্দোলন দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। আর এ নারী মুক্তির প্রথম শর্ত হিসেবে তাঁরা নারীশিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করেন। নারীশিক্ষা সম্পর্কে শিক্ষিত বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের আগ্রহ বৃদ্ধির ফলে নারীশিক্ষার ক্ষেত্র সম্প্রসারিত হয়।

নারীশিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নের উদ্যোগ হিসেবে বাঙালি বুদ্ধিজীবী সমাজ এর সপক্ষে জনমত গঠনের উদ্যোগ নেয়। একই সাথে নারীশিক্ষা প্রসারে অন্তঃপুর শিক্ষা কার্যক্রম ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। বর্তমান অভিসন্দর্ভের পূর্ববর্তী অধ্যায়ে উনিশ শতকে বাংলায় নারীশিক্ষা প্রসারে এদেশীয় উদ্যোগের জনমত সংগঠন প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। বর্তমান অধ্যায়ে বাংলায় নারীশিক্ষা প্রসারে অন্তঃপুর ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। এ বিষয়ে ব্যক্তি ও বেসরকারি সাংগঠনিক– উভয়বিধ প্রয়াস আলোচনা, পর্যালোচনা ও বিচার বিশ্লেষণ করা হবে। পুনশ্চ স্মরণীয় যে, বাংলায় নারীশিক্ষায় সরকারি প্রয়াসের সূচনা উনিশ শতকের মধ্য ভাগে ১৮৫৪ সালে গৃহীত উড ডেচপাসের (Wood Despatch) মাধ্যমে। এর আগে নারীশিক্ষা বিষয়ে ব্রিটিশ কোম্পানি সরকার কোনো আনুষ্ঠানিক দায়িত্ব পালন করেনি।

৪. ১: নারীশিক্ষায় ব্যক্তিগত ও বেসরকারি সাংগঠনিক উদ্যোগ (১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত)

পুনশ্চ উল্লেখ্য যে, নারীশিক্ষা সম্পর্কে শিক্ষিত বাঙালিদের আগ্রহ ও তৎপরতা ফলে বাংলায় নারীশিক্ষা সম্প্রসারিত হয়। তবে লক্ষ্যণীয় যে, উনিশ শতকের প্রথমার্ধে নারীশিক্ষার জন্য দেশীয় উদ্যোগে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা করা সম্ভবপর হয়নি। অর্থাৎ বেথুন স্কুল প্রতিষ্ঠার পূর্বে এদেশীয় নারীশিক্ষা সমর্থকগণ মেয়েদের পড়ার জন্য কার্যতঃ কোনো বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি। এর অন্যতম কারণ ছিল প্রচলিত সামাজিক সংস্কার। বাঙালি সমাজে বিদ্যমান অবরোধপ্রথা, বাল্যবিবাহ ও জাতিভেদ ব্যবস্থার ধারণাকে অতিক্রম করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই নারীশিক্ষার সমর্থক এদেশীয় গোষ্ঠীর কাছে মেয়েদের জন্য বিদ্যমান সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় রেখে তাদের শিক্ষাদান করাই শ্রেয় বলে অনুমিত হয়েছিল। তাই মেয়েদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাদান করার পূর্বে গৃহাভ্যন্তরে রেখেই তাদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়। গৃহাভ্যন্তরে মেয়েদের জন্য চালু করা এ শিক্ষাপদ্ধতি "অন্তঃপুর শিক্ষা" (Home Education For Women) বা 'জেনানা শিক্ষা' ব্যবস্থা নামে পরিচিত।[১] কেউ কেউ একে Private Tuition বা Herem Female Education বলেও আখ্যায়িত করেছেন।[২] এ শিক্ষা ব্যবস্থার মূল কথা ছিল সামাজিক বিঘ্ন বা অন্য কোনো কারণে নারীরা শিক্ষা লাভের জন্য ঘরের দুয়ার পেরুতে না পারলেও তাদের কাছে শিক্ষা পৌঁছে দেয়া হবে। অর্থাৎ নারীদের নিজ

---

১. অন্তঃপুর বা জেনানা শিক্ষা উনিশ শতকেই বাংলা প্রথম চালু হয়েছে এমনটা নয়। এর আগেও এদেশে এ শিক্ষাব্যবস্থা চালু ছিল। মুঘল আমলে এ শিক্ষা পদ্ধতি বঙ্গ-ভারতে বেশ জনপ্রিয়তাও পেয়েছিল। রাজপরিবার ছাড়াও এসময় হিন্দু-মুসলিম অভিজাত পরিবারে জন্য অন্তঃপুর বা জেনানা শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে নারীদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হতো।

২. ডিরোজিওর শিষ্য ধর্মান্তরিত খ্রিস্টান রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায় ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে 'Indian Female Education' নামে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। এতে তিনি বাঙালি নারীদের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক নয়, বরং Private Tuition নামক অন্তঃপুর শিক্ষাদানের পক্ষে সুপারিশ করেছিলেন। Latika Goshe, 'Social and Educational Movements for Women by Women', in Dr Kalidas Nag (ed.), *Bethun School & College Centenary Volume, 1849-1949,* Reprint, Bethun School & College, Calcutta, 2004, p. 132

গৃহে থেকে শিক্ষিত স্বামী, ভাই বা উপযুক্ত শিক্ষকের কাছে পাঠ গ্রহণ করবেন। বস্তুত, বাড়িতে ব্যক্তিগতভাবে পরিবারের শিক্ষিত পুরুষ/নারী বা শিক্ষকের কাছে নারীদের পাঠগ্রহণ পদ্ধতিকেই অন্তঃপুর বা জেনানা শিক্ষা বলা হয়।[৩] উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে প্রাতিষ্ঠানিক নারীশিক্ষা চালু হয়। তবে সামাজিক বাস্তবতার কারণে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি অন্তঃপুর শিক্ষাও চালু রাখতে হয়। অনেকেই ব্যক্তিগতভাবে যেমন অন্তঃপুর শিক্ষার পৃষ্ঠপোষকতা করেন, তেমনি সাংগঠনিকভাবেও এ শিক্ষা ব্যবস্থা চালু রাখা হয়।

মিশনারীদের তৎপরতা এবং ইউরোপীয় ভাবধারার প্রভাবে উনিশ শতকের বিশের দশকেই হিন্দু সমাজের নেতৃস্থানীয় কতিপয় ব্যক্তি নারীশিক্ষার প্রতি নৈতিক সমর্থন দান করেন। এদের মধ্যে রাজা রাধাকান্ত দেব (১৭৮৪-১৮৬৭ খ্রি.) রাজা বৈদ্যনাথ রায়[৪], রাজা রামমাহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩ খ্রি.) ও মতিলাল শীল (১৭৯২-১৮৫৪ খ্রি.) প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। রাজা রাধাকান্ত দেব ছিলেন কলকাতার হিন্দু সমাজের বিশিষ্ট নেতা। তাঁর পিতা গোপীমোহন দেব ছিলেন মহারাজ নবকৃষ্ণ দেবের দত্তক পুত্র ও উত্তরাধিকারী। সংস্কৃত, ফারসি ও আরবিতে দক্ষ পন্ডিত এবং ইংরেজিতেও মোটামুটি ভালো জ্ঞানের অধিকারী রাধাকান্ত একজন বিদ্যোৎসাহী ছিলেন।[৫] রাধাকান্ত দেব ১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি (১৮১৭ খ্রি.) প্রতিষ্ঠা ও এদের কর্মকান্ডের সাথেও তিনি সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন। বাংলায় পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের সাথেও তিনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। নারীশিক্ষার প্রতিও ছল তাঁর গভীর আগ্রহ। তাঁর উৎসাহ এবং আগ্রহে কলিকাতা স্কুল সোসাইটির হেডপণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার নারীশিক্ষার সমর্থনে বিখ্যাত *স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক* পুস্তিকাটি রচনা করেছিলেন। রাধাকান্ত দেবের উদ্যোগ ও প্রচেষ্টায় *The Female Juvenile Society* এ পুস্তিকাটি প্রকাশ করে। *স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক* রচনা ও এর প্রকাশে রাজা রাধাকান্ত দেবের সক্রিয় সহযোগিতা ও তৎপরতার কারণে অনেকে তাঁকেই এ পুস্তিকাটির প্রণেতা হিসেবে আখ্যায়িত করতে থাকলে ড্রিঙ্কওয়াটির বেথুনকে লেখা এক চিঠিতে রাধাকান্ত দেব স্বয়ং এ ভুলটি সংশোধন করেন।[৬] তবে এ কথাও সত্য যে, নারীশিক্ষার প্রতি অনুরাগ থাকলেও নারীশিক্ষার ব্যাপারে রাধাকান্ত দেবের মধ্যে কিছু স্ববিরোধিতাও ছিল। তিনি মিশনারী মিস ম্যারী কুক কর্তৃক পরিচালিত বালিকা

---

৩. অন্তঃপুর বা জেনানা শিক্ষা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যের জন্য দ্রষ্টব্য Asha Islam Nayeem, *From Andarmahal to Schools: Women's Education in Eastern Bengal in the 19th and 20th Centuries.*, unpublished Ph.D. dissertation, University of Dhaka; Asha Islam Nayeem. "Dwelling on the Question of Female Education in Nineteenth Century Bengal: From Western Theory to Local Reality." *Bangladesh Historical Studies* (Volume XXI, 2008-2009): pp. 9-22

৪. রাজা বৈদ্যনাথ রায় মহারাজা সুখময় রায়ের তৃতীয় পুত্র । মহারাজা সুখময় রায় ধনকুবের ছিলেন । ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গলের তিনিই প্রথম বাঙালি ডিরেক্টর।

৫. তিনি আটখন্ডে সংস্কৃত ভাষার অভিধান "শব্দকল্পদ্রুম" প্রকাশ করেন। এ অভিধান তাঁকে পন্ডিত হিসেবে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি দান করে এবং তিনি লন্ডনের রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি ও ইউরোপের অন্যান্য বিদ্বৎ সমাজ দ্বারা সম্মানিত হন।

৬. J. C. Bagal, *Women's Education in Eastern India: the first Phase*, World Press Private, Calcutta, 1956, p. 102

বিদ্যালয়ে হিন্দু মেয়েদের প্রেরণকে সমর্থন করেননি। বরং মিশনারী স্কুলে মেয়েদের প্রেরণ সম্ভ্রান্ত হিন্দুদের জন্য অসম্মানজনক বলে তিনি মনে করতেন।[৭] তবে এ রাজা রাধাকান্ত দেবই আবার ১৮২১ ও ১৮২২ সালে মিশনারীদের পরিচালিত বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের কলিকাতা স্কুল সোসাইটির ছেলে শিক্ষার্থীদের সাথে বার্ষিক পরীক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা করেন। রাজার শোভা বাজারের বাড়িতে এ পরীক্ষাটি অনুষ্ঠিত হয়। ৪০ জন নারীশিক্ষার্থী এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিল।[৮] চূড়ান্ত বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, নারীশিক্ষার উপযোগিতা স্বীকার করলেও মননের দিক থেকে কিছুটা রক্ষণশীল হওয়ায় রাজা রাধাকান্ত দেব নারীশিক্ষার ব্যাপারে আধুনিক যুগের চিন্তনের সাথে একাত্ম হতে পারেননি। তাই তিনি মেয়েদের বিদ্যালয়ের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নয়, বরং বাঙালির প্রাচীন পারিবারিক ঐতিহ্য বজায় রেখে মেয়েরা যেন অন্তঃপুরেই শিক্ষা লাভ করতে পারে-নারীশিক্ষার এই ছিল তাঁর আদর্শ। ১৮২১ সালে কলিকাতা স্কুল সোসাইটির ডব্লিউ এইচ পিয়ার্সকে লেখা তাঁর এক চিঠিতে তিনি এ কথা উল্লেখ করেছেন।[৯] তিনি নিজ পরিবারের মেয়েদেরও গৃহশিক্ষকের মাধ্যমে লেখাপড়ার ব্যবস্থা করেছিলেন।

রাজা বৈদ্যনাথ রায় (১২২৭-১২৮২ বঙ্গাব্দ) ছিলেন মহারাজা সুখময় রায় বাহাদুরের তৃতীয় পুত্র। সুখময় রায় ছিলেন কলকাতা সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার এলিজা ইম্পের দিউয়ান। তাঁর কলমেই লেখা হয়েছিল মহারাজা নন্দকুমারের ফাঁসির আদেশ। সুখময় রায় সেকালে বহু জনহিতকর কাজের জন্য বাঙালি সমাজে সুপরিচিত ছিলেন। তাঁর পুত্র বৈদ্যনাথ রায় বহু পরিমাণে পিতৃগুণের অধিকারী হয়েছিলেন। শিষ্টাচার সম্পন্ন ও উদার মনের মানুষ বৈদ্যনাথ রায়ের জনহিতৈষণামূলক কাজের জন্য লর্ড আমহার্স্ট (১৭৭৩-১৮৫৭ খ্রি.) তাঁকে 'রাজা' উপাধি দ্বারা সম্মানিত করেন। রাজা বৈদ্যনাথ রায় একজন নারী হিতৈষী ও নারীশিক্ষার সমর্থক হিসেবেও পরিচিত ছিলেন। তাঁর স্ত্রীরও লেখা পড়ার প্রতি প্রবল আগ্রহ ছিল। বৈদ্যনাথ স্ত্রীর এ আগ্রহ দেখে তাঁর লেখাপড়ার ব্যবস্থা করেন। বৈদ্যনাথের অনুরোধে মিসেস উইলসন তাঁর স্ত্রীকে ইংরেজি ভাষা শেখান। ১৮২৫ সালে রাজা বৈদ্যনাথ রায় মিশনারী সংগঠন লেডিজ সোসাইটি 'সেন্ট্রাল ফিমেল স্কুল' স্থাপনের জন্য এককালীন বিশ হাজার টাকা অনুদান দিয়েছিলেন। উল্লেখ্য যে, স্কুল ভবন নিমার্ণের জন্য সোসাইটির পক্ষ থেকে সরকারের কাছে দশ হাজার টাকা অনুদান চাওয়া হয়েছিল। কিন্তু সরকার সে অনুদান প্রদানে অস্বীকৃতি জানালে রাজা বৈদ্যনাথ তাদের সহযোগিতায় এগিয়ে আসেন এবং বিশ হাজার টাকা অনুদান প্রদান করেন। জানা যায় যে, এ অনুদান প্রদানের জন্য বৈদ্যনাথ রায়কে তাঁর বিদুষী স্ত্রী বিশেষভাবে উৎসাহিত করেছিলেন।[১০] *সমাচার দর্পন* ও *ইন্ডিয়া গেজেট*

---

৭. গোলাম মুরশিদ, *সংকোচের বিহ্বলতা: আধুনিকতার অভিঘাতে বঙ্গনারীর প্রতিক্রিয়া ১৮৪৯-১৯০৫* (লেখক কর্তৃক তাঁর *Reluctant Debutante: Response of Bengali Women to Modernization 1849-1905*, গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ), বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ. ২১

৮. শ্যামলী আকবর ও অন্যান্য, *নারীশিক্ষা উদ্ভব ও বিকাশ*, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা, ১৪০৫ বঙ্গাব্দ, পৃ.৭৬

৯. উদ্ধৃতি দ্রষ্টব্য স্বপন বসু, *উনিশ শতকে বাংলায় নবচেতনা*, সুবর্ণ, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ১৬৮

১০. শ্যামলী আকবর ও অন্যান্য, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭৭

পত্রিকায় এ বদান্যতার জন্য উচ্ছ্বসিত প্রশংসাসহ তাঁকে অভিনন্দিত করা হয়েছিল। বৈদ্যনাথ রায়ের অর্থানুকূল্যে কলকাতার হেদুয়ার পূর্বদিকে সেন্ট্রাল ফিমেল স্কুলটি প্রতিষ্ঠা করা হয়। লেডি আমহার্স্ট ১৮২৬ সালের ১৮ মে স্কুলটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন এবং ১৮২৮ সালে মিসেস উইলসনের পরিচালনায় স্কুলটির যাত্রা শুরু হয়। বাংলায় নারীশিক্ষা প্রসারে এ স্কুলটির অবদান বিশেষভাবে স্মরণীয়।[১১]

রাজা রামমোহন রায় ছিলেন নারীমুক্তি আন্দোলনের অগ্রদূত। নারীদের বিরুদ্ধে সব রকমের রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন এক সোচ্চার প্রতিবাদী কণ্ঠ। তাঁর সর্বাত্মক প্রচেষ্টাতেই লড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক (১৭৭৪-১৮৩৯ খ্রি.) সতীদাহ প্রথা বন্ধে আইন প্রণয়ন করেন। তিনি বাঙালি সমাজে প্রচলিত বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহহের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। তিনি মনে করতেন যে, নারী মুক্তির অন্যতম শর্ত হলো নারীশিক্ষা। নারীরা যে পুরুষের সমমর্যাদায় শিক্ষা লাভের সুযোগ পায় সে জন্য তিনি সরকার ও সমাজের প্রতিনিধিদের কাছে বক্তব্য রেখেছিলেন। এ বিষয়ে বর্তমান অভিসন্দর্ভের অন্যত্র আলোচনা করা হয়েছে।

পুনশ্চ: উল্লেখ্য যে, মিশনারীরা নারীশিক্ষা সমন্ধে বাঙালি সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয় বটে, কিন্তু তারা একে একটি সামাজিক আন্দোলনে রূপ দিতে ব্যর্থ হয়। রাজা রাধাকান্ত দেব, এমনকি রাজা রামমোহন রায়ও নারীশিক্ষাকে সামাজিক আন্দোলনের স্তরে উন্নীত করতে পারেননি। পুরোপুরি না হলেও এ কাজে অনেক সফল ছিল ডিরোজিও'র শিষ্য 'ইয়ং বেঙ্গল' দল। হিউমের অভিজ্ঞতাবাদ, বেন্থামের উপযোগবাদ এবং শেলী ও বায়রনের রোমান্টিকতাবাদ আন্দোলনের আদর্শ দ্বারা প্রবলভাবে উজ্জীবিত ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠী বাংলায় নারীমুক্তি স্বাধীনতার বলিষ্ঠ সমর্থক ছিল। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য তারা নারীশিক্ষা প্রসার কর্মসূচি গ্রহণ করে। তাঁদের মুখপত্র *পার্থেনন, জ্ঞানান্বেষণ, এনকোয়ার ও বেঙ্গল স্পেকটেটর* পত্রিকায় একদিকে নারীশিক্ষা সম্পর্কে হিন্দুসমাজের কুসংস্কারকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করা হয়, অন্যদিকে নারীশিক্ষার পক্ষে বাঙালি জনমতকে সচেতন ও সংগঠিত করার চেষ্টা করা হয়। ইয়ং বেঙ্গল পরিচালিত *The Academic Association* ও *The Society for the Acquisition of General Knowledge*- এরও অন্যতম কর্মসূচি ছিল নারীশিক্ষার প্রসার। এ প্রসঙ্গে গবেষক ও লেখক স্বপন বসু লিখেছেন:

> শিক্ষার জন্যই শিক্ষা–এই মতবাদে বিশ্বাসী ইয়ংবেঙ্গল ছিলেন স্ত্রীশিক্ষার গোঁড়া সমর্থক। ১৮৩০ এ প্রকাশিত 'পার্থেনন'-এর প্রথম সংখ্যায় এবং 'জ্ঞানান্বেষণ' ও 'এনকোয়ার'-এ তাঁরা স্ত্রীশিক্ষার সমর্থনে কলম ধরেছিলেন। 'অ্যাকাডেমিক এসোসিয়েশন' ও সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা'র অন্যতম আলোচ্য বিষয় ছিল স্ত্রীশিক্ষা।[১২]

---

১১. মুহাম্মদ শামসুল আলম, *রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন:জীবন ও সাহিত্যকর্ম*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৯, পৃ. ৪৩

১২. স্বপন বসু, *উনিশ শতকে বাংলায় নবচেতনা*, সুবর্ণ, ঢাকা, ২০১১, পৃ. ১৬৬

রামগোপাল ঘোষ, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ ছিলেন ইয়ং বেঙ্গল দলের সক্রিয় সদস্য। তাঁরা বাংলায় নারীশিক্ষাকে সামাজিক আন্দোলনে পরিণত করার সর্বাত্মক চেষ্টা করেন। এ সময় কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় নারীশিক্ষা বিষয়ে একটি প্রবন্ধ রচনা করেন। ১৮৪০ সালে তাঁর এ প্রবন্ধটি গৌরমোহন আড্ডির Oriental Seminaryতে ছাত্রদের সামনে পাঠ করা হয় এবং ১৮৪১ সালে এটি *Native Female Education* নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। এতে লেখক হিন্দু মেয়েদের শিক্ষা দীক্ষায় পশ্চাৎপদতার জন্য হিন্দু ধর্মশাস্ত্রের নানা গোঁড়ামী এবং হিন্দু সমাজে প্রচলিত কুসংস্কারকে দায়ী করেন। তিনি সম্ভ্রান্ত হিন্দু নারীদের জন্য 'অন্তঃপুর শিক্ষা' অব্যাহত রাখার পক্ষে মত দেন। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, "ইউরোপীয় ও স্বদেশীয়দের সুপরিচালিত কোন সংস্থার তত্ত্বাবধানে যদি স্ত্রী শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয় এবং শিক্ষা যদি হিন্দুদের গাহার্স্থ্য ব্যবস্থায় বিপ্লবাত্মক পরিবর্তনের প্রচেষ্টা না হয় তা হলে স্ত্রী শিক্ষা ক্রমশ প্রসারিত হবে।"[১৩] নারীশিক্ষাকে উৎসাহিত করা জন্য ১৮৪২ সালে ইয়ং বেঙ্গল নেতা রামগোপল ঘোষ হিন্দু কলেজের ছাত্রদের নারীশিক্ষা বিষয়ে প্রবন্ধ রচনার জন্য একটি স্বর্ণ ও একটি রৌপ্যপদক পুরস্কার ঘোষণা করেন। মধুসূদন দত্ত ও ভূদেব মুখোপাধ্যায় যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় পুরস্কার লাভ করেন।

ইয়ং বেঙ্গল নারীশিক্ষার ব্যাপারে আগ্রহী হলেও এর জন্য তারা কোনো প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেনি। এতদসত্ত্বেও তাঁদের প্রয়াসকে উপেক্ষা করা বা খাটো করে দেখার অবকাশ নেই। নিঃসন্দেহে তাদের কর্মপ্রয়াস নারীশিক্ষার পক্ষে বাঙালি সমাজে একটি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরিতে ভূমিকা রেখেছিল।

উনিশ শতকের চতুর্থ দশকেই নারীশিক্ষা আন্দোলন মিশনারীদের প্রচেষ্টার বাইরে ক্রমেই এদেশীয় শিক্ষিত সমাজের চেষ্টায় বৃহত্তর বাঙালি সমাজে বিস্তার লাভ করতে থাকে। তবে চল্লিশের দশকের শুরুতেও নারীশিক্ষার সমর্থকগণ অন্তঃপুর শিক্ষাকেই অবলম্বন হিসেবে আঁকড়ে থাকেন। প্রসন্নকুমার ঠাকুর (১৮০১-১৮৬৮ খ্রি.)[১৪] নিজ বাড়িতে বৈষ্ণবী ও খ্রিস্টান গৃহশিক্ষক রেখে তাঁর মেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। শিবচন্দ্র রায়, আশুতোষ দেব, চণ্ডীচরণ তর্কালঙ্কার প্রমুখ বাঙালি ভদ্রলোকগণ নিজ নিজ কন্যাদের গৃহাভ্যন্তরেই লেখাপড়ার সুযোগ তৈরি করে দেন। কেউ কেউ নিজ কন্যাদের শিক্ষাদানের বিষয়টি নিজ হাতে তোলে নেন।

জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িতেও অন্তঃপুর শিক্ষার প্রচলন ছিল। ঠাকুর পরিবারের দ্বারকানাথ ঠাকুর (১৭৯৪-১৮৪৭ খ্রি.) এবং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫ খ্রি.) উভয়েই ছিলেন নারীশিক্ষার সমর্থক। দেবেন্দ্রনাথ

---

১৩. J. C. Bagal, *Women's Education in Eastern India, op.cit,* p. 72

১৪. প্রসন্নকুমার ঠাকুর ছিলেন ঊনবিংশ শতাব্দীর একজন বাঙালি সমাজ সংস্কারক। তাঁর পিতা গোপীমোহন ঠাকুর ছিলেন হিন্দু কলেজের (অধুনা প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়) অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। রক্ষণশীল হিন্দু সংগঠন 'গৌড়ীয় সমাজ'-এর প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক প্রসন্নকুমার ঠাকুর শিক্ষাবিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। তাঁর দানের অর্থে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত 'ঠাকুর আইন অধ্যাপক' পদটি সৃষ্টি হয়। তাঁর লেখা দুটি গ্রন্থের নাম *An Appeal to Countrymen* ও *Table of Succession According to Hindu Law of Bengal.* তাঁর পুত্র জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর (১৮২৬-১৮৯০ খ্রি.) ছিলেন প্রথম ভারতীয় ব্যারিস্টার।

ঠাকুর নারীশিক্ষা ও স্বাধীনতা বিরুদ্ধাচরণকারীদের কঠোর ভাষায় সমালোচনা করেছেন। নিম্নোক্ত বক্তব্যে তাঁর এ মনোভাব বিধৃত হয়েছে:

> With regard to female children there is a fourth class of men who consider female education either as practically unnecessary or as improper on social or moral grounds, who are opposed to it from a superstitious fear of the consequences of leaving upon matrimonial happiness of their daughters. But as all these obstacles rose to the instruction of females are fruits only of ignorance it must be left to time and the spread of popular education to cure people of these misgivings and errors on this subject, and I have nothing to do with this class of men here.[১৫]

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে পর্দাপ্রথার সামাজিক কঠোরতা মেনেও ঠাকুর বাড়ির এ দুই কীর্তিমান পুরুষ নিজ পরিবারের মেয়েদের শিক্ষার যথাযথ ব্যবস্থা করেছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা স্বর্ণকুমারী দেবীর 'আমাদের গৃহে অন্তঃপুরশিক্ষা ও তাহার সংস্কার' শীর্ষক রচনা থেকে এ বিষয়ে সম্যক ধারণা পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন:

> যখন আমার মাতৃদেবী পুত্রবধু হইয়া আমাদের গৃহে আসেন, প্রপিতামহের পরিবারে অন্তঃপুর পরিপূর্ণ। প্রপিতামহ দ্বারকনাথ ঠাকুরের স্ত্রী ও পুত্রবধুগণ, তাহার ভ্রাতৃবর্গের স্ত্রীকন্যা পুত্রবধুগণ, তাহার ভগিনী ও ভাগিনেয়ীগণ প্রভৃতি সকলেই এক বাড়িতেই বাস করিতেন। এই বহু পরিবারের কেহই মূর্খ ছিলেন না। বরং ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ বিশেষ বিদ্যাবতী বলিয়া আদরনীয়া ছিলেন। স্ত্রীলোকের বিদ্যাশিক্ষা তাহারা গৌরবের বলিয়াই জানিতেন। --- আহার বিহার পূজা অর্চ্চনার ন্যায় সেকালেও আমাদের অন্তঃপুরে লেখাপড়া মেয়েদের মধ্যে একটি নিত্যনিয়মিত ক্রিয়ানুষ্ঠান ছিল। প্রতিদিন প্রভাতে গয়লানি যেমন দুধ লইয়া আসিত, মালিনী ফুল যোগাইত, দৈবজ্ঞ ঠাকুর পাঁজি পুঁথি হস্তে দৈনিক শুভাশুভ বলিতে আসিতেন, তেমনি স্নানবিশুদ্ধা, শুভ্রবসনা, গৌরী বৈষ্ণবী ঠাকুরাণী বিদ্যালোক বিতরণার্থে অন্তঃপুরে আবির্ভূতা হইতেন।[১৬]

দ্বারকানাথ ঠাকুরের মতো তাঁর পুত্র দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরও পরিবারের মেয়েদের জন্য অন্তঃপুর শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। সৌদামনী দেবীর কথায়:

> পিতৃদেব সিমলা পাহাড় হইতে ফিরিয়া আসিয়া আমাদের শিক্ষার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিলেন। কেশববাবুদের অন্তঃপুরে মিশনারী মেয়েরা পড়াইতে আসিত। আমাদের শিক্ষার জন্য পিতা তাহাদের নিযুক্ত করিলেন। বাঙালি খ্রিস্টান শিক্ষয়িত্রী প্রতিদিন আমাদিগকে পড়াইতেন এবং হপ্তায় একদিন মেম আসিয়া আমাদের বাইবেল পড়াইয়া যাইতেন।[১৭]

---

১৫. উদ্ধৃতি, পশুপতি শাশমল, *স্বর্ণকুমারী ও বাংলা সাহিত্য*, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন, ভারত, ১৯৭১, পৃ. ৪২

১৬. স্বর্ণকুমারী দেবী, 'আমাদের গৃহে অন্তঃপুরশিক্ষা ও তাহার সংস্কার', *প্রদীপ*, মাসিক পত্রিকা, ভাদ্র ১৩০৬ বঙ্গাব্দ, উদ্ধৃতি, সুতপা ভট্টাচার্য (সম্পা. ও সংকলন), *বাঙালি মেয়ের ভাবনামূলক গদ্য*, সাহিত্য একাদেমি, নতুন দিল্লি, ২০১১, পৃ. ১৭৩

১৭. পশুপতি শাশমল, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫৪

একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, বাংলার নারীশিক্ষা ব্যাপারে মিশনারীদের প্রচেষ্টা ছিল সংগঠিত। কিন্তু এ ব্যাপারে বাঙালিদের এ যাবতকালের প্রচেষ্টা ছিল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিচ্ছিন্ন ও ব্যক্তিগত পর্যায়ে সীমাবদ্ধ। 'ইয়ং বেঙ্গল' ছাড়া এ যাবৎ নারীশিক্ষার ব্যাপারে আর কোনো সাংগঠনিক তৎপরতা দেখা যায়নি। এ সময় কেউ কেউ উপলব্ধি করেন যে, বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা বা কেবল শুভেচ্ছা জোরে নারীশিক্ষা আন্দোলন সফল হবে না, এর জন্য প্রয়োজন সংগঠিত ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস। অক্ষয়কুমার দত্ত, কৃষ্ণমোন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ নারীশিক্ষা অনুরাগী ব্যক্তিবর্গ নারীশিক্ষা প্রসারের জন্য সংঘবদ্ধ তৎপরতার প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করেন। ১৮৩০ সালে রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। রামমোহনের মৃত্যুর পর দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এর নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তিনি তাঁর ধর্মচিন্তা ও ধর্মতত্ত্ব আলোচনা ও প্রচারের জন্য 'তত্ত্ববোধিনী সভা' নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। এ সংগঠনটির সমাজ সংস্কারমূলক কার্যক্রমের মধ্যে নারীশিক্ষা ছিল অন্যতম। সংগঠনটির মুখপত্র *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা* নারীশিক্ষার সপক্ষে বাঙালি জনমতকে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করেছিল। ১৮৪৩ সালে প্রতিষ্ঠিত Bengal British India Society ছিল মূলত একটি রাজনৈতিক সংগঠন। তবে রামগোপাল ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্র, তারাপদ চক্রবর্তী ও কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ সংগঠনের সদস্যগণের চেষ্টায় সোসাইটি সমাজ সংস্কারমূলক বিশেষ করে নারীশিক্ষা প্রসারের জন্য কিছু কর্মসূচি গ্রহণ করেছিল। ১৮৪৫ সালে Society নেতা রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় (১৮১৪-১৮৭৮ খ্রি.)[১৮] ও তারাপদ চক্রবর্তী প্রমুখ কলকাতায় একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করেছিলেন। তবে রক্ষণশীলদের বিরোধিতার কারণে শেষপর্যন্ত তাঁদের এ পরিকল্পনাটি বাস্তবরূপ পায়নি।[১৯] বাংলার নারী জাতির বিশেষ করে তাদের শিক্ষার উন্নতির জন্য ইংরেজ ব্যবসায়ী David Hare এর উৎসাহও অবদান উল্লেখযোগ্য। ১৮৪২ সালে তাঁর মৃত্যুর পর স্মৃতি রক্ষার্থে কয়েকজন এদেশীয় প্রগতিশীল ব্যক্তি মিলে Hare Prize Fund গঠন করা হয়। বাংলায় নারীশিক্ষার প্রসার ছিল এর অন্যতম লক্ষ্য ও কর্মসূচি।[২০]

পুনশ্চ উল্লেখ্য যে, বেথুন স্কুল প্রতিষ্ঠার পূর্বে বাংলায় নারীশিক্ষার জন্য কার্যতঃ দেশীয় উদ্যোগে উল্লেখযোগ্য কোনো বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হয়নি। তবে উনিশ শতকের চল্লিশের দশকের মাঝামাঝি সময় একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল। আর উদ্যোগটি নিয়েছিলেন উত্তরপাড়ার জমিদার জয়কৃষ্ণ

---

১৮. রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ছিলেন ইয়ং বেঙ্গল দলের কর্মী ও ডিরোজিওর প্রিয় পাত্র। ছাত্রাবস্থায়ই তিনি *জ্ঞানান্বেষণ* (১৮৩১ খ্রি.) পত্রিকা সম্পাদনা করেন। পরে তিনি *ভারত* পত্রিকা, *সমাচার হিন্দুস্থানী* ইত্যাদি পত্রিকাও সম্পাদনা করেন। তিনি *বেঙ্গল স্পেক্টেটর* পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন। দক্ষিণারঞ্জন স্ত্রীশিক্ষার জন্য বেথুন সাহেবকে জমি দান করেন (১৮৪৯ খ্রি.); পরে বেথুন বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হলে তার উন্নতির জন্যও তিনি নানাভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করেছিলেন।

১৯. স্বপন বসু পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭০

২০. Peary Chand Mittra, *A Biographical Sketch of David Hare*, W Newmen & Company, Calcutta, 1877, p. 107-108

মুখোপাধ্যায় (১৮০৮-১৮৮৮ খ্রি.)।[২১] প্রগতিশীল চিন্তার অধিকারী জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় দেশ ও সমাজের বিভিন্ন প্রকার উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি কলকাতায় 'ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন' গঠনে অন্যতম উদ্যোক্তার ভূমিকা পালন করেন। পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের (১৮২০-১৮৯১ খ্রি.) বিধবাবিবাহ আন্দোলনেরও তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ সমর্থক। জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় একজন বিদ্যোৎসাহী জমিদার হিসেবে সুখ্যাতি লাভ করেছিলেন। তাঁর উদ্যোগ ও আর্থিক সহায়তায় উত্তরপাড়া ও আশেপাশের এলাকায় দশটি এ্যাংলো-বাংলা বিদ্যালয়, চৌদ্দটি বাংলা বিদ্যালয় এবং একটি কলেজ স্থাপন করা হয়েছিল। এছাড়া তিনিই প্রথম ব্যক্তি উদ্যোগে উত্তরপাড়ায় একটি গণগ্রন্থাগার স্থাপন করেছিলেন।[২২] জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় নারীশিক্ষারও একজন সমর্থক ছিলেন। নিজ এলাকার নারীদের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে ১৮৪৫ সালে জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সরকারের তৎকালীন শিক্ষা সংসদের কাছে উত্তরপাড়ায় একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য অনুমতি চেয়ে আবেদন করেন। তিনি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য জমিদানসহ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় আর্থিক অনুদান প্রদানের প্রস্তাব দেন। এমনকি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে তাঁর দু'কন্যা লক্ষ্মী ও সরস্বতীকে সেখানে পড়াবেন বলেও প্রতিশ্রুতি দেন। জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের এ আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে হুগলির তদান্তিন কালেক্টর ডি জে মানি (D J Money) শিক্ষা সংসদের কাছে লিখিত এক পত্রে জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের শিক্ষা ও মানব হিতৈষণামূলক কাজের প্রশংসা করে তাঁর আবেদনের অনুকূলে সুপারিশ করেন।[২৩] কিন্তু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের আবেদনটি শিক্ষা সংসদ কর্তৃক অনুমোদিত না হওয়ায় ব্যক্তি উদ্যোগে উত্তরপাড়ায় বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন পরিকল্পনাটি তখন ব্যর্থ হয়।

১৮৪৫ সালে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যাত হলে জয়কৃষ্ণ ১৮৪৯ সালে বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য পুনরায় কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করেন। তাঁর এ প্রচেষ্টার কথাটি সে সময় *সংবাদ প্রভাকর* পত্রিকায় উল্লেখ করে মন্তব্য করা হয় যে:

> আমরা শুনিলাম উত্তরপাড়া নিবাসী বিদ্যানুরাগী বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় আপন গ্রামে অবিলম্বে এক বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত করিবেন, তাহার সমুদয় অনুষ্ঠান হইয়াছে– হে শুভাদৃষ্ট, তুমি শীঘ্র আগমন কর, হে কুসংস্কার–তুমি আর এদেশে অবস্থান করিও না, ত্বরায় প্রস্থান কর; দেশীয় পুরুষ সকল স্ত্রী-জাতির দুরাবস্থা সম্পর্কে যত্নবান হউন---।[২৪]

---

২১. উত্তরপাড়া বর্তমান ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের হুগলি জেলার শ্রীরামপুর মহকুমার একটি শহর ও পৌরসভা এলাকা। ১৮৩৫ সালে এ উত্তরপাড়ায় জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় একটি জমিদারি প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর পিতা জগন্মোহন মুখোপাধ্যায় ছিলেন একজন সরকারি কর্মকর্তা। প্রথমে জয়কৃষ্ণ নিজেও কোম্পানি সরকারের সামরিক বিভাগের একজন কর্মকর্তা ছিলেন। চাকুরিতে থাকা অবস্থায় তিনি প্রচুর বিত্তের মালিক হন এবং নিজগ্রাম উত্তর পাড়ায় বিপুল পরিমাণ ভূ-সম্পত্তি ক্রয় করে জমিদারি প্রতিষ্ঠা করেন।

২২. বসন্তকুমার সামন্ত, *হিতকরী সভা: স্ত্রী-শিক্ষা ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ*, সাহিত্যলোক, কলকাতা, ১৯৮৭, ভূমিকা দ্রষ্টব্য

২৩. অম্বিকাচরণ গুপ্ত, *জয়কৃষ্ণ চরিত*, কলকাতা, ১৩০৮ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৭২

২৪. *সংবাদ প্রভাকর*, ৯ মে, ১৮৪৮

তবে দুঃখজনক হলেও এবারো শিক্ষা সংসদ জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের প্রস্তাব অনুমোদন করেনি। ফলে উত্তরপাড়ায় নারীশিক্ষা প্রসারে একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের ঐকান্তিক ইচ্ছাটি অপূর্ণ থেকে যায়।

দেশীয় উদ্যোগে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের জয়কৃষ্ণের উদ্যোগটি ব্যর্থ হলেও বারাসতে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনাটি সফল হয়। বেথুন স্কুল প্রতিষ্ঠা দু'বছর পূর্বে ১৮৪৭ সালে কতিপয় মহৎপ্রাণ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বারাসতে একটি অবৈতনিক বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এ বিদ্যালয়টির প্রতিষ্ঠার মূল উদ্যোক্তা ছিলেন কালীকৃষ্ণ মিত্র (১৮২২-১৮৯১ খ্রি.)। তিনি ছিলেন তদানিন্তন বাংলার অন্যতম খ্যাতিমান শিক্ষাবিদ ও সমাজ সংস্কারক। তিনি বিধবা বিবাহ প্রচলন ও মাদকসেবন নিবারণ আন্দোলনে সক্রিয় ও নেতৃস্থানীয়দের অন্যতম ছিলেন। নারীশিক্ষার উন্নতিকল্পেও তিনি সচেষ্ট ছিলেন। তাঁর জীবনের সেরা কীর্তি হলো বারাসতের এ বালিকা বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা। তিনি তাঁর ভাই নবীনকৃষ্ণ মিত্র ও প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ও সমাজ সংস্কারক প্যারীচরণ সরকারের (১৮২৩-১৮৭৫ খ্রি.)[২৫] সহায়তায় এ বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর নামানুসারে পরে বিদ্যালয়টির নামকরণ করা হয় 'কালীকৃষ্ণ গার্লস হাই স্কুল।' তবে বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা সহজ কাজ ছিল না। নারীশিক্ষা বিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি উদ্যোক্তাদের নানাভাবে হয়রানী ও নিপীড়ন করেছিলেন বলে প্যারীচরণের জীবনীকার নবকৃষ্ণ ঘোষের বর্ণনা থেকে জানা যায়। নবকৃষ্ণ ঘোষের ভাষায়:

> ব্রাহ্মণ অধ্যাপক বহু গণ্ডগ্রাম বারাসাতে ঐ দেশাচার বিরুদ্ধ নব অনুষ্ঠানের জন্য প্যারীবাবু প্রমুখ ঐ বালিকা বিদ্যালয়ের স্থাপনকর্তাগণকে কত বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করিতে হইয়াছিল, কত লাঞ্ছনা-নিগ্রহ ভোগ করিতে হইয়াছিল। প্যারীবাবু, নবীনকৃষ্ণবাবু এবং বালিকা বিদ্যালয়ের শুভানুধ্যায়ী ব্যক্তিগণ বারাসতে সমাজচ্যুত হয়েছিলেন। এমনকি তৎসাময়িক দ্বিতীয় শিক্ষক হরিদাস বাবুও প্যারীবাবুর বিপক্ষ দলে যোগদেন। পাঠকের যেন স্মরণ থাকে স্ত্রীলোকে লেখা পড়া শিখিলে বিধবা হয়, জাতি যায় প্রভৃতি কুসংস্কার বঙ্গীয় পল্লীবাসীগণের অন্তরে বদ্ধমূল ছিল। এমনিক একজন সম্ভ্রান্ত ইংরেজ কর্মচারী স্বস্ত্রীক বারাসতের বালিকা বিদ্যালয় পরিদর্শনার্থে আসিয়া একটি দুগ্ধপোষ্যা বালিকার চিবুকে হাত দিয়া আদর করায় জাতিনাশ আশঙ্কা করিয়া বরাসতবাসীগণ ঘোটমঙ্গল বসাইয়াছিলেন।[২৬]

---

২৫. শিক্ষাবিদ প্যারীচরণ সরকার ১৮৪৬-১৮৫৪ বারাসত গভর্নমেন্ট স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। সেখানে কৃষি বিদ্যালয় স্থাপনে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। কুলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুলের প্রধান শিক্ষকরূপে দায়িত্ব পালনের সময় তাঁর চেষ্টায় স্কুলটির নাম পরিবর্তিত হয়ে হেয়ার স্কুল হয়। ১৮৬৩ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপক পদে যোগদান করেন এবং ১৮৬৭ সালে অবসর নেন। তিনি পাঠ্যপুস্তক রচয়িতা হিসেবেও খ্যাতিমান ছিলেন। তাঁর পাঠ্যবইমালা বাঙালির এক সমগ্র প্রজন্মকে ইংরেজি ভাষায় পরিচিত করেছিল। বাংলার নবজাগরণে তাঁর সক্রিয় ভূমিকা ছিলো। তিনি বাংলায় নারীশিক্ষার অগ্রদূত ছিলেন এবং নারীশিক্ষা প্রসারে একাধিক বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। বাংলার নবজাগরণ ও নারীশিক্ষায় তাঁর অবদানের জন্য তাঁকে 'প্রাচ্যের আর্নল্ড' বলা হতো। সুবোধ সেনগুপ্ত ও অঞ্জলি বসু সম্পাদিত, *সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান*, প্রথম খণ্ড, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, নভেম্বর ২০১৩, পৃ.৩৯৯-৪০০

২৬. নবকৃষ্ণ ঘোষ, *প্যারীচরণ সরকার (জীবনবৃত্ত)*, অশোক পুস্তকালয়, কলকাতা, ২০১১; উদ্ধৃত বিনয় ঘোষ, *বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ*, ওরিয়েন্ট এন্ড লংম্যান, কলকাতা, ১৯৭৩, পৃ. ২১৬-২১৭

বাংলার নারীশিক্ষার ইতিহাসে বারাসত বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এটি উনিশ শতকে স্থানীয় বাঙালিদের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত প্রথম বালিকা বিদ্যালয়। ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন এ স্কুলটি পরিদর্শন করেছিলেন। বলা হয় যে, এ বিদ্যালয়টি পরিদর্শন করতে এসেই বেথুন কলকাতায় একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অনুপ্রেরণা লাভ করেন এবং দু'বছর পর ১৮৪৯ সালে স্কুলটি স্থাপন করা হয়।

উনিশ শতকের গোড়াতেও নারীশিক্ষা সম্পর্কে বাঙালি সমাজের মনোভাব অনুদার ছিল। এ অবস্থায় মিশনারীদের নারীশিক্ষার প্রয়াস সমাজে মিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। মিশনারীদের তৎপরতায় ধর্মচ্যুতির আশঙ্কায় নারীশিক্ষা বিরোধীদের একদলের অনুদার মনোভাব প্রতিরোধে পরিণত হয়। অন্যদিকে পাশ্চাত্য ভাবধারাপুষ্ট আরেকদল বাঙালি নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। এ অবস্থায় নারীশিক্ষার পক্ষে তীব্র বাদানুবাদ এবং কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তি ও ইয়ং বেঙ্গলের মতো সংগঠন নারীশিক্ষার পক্ষে প্রচার প্রচারণা শুরু করায় উনিশ শতকের প্রথমার্ধেই মধ্যবিত্ত বাঙালির মন নারীশিক্ষার জন্য প্রস্তুত হতে থাকে। ফলে অন্তঃপুর শিক্ষার পাশাপাশি বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান মেয়েদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার জন্য বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় মনোযোগী হয়। ১৮৪৯ সালে বেথুন স্কুল প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে বাংলায় নারীশিক্ষার এক যুগান্তকারী অধ্যায়ের সূচনা হয়।

৪.২: নারীশিক্ষার বিকাশে ব্যক্তিগত ও বেসরকারি সাংগঠনিক উদ্যোগ (১৮৪৯-১৯০৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত)

উনিশ শতকে নানামুখী তৎপরতার মাধ্যমে বাঙালি সমাজে ধীরে ধীরে নারীশিক্ষার অনুকূল পরিবেশ তৈরি হতে থাকে। এ সময় মিশনারীদের উদ্যোগের বাইরে স্থানীয় বাঙালি সমাজ সংস্কারকদের নারীশিক্ষা প্রসারে এগিয়ে আসতে দেখা যায়। উপরের আলোচনায় এতদবিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। এ পর্যায়ে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে নারীশিক্ষা প্রসারের বেসরকারি উদ্যোগ সম্পর্কে আলোচনার প্রয়াস নেয়া হলো।

৪.২. ক. ব্যক্তিগত উদ্যোগ

উনিশ শতকে বাংলায় নারীশিক্ষা প্রসারে প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ হিসেবে বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রথম কৃতিত্ব খ্রিষ্টান মিশনারীদের। দেশীয় উদ্যোগে প্রথম বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বারাসতে। তবে তখন পর্যন্ত প্রাতিষ্ঠানিক নারীশিক্ষার অগ্রগতি সন্তোষজনক ছিল না। ১৮৩৪ সালের এডাম এর শিক্ষা রিপোর্ট অনুসারে কলিকাতা ব্যতীত শ্রীরামপুর, বর্ধমান, কালনা, কাটোয়া, কৃষ্ণনগর, ঢাকা, বাখরগঞ্জ, চট্টগ্রাম, মুরশিদাবাদ ও বীরভূম, প্রভৃতি স্থানে ১৯টি বালিকা বিদ্যালয় ও এতে প্রায় ৪৫০ জন ছাত্রী ভর্তি করা হয়েছিল বলে দেখা যায়।[২৭] তবে তখনও বাংলার সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়েদের এসব স্কুলে যাবার অনুমতি ছিল না। এসব মিশনারী বিদ্যালয় সমাজের দরিদ্র শ্রেণির নিম্নবর্ণের মধ্যে থেকে ছাত্রী সংগ্রহ করতো। এসব

২৭. শিবনাথ শাস্ত্রী, *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ*, দ্বিতীয় সংস্করণ, এসকে লাহিড়ী এণ্ড কোং, কলকাতা, ১৯০৯, পৃ.১৮৯

শিক্ষার্থীদের বিদ্যার্জন যতটা না উদ্দেশ্য ছিল, তার থেকে বড় লক্ষ্য অর্থনৈতিক স্বার্থ এবং অন্যান্য বিষয়। মিশনারীদের চিন্তাতেও ধর্মান্তকরণের লক্ষ্য কাজ করতো। ফলে মিশনারীদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা উদ্যোগ অনেকাংশেই ব্যর্থ হয়। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে এ ব্যাপারে দেশীয় উদ্যোগও সন্তোষজনক ছিল না। এ অবস্থায় ইংরেজ কর্মকর্তা বেথুন কর্তৃক ১৮৪৯ সালে কলকাতায় 'হিন্দু ফিমেল স্কুল' নামে একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা বাংলায় নারীশিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করে।

বাংলায় নারীশিক্ষা প্রসারে জন এলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুনের ভূমিকা

বেথুনের পূর্ণনাম জন এলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন (John Elliot Drinkwater Bethune, ১৮০১-১৮৫১ খ্রি.)।[২৮] তিনি ছিলেন একজন ভারতপ্রেমী ব্রিটিশ রাজকর্মচারী। ১৮৪৮ সালে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক Governor General's Council-এর 'Law Member' হিসেবে নিযুক্ত হয়ে তিনি কলকাতায় আসেন। পদাধিকার বলে তিনি Council of Education এরও সভাপতি হয়েছিলেন। বেথুন তাঁর উদার দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্মতৎপরতার জন্য সমকালীন বাঙালি সমাজে সুপরিচিত লাভ করেন। বেথুন ছিলেন শিক্ষানুরাগী মানুষ, বিশেষ করে নারীশিক্ষার প্রতি তাঁর প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। দায়িত্বভার নিয়ে কলকাতায় আসার আগেই তিনি এদেশের নারীদের দুঃখ-দুর্দশা ও বঞ্চনা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। ফলে তিনি নারীদের আনুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদানের জন্য আগ্রহী হন। তাঁর মতে, শিক্ষা নারীদের "সুগৃহিনী ও আদর্শ মা" হিসেবে গড়ে উঠতে সাহায্য করবে। বেথুন জানতেন যে, মিশনারীদের দ্বারা উচ্চশ্রেণির হিন্দু পরিবারের নারীদের শিক্ষাদানের পূর্ব প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। অথচ নারীশিক্ষার প্রসারের জন্য সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়েদের শিক্ষিত করা বিশেষ প্রয়োজন। এ অবস্থায় বেথুন প্রথমেই সম্ভ্রান্ত পরিবারের নারীদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার জন্য একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করেন। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, অনেকেই মনে করেন ১৮৪৭ সালে বারাসতে প্রতিষ্ঠি বালিকা বিদ্যালয়টি পরিদর্শন করতে গিয়ে তিনি অনুরূপ একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলেন।[২৯] একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের বিষয়ে নারীশিক্ষাব্রতী পন্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার, রামগোপাল ঘোষ, রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রমুখের সাথে তিনি পরামর্শ করেন এবং তাঁরা এ ব্যাপারে সহযোগিতা করতে এগিয়ে আসেন। তাঁদের মত সজ্জন ব্যক্তিবর্গ নারীদের জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব সম্পর্কে

---

২৮. ইংল্যান্ডের ইলিং শহরে বেথুন এর জন্ম। তাঁর পিতা ছিলেন স্ট্যানফোর্ডের স্বনামধন্য কর্ণেল জন ড্রিঙ্কওয়াটার যিনি *History of the Siege of Gibraltar* বইটি লিখে বিখ্যাত হয়েছিলেন। মেধাবী বেথুন ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় এর ট্রিনিটি কলেজ থেকে কৃতিত্বের সাথে গণিতশাস্ত্রে পড়া শেষ করে কিছুদিন আইন পেশায় ছিলেন। কিছুদিনের মধ্যে তিনি পার্লামেন্ট এর সদস্য হন। মাতৃভাষা ইংরেজি ছাড়াও তিনি গ্রিক, ল্যাটিন, জার্মান,ফ্রেঞ্চ, ইতালীয় ভাষাতেও সাবলীল ছিলেন। এছাড়া কবি হিসেবেও তাঁর বেশ সুনাম ছিল। বেথুন আরো বিস্তারিত তথ্যের জন্য দ্রষ্টব্য *Bethune: His School and Nineteenth Century Bengal* (A Compilation of contributed articles on the life and times of John Elliot Drinkwater Bethune), Published by Bethune School Praktani Samiti, Kolkata, 2006

২৯. শ্যামলী আকবর ও অন্যান্য, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৮৭

হিন্দুসমাজের সম্মানিত ব্যক্তিদের বোঝাতে সক্ষম হন এবং তাঁদের নিকট থেকে এই নিশ্চয়তা পান যে, তাঁরা তাঁদের কন্যাদের প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের জন্য পাঠাবেন। রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় তাৎক্ষণিকভাবে তাঁর বাহির শিমুলিয়ার সুকিয়া সড়কের বাড়িটি বেথুনের প্রস্তাবিত বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য দিতে রাজি হন। শুধু তাই নয়, তিনি দশ হাজার টাকা মূল্যের একখন্ড জমিও এ স্কুলের জন্য দান করেন। *সম্বাদ ভাস্কর* পত্রিকার একটি প্রতিবেদনে এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয় যে,

> দক্ষিণ বাবু, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বাবু প্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়াছিলেন হিন্দু বালিকাদিগের বিদ্যালয় করণার্থ বেথুন সাহেব, বাবু রাম গোপাল ঘোষের সহিত একত্র হইয়া আসিয়া তাঁহার সিমলার বৈঠকখানা দেখিয়া গিয়াছেন, ইহাতেই নির্মল হৃদয় দক্ষিণ বাবুর মনে উদয় হইল তাঁহার সৎ স্বভাব প্রকাশের উপযুক্ত সময় প্রাপ্ত হইয়াছেন, সময় গেলে আর আসিবেক না। অতএব, আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া বেথুন সাহেবের নিকট গমন করিলেন এবং বেথুন সাহেব যে এদ্দেশীয় হিন্দু বালিকাগণকে বিদ্যাদানের উদ্যোগ করিয়াছেন তদর্থে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া কহিলেন তাঁহার বাগানের বৈঠকখানা অমনি দিলেন। বালিকাদিগের উপযুক্ত শিক্ষালয় যতকাল প্রস্তুত না হয় ততকাল বালিকারা এ বৈঠকখানায় বিদ্যাভ্যাস করিবে তিনি টাকা লইবেন না।[৩০]

১৮৪৯ সালের ৭ মে সকাল ৭ টায় ২১ জন ছাত্রী নিয়ে 'হিন্দু ফিমেল স্কুল' নামে বেথুনের ঐতিহাসিক বিদ্যালয়ের কার্যক্রম শুরু হয়।[৩১] পরে তাঁর নামানুসারে স্কুলটির নামকরণ করা হয় বেথুন স্কুল। বেথুন তাঁর স্কুলের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কোনো ইউরোপীয়কে আমন্ত্রণ জানাননি। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি অত্যন্ত সুন্দর ভাষায় নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেন এবং বলেন, "I believe this is the beginning of a revolution...We have succeeded and the banner which we plant this day will never go backwards."[৩২] গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য সম্পাদিত *সম্বাদ ভাস্কর* এবং ঈশ্বর গুপ্ত সম্পাদিত *সংবাদ প্রভাকর*সহ বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির প্রায় সকল বাংলা ইংরেজি সংবাদপত্রে বেথুনের হিন্দু ফিমেল স্কুলের উদ্বোধনী সংবাদ গুরুত্বের সাথে প্রকাশিত হয়েছিল। রাজনারায়ণ বসুর লিখেছেন:

> যেদিন উহা সংস্থাপিত হয়, সেদিন ফ্রিমেসনেরা পতাকা উড়াইয়া ও বাদ্যোদ্যম করিয়া মহা সমারোহের সহিত কলিকাতার রাস্তা দিয়া গমন করিয়া উহার মূল প্রস্তর নিখাত করেন। দ্বারে পূর্ণ কুম্ভ ও অশোক স্থাপিত

---

৩০. *সম্বাদ ভাস্কর*, ১২ মে, ১৮৪৯, উদ্ধৃতি যোগেশচন্দ্র বাগাল, *বাংলার স্ত্রী শিক্ষা*, কলিকাতা, ১৩৫৭ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৩৫

৩১. গোলাম মুরশিদের তথ্য মতে, বেথুন প্রতিষ্ঠিত স্কুলটির নাম ছিল 'ভিক্টোরিয়া গার্লস স্কুল।' গোলাম মুরশিদ, *সংকোচের বিহ্বলতা*, পৃ. ২৩.

৩১. সুখময় সেন গুপ্ত এর নাম লিখেছেন 'ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল' হিসেবে। সুখময় সেন গুপ্ত, *বঙ্গদেশ ইংরেজী শিক্ষা ও বাঙ্গালীর শিক্ষা চিন্তা*, কলিকাতা, ১৯৮৫, পৃ.৪০। বেথুন স্কুল সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যের দ্রষ্টব্য: *বেথুন স্কুল ও নারীশিক্ষার দেড়শ বছর*, বেথুন স্কুল প্রকাশনী সমিতি, কলকাতা, ২০০০; Kalidas Nag (ed), *Bethune College & School: Centenary Volume (1849-1949)*, Reprint, Bethune School Praktani Samiti, Kolkata, 2004; Mira Bhattachajee & Shantana Sen (ed), *Bethune College Centenary Volume (1879-1971)*, Bethune School Praktani Samiti, Kolkata, 1980; আখতার ইমাম, *ইডেন থেকে বেথুন*, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ১৯৯০

৩২. http://bn.banglapedia.org/index.php?title= ,_জন_ _ , Retrived 20.10. 2020

হইয়াছিল। স্ত্রীশিক্ষা দ্বারা ভারতবর্ষীয় স্ত্রীলোকদিগের সকল শোক ও দুঃখ আপনীত হইবে তাহার সাঙ্কেতিক চিহ্ন স্বরূপ উক্ত অশোক বৃক্ষ রোপিত হইয়াছিল।[৩৩]

বেথুন প্রতিষ্ঠিত স্কুলটি ছিল বাংলায় নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালনকারী একটি প্রতিষ্ঠান। বেথুন কোম্পানির সরকারের উচ্চপদমর্যাদায় অধিষ্ঠিত থাকা সত্ত্বেও নিজের উদ্দেশ্যাবলি অর্জনের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত উদ্যোগকেই অগ্রাধিকার প্রদান করেন। তিনি হিন্দু ফিমেল স্কুল পরিচালনার সমুদয় অর্থনৈতিক দায়-দায়িত্ব নিজের সঞ্চিত অর্থ থেকে ব্যয় করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। ১৮৫১ সালে আকস্মিক মৃত্যুর পূর্বেই বেথুন তাঁর যাবতীয় স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি এই স্কুলকে দান করে দিয়েছিলেন। একজন বিদেশী ব্যক্তির এদেশীয় নারীদের শিক্ষার জন্য এরূপ বদান্যতার জন্যই বাংলার সামাজিক ইতিবৃত্তে বেথুনের নাম চিরস্মরণীয় হয়ে আছে।

আগেই বলা হয়েছে যে, বেথুন স্কুল প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ছিল সম্ভ্রান্ত হিন্দু পরিবারের মেয়েদের শিক্ষা দান। মদনমোহন তর্কালঙ্কার তাঁর দু'কন্যা ভুবনমালা ও কুন্দমালাকে এ স্কুলে ভর্তি করিয়েছিলেন। তারা ছিলেন স্কুলে প্রথম ২১ জন শিক্ষার্থীর অন্যতম। উল্লেখ্য যে, মদনমোহন তর্কালঙ্কার শুধু নিজের মেয়েদেরকেই তিনি কিছুদিন এ স্কুলে শিক্ষকতার দায়িত্বও পালন করেছেন। তাছাড়া তিনি বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য পাঠোপযুগী বাংলা বইও লিখেছিলেন। ১৮৫১ সালের জুলাই মাসে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর বড় মেয়ে সৌদামিনী দেবী ও ভ্রাতুষ্পুত্রী কুমুদিনীকে এ স্কুলে ভর্তি করেন। এরপর তিনি রাজনারায়ণ বসুকে এ পত্রে লিখেন,"আমি বেথুন সাহেবের বালিকা বিদ্যালয়ে সৌদামিনীকে পেরণ করিয়াছি, দেখি এ দৃষ্টান্তে কি ফল হয়।"[৩৪] এর ফল যে ইতিবাচক হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। ফলে আরও অনেক সম্ভ্রান্ত পরিবারের ছাত্রী উৎসাহিত হলো এখানে ভর্তি হতে। ১৮৫০ সালে বেথুনের অনুরোধে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বেথুন স্কুলের অবৈতনিক সেক্রেটারির পদ গ্রহণ করেন। বিদ্যাসাগরের অনুজ ও তাঁর জীবনীকার শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন লিখেছেন, সেক্রেটারি হিসেবে বিদ্যাসাগরের দায়িত্বভার গ্রহণের ফলে বেথুন স্কুলের অগ্রগতি ত্বারান্বিত হয়। তিনি দীর্ঘদিন এ স্কুলটি পরিচালনার সাথে যুক্ত ছিলেন। শম্ভুচন্দ্র লিখেছেন,"তাঁহার যত্নের শৈথিল্য থাকিলে কোন্‌কালে বেথুন ফিমেল স্কুল উঠিয়া যাইত।"[৩৫] বিদ্যাসাগরে প্রচেষ্টা ও অনুরোধে সামাজিক নিন্দা ও বাধা অতিক্রম করে অনেক সম্ভ্রান্ত হিন্দু ভদ্রলোক তাঁদের কন্যাদের বেথুনের স্কুলে ভর্তি করিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, ঈশানচন্দ্র বসু, শম্ভুনাথ পণ্ডিত, তারানাথ তর্ক বাচস্পতি, গোবিন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র, হেনাথ রায়, রসিকলাল সেন, মাধবচন্দ্র মল্লিক, হরিনারায়ণ দে, গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য ও হরকুমার বসু প্রমুখ। প্রসঙ্গত

৩৩. রাজনারায়ণ বসু, *আত্মচরিত*, কুন্তলাইন প্রেস, কলিকাতা, ১৩১৫ বঙ্গাব্দ, পৃ.৬১-৬২

৩৪. প্রিয়নাথ শাস্ত্রী, *দেবেন্দ্রনাথের পত্রাবলী*, ৩০ নং পত্র, পৃ. ৪০; উদ্ধৃতি সুখময় সেন গুপ্ত, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪১

৩৫. শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন, *বিদ্যাসাগর জীবনচরিত ও ভ্রমনিরাশ*, বুকল্যান্ড, কলিকাতা, ১৮৯১, পৃ. ৮৬

আরেকটি বিষয় উল্লেখ করা আবশ্যক যে, বেথুন তাঁর নারীশিক্ষা প্রসার কার্যক্রমে 'নিম্নমুখী পরিশ্রাবণ নীতি' (Downward Filtration Theory) গ্রহণ করেছিলেন বলে মনে হয়। তিনি সমাজের শিক্ষিত ও অভিজাত হিন্দু পরিবারের মেয়েদের শিক্ষা দেয়ার নীতি গ্রহণ করেছিলেন, যাতে তারা শিক্ষিত হয়ে সমাজের সাধারণ পরিবারের মেয়েদের শিক্ষার আলোকে উদ্দিপ্ত করতে পারেন।

বেথুন স্কুলের শিক্ষার মাধ্যম ছিল বাংলা। তবে অভিভাবকদের সুনির্দিষ্ট চাহিদা ও অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে ইংরেজি ভাষা শিক্ষারও ব্যবস্থা ছিল। মেয়েদের গার্হাস্থ্য শিক্ষার অংশ হিসেবে সেলাই ও অন্যান্য হাতের কাজ শেখানো হতো। স্কুলের শিক্ষা ছিল অবৈতনিক। দূর থেকে আগত মেয়েদের জন্য গাড়ির ব্যবস্থা ছিল এবং এসব গাড়ির গায়ে মহানির্বাণতন্ত্রোদ্ধৃত"কন্যাপেব্যং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতি যত্নতঃ" অর্থাৎ পুত্রের মত কন্যাকেও যত্নসহকারে পালন করতে হবে এবং শিক্ষা দিতে হবে- এই শ্লোকটি অঙ্কিত ছিল।

বেথুন স্কুলের চলার পথটি মোটেই মসৃণ ছিল না। স্কুল স্থাপিত হওয়ার পরই এর বিরুদ্ধে ধর্মান্ধ রক্ষণশীল সমাজপতিরা তীব্র বিরোধিতা শুরু করেছিলেন। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন:

> বিদ্যালয়ের গাড়ি যখন রাজপথে বাহির হইত, তখন লোকে হা করিয়া তাকাইয়া থাকিত ও নানা কথা কহিত; এবং সুকুমারমতি শিশু বালিকাদিগকে উদ্দেশ করিয়া কত অভদ্র কথাই কহিত। লোকে বলিতে লাগিল "এইবার কলির বাকি যা ছিল হইয়া গেল! মেয়েগুলো কেতাব ধরলে আর কিছু বাকি থাকিবে না।" নাটুকে রামনারায়ণ রসিকতা করিয়া বাবুদের মজলিসে বলিতে লাগিলেন;"বাপরে বাপ মেয়েছেলেকে লেখা পড়া শেখালে কি আর রক্ষা আছে! এক "আন" শিখাইয়াই রক্ষা নাই! চাল আন, ডাল আন, কাপড় আন, করিয়া অস্থির করে, অন্য অক্ষরগুলো শেখালে কি আর রক্ষা আছে!" লোকে শুনিয়া হা হা করিয়া এক গাল হাসিতে লাগিল।[৩৬]

কবি ঈশ্বরগুপ্ত ব্যঙ্গ করে লিখে ছিলেন:

যত ছুড়ীগুলো তুড়ী মেরে কেতাব হাতে নিচ্চে যবে,
এ বি শিখে, বিবী সেজে, বিলাতী বোল কবেই কবে;
আর কিছু দিন থাকরে ভাই! পাবেই পাবে দেখতে পাবে,
আপন হাতে হাঁকিয়ে বগী, গড়ের মাঠে হাওয়া খাবে।[৩৭]

পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার বেথুন স্কুল প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন ও নিজ মেয়েদের এ স্কুলে ভর্তি করায় ৮/৯ বছর তাঁকে সমাজচ্যুত থাকতে ও আজীবন রক্ষণশীলদের সামাজিক উপদ্রব সহ্য করতে হয়েছে। এমনকি এ স্কুলের শিক্ষার্থীদের বিবাহের সময়ও তারা বাধা দিতেন। সামাজিক নিগ্রহের ভয়ে অনেকেই এসব ছাত্রীদের বিবাহ করতে চাইতেন না।

---

৩৬. শিবনাথ শাস্ত্রী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৯০

৩৭. উদ্ধৃতি, শিবনাথ শাস্ত্রী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৯০

পূর্বোক্ত বিপত্তির মধ্যেও বেথুন স্কুল চলতে থাকে। কিন্তু স্কুলটির জন্য সবচেয়ে বড় ধাক্কাটি লাগে ১৮৫১ সালের ১২ আগস্ট বেথুন এর মৃত্যু হলে। একসময় যাঁরা স্কুল প্রতিষ্ঠায় বেথুনের সহযোগী ছিলেন তাঁদের অনেকই এখন স্কুল পরিচালনা থেকে দূরে সরে গেলেন। ফলে স্কুলটি অবস্থা ক্রমশ শোচনীয় হয়ে পড়ে। এরইমধ্যে কর্নওয়ালিস স্কোয়ারের পশ্চিম দিকের একটি নতুন ভবনে বিদ্যালয়টি স্থানান্তরিত হয়। বেথুন স্কুলের দুর্দিনে সেক্রেটারি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর স্কুলটি রক্ষায় আপ্রাণ চেষ্টা করেন। এ সময় তৎকালীন গভর্নর জেনারেল লর্ড ডালহৌসী (১৮৪৮-১৮৫৬ খ্রি.) বেথুন স্কুলের অগ্রগতি অব্যাহত রাখার জন্য সহযোগিতার হাত বাড়ান। উল্লেখ্য যে, গভর্নর জেনারেল ও তাঁর স্ত্রী উভয়েই নারীশিক্ষার প্রতি বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। অবশ্য ইতোমধ্যে নারীশিক্ষার ব্যাপারে কোম্পানি সরকারেরও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটে। এর প্রতিফলন ঘটে ১৮৫৪ সালের 'উড ডেসপ্যাচে' (Wood's despatch)। এতে নারীশিক্ষার ব্যাপারে সরকারের সরল ও আন্তরিক সমর্থন থাকবে বলে উল্লেখ করা হয়। তাই উডের ডেসপ্যাচকে বাংলায় মেয়েদের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা প্রচলনের সরকারি সুপারিশ সম্বলিত প্রথম দলিল হিসেবে গণ্য করা হয়। উডের ডেচপ্যাচে নারীশিক্ষার বিস্তারে সরকারি সাহায্যের অনুকূলে সুপারিশ করা হলে নারীশিক্ষার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যালয় স্থাপন ক্রমশ সহজ হয়ে ওঠে। ১৮৫৬ সালে সরকার বেথুন স্কুলের দায়িত্বভার গ্রহণ করায় স্কুলটির অনিশ্চিত অবস্থার অনেকটাই অবসান ঘটে।

নানা সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, বেথুন স্কুল প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়েই উনিশ শতকে বাংলায় যথার্থ অর্থে প্রাতিষ্ঠানিক নারীশিক্ষার সূত্রপাত ঘটেছিল। এ কথা বলা অসঙ্গত হবে না যে, বেথুনই ভারতীয় নারীদের জন্য তিনি একটি প্রাতিষ্ঠানিক স্থাপনা তৈরি করেছেন এবং একটি মজবুত নির্ভরযোগ্য ভিত্তির উপর নারীশিক্ষা প্রতিষ্ঠিত করেছেন। লক্ষণীয় যে, খ্রিস্টধর্ম প্রচার বা অন্য কোনো স্বার্থে নয়, কেবল নারী জাতির প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধাই বেথুনকে নারীশিক্ষা বিস্তারে তাঁর সর্বস্ব দানে অনুপ্রাণিত করেছিল।

বেথুন স্কুল প্রতিষ্ঠাকালেও মেয়েদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা বিরোধী মনোভাব প্রবল ছিল সত্য, তবে এর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে অনেক বাঙালি তাঁদের মনোভাব পরিবর্তন করেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ রাজা রাধাকান্ত দেবের কথা উল্লেখ করা যায়। তিনি যে নারীশিক্ষার সমর্থক ছিলেন সে কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। তবে মেয়েদের বাড়ির বাইরে গিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণের ছিলেন ঘোর বিরোধী। কিন্তু বেথুন স্কুল প্রতিষ্ঠার পর তাঁর এ মনোভাব পরিবর্তন হয়। ২০ মার্চ ১৮৫০ সালে তিনি বেথুনকে লেখা এক পত্রে জাতির নৈতিক চরিত্র ও সামাজিক সুখ সমৃদ্ধির বৃদ্ধির জন্য নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন।[৩৮] শুধু তাই নয়, তিনি তাঁর

৩৮. যোগেশচন্দ্র বাগাল, 'রাজা রাধাকান্ত দেব', *সাহিত্য সাধক চরিতমালা*, দ্বিতীয় খণ্ড, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, পৃ. ৩৫

শোভাবাজার বাড়িতে একটি বালিকা বিদ্যালয়ও স্থাপন করেছিলেন বলে *সম্বাদ ভাস্কর* পত্রিকায় একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। পত্রিকাটির ভাষ্য মতে:

> কলিকাতা নগরে বালিকাদের শিক্ষার্থ দ্বিতীয় বালিকা বিদ্যালয়– আমরা শ্রবণ করিলাম শ্রীযুক্ত রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর তাঁহার বাটীতে স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষার্থ এক পাঠশালা সংস্থাপন করিয়াছেন। সংস্কৃত কলেজের একজন ছাত্র ভদ্র বালিকাদের ইংরাজী বাঙ্গালা উভয় ভাষায় শিক্ষা দান করিতেছেন।[৩৯]

বেথুনের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় উত্তরপাড়ায় একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। উত্তরপাড়া বালিকা বিদ্যালয়ের সমসাময়িক চন্দননগর, বলুটি ও মজিলপুরেও তিনটি বালিকা বিদ্যালয় পরিচালিত হতো। এ বিদ্যালয়গুলো পরিচালনায়ও উত্তরপাড়া হিতকরী সভা থেকে আর্থিক অনুদান প্রদান করা হতো। আর সম্ভবত দুই তিন বছর পর কিশোরীচাঁদ মিত্র রাজশাহীতেও একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন।[৪০] ইতোপূর্বে প্রতিষ্ঠিত বারাসতের কালীকৃষ্ণ গার্লস স্কুলটিও এখন নতুন উদ্যম লাভ করে।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও নারীশিক্ষা

উনিশ শতকে বাংলায় নারীমুক্তি ও নারীশিক্ষা প্রসারে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১ খ্রি.)[৪১] এর অবদান অবিস্মরণীয়। তিনি ছিলেন একজন সংস্কৃত পন্ডিত, লেখক, শিক্ষাবিদ, সমাজসংস্কারক ও জনহিতৈষী। নারীমুক্তি ভাবনা তাঁর বর্ণাঢ্য কর্মজীবনের কেন্দ্রে ছিল। রাজা রামমোহন রায়ের চেষ্টা বাঙালি নারী সমাজ সতীদাহের মতো নির্মম অমানবিক কু-প্রথা থেকে রক্ষা পায়। আর বিদ্যাসাগরের চেষ্টা বাঙালি সমাজে বিধবা বিবাহের প্রচলন হয়। বিদ্যাসাগর ছিলেন একজন আধুনিক মনোভাবাপন্ন মানবতাবাদী দর্শনে অনুপ্রাণিত মানুষ। তিনি উপলব্ধি করেছেন, পুরোনো মূল্যবোধ এবং পরিবারের ভেতর থেকে পরিবর্তন আনতে না পারলে সমাজ এবং দেশের কখনো প্রকৃত উন্নতি হবে না। নিপীড়িত জনের প্রতি বিদ্যাসাগরের গভীর মমত্ববোধ ও সহমর্মিতা ও সমদর্শী দৃষ্টিভঙ্গি তাঁকে সমাজস্থ নারী জাতির জীবন মানের উন্নয়নে কাজ করার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করেছিল। আর এ জন্যে তিনি বিধবা-বিবাহ চালু করা, বহুবিবাহ ও বাল্যবিবাহ নিষিদ্ধ করার মতো নারী কল্যাণমূলক সংস্কার আন্দোলনে ব্রতী হয়েছিলেন। উল্লেখ্য যে, বিধবা বিবাহের পক্ষে জনমনে চেতনার প্রসারে বিদ্যাসাগর ১৮৫৪ সালের *তত্ত্ববোধিনী* পত্রিকায় প্রথম বিধবা বিবাহের পক্ষে প্রবন্ধ লেখেন। পরের বছর ১৮৫৫ সালের জানুয়ারি মাসে *বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব* নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। পরাশর সংহিতা থেকে উদ্ধৃতি তুলে বিদ্যাসাগর বলেন যে, বিধবা বিবাহ সম্পূর্ণভাবে

---

৩৯. *সম্বাদ ভাস্কর*, ২৯ মে, ১৮৪৯

৪০. গোলাম মুরশিদ, *সংকোচের বিহ্বলতা*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৫

৪১. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১ খ্রি.) ছিলেন উনবিংশ শতকের একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, লেখক ও সমাজসংস্কারক। তাঁর পারিবারিক প্রদত্ত নাম ছিল 'ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়'। ১৮৩৯ সালে হিন্দু ল কমিটির পরীক্ষা দেন ঈশ্বরচন্দ্র। এই পরীক্ষাতেও যথারীতি কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে ১৬ মে ল কমিটির কাছ থেকে যে প্রশংসাপত্রটি পান, তাতেই প্রথম তাঁর নামের সঙ্গে 'বিদ্যাসাগর' উপাধিটি ব্যবহৃত হয়। আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম বিবিসির জরিপে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালির তালিকায় অষ্টম স্থান লাভ করেন তিনি।

শাস্ত্রসম্মত। বিধবা পুনর্বিবাহের পক্ষে বিদ্যাসাগরের আন্দোলনের পক্ষে-বিপক্ষে হিন্দু সমাজে তুমুল বিতর্ক সৃষ্টি হয়। রাজা রাধাকান্ত দেবের নেতৃত্বে রক্ষণশীল হিন্দু সমাজপতিরা বিদ্যাসাগরের প্রয়াসের তীব্র বিরোধিতা করেন। বিদ্যাসাগরের বক্তব্যকে চ্যালেঞ্জ করে এসময় কমপক্ষে তাঁরা ৩০টি পুস্তিকা প্রকাশ করেন।[৪২] তবে বিদ্যাসাগরও হাল ছাড়ার পাত্র ছিলেন না। রক্ষণশীলদের বিরোধিতা সত্ত্বেও তিনি লক্ষ্য অর্জনে এগিয়ে যান এবং শেষ পর্যন্ত তাঁর প্রয়াস সফল হয়। বড়লাট ক্যানিং ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দের ২৬শে জুলাই ১৫ নং রেগুলেশন জারি করে বিধবা বিবাহকে আইন সিদ্ধ করেন ।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নারীমুক্তি সংগ্রামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র ছিল নারীশিক্ষার প্রসার। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, নারী সমাজকে দীর্ঘ দিনের বঞ্চনা ও দুঃখ-দুর্দশার হাত থেকে রক্ষা করতে হলে তাদের নিজেদের মধ্যেও আত্মসচেতনতা তৈরি করতে হবে। আর শিক্ষাই পারে তাদের সচেতন ও আলোকিত মানুষ করতে। আর এ জন্যই তিনি নারীশিক্ষা বিস্তারের জন্যেও আন্দোলন আরম্ভ করেছিলেন। তিনি ছিলেন নারীশিক্ষার একজন অত্যুৎসাহী সমর্থক। তিনি মনে করতেন নারীশিক্ষা ব্যতীত সমাজ ও দেশের উন্নতি সম্ভব নয়। তাই তিনি বিভিন্ন সভায় বক্তৃতাকালে গীতা, সাবিত্রী, গার্গী ও মৈত্রীয়ের শতমুখে প্রশংসা করতেন এবং হিন্দু শাস্ত্রবচনের উল্লেখ করে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মনে নারীশিক্ষার প্রতি আগ্রহ তৈরি চেষ্টা করতেন। কারণ তিনি জানতেন যে, নারীশিক্ষার প্রতি রক্ষণশীল ও অনুদার মনোভাব পরিবর্তন করতে হলে এর সপক্ষে ধর্মীয় শাস্ত্রীয় বিধানগুলোকে জনসমক্ষে তুলে ধরতে হবে। বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে বিদ্যাসাগর বুঝতে পেরেছিলেন বাঙালি সমাজে গ্রামীণ নারীরাই বেশি নিপীড়ন ও বঞ্চনার শিকার হয়। আর এ কারণেই তিনি নারীশিক্ষার ক্ষেত্র হিসেবে গ্রাম বাংলার উপরও বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। এটি ছিল বিদ্যাসাগরের ব্যতিক্রমী প্রয়াস।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, বেথুনের অনুরোধে বিদ্যাসাগর তাঁর স্কুলে অবৈতনিক সম্পাদকের পদ গ্রহণ করেছিলেন। বেথুনের মৃত্যুর পর তিনি স্কুলটিকে শক্ত হাতে হাল ধরে একে রক্ষা করেন। ১৮৫৬ সালে ভারত সরকার বেথুন স্কুলের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। স্কুলটি পরিচালনার জন্য সরকার যে কমিটি করে সেই কমিটির সম্পাদক হিসেবে বিদ্যাসাগরকে বহাল রাখা হয়। এ সময় তাঁর উদ্যোগে স্কুল পরিচালনা কমিটির পক্ষ থেকে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। এতে নারীশিক্ষার উপকারিতা সম্পর্কে স্বদেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। এতে বলা হয় যে:

> যাঁহাদের অন্তঃকরণ জ্ঞানালোক দ্বারা প্রদীপ্ত হইয়াছে, তাহারা অবশ্যই বুঝিতে পারেন ইহা কত প্রার্থনীয় যে যাঁহার সহিত সারা জীবন সহবাস করিতে হয় সেই স্ত্রী সুশিক্ষিত ও জ্ঞান সম্পন্ন হন এবং শিশুসন্তানদিগকে শিক্ষা দিতে পারেন আর স্ত্রী ও কন্যাগণের মনোবৃত্তি প্রকৃতরূপে মার্জিত হইয়া অকিঞ্চিৎকর কার্যের অনুষ্ঠানে

৪২. https://www.bengalstudents.com/Madhyamik%20History/retrived 15.11.2020

পরান্মুখ থাকে এবং যে সকল কার্যের অনুষ্ঠানে বৃদ্ধিবৃত্তির উন্নতি ও পরিশুদ্ধি হইতে পারে তাহাতে প্রবৃত্ত হয়।[৪৩]

পূর্বোক্ত উদ্দেশ্য সাধন করে নারীশিক্ষার ফলভোগী হওয়ার জন্য বিজ্ঞপ্তিতে সকলের প্রতি আহ্বন জানানো হয়েছিল।

সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পদে অধিষ্ঠিত থাকা অবস্থাতেই বিদ্যাসাগরকে সরকার দক্ষিণ বাংলার 'সহকারী বিদ্যালয়' পরিদর্শক নিযুক্ত করেছিল। এ সময় তিনি উপলব্ধি করেন যে, শুধু কলকাতার সম্ভ্রান্ত ও মধ্যবিত্ত সমাজকে নারীশিক্ষায় আগ্রহী করাই যথেষ্ট নয়, বাংলার প্রত্যন্ত পল্লী অঞ্চলেও নারীশিক্ষার সুফল বিস্তৃত করতে হবে। এ বিষয়ে তিনি বাংলার প্রথম লেফটেন্যান্ট গভর্নর স্যার ফ্রেডারিক জেমস হ্যালিডে (১৮৫৪-১৮৫৯ খ্রি.) এর সাথে পরামর্শ করেন। হ্যালিডেও ছিলেন নারীশিক্ষার ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহী এবং তিনি বিদ্যাসাগরকে পল্লী অঞ্চলে বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা পরিকল্পনা বাস্তবায়নে উৎসাহিত করেন। হ্যালিডের সাথে মৌখিক আলোচনা এবং বালিকা বিদ্যালয়গুলো সরকারি সহায়তা লাভ করবে এ আশ্বাসে বিদ্যাসাগর মফস্বল ও পল্লী এলাকায় বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কর্মসূচি নিয়ে অগ্রসর হন। ১৮৫৭ সালের নভেম্বর মাস থেকে ১৮৫৮ সালের মে মাসের মধ্যে বিদ্যাসাগর হুগলি জেলায় ২০টি, বর্ধমানে ১১টি, মেদিনিপুরে ২টি এবং নদীয়ায় ১টিসহ মোট ৩৫ টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। বিদ্যালয়গুলোর মাসিক পরিচালনা ব্যয় ছিল ৮৫০ টাকা এবং এসব বিদ্যালয়ে পাঠরত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল প্রায় ১৩০০।[৪৪] বিদ্যাসাগর স্কুলগুলো পরিচালনার ব্যয় নির্বাহের জন্য সরকারের কাছে আর্থিক সহায়তার জন্য আবেদন করেন। এ নিয়ে সরকারের বিভিন্ন মহলে পত্র চালাচালি হয়। কিন্তু কর্তৃপক্ষ সিপাহী-বিদ্রোহের জন্য সরকারের আর্থিক অনটনবশতঃ বালিক-বিদ্যালয়গুলো পরিচালনায় কোন স্থায়ী সাহায্য করতে অস্বীকার করে। তবে বিদ্যাসাগরকে আশ্বস্ত করেন যে, বিষয়টি ভবিষ্যতে বিবেচনা করা হবে। সরকারের এ সিদ্ধান্তে বিদ্যাসাগর অত্যন্ত মর্মাহত হন। এতদিন পর্যন্ত তিনি বলতে গেলে নিজ ব্যয়ে স্কুলগুলো পরিচালনা করে আসছিলেন। এমনকি স্কুলের দরিদ্র অসহায় শিক্ষার্থীদের তিনি বই-পুস্তক, স্লেট-পেন্সিল পর্যন্ত সরবরাহ করতেন। তবে শিক্ষকদের বেতন প্রদান করা সম্ভব হচ্ছিল না। তিনি আশাবাদী ছিলেন সরকার এ বিদ্যালয়গুলোর পরিচালনায় সহায়তা করবে। কিন্তু তাঁর সে আশা ব্যর্থ হয়। এ নিয়ে Public Instruction এর তদানিন্তন পরিচালকের সাথে তাঁর মনোবিবাদ হয়। প্রতিক্রিয়া হিসেবে ১৮৫৮ সালে বিদ্যাসাগর সরকারি চাকুরি থেকে ইস্তফা দেন।

সরকারি চাকুরি থেকে ইস্তফা প্রদানের ফলে মাসিক ৫০০ টাকার আয় হ্রাস, সরকারের সাহায্যদানে অসম্মতিতে বিদ্যাসাগর কিছুটা হতাশ হয়েছিলেন সত্য, তবে নারীশিক্ষা বিস্তারে তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়গুলোর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একেবারেই নিরাশ হননি। বালিকা-বিদ্যালয়গুলো পরিচালনা ব্যয় সংগ্রহের জন্য তিনি একটি

---

৪৩. *সংবাদ প্রভাকর*, ১৩ জানুয়ারি, ১৮৫৭; উদ্ধৃতি, সুখময় সেন গুপ্ত, *পূর্বোক্ত*, পৃ, ৫৭

৪৪. যোগেশচন্দ্র বাগাল, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর', *সাহিত্য সাধক চরিতমালা*, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৬৬। এ ৩৫টি বিদ্যালয়ের জেলাওয়ারি নাম, প্রতিষ্ঠাকাল ও প্রত্যেকটির মাসিক পরিচালনা ব্যয় সম্পর্কে তথ্য রয়েছে উক্ত গ্রন্থের পৃ. ৬৬-৬৮

"নারীশিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভাণ্ডার" খোলেন। তাঁর এ ভাণ্ডারে পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ প্রমুখ বহু সম্ভ্রান্ত দেশীয় ভদ্রলোক এবং উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারীরা নিয়মিত চাঁদা দিতেন। স্ত্রীশিক্ষার বিস্তারে তাঁর এ প্রচেষ্টা যে দেশবাসীর আনুকুল্য লাভ করেছিল, তা সার বার্টল ফ্রিয়ারকে লিখিত বিদ্যাসাগরের একটি পত্র থেকে জানা যায়। তিনি লিখেছিলেন:

> শুনিয়া সুখী হইবেন, মফস্বলের যে-সকল বালিকাবিদ্যালয়ের জন্য আপনি চাঁদা দিয়াছিলেন, সেগুলি ভালই চলিতেছে। কলিকাতার নিকটবর্তী জেলাসমূহের লোকেরা স্ত্রীশিক্ষার সমাদর করিতে আরম্ভ করিয়াছে। মাঝে মাঝে নুতন নুতন স্কুলও খোলা হইতেছে।[৪৫]

নারীশিক্ষা প্রসারে বিদ্যাসাগরের প্রবল আগ্রহ দেখে বাংলার তদানিন্তন ছোটলাট স্যার সেসিল বীডনও (১৮৬২-১৮৬৭ খ্রি.) তাঁকে মাসিক ৫৫ টাকা করে অনুদান প্রদান করতেন। এভাবেই নারী নারীশিক্ষা প্রসারের অগ্রদূত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নারীশিক্ষা উদ্যোগটি অব্যাহত থাকে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, নারীশিক্ষা প্রসারের জন্য বিদ্যাসাগর উপযুক্ত বাঙালি শিক্ষিকা তৈরিরও উদ্যোগ নিয়েছিলেন। তাঁর প্রচেষ্টায় বেথুন স্কুলে শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য একটি নর্মাল স্কুল করা হয়েছিল।

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, নারীশিক্ষায় বিদ্যাসাগরের অবদান ছিল অসামান্য। অন্ধকারে নিমজ্জিত নারী সমাজে শিক্ষার প্রদীপ জ্বেলে তিনি তাদের মুক্তির যে দিশা দেখিয়েছিলেন, তা আজো নারী মুক্তির অন্যতম পথ। তাঁর এ প্রয়াস রবীন্দ্রনাথসহ সমকালীন পণ্ডিতদের প্রশংসা অর্জন করেছিল। সমাজ সংস্কারে তাঁর অনন্য অবদান উল্লেখ করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "বিধাতা বিদ্যাসাগরের প্রতি বঙ্গভূমিকে মানুষ করিবার ভার দিয়াছিলেন"।

ব্যক্তি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নারীশিক্ষা প্রতিষ্ঠান

শিক্ষা ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক হিসেবে হুগলির উত্তরপাড়ার জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের কথা ইতোমধ্যেই উল্লেখ করা হয়েছে। নারীশিক্ষা প্রসারের জন্য ১৮৪৫ সাল ও ১৮৪৯ সালে উত্তরপাড়ায় তাঁর একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যর্থ প্রয়াসের কথাও অন্যত্র আলোচনা করা হয়েছে। জয়কৃষ্ণের বৈমাত্রেয় ভাই ছিলেন বিজয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। অগ্রজ জয়কৃষ্ণের প্রজাহিতৈষণামূলক কাজ, বিশেষ করে শিক্ষা বিস্তারে তাঁর কর্মোদ্যোগ দেখে বিজয়কৃষ্ণও এ ব্যাপারে বিশেষভাবে উৎসাহিত হয়েছিলেন। ১৮৬৩ সালে তিনি অনুজ জয়কৃষ্ণের সাথে যৌথ প্রয়াসের মাধ্যমে তিনি উত্তরপাড়ায় একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। পরে উত্তরপাড়া হিতকরী সভা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর উক্ত সভা এ বালিকা বিদ্যালয়টি পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করে এবং এর পরিচালনায় বিদ্যালয়টি নারীশিক্ষা প্রসারে একটি সফল প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়।[৪৬]

---

৪৫. যোগেশচন্দ্র বাগাল, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর', *সাহিত্য সাধক চরিতমালা*, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ.৭২

৪৬. বসন্তকুমার সামন্ত, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৬, ৩৩

ব্যক্তি উদ্যোগে কেবল কলকাতা বা পশ্চিমবঙ্গে নয় পূর্ব বাংলায়ও নারীশিক্ষা প্রসারের চেষ্টা হয়েছিল। *সোমপ্রকাশ* পত্রিকার তথ্য অনুযায়ী ১৮৬২ সালে পাবনার বিখ্যাত জমিদার হরিশচন্দ্র শর্মা তাঁর নিজ বাড়িতে নিজ ব্যয়ে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। হরিশচন্দ্রের বিদুষী স্ত্রী বামাসুন্দরী দেবী এই স্কুলে শিক্ষকতা করতেন এবং পরে তিনি এর প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব লাভ করেন। বাবু প্রাণনাথ সাহা স্কুল পরিচালনা কমিটির সম্পাদক ছিলেন। পাবনা বালিকা বিদ্যালয় নামে পরিচিত স্কুলটিতে এক বছরের মধ্যে ২৫ জন ছাত্রী ভর্তি হয়েছিল। ছাত্রীদের প্রায় সকলেই ছিল স্থানীয় সম্পন্ন ভূস্বামী ও অভিজাত পরিবারের সন্তান। স্কুলটি মাসিক ৩৫ রুপি সরকারি অনুদান লাভ করেছিল।[৪৭]

এ সময় যশোর অঞ্চলেও নারীশিক্ষা প্রসারে উদ্যোগ পরিলক্ষিত হয়। ১৮৬৫-৬৬ সালে যশোর জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের এক প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, সে সময় যশোর সদর এবং আশপাশের এলাকায় ১৫টি বালিকা বিদ্যালয় চালু ছিল। এসব বিদ্যালয়ের মধ্যে ৫টি সরকারি অনুদানে পরিচালিত হতো এবং বাকি ১০ টি পরিচালিত হতো ব্যক্তি ও বেসরকারি উদ্যোগে। এ ১৫টি বিদ্যালয়ের মধ্যে তিনটি ছিল মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।[৪৮] ১৮৬৫ সালের অক্টোবর সংখ্যা *বামাবোধিনী* পত্রিকায় প্রকাশিত এক প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, যশোর অঞ্চলের ধানপোতা, মঙ্গালপুত, আজমতপুর, মথুরাপুর, আগরাইল, খাজুরা, মাজিয়ালী, গহেরপুর ও নেবুতলা অঞ্চলে কয়েকটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এসব বিদ্যালয়ের প্রত্যেকটিতে গড়ে ১০ থেকে ১৫ জন শিক্ষার্থী পড়াশুনা করতো। গ্রামীণ এসব বালিকা বিদ্যালয়গুলোর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন স্থানীয় শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিগণ। সাধারণত স্কুলগুলো পরিচালিত হতো তাঁদের নিজেদের বাড়িতেই এবং শিক্ষার্থীদের অধিকাংশই ছিল তাঁদের পরিবার বা আত্মীয়-স্বজন। পাঠদানের কাজটিও করতেন পরিবার বা আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে শিক্ষিত কেউ একজন। স্কুলগুলোতে সাধারণত বাংলা পাঠ ও লেখা শেখানো হতো। নদীয়ার কমিশনার R.B. Chapman এধরণের কিছু বালিকা বিদ্যালয় পরিদর্শন করে যে প্রতিবেদন প্রদান করেন, এতে এসব স্কুলের শিক্ষার মান সন্তোষজনক ছিল বলে মত দিয়েছিলেন।[৪৯]

১৮৬৭ সালে যশোর ফৌজদারি আদালতের ক্লার্ক রাজকৃষ্ণ মিত্রের অর্থায়নে যশোর শহরে একটি হিন্দু বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মদনমোহন মজুমদার বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠার জন্য জমি দান করেছিলেন। নিম্ন প্রাথমিক শ্রেণিতে ৬ জন শিক্ষার্থী নিয়ে এ বিদ্যালয়টির যাত্রা শুরু হয়েছিল। তবে কয়েক বছরের মধ্যে এর শিক্ষার্থী সংখ্যা ২০ জনে উন্নীত হয়েছিল। অবৈতনিক এ স্কুলটির ব্যয় নির্বাহ হতো স্থানীয় বিদ্যানুরাগী ব্যবসায়ী ও ভূস্বামীদের

৪৭. Asha Islam Nayeem, 'Women's Emancipation through Education in 19th Century Eastern Bengal: Private Enterprise or Government Agency?' in *Journal of the Asiatic Society of Bangladesh* (Hum.), Vol. 60(1), 2015, p.45

৪৮. Extract from the Jessore Magistrate's Annual General Report for the year 1865-66, From R.B. Chapman, Officiating Commissioner of the Nuddea Division, GoB, Education (A) Proceedings for February, 1867

৪৯. Extract from the Jessore Magistrate's Annual General Report for the year 1865-66, From R.B. Chapman, Officiating Commissioner of the Nuddea Division, GoB, Education (A) Proceedings for February, 1867

পৃষ্ঠপোষকতায়। বিদ্যালয় পরিদর্শক সি বি ক্লার্ক ও কালেক্টর জে মনরো বিদ্যালয়টি পরিদর্শনে এসে শিক্ষার্থীদের পাঠনৈপুণ্য দেখে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন এবং পুরস্কার হিসেবে তাদের পাঁচ টাকা দিয়েছিলেন বলে জানা যায়।[৫০]

তদানিন্তন কুষ্টিয়া অঞ্চলের মধ্যে কুমারখালি অঞ্চল নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে যথেষ্ট অগ্রগামী ছিল। জানা যায় যে, গ্রামীণ সাংবাদিকতার পথিকৃৎ হিসেবে সুপরিচিত কাঙাল হরিনাথ মজুমদার (১৮৩৩-১৮৯৬ খ্রি.) ১৮৫৪ সালে স্থানীয় একটি মন্দিরের পাশে একটি Vernacular School প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।[৫১] এ স্কুলটিতে বালকদের সাথে স্থানীয় হিন্দু মেয়েদের পাঠদানের ব্যবস্থা ছিল। ১৮৫৫ সালে স্থানীয় জমিদার কুমারখালিতে যে বালিকা বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সেটি প্রতিষ্ঠায় কাঙাল হরিনাথ তাঁকে বিশেষভাবে সহযোগিতা করেছিলেন।[৫২] ১৮৭৩ সালে কুষ্টিয়ার স্থানীয় আরেকজন জমিদার রামলাল বাবু একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। বর্তমানে এটি চারুলতা সরকারি বালিকা বিদ্যালয় নামে পরিচিত।[৫৩]

১৮৬৮ সালে রাজশাহীতে নারীশিক্ষার জন্য একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। দিঘাপাতিয়ার জমিদার প্রমথনাথ রায় স্কুলটি পরিচালনার জন্য ৪৫০০ রুপির একটি স্থায়ী ফান্ড তৈরি করেন। এ ফাণ্ড থেকে প্রাপ্ত মুনাফা দ্বারা স্কুলটির ব্যয় নির্বাহ করা হতো। স্কুলটি পরিচালনায় প্রমথনাথ রায়ের এ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁর নামে এর নামকরণ করা হয় পি এন বালিকা বিদ্যালয়। বর্তমানে এটি পি এন সরকারি বালিকা বিদ্যালয় নামে পরিচিত এবং এটি এখন রাজশাহীর অন্যতম সেরা নারীশিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

রাজশাহী শহরে অবস্থিত একটি প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী বালিকা বিদ্যালয় হচ্ছে 'মিশন বালিকা বিদ্যালয়।' বিদ্যালয়টির সাইনবোর্ডে প্রদর্শিত তথ্যানুসারে এর প্রতিষ্ঠাকাল ১৮৮৮ সাল। তবে রাজশাহী থেকে প্রকাশিত স্থানীয় দৈনিক পত্রিকা *সোনার দেশ*-এ জনৈক আনারুল হক আনা 'মিশন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ১৮৮৮ সালেরও প্রাচীন' শিরোনামে এক নিবন্ধে দেখিয়েছেন যে, স্কুলটি আরো প্রাচীন। নিবন্ধ লেখক রেভারেন্ড প্রিয় কুমার বারুই রচিত *বঙ্গীয় খৃষ্টমণ্ডলীর ইতিহাস* গ্রন্থসহ স্থানীয় কয়েকটি ইতিহাস গ্রন্থের তথ্যসূত্র পর্যালোচনা

---

৫০. স্বপন বসু, *সংবাদ সাময়িকপত্রে উনিশ শতকের বাঙালিসমাজ*, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাডেমি, কলকাতা, পৃ.২৯৬-২৯৭

৫১. কাঙাল হরিনাথ মজুমদার ছিলেন একজন সাংবাদিক, সাহিত্যিক, বাউল গান রচয়িতা। কাঙাল ফিকিরচাঁদ বা ফিকিরচাঁদ বাউল নামেও তিনি পরিচিত ছিলেন। হরিনাথ ছিলেন ফকির লালন শাহর শিষ্য। তিনি আধ্যাত্মবাদ প্রচারের জন্য ১৮৮০ সালে 'কাঙাল ফিকির চাঁদের দল' নামে একটি বাউল দল গঠন করেন। গ্রামের সাধারণ মানুষের উন্নতির জন্য এবং তাদের শোষণ-পীড়নের বিরুদ্ধে হরিনাথ সারাজীবন আন্দোলন করেছেন। অত্যাচারিত এবং অসহায় কৃষক সম্প্রদায়কে রক্ষার উদ্দেশ্যে তিনি সাংবাদিকতা পেশা গ্রহণ করেন। প্রথমে তিনি *সংবাদ প্রভাকর* পত্রিকায় লিখতেন, পরে ১৮৬৩ সালে তিনি নিজেই *গ্রামবার্তা প্রকাশিকা* নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। পত্রিকাটি পরে পাক্ষিক ও শেষে এক পয়সা মূল্যের সাপ্তাহিকে পরিণত হয়। পত্রিকা প্রকাশের সুবিধার্থে তিনি ১৮৭৩ সালে একটি ছাপাখানা স্থাপন করেন। তিনি একজন লেখক ছিলেন এবং তাঁর রচিত গ্রন্থসংখ্যা ১৮টি ছিল বলে জানা যায়।

৫২. শিপ্রা দস্তিদার, 'হরিনাথ কাঙাল', *বাংলাপিডিয়া*, https://bn.banglapedia.org/index.php?title= -

৫৩. মীর জাহেদা নাজনীন, বাংলাদেশে নারী উন্নয়নের ধারা (১৯৪৭-১৯৯৫), অপ্রকাশিত পিএইচডি থিসিস, ইতিহাস বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৯, পৃ. ৭৩

করে দেখিয়েছেন যে, সম্ভবত ১৮৬২-৬৪ সালের মধ্যে এ স্কুলটি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন রাজশাহীর রামপুর বোয়ালিয়ায় ইংলিশ প্রেসবিটারিয়ান মিশনের প্রধান রেভারেন্ড বিহারীলাল সিং। এ সময়ের মধ্যে তিনি মিশন কম্পাউন্ডে একটি পাঠশালা বা প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। প্রথমে এটি একটি সহশিক্ষা বিদ্যালয় ছিল। পরে একে বালিকা বিদ্যালয়ে উন্নীত করা হয়। তখন এর নামকরণ করা হয় বুলনপুর মিশন স্কুল। প্রতিষ্ঠার পর প্রায় শতবছর এটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ই ছিল। পরে ১৯৬৭ সালে একে উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে উন্নীত করা হয়। ১৯৭০ সালে এ বিদ্যালয়ের ১৪ জন শিক্ষার্থী প্রথম মাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। বর্তমানে রাজশাহী জেলা প্রশাসকের অফিসের বিপরীতে কোর্ট এলাকায় রাজশাহী-চাঁপাই নবাবগঞ্জ সড়কের উত্তর-পূর্ব অবস্থিত মিশন হাউজের মধ্যে নিজস্ব ভবনে এটি ‘মিশন বালিকা বিদ্যালয়’ নামে কার্যক্রম পরিচালনা করছে।[৫৪] নিবন্ধকারের তথ্য মতে, পেসবিটিরিয়ান মিশনারীদের প্রতিষ্ঠিত উপর্যুক্ত স্কুলটির সমকালেই রাজশাহীর হেতেমখাঁয় আরেকটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। স্থানীয় বাসিন্দা খোন্দকার ওয়াসিমুদ্দিন আহম্মদের পরিবারের দান সম্পত্তি ও অবকাঠামোতে এ বিদ্যালয়টি স্থাপিত হয়েছিল। খোন্দকার ওয়াসিমউদ্দিনের বংশধর খোন্দকার এনামুল রচিত *উৎস সন্ধানে* গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, “১৮৬৮ সালে খোন্দকার ওয়াসিমুদ্দিন নিজ গৃহে একটি ইংরেজি মিশন স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন।” আনারুল হক আনার তথ্য অনুযায়ী এটিই ছিল সে বালিকা বিদ্যালয়।[৫৫] অবশ্য বর্তমানে এর কোনো অস্তিত্ব নেই।

উনিশ শতকের ষাটের দশকে নারীশিক্ষা প্রসঙ্গে ময়মনসিংহের একটি উজ্জ্বল ইতিহাস পাওয়া যায়। ১৮৬৫ সালে ময়মনসিংহের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, সে সময় ময়মনসিংহ সদরে একটি এবং মফস্বল আরো ২টি গার্লস স্কুল ছিল। এর মধ্যে সদর স্কুলটিতে ৮ জন এবং মফস্বলের দুটি স্কুলে ২৯জন মেয়ে লেখাপড়া করতেন।[৫৬] তবে এ স্কুলগুলোর নাম এবং প্রতিষ্ঠাতাদের নাম সম্পর্কে কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। তবে ময়মনসিংহের একটি বিখ্যাত নারীশিক্ষা প্রতিষ্ঠান হলো ‘বিদ্যাময়ী বালিকা বিদ্যালয়’। ভারতীয় উপমহাদেশে নারীশিক্ষার উন্নয়নে যে কয়টি বিদ্যালয় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে, তার মধ্যে অন্যতম এ বিদ্যাময়ী বালিকা বিদ্যালয়। বিদ্যাময়ী বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা মুক্তাগাছা জমিদার রামরাম। তিনি তাঁদের পরিবারের মেয়েদের লেখাপড়ার জন্য ময়মনসিংহ শহরে নিজবাড়িতে ১৮৭৩ সালে এই স্কুলটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। প্রতিষ্ঠার কিছুকাল পরে এর নামকরণ করা হয় Alexander Girls’ School.[৫৭] যা’হোক পরে

---

৫৪. আনারুল হক আনা, ‘মিশন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ১৮৮৮ সালেরও প্রাচীন’, *সোনার দেশ*, জানুয়ারি, ২০১৭

৫৫. আনারুল হক আনা, *পূর্বোক্ত*

৫৬. Report of the Commissioner of the Dacca Division, GoB, Edu. Branch, February Proceedings, 1867. p. 55

৫৭. কেন এ নামকরণ করা হয়েছিল তা নিঃসন্দেহে বলা মুশকিল। কারো কারো মতে, রাশিয়ার জার আলেকজেন্ডারের নামে এ স্কুলটির নামকরণ করা হয়েছিল। আবার অন্য মতে বিখ্যাত খ্রিষ্টান মিশনারী Alexander Duff এর নামে এ স্কুলটির নামকরণ করা হয়। যেহেতু স্কুলটি একজন আচারনিষ্ঠ হিন্দু জমিদার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তাই একজন খ্রিস্টান মিশনারীর নামানুসারে এর

এর নামকরণ করা হয় বিদ্যাময়ী স্কুল। স্কুলটির উন্নয়নে মুক্তাগাছা জমিদার পরিবারের জগৎকিশোর আচার্য ৫০ হাজার টাকা অনুদান প্রদান করেন। তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বিদ্যালয়টির পূর্ণ অবয়ব লাভ করেছিল। স্কুলটি উন্নয়নে জমিদার জগৎকিশোর রায়ের অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ তাঁর মায়ের নামে এর নতুন নামকরণ করা হয় 'বিদ্যাময়ী বালিকা বিদ্যালয়।' স্কুলটির উন্নয়ন ও ছাত্রী নিবাস তৈরির জন্য মুক্তাগাছা জমিদার পরিবারের আত্মীয় গৌরিপুরের তদান্তিন জমিদার ৯ হাজার রুপি এবং কৃষ্ণনগরের জমিদার ৬ হাজার রুপি অনুদান দিয়েছিলেন। বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠার সুদীর্ঘ একষট্টি বছর পর ১৯১২ সালে এটি জাতীয়করণ হয়। এ বালিকা বিদ্যালয়টি এখন 'বিদ্যাময়ী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়' নামে পরিচিত এবং এটি বাংলাদেশের নারীশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে প্রথম সারির একটি বিদ্যালয়।

'বিন্দুবাসিনী সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়' টাঙ্গাইল জেলা তথা ঢাকা বিভাগের অত্যন্ত স্বনামধন্য একটি বিদ্যালয়। ১৮৮২ সালে এ বিদ্যালয়টিও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ব্যক্তি উদ্যোগে। এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সন্তোষের (টাঙ্গাইলের) পাঁচ আনির জমিদার শ্রী দ্বারকানাথ রায় চৌধুরীর স্ত্রী এবং সুসাহিত্যিক শ্রী প্রমথনাথ রায় চৌধুরী ও স্যার মন্মথরায় চৌধুরীর মাতা রাণী বিন্দুবাসিনী চৌধুরাণী। এতদঞ্চলের নারী সমাজকে শিক্ষার আলোয় আলোকিত করে পৃথিবীকে জানতে, নিজের মেধা, সত্ত্বা, চিন্তা-চেতনার বিকাশের পথকে সুগম করার মহতি লক্ষ্যকে সামনে রেখে মহিয়সী বিন্দুবাসিনী চৌধুরাণী পরম মমতায় গড়ে তুলেছিলেন এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি। তিনি বিদ্যালয়ের জন্য টাঙ্গাইল কালিবাড়ির বিপরীত দিকে আকুর টাকুর পাড়ায় ০.৮২ একর জমিসহ একটি একতলা ভবন দান করেছিলেন। প্রতিষ্ঠালগ্নে এটি ছিল একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়। পর্যায়ক্রমে ১৯২২ সালে মাধ্যমিক স্তরে এবং ১৯৩৪ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় হিসাবে স্বীকৃত লাভ করে। এই ঐতিহ্যবাহী বিদ্যালয়টিকে ১৯৬৮ সালে ১৫ই নভেম্বর জতীয়করণ করা হয়।

চট্টগ্রামের ব্রাহ্মসমাজের নেতা ডা. অন্নদাচরণ খাস্তগীর (১৮৩০-১৮৯০ খ্রি.) ছিলেন একজন বিখ্যাত চিকিৎসক, সমাজসংস্কারক এবং গবেষণামূলক প্রবন্ধকার।[৫৮] উনিশ শতকের নারীরমুক্তি এবং অধিকার রক্ষা আন্দোলনে তিনি ছিলেন একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। এই কাজে তাঁর সহযোগী ছিলেন দুর্গামোহন দাস, গুরুচরণ মহলানবিশ, রজনীনাথ রায়, এবং দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ। তাঁর কন্যা কুমুদিনী চট্টগ্রামের প্রথম মহিলা

নামকরণ করা হবে, তা স্বাভাবিক নয়। আবার রাশিয়ার জারের নামে নামকরণেরও কোনো যৌক্তিক কারণ নেই। তাই কেন এ নামকরণ করা হয়েছিল এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত টানা সঙ্গত নয়।

৫৮. অন্নদাচরণ *চিকিৎসক সম্মিলনী* নামক একটি মাসিক পত্রিকা (১২৯১- ১২৯৯ বঙ্গাব্দ) সম্পাদনা করতেন। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো: *মানব জন্মতত্ত্ব*, *ধাত্রীবিদ্যা*, *নবপ্রসূত শিশুর পীড়া ও চিকিৎসা*, *স্ত্রীজাতির ব্যাধিসংগ্রহ*, *আয়ুর্বর্ধন*, *শরীর রক্ষণ* ও পারিবারিক সুস্থতা প্রভৃতি।

স্নাতক।[৫৯] অন্নদাচরণ খাস্তগীর ১৮৭৮ সালে চট্টগ্রামের বর্তমান জামাল খান সড়কে মেয়েদের জন্য একটি 'ভার্নাকুলার মাধ্যমিক বিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠা করেন। এটি চট্টগ্রামের প্রাচীনতম এবং প্রথম বালিকা বিদ্যালয়। অন্নদাচরণের জামাতা প্রখ্যাত আইনজীবী ও রাজনীতিবিদ এবং চট্টগ্রামের সামাজিক আন্দোলনের পথিকৃৎ যাত্রামোহন সেন (অন্নদাচরণের ৩য় কন্যা বিনোদিনী খাস্তগীরের স্বামী) তাঁর স্মৃতি রক্ষার জন্যে একে ইংরেজি উচ্চ বিদ্যালয়ে উন্নীত করার লক্ষ্যে জমিদানসহ একটি বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ করেন। এ সময় তাঁর শ্বশুরের স্মৃতি রক্ষার্থে বিদ্যালয়টির নামকরণ করা হয় 'ডা. খাস্তগীর বালিকা বিদ্যালয়।' ১৯০৭ সালে সরকার ডা. খাস্তগীর বালিকা বিদ্যালয়টি পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করে। উল্লখ্য যে, বিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলার নারী জাগরণের অন্যতম নেত্রী, শিক্ষাবিদ ও রাজনীতিবিদ শামসুন নাহার মাহমুদ (১৯০৮-১৯৬৪) এবং ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক ও যোদ্ধা প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার (১৯১১-১৯৩২) এ বিদ্যালয়ের প্রতিথযশা ছাত্রী ছিলেন। বর্তমানে এটি 'ডা খাস্তগীর সরকারি বালিকা বিদ্যালয়' হিসেবে চট্টগ্রাম অঞ্চলে নারীশিক্ষার একটি অগ্রণী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে সুপরিচিত।

ভগিনী নিবেদিতা ও নারীশিক্ষা

বাংলায় নারীশিক্ষা প্রসারে ভগিনী নিবেদিতার (১৮৬৭-১৯১১ খ্রি.) অবদানের কথা এ প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য। তাঁর প্রকৃত নাম মার্গারেট এলিজাবেথ নোবেল। অ্যাংলো-আইরিশ বংশোদ্ভুত ভগিনী নিবেদিতা ছিলেন একজন সমাজকর্মী, লেখিকা, শিক্ষিকা এবং স্বামী বিবেকানন্দের একজন শিষ্য। ১৮৯৫ সালের নভেম্বর মাসে লন্ডনের এক পারিবারিক আসরে মার্গারেট স্বামী বিবেকানন্দের বেদান্ত দর্শনের ব্যাখ্যা শোনেন। বিবেকানন্দের ধর্মব্যাখ্যা ও ব্যক্তিত্বে তিনি মুগ্ধ হন এবং বিবেকানন্দকেই নিজের গুরু বলে বরণ করে নেন। গুরুর আহ্বানে সাড়া দিয়ে ১৮৯৮ সালে স্বদেশ ও পরিবার-পরিজন ত্যাগ করে মার্গারেট ভারতে চলে আসেন। এর কিছুদিন পর স্বামী বিবেকানন্দ তাঁকে ব্রহ্মচর্য ব্রতে দীক্ষা দেন। তিনিই মার্গারেটের নতুন নাম রাখেন 'নিবেদিতা'। বিশ্ব পরিবারের কাছে তখন থেকেই মার্গারেট এলিজাবেথ পরিচিতি লাভ করেন 'ভগিনী (সিস্টার) নিবেদিতা' হিসেবে। স্বামীজির নিবেদিতাকে ভারতে আসার আহ্বান জানানোর পেছনে প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় নারীদের মধ্যে শিক্ষার প্রসারে কাজ করা। কলকাতাস্থ The Ramakrishna Mission Institute of Culture এর প্রকাশিত *Nivedita of India* শিরোনামের একটি পুস্তিকায় বলা হয়েছে যে, "The main reason why Swamiji invited Nivedita to India was to spread education to the women of the country." [৬০]

৫৯. কুমুদিনী খাস্তগীর বেথুন কলেজ থেকে স্নাতক ডিগ্রি লাভের পর বেথুন স্কুলে শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। পরে তিনি বেথুন কলেজের লেকচারার এবং পরিশেষে এর অধ্যক্ষ হিসেবে ১৯১৩ সালে অবসর গ্রহণ করেন। দ্রষ্টব্য, Asha Islam Nayeem, *op.cit*, p.50

৬০. *Nivedita of India*, The Ramakrishna Mission Institute of Culture, Kolkata, Fourth Reprint : May 2007, p. 21

উল্লেখ্য যে, স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্বাস করতেন যে, নারী জাতিকে যথাযথভাবে শিক্ষিত করা ছাড়া ভারতের উন্নতি সম্ভব নয়।[৬১] সেই জন্য নিবেদিতা ভারতে বিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনার কথা জানালে বিবেকানন্দ উৎসাহী হন। নিবেদিতা বলরাম বসুর বাড়িতে এই ব্যাপারে একটি সভা ডাকেন। মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, সুরেশ দত্ত, হরমোহন প্রমুখ রামকৃষ্ণ পরমহংসের গৃহস্থ শিষ্যেরা এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। এই সভাতেই নিবেদিতা বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব দেন এবং সবাইকে বিদ্যালয়ে ছাত্রী পাঠানোর জন্য অনুরোধ করেন। সভা চলাকালীন বিবেকানন্দ সভায় প্রবেশ করে সবার পিছনে আসন গ্রহণ করেন। নিবেদিতা তা লক্ষ্য করেননি। নিবেদিতা ছাত্রী পাঠানোর অনুরোধ করার পরই বিবেকানন্দ উঠে দাঁড়িয়ে সবাইকে বলতে থাকেন, "ওঠো, ওঠো, শুধু মেয়ের বাবা হলেই চলবে না। মেয়েদের শিক্ষাবিস্তারের জন্য সবাইকে সাহায্য করতে হবে। এটা জাতীয় আদর্শ।"[৬২] তখন সকলেই তাদের মেয়েদের বিদ্যালয়ে পাঠাতে রাজি হন।

১৮৯৮ সালের ১৩ নভেম্বর কালীপূজার দিন কলকাতার বাগবাজার এলাকার ১৬, বোসপাড়া লেনে বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। স্বামী বিবেকানন্দ ও রামকৃষ্ণ পরমহংসের অন্যান্য অনুগামীদের উপস্থিতিতে বিদ্যালয়ের উদ্বোধন করেন সারদা দেবী। সারদা দেবী বিদ্যালয়ের সাফল্য কামনা করে বলেন, "আমি এই বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের উপর দিব্যজননীর আশীর্বাদ প্রার্থনা করি। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা যেন শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে আদর্শ নারী হয়ে উঠতে পারে।"[৬৩] এভাবেই প্রতিষ্ঠিত হয় 'ভগিনী নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়'। ১৮৯৯ সালের জুলাই মাসে স্বামী বিবেকানন্দ যুক্তরাষ্ট্রে যান এবং সেখানে এক বছর ধরে গণসংযোগের মাধ্যমে বিদ্যালয়ের জন্য অর্থ সংগ্রহ করেন। ১৯০২ সালে বিদ্যালয়টি নিয়মিত বিদ্যালয়ে পরিণত হয়। ১৯০৩ সালে বিবেকানন্দের আমেরিকান শিষ্যা ভগিনী ক্রিস্টিন নিবেদিতাকে সাহায্য করতে বিদ্যালয়ে যোগ দেন। সাধারণ শিক্ষা প্রদানের পাশাপাশি এ বিদ্যালয়টিতে একটি শিল্প বিভাগ পরিচালনা করা হয়। ১৯০৩ সালে ভগিনী নিবেদিতা ও ভগিনী ক্রিস্টিন এই বিভাগটি চালু করেছিলেন। সে সময় এ বিভাগের নাম ছিল 'পুরস্ত্রী বিভাগ'। এখানে বিনামূল্যে শিক্ষার্থীদের সেলাই, খেলনা তৈরি ইত্যাদি হাতের কাজ শেখানো হয়। এই বিভাগের ছাত্রীরা প্রতি বছর একটি প্রদর্শনী আয়োজন করে। ১৯৪৯ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প দফতর এই বিভাগটি অনুমোদন করে।

---

৬১. It was realized by Swami Vivekananda that the rejuvenation of India was not possible without the proper education of her women. Even before starting the Belur Math, he was planning to start a centre where girls could be educated on national lines. https://sisterniveditagirlsschool.org/grandhistory_inside.html, Retrieved on 10.06.2022

৬২. *Nivedita of India, op.cit.*, p.21

৬৩. *Nivedita of India, op.cit.*, pp. 21-22

১৯১১ সালের অক্টোবর মাসে নিবেদিতার মৃত্যু পর থেকে বিদ্যালয়টি নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে থাকে। ১৯১৪ সালে ভগিনী সুধীরা এসে বিদ্যালয়ের কার্যভার নিজের হাতে তুলে নেন। সেই থেকে বিদ্যালয়ের পরিচালনভার রামকৃষ্ণ মিশন-অনুগামী শিক্ষিতা মহিলাদের হাতে অর্পিত হয়। ১৯১৮ সালে বিদ্যালয়টি ছিল রামকৃষ্ণ মিশনের একটি শাখাকেন্দ্রে পরিণত হয়। ১৯৬৩ সালের ৯ আগস্ট রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়টিকে রামকৃষ্ণ সারদা মিশনের হাতে সমর্পণ করেন। তখন বিদ্যালয়ের নাম 'রামকৃষ্ণ সারদা মিশন ভগিনী নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়' রাখা হয়। বর্তমানে এটি কলকাতার একটি গুরুত্বপূর্ণ ও খ্যাতিমান বালিকা বিদ্যালয় হিসেবে পাঠদানরত আছে।

নারীশিক্ষা প্রসারে কতিপয় মহিয়ষী নারীর অবদান

উনিশ শতকে নারীশিক্ষা এবং নারীর উন্নয়নে নিঃশব্দে কয়েকজন নারী কাজ করে গেছেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন অঘোর কামিনী রায় (১৮৫৬-১৮৯৬)। তিনি ছিলেন বিধান রায়ের মা। এ মহিয়সী নারী স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। তাঁর নিজের কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছিল না। স্বামী প্রকাশচন্দ্র রায়ের উৎসাহে স্বামী গৃহেই তিনি পাঠ গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর ব্রাহ্ম স্বামী যখন বিহারে কর্মরত ছিলেন তখন তিনি নিজ বাড়িতে একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। বিদ্যালয়টি পরিচালনায় অসুবিধা হওয়ায় তিনি তাঁর নিজের দুই কন্যাকে নিয়ে লক্ষ্ণৌতে ইসাবেলা থর্বন কলেজে বছরাধিক কাল ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ এবং বিদ্যালয় পরিচালনা সংক্রান্ত শিক্ষা লাভ করেন। ১৮৯২ সালে বাঁকীপুরের একজন প্রখ্যাত আইনজীবী গুরুপ্রসাদ সেন অঘোর কামিনী রায়কে সেখানকার প্রায় বন্ধ হয়ে যাওয়া একটি বালিকা বিদ্যালয়ের পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণে অনুরোধ জানালে তিনি সানন্দে তা গ্রহণ করেন। অঘোর কামিনী রায় এ বালিকা বিদ্যালয়টির জন্য অর্থ সংগ্রহের পাশাপাশি নিজ কন্যাদের স্কুলে পাঠাতে স্থানীয় অভিভাবকদের উদ্বুদ্ধ করতেন। তিনি তাঁর দুই কন্যাকে এ স্কুলের শিক্ষক করেছিলেন। অসহায় অস্বচ্ছল শিক্ষার্থীদের নিজ বাড়িতে রেখে বিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। তিনি দুঃস্থ নারীদের কল্যাণার্থে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন– যেটি পরবর্তীতে 'অঘোর কামিনী সমিতি' নামে পরিচিতি লাভ করে। দুঃস্থ্য নারীদের স্বাবলম্বী করার জন্য প্রয়োজনী শিক্ষার ব্যবস্থা করা ছিল এ সমিতির প্রধান লক্ষ্য।[৬৪] মাত্র চল্লিশ বছর বয়সে অঘোর কামিনী রায়ের অকাল প্রয়াণ ঘটে। তাঁর এ মৃত্যু বাঙালি নারীশিক্ষার জন্য এক বড় ক্ষতির কারণ হয়েছিল।

বাংলায় নারীশিক্ষার প্রসারে কাশিমবাজারের মহারাণী স্বর্ণময়ীর নামও স্মরণযোগ্য। মাত্র ষোল বছর বয়সে বিধবা হওয়া এ নারী কেবল শক্ত হাতে সাফল্যের সাথে নিজের জমিদারিই পরিচালনা করেননি। নানা সমাজকল্যাণমূলক কাজের জন্যও তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। তাঁর জনকল্যাণমূক কাজের মধ্যে অন্যতম

৬৪. সুনীতা বন্দ্যোপাধ্যায়, *আধুনিতার অভিঘাতে বঙ্গনারী*, পরিমার্জিত সংস্করণ, কলকাতা, অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটর, ২০০৫, পৃ. ১৯৪

ছিল শিক্ষার প্রসার। আর শিক্ষা প্রসারমূলক কাজের মধ্যে নারীশিক্ষা বিষয়ক কাজ ছিল অন্যতম। এ জন্য তিনি বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উদার হস্তে অনুদান দিয়েছিলেন। বাংলায় নারী জাগরণ ও নারীশিক্ষার স্বপক্ষে মুখপত্র হিসেবে কাজ করতো বামাবোধিনী পত্রিকা। অর্থ সংকটে নিপতিত বামাবোধিনী পত্রিকার পুনরুদ্ধারে তিনি ২০০ টাকা অনুদান দিয়েছিলেন।[৬৫]

৪.৩: নারীশিক্ষা প্রসারে সাংগঠনিক উদ্যোগ

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলায় নারী স্বার্থানুসারী অনেক সংগঠনের সূত্রপাত হয়। এসব সংগঠনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বেশ কয়েকটি সংগঠন ব্রাহ্মসমাজের সাথে যুক্ত ছিল। এ পর্যায়ে আলোচ্য সময়ে নারীশিক্ষার প্রসারে কতিপয় উল্লেখযোগ্য সংগঠনের উদ্যোগ সম্পর্কে আলোকপাত করা হবে।

নারীশিক্ষার প্রসার ও নারী স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণে দেশীয় বিদ্বৎসমাজের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত প্রথম উল্লেখযোগ্য সংগঠন ছিল 'তত্ত্ববোধিনী সভা'। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ সংগঠনের মুখপত্র ছিল *তত্ত্ববোধিনী* পত্রিকা। এ সংগঠনটি নারীশিক্ষার জন্য কোনো বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি বটে, তবে এর সপক্ষে জনমত সৃষ্টিতে সংগঠনটি বিশেষ ভূমিকা রেখেছিল। সংগঠনটি অন্তঃপুর শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতিও তার সমর্থন প্রকাশ করেছিল।

তারকনাথ দত্তের নেতৃত্বে হিন্দু কলেজের কিছু সমাজ সচেতন বাঙালি তরুণ ছাত্র সমাজের উদ্যোগে ১৮৫০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 'সর্ব্বশুভকরী সভা'। উত্তর কলকাতার ঠনঠনিয়ায় বাবু রামচন্দ্র দত্তের ৫৮ নং বাড়িতে সর্ব্বশুভকরী সভার প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। সামাজিক ও ধর্মীয় বিভিন্ন সমস্যার নারীমুক্তি ও নারীশিক্ষা বিষয়ক আলোচনা ও এর অন্তরায়সমূহ দূরীকরণের উপায় উদ্ভাবন ইত্যাদি এ সংগঠনটির মূল লক্ষ্য ছিল। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও মদনমোহন তর্কালঙ্কারের পরামর্শ ও উদ্যোগে সংগঠনটির মুখপত্র হিসেবে 'সর্ব্বশুভকরী পত্রিকা' প্রকাশ করা হয়। পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন মতিলাল চট্টোপাধ্যায়। পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যায় বিদ্যাসাগর 'বিধবা বিবাহ' নামে একটি নিবন্ধ লিখেছিলেন। এ পত্রিকায় 'বাল্য বিবাহের দোষ' নামেও একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। যদিও এতে রচনাকারের নাম ছিল না, তবে ওই লেখা যে বিদ্যাসাগরেরই, তার উল্লেখ পাওয়া যায় মনীষী রাজনারায়ণ বসুর লেখা *আত্মচরিত* গ্রন্থ এবং বিদ্যাসাগর-অনুজ শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্নের লেখা *বিদ্যাসাগর জীবনচরিত ও ভ্রমনিরাশ* গ্রন্থে।[৬৬] পত্রিকাটি তার দ্বিতীয় সংখ্যায় মদমোহন তর্কালঙ্কারের লেখা 'স্ত্রীশিক্ষা' নামক একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিল।

---

৬৫. সুনীতা বন্দ্যোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৯৪

৬৬. শম্ভু সেন, 'প্রগতিশীল সামাজিক-রাজনৈতিক সাংবাদিকতার অন্যতম প্রবর্তক ও পথপ্রদর্শক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর' *খবর অনলাইন*, https://www.khaboronline.com/, Retrieved on 12.08.2022

নারী সমাজের সর্বাত্মক জাগরণ ও নারীশিক্ষার প্রসারে 'বেথুন সোসাইটি' নামক সংগঠনেরও বিশেষ ভূমিকা ছিল বলে জানা যায়। নারীশিক্ষার পরম সমর্থক ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুনের স্মৃতি রক্ষার্থে কতিপয় দেশি-বিদেশী মনীষীর প্রচেষ্টায় এ সোসাইটিটি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। তদানিন্তন বঙ্গীয় শিক্ষা পর্ষদের সম্পাদক ডা. এফ জে মৌএট এর সভাপতি এবং প্যারীচাঁদ মিত্র এর সম্পাদক ছিলেন। সোসাইটির উল্লেখযোগ্য সদস্যদের মধ্যে ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কৈলাস বসু, রামগোপাল ঘোষ, রাধানাথ শিকদার, হরমোহন চট্টোপাধ্যায়, জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, প্রসন্নকুমার মিত্র, প্যারীচরণ সরকার, গোপাল মিত্র প্রমুখ। ১৮৫৫ সালে সোসাইটির সভাপতি নারীশিক্ষা সম্পর্কে একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ পাঠ করেন। ১৮৫৬ সালে কৈলাসচন্দ্র বসু সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কীভাবে নারীশিক্ষার প্রসার ঘটানো যায় সে বিষয়ে একটি দিক-নির্দেশনামূলক প্রবন্ধ পাঠ করেন। ১৮৫৯ সালে বেথুন সোসাইটি পুনর্গঠন করে একে ছয়টি পৃথক বিভাগে বিন্যস্ত করা হয়। এসব বিভাগের অন্যতম ছিল নারী সমাজের উন্নতি সংক্রান্ত বিভাগ। রাজা রামমোহন রায়ের পুত্র রমাপ্রসাদ রায়কে এ বিভাগটি পরিচালনার দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। এ বিভাগের উদ্যোগে হানামুর, কালীকৃষ্ণ এবং কিশোরীচাঁদ মিত্র প্রমুখের প্রদত্ত কয়েকটি বক্তৃতার মাধ্যমে নারীশিক্ষার অপ্রতুলতার প্রেক্ষাপটে এর প্রসারে করণীয়, নারী জাতির সামগ্রিক উন্নয়নে সম্ভাব্য উদ্যোগ এবং শিক্ষার মাধ্যমেই যে নারী জাতির মানসিক উন্নতি সম্ভব ইত্যাদি বিষয়ে জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।[৬৭]

১৮৬৪ সালে কিশোরীচাঁদ মিত্রের উদ্যোগে 'সমাজ উন্নতি বিধায়িনী সুহৃদ সমিতি' নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা হয়। নারীশিক্ষা প্রবর্তন, হিন্দু বিধবা বিবাহ প্রবতৃন, বাল্য বিবাহ ও বহু বিবাহ প্রতিরোধ এ সভার অন্যতম লক্ষ্য ছিল। এ সভার উদ্যোগে কিশোরীচাঁদ মিত্রের বাসভবনে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছিল। অবশ্য ছাত্রী সংকট এবং স্থানীয় রক্ষণশীল মানুষের অসহযোগিতার কারণে স্কুলটি সফল হয়নি।[৬৮]

নারীশিক্ষা বিস্তারে এদেশীয় উদ্যোক্তাদের মধ্যে ব্রাহ্মসমাজের ভূমিকা ছিল সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ও ফলপ্রসু। 'ব্রাহ্মসমাজ' বা 'ব্রাহ্মসভা' উনিশ শতকে বাংলায় স্থাপিত একটি সামাজিক ও ধর্মীয় আন্দোলন। ব্রাহ্মসমাজকে সর্বজনীন ধর্ম হিসেবে বিবেচনার একটি তাত্ত্বিক দাবি থাকলেও এটি হিন্দু ধর্মেরই একটি শাখা ছিল। তাঁদের উপাস্য ছিল 'নিরাকার ব্রহ্ম' এবং এ থেকেই নিজেদের ধর্মের নাম রাখা হয় ব্রাহ্ম। আর এ মতের অনুসারীদের মিলিত সংগঠন 'ব্রাহ্মসমাজ'। ব্রাহ্ম আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩ খ্রি.)। জানা যায় যে, ধর্মসংস্কার আন্দোলনের অঙ্গ হিসাবে বেদান্তের একেশ্বরবাদের ওপর ভিত্তি করে রাজা রামমোহন রায় হিন্দু ধর্মকে সংস্কারমুক্ত করার জন্য ১৮১৫ খ্রিষ্টাব্দের শেষের দিকে 'আত্মীয় সভা' নামক একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। কলকাতায় রামমোহনের মানিকটোলার বাগান বাড়িতে নিয়মিতভাবে আত্মীয় সভার বৈঠক

৬৭. অরুণা চট্টোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৩

৬৮. ঐ, পৃ. ১৪

অনুষ্ঠিত হতো। আত্মীয় সভার বৈঠকগুলোতে আলোচিত বিষয়ের মধ্যে ছিল মূর্তি পূজার অসারতা, বর্ণ প্রথা এবং সতীদাহ প্রথা ও বহুবিবাহের কুফলসমূহ এবং বিধবা বিবাহ প্রচলনের বাঞ্ছনীয়তা ইত্যাদি। পারিবারিক ও অন্য নানাবিধ সমস্যার কারণে রামমোহন রায় আত্মীয় সভার কাজ বেশি দিন নিয়মিত চালাতে পারেননি। তবে তাঁর অনুসন্ধিৎসু মন অবিরতভাবে ধর্ম সংস্কার চিন্তায় মগ্ন ছিল। এ অবস্থায় রাজা রামমোহন রায় ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮২৮ খ্রিষ্টাব্দের ২০ আগষ্ট তাঁদের মতাদর্শে বিশ্বাসী বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে উত্তর কলকাতার বাঙালি খ্রিস্টান কমল বোসের বাড়িতে একটি 'ধর্মসভা'র আয়োজন করেন। এই সভায় রামমোহনের অনুসারীগণ 'ব্রাহ্মসমাজ' নামে একটি পৃথক ধর্মীয় সমাজ গঠন করে।[৬৯] ১৮৩০ খ্রিষ্টাব্দের ২৩ জানুয়ারি (১১ মাঘ) রাজা রামমোহন রায়ের উৎসাহে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁদের জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িতে একটি অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়ে ব্রাহ্মসমাজের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেন। ব্রাহ্মসভার মূল বক্তব্য ছিল, ঈশ্বর এক ও অভিন্ন, সকল ধর্মের মূল কথা এক। উল্লেখ্য যে, রামমোহন রায় ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা হলেও এর বিকাশের সাথে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র সেন, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ অনেক বিখ্যাত ব্যক্তির নাম বিশেষভাবে জড়িয়ে আছে।

একটি নতুন ধর্মমতের প্রচার ও প্রসার ব্রাহ্ম আন্দোলনের মূল লক্ষ্য হলেও সমাজ সংস্কার কাজেও তারা অত্যন্ত সক্রিয় ছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের বহুমুখী সামাজিক কার্যক্রমের মধ্যে ভারতীয় নারী সমাজের অবস্থার উন্নয়ন ছিল অন্যতম। নারী সমাজের জীবনমান উন্নয়নে ব্রাহ্মরা তৎকালে হিন্দু সমাজে প্রচলিত বহু কু-প্রথার অবসানার্থে নানাভাবে প্রয়াস চালান। ব্রাহ্মরা মনে করতেন যে, মানব জগতের অন্ধকার দূরিভূত করা, অন্ধবিশ্বাস ও মানসিক জড়তা দূর করে মানবমুক্তির উপায় উদ্ভাবন এবং নৈতিক গুণাবলি সম্পন্ন ভালো মানুষ সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন শিক্ষার প্রসার। আর এ শিক্ষা যেমন পুরুষদের জন্য প্রয়োজন, তেমনি নারীদের জন্যও। ব্রাহ্মরা মনে করতেন, নারীদের মুক্তি ও তাদের সামাজিক অবস্থার উন্নতি সাধন করার পূর্ব শর্ত হচ্ছে তাদের শিক্ষার আলোতে আলোকিত করা। এ লক্ষ্যে নারীশিক্ষা প্রসারে ব্রাহ্মরা নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। নারীশিক্ষা বিস্তারে ব্রাহ্মদের পরিচালিত কার্যক্রমকে প্রধানত তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- ক) নারীশিক্ষার পক্ষে জনমত সৃষ্টি ও জনসচেতনতা বৃদ্ধি; খ) জেনানা বা অন্তঃপুর শিক্ষা বিস্তার এবং গ) প্রাতিষ্ঠানিক নারীশিক্ষার প্রসার।

ব্রাহ্মসমাজ বাংলায় নারীশিক্ষার পক্ষে জনমত সৃষ্টির লক্ষ্যে নানামুখী প্রয়াস নিয়েছিলেন। এসব কার্যক্রমের মধ্যে ছিল ব্রাহ্ম নেতৃবৃন্দের নারীশিক্ষার পক্ষে বক্তৃতা, গ্রন্থ রচনা, পত্র-পত্রিকায় প্রবন্ধ নিবন্ধ রচনা ইত্যাদি। অভিসন্দর্ভের পূর্ববর্তী অধ্যায়ে এতদবিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

নারীশিক্ষা প্রসারে নানামুখী তৎপরতা সত্ত্বেও উনিশ শতকের পঞ্চাশের দশকের শেষাবধি এ বিষয়ে কাঙ্ক্ষিতমাত্রার সাফল্য অর্জিত হয়নি। রক্ষণশীল গোঁড়া বাঙালি সমাজের তীব্র বিরোধিতা ও নারীশিক্ষার সমর্থকদের উপর নানা

৬৯. এর আগে রামমোহন রায় ১৮২৫ খ্রিস্টাব্দে 'ব্রাহ্মসভা' নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বলে জানা যায়। ব্রাহ্মসমাজকে অনেকেই ব্রাহ্মসভার উত্তরসূরি সংগঠন হিসেবে গণ্য করে থাকেন।

রকম নিপীড়ন নির্যাতনের কারণে নারীশিক্ষার বিশেষ করে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সন্তোষজনক বিস্তার ঘটেনি। ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে বেথুন স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বটে, তবে এ সময়াবধি এ স্কুলে ছাত্রী সংখ্যা ছিল একেবারেই হাতে গোনা। ১৮৬৩ সালে বাংলায় বালিকা বিদ্যালয়ের মোট সংখ্যা ছিল ৩৫টি এবং ছাত্রীসংখ্যা ছিল মাত্র ১১৮৩ জন। এর কারণ সেকালে যারা নারীশিক্ষার সমর্থক ছিলেন, তাদেরও অনেকে পুরুষ শিক্ষকদের দ্বারা পরিচালিত বিদ্যালয়ে মেয়েদের বেশিদিন পাঠ গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন না। সাধারণভাবে তখনো বাঙালি সমাজের প্রতিষ্ঠানিক নারীশিক্ষার প্রতি কঠোর নেতিবাচক মনোভাব ছিল। মেয়েরা পড়বে, কিন্তু বাড়ির বাইরে গিয়ে পড়াশোনা করবে, সমাজের অনেকেই তা মেনে নিতে পারছিলেন না। এ কারণেই ব্রাহ্মনেতা শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর বন্ধুদের সাথে মিলে যখন মহিলপুরে একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তখন স্থানীয় জমিদারসহ সমাজপতিরা এতে প্রচণ্ড বাধা দেন। এমনকি এক রাতে বিদ্যালয়টি ভেঙ্গে দেয়া হয়। অথচ এ সময় ব্রাহ্ম এবং ব্রাহ্মসমাজ প্রভাবিত বাঙালি শিক্ষিত যুবকগণ (যারা স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক বিষয়ক পাশ্চাত্য ধারণা দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন) উপযুক্ত জীবনসঙ্গিনী হিসেবে তাদের নিজেদের স্ত্রীদেরও শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন। তবে তাদের অনেকেই সামাজিক বিধি লঙ্ঘন ও অবরোধ প্রথা ভেঙ্গে মেয়েদের বিদ্যালয়ে প্রেরণের মতো দুঃসাহস দেখাতে পারেননি। এরূপ একটি পরিস্থিতিতে 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ'-এর প্রতিষ্ঠাতা কেশবচন্দ্র সেন নারীদের জন্য 'অন্তঃপুর শিক্ষার' প্রস্তাব ও এর প্রসারে উদ্যোগ নেন। পুনশ্চ উল্লেখ্য যে, সে সময় বাঙালি সমাজে পর্দা ও অবরোধ প্রথার কড়াকড়ি অস্বীকার করে নারীশিক্ষা প্রসারের কোনো উপযুক্ত ও সার্থক পন্থা অবলম্বন করা খুবই কঠিন ছিল। এমনকি পর্দা প্রথা রহিতকরণের উদ্যোগেরও সাফল্যের কোনো সম্ভাবনা ছিল না।[৭০] এছাড়া বাল্য বিবাহজনিত কারণেও নারীদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা বেশি দূর অগ্রসর হতো না। এ অবস্থায় ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র ও তাঁর অনুসারীরা নারীদের জন্য যে বিশেষ শিক্ষা ব্যবস্থার প্রসারে উদ্যোগী হন–তার নাম 'অন্তঃপুর নারীশিক্ষা' (Home Education For Women) বা 'জেনানা শিক্ষা' ব্যবস্থা।[৭১] বস্তুত, বাড়িতে ব্যক্তিগতভাবে পরিবারের শিক্ষিত পুরুষ/নারী বা শিক্ষকের কাছে নারীদের পাঠগ্রহণ পদ্ধতিকেই অন্তঃপুর বা জেনানা শিক্ষা বলা হয়।[৭২] কেশবচন্দ্র সেন ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে 'ব্রাহ্মবন্ধু সভা' (The Society of Theistic Friends) নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। এ সভাটি বাঙালি সমাজে অন্তঃপুর নারীশিক্ষা বিস্তারে বিশেষভাবে

---

৭০. মনীন্দনাথ রায়, 'বাংলাদেশের বালিকা ও অন্তঃপুরিকাদের মধ্যশিক্ষা', ভারতবর্ষ, একাদশবর্ষ প্রথম খণ্ড, আষাঢ় ১৩৩০, কলকাতা, পৃ. ৮২;, বসন্তকুমার সামন্ত, *হিতকরী সভা, স্ত্রী-শিক্ষা ও তৎকালীন সমাজ*, সাহিত্যলোক, *কলকাতা, ১৯৮৭, পৃ. ৩০*

৭১. কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায় ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে Indian Female Education নামে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। এতে তিনি বাঙালি নারীদের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক নয়, বরং Private Tuition এর পক্ষে সুপারিশ করেছিলেন। Latika Goshe, *op.cit*, 132 ; তবে বঙ্গ-ভারতে এর আগেও অন্তঃপুর নারীশিক্ষা চালু ছিল। মুঘল আমলে এ শিক্ষা পদ্ধতি বেশ জনপ্রিয়তাও পেয়েছিল।

৭২. অন্তঃপুর বা জেনানা শিক্ষা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যের জন্য দ্রষ্টব্য Asha Islam Nayeem, *From Andarmahal to Schools: Women's Education in Eastern Bengal in the 19th and 20th Centuries.*, unpublished Ph.D. dissertation, University of Dhaka; Asha Islam Nayeem. "Dwelling on the Question of Female Education in Nineteenth Century Bengal: From Western Theory to Local Reality." *Bangladesh Historical Studies* (Volume XXI, 2008-2009) : pp 9-22 .

চেষ্টা চালিয়েছিল। বিবাহিত ও বয়স্ক নারীদের শিক্ষার আলোকে আলোকিত করার জন্য ব্রাহ্মবন্ধু সভার উদ্যোগে একই বছর 'অন্তঃপুর নারীশিক্ষা সভা' স্থাপন করা হয়।[৭৩]

অন্তঃপুর নারীশিক্ষা প্রণালী সম্পর্কে ব্রাহ্মবন্ধু সভার সম্পাদক হরলাল রায়ের একটি মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তাঁর ভাষায়-

> যাহাতে বালিকাগণ উত্তমরূপে শিক্ষালাভ করিতে পারে এইরূপ একটি প্রণালী ব্রাহ্মবন্ধু সভা অবলম্বন করিয়াছেন। এই প্রণালীক্রমে বালিকাগণ বিদ্যালয়ে না গিয়া বাটীতে নিযুক্ত শিক্ষক দ্বারা বা পরিবারস্থ কোনো ব্যক্তি দ্বারা শিক্ষিত হইতে পারিবেক। পাঠের বিবরণ বর্ষে চারিবার উক্ত সভায় প্রেরণ করিতে হইবেক বৎসরে দুইবার বালিকা দিগকে পরীক্ষা করিয়া উপযুক্ত ছাত্রী দিগকে পারিতোষিক দেওয়া হইবেক।[৭৪]

মুনতাসির মামুনের ভাষ্য মতে, অন্তঃপুর শিক্ষা ব্যবস্থায় বছরে একবার পরীক্ষা গ্রহণ করা হতো। আর এ পরীক্ষাকে বলা হতো 'অন্তঃপুরিকা পরীক্ষা' (Zenana Examination)। নির্ধারিত কারিকুলাম অনুযায়ী প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করে আগ্রহী শিক্ষার্থীদের নিকট তা পাঠিয়ে দেয়া হতো। তারা উত্তর লিখে তা পাঠিয়ে দিতেন। পরীক্ষকগণ উত্তরপত্র মূল্যায়ন করে ফলাফল দিতেন।[৭৫]

১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে ব্রাহ্মবন্ধু সভার উৎসাহী সদস্য সিটি কলেজের অধ্যক্ষ উমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৪০-১৯০৭ খ্রি.) কয়েকজন তরুণ ব্রাহ্ম নেতার সঙ্গে একত্র হয়ে সাবেক কলকাতার সিমুলিয়া অঞ্চলের রঘুনাথ স্ট্রিটে 'বামাবোধিনী সভা' নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। বাঙালি নারীদের শিক্ষিত করে তোলা এবং তাদের মানসিক উন্নতির জন্য পুস্তক ও পত্রিকা প্রকাশ করা এ সভার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। এ সভার মুখপত্র ছিল 'বামাবোধিনী পত্রিকা'। অনেক উত্থান-পতনের মধ্যেও ১৯২২ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ষাট বছর পত্রিকাটি টিকে থাকে। শুরু থেকে উমেশচন্দ্র ৪৪ বছর এ মাসিক পত্রিকাটি সম্পাদনা করেন। পরে সুকুমার দত্ত, তারাকুমার কবিরত্ন ও অন্যরা পত্রিকাটির সম্পাদনা চালিয়ে যান। এ পত্রিকায় ধর্ম, ন্যায়শাস্ত্র, বিজ্ঞান, ইতিহাস, পারিবারিক চিকিৎসা, শিশুদের প্রতি যত্ন নেয়া ইত্যাদি বিষয়ের পাশাপাশি নারীশিক্ষা বিষয়ক প্রবন্ধ নিবন্ধ প্রকাশিত হতো। বামাবোধিনী সভা ও *বামাবোধিনী পত্রিকা* অন্তঃপুর নারীশিক্ষার সমর্থক ছিল। বামাবোধিনীর ১২৮১ (১৮৬৫ খ্রি.) বঙ্গাব্দের পৌষ সংখ্যায় অন্তঃপুর শিক্ষা সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। এদিকে কলকাতার ব্রাহ্মবন্ধু সভা অন্তঃপুর নারীশিক্ষার দায়িত্ব ত্যাগ করলে বামাবোধিনী সভা তখন এ দায়িত্ব গ্রহণ করে এবং অন্তঃপুর নারীশিক্ষা বিস্তারে তৎপরতা চালায়।

বামাবোধিনী সভার প্রতিষ্ঠার বছরই উত্তরপাড়ার বিখ্যাত বিদ্যোৎসাহী ও সমাজহিতৈষী জমিদার বিজয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় 'উত্তরপাড়া হিতকরী সভা' নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। এ সভা তৎকালীন বাঙালি

---

৭৩. অরুণা চট্টোপাধ্যায়, 'নারী-শিক্ষা ও নারী স্বাধীনতা উন্মেষে সভা-সমিতি: ১৮৩৯-১৮৯৬', *কলকাতা পুরশ্রী*, নবপর্যায় ১৩শ বর্ষ, দ্বিতীয়-চতুর্থ সংখ্যা, এপ্রিল ২০১৩, পৃ. ১৩

৭৪. অরুণা চট্টোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৪

৭৫. মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকে পূর্ববঙ্গে ব্রাহ্ম আন্দোলন*, অনন্যা, ঢাকা, ২০১৭, পৃ. ১৬৫

সমাজের সামাজিক, নৈতিক ও মানসিক উন্নতি সাধনে নানামুখী তৎপরতা চালালেও নারীশিক্ষা বিস্তার কার্যক্রমই এর মূল কর্মসূচি ছিল। আর নারীশিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে অন্তঃপুর শিক্ষাও এর অন্যতম লক্ষ্য ছিল। *আর্যদর্শন* পত্রিকার একটি প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে,

> হিতকরী সভার একটি প্রধান ব্রত স্ত্রী শিক্ষার উন্নতিসাধন করা। ---পরিণত বয়স্কা অন্তঃপুরিকা ও অপরিণত বয়স্ক বালিকা এই উভয় শ্রেণীর ছাত্রীদিগের শিক্ষা দান ও পরীক্ষা গ্রহণাদি বিষয়ে বিবিধ উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন। এই শ্মশানতুল্য বঙ্গভূমিতে জীবনচিহ্ন দেখিলে হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হয়।[৭৬]

উল্লেখ্য যে, হিতকরী সভা তার অন্তঃপুর নারীশিক্ষায় ব্রাহ্মবন্ধু সভা ও বামাবোধিনী সভার পঠন ও পরীক্ষা গ্রহণ পদ্ধতি অনুসরণ করতো। বসন্তকুমার সামন্ত তাঁর গ্রন্থের 'বঙ্গে স্ত্রী-শিক্ষার প্রসার: হিতকরী সভার অবদান' শীর্ষক অধ্যায়ে এ বিষয়ে সবিস্তার আলোচনা করেছেন।[৭৭]

শুধু কলকাতা বা পশ্চিমবঙ্গে নয়, পূর্ব বাংলায়ও ব্রাহ্মদের উদ্যোগে অন্তঃপুর শিক্ষা চালু হয়েছিল। ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে ঢাকায় 'অন্তঃপুর স্ত্রী শিক্ষা সভা' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এ সভার প্রতিষ্ঠা ও কার্যক্রমের সাথে ঢাকার ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা ব্রজসুন্দর মিত্রসহ ব্রাহ্মসমাজের অনেকেই সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। ঢাকার মত ময়মনসিংহেও ব্রাহ্মদের উদ্যোগে নারীশিক্ষা বিস্তারের উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল। ভগবানচন্দ্র বসুকে সভাপতি এবং মধুসুধন সেনকে সম্পাদক করে ১৮৭২ সালে ময়মনসিংহে 'স্ত্রী শিক্ষা সভা' নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। কলকাতা ও ঢাকার অন্তঃপুর শিক্ষার মতোই এ সংগঠনের কার্যক্রম পরিচালিত হতো। বেশ কয়েকজন জমিদার পত্নী ও অভিজাত নারী এ সভা পরিচালিত সর্বোচ্চ শ্রেণি পর্যন্ত পাঠগ্রহণ করেছিলেন। কৃষ্ণকুমারসহ কলকাতায় বসবাসরত ময়মনসিংহের কতিপয় উদ্যোগী ব্রাহ্ম 'ময়মনসিংহ সম্মিলনী সভা' নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এ সভাটিও অন্তঃপুর শিক্ষা বিস্তারে কাজ করেছিল।[৭৮]

বরিশালের ব্রাহ্মরাও অন্তঃপুর নারীশিক্ষার ব্যাপারে তৎপর ছিলেন। এ প্রসঙ্গে ব্রাহ্মদেরই উদ্যোগ এবং প্রচেষ্টায় ১৮৭১ সালে প্রতিষ্ঠিত Barisal Female Improvement Association নামক একটি সংগঠনের কথা বলা যায়। এ সংগঠনের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত অন্তঃপুর নারীশিক্ষার কাজও সন্তোষজনক ছিল বলে *অবলাবান্ধব*[৭৯] পত্রিকার একটি প্রতিবেদন থেকে জানা যায়। পত্রিকাটির মতে,

> বরিশালের অন্তঃপুর স্ত্রী শিক্ষা সভার অধীনে যে সকল কুলকন্য পরীক্ষা দান করিয়াছেন তাহাদিগের ফলাফল দৃষ্ট আমরা কেবল সন্তুষ্ট হই নাই, বিস্মিতও হইয়াছি। অন্তঃপুর থাকিয়া লোকদ্বারা এত অল্পসময়ে শিক্ষা সমন্ধেএতদূর

৭৬. *আর্যদর্শন* পত্রিকা , আষাঢ়, ১২৮৭, পৃ. ১৪৪; সুনীতা বন্দোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৫৮

৭৭. এতদবিষয়ে বিস্তারিত দ্রষ্টব্য বসন্তকুমার সামন্ত, *হিতকরী সভা স্ত্রী-শিক্ষা ও তৎকালীন সমাজ*, সাহিত্যলোক, কলকাতা, ১৯৮৭, পৃ. ৭-২৪

৭৮. মুনতাসির মামুন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৭১

৭৯. *অবলাবান্ধব* (নারী বন্ধু) ছিল একটি পাক্ষিক পত্রিকা। ১৮৬৯ সালে দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় এটি ঢাকায় মুদ্রিত হয়ে লোনসিংহ (অধুনা বাংলাদেশের বরিশাল জেলায় অবস্থিত) থেকে প্রচারিত হত। ব্রজেন্দ্রনাথ জানিয়েছেন "সংসারে স্ত্রীলোকের উপযোগিতা ও স্ত্রীশিক্ষার আলোচনা করাই এতৎ পত্রের উদ্দেশ্য।" দ্বারকানাথ কলকাতায় চলে এলে ১৮৭০ সাল থেকে পত্রিকাটি কলকাতা থেকেই প্রকাশিত হতে থাকে।

উন্নতি করিতে সমর্থ হইবেন। আমরা পূর্ব্বে ইহা প্রত্যাশা করি নাই। --- এই সকল অন্তঃপুর বাসিনী কুল-কন্যা নানা প্রকার প্রতিবন্ধকতা সত্বেও শিক্ষার যেরূপ অনুরাগ প্রদর্শন করিয়াছেন। তাহা দেখিয়া এই মহানগরস্থ অগ্রগামিনী কুলকন্যাদিগের অধিকাংশের লজ্জা হওয়া উচিত।[৮০]

পূর্বোক্ত প্রতিষ্ঠানটি ছাড়াও জগবন্ধু লাহার সম্পাদনায় পরিচালিত 'বরিশাল অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা সভা' নামেও একটি প্রতিষ্ঠান একাজে রত ছিল। এছাড়াও পূর্ব বাংলার 'বিক্রমপুর সম্মিলনী'[৮১] 'ফরিদপুর সুহৃদ সভা' (১৮৮০ খ্রি.), 'বাকরগঞ্জ হিতকরী সভা','যশোর ইউনিয়ন সভা' ইত্যাদিও অন্তঃপুর নারীশিক্ষা প্রসারে কাজ করেছিল। এসব সংগঠনের তৎপরতা এবং সাফল্য সম্পর্কে *বামাবোধিনী* পত্রিকায় একাধিক প্রতিবেদন ছাপা হয়েছিল।[৮২] অন্তঃপুর নারীশিক্ষা বিস্তারে কাজ করা আরেকটি সংগঠনের কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। সেটি হলো 'ত্রিপুরা জেনানা শিক্ষা সমিতি।' বাঙালি নারীদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারে এ সংগঠনটিরও বিশেষ ভূমিকা ছিল।

জেনানা শিক্ষা সম্প্রসারণে পূর্ব বাংলার সংগঠনসমূহ যে বিশেষ সাফল্য লাভ করেছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় ১৮৮২ সালে সংগঠনগুলোর পক্ষ থেকে Education Committee কে প্রদত্ত একটি যৌথ স্মারকলিপি থেকে। এ স্মারক লিপিতে উল্লেখ করা হয়েছিল যে, ১৮৮১ সালে পূর্ব বাংলার পূর্বোক্ত সংগঠনসমূহ থেকে ৫৫০ জন নারী অন্তঃপুর পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল।[৮৩]

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে জেনানা শিক্ষার প্রাথমিক পর্যায়ে ইউরোপীয় নারী শিক্ষকরা পাঠদান কার্যক্রমের সাথে যুক্ত হয়েছিলেন। এ জেনেনা শিক্ষা সূত্র ধরে মিস অ্যান কুকের মতো ব্রিটিশ নারীদের বাংলায় আগমনের কথা জানা যায়। তবে এতে অন্তঃপুরে খ্রিস্টান নারীদের প্রবেশের কারণে বাঙালি নারীদের ধর্মীয় সংস্কার ও মানসিকতায় পরিবর্তনের আশঙ্কা করা হয়। ফলে এ ব্যাপারে অনেকেই নিরুৎসাহিত বোধ করেন। এ অবস্থায় অন্তঃপুর শিক্ষার সাফল্যের জন্য শিক্ষক হিসেবে কাদের নিয়োগ করা হবে, সে ব্যাপারে তত্ত্বাবোধিনী সভা একটি মত দিয়েছিল। এ বিষয়ে *তত্ত্ববোধিনী* পত্রিকায় লেখা হয়েছিল-

কলিকাতা মহানগরে ও পল্লিগ্রামে কতগুলি বয়স্কা বিদ্যাবতী হিন্দু স্ত্রী প্রস্তুত হইয়াছেন, যাহারা অন্তঃপুর শিক্ষার ভার গ্রহণ করিতে পারেন। তাঁহাদিগের অবস্থা এত ভাল নয়, অতএব উল্লেখিত কার্য অবলম্বন করিতে তাঁহাদিগের লওয়ান যাইতে পারে। অন্তঃপুরবাসিনীদিগকে কি প্রকারে শিক্ষা দেওয়া উচিত তাহা তাঁহাদিগকে বলিয়া দিয়া উল্লিখিত শিক্ষাকার্যে তাঁহাদিগকে প্রবর্তিত করা কর্তব্য।[৮৪]

জেনানা শিক্ষা ব্যবস্থার পাঠক্রমে কী ছিল সে বিষয়টিও আলোচনার দাবি রাখে। এ শিক্ষার মান ও বিষয়বস্তু যে সাধারণ মানের ছিল তা বলা বাহুল্য। প্রাপ্ত তথ্যাদি থেকে জানা যায় যে, অন্তঃপুর শিক্ষার পাঠক্রমে ছিল প্রধানত

---

৮০. উদ্ধৃতি হীরালাল দাশগুপ্ত, *স্বাধীনতা সংগ্রামে বরিশাল*, প্রথমখণ্ড, কলকাতা, ১৯৭২, পৃ. ২২

৮১. ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সভার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয় যে, "to extend the advantages to the female population of the pargana, to found school in villages where none exist to strive also to improve the education of adult in their home." উদ্ধৃতি শ্রী প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপধ্যায়, *পূর্বোক্ত*. পৃ. ৮০

৮২. *বামাবোধিনী পত্রিকা*, অক্টোবর, ১৮৮২; Latika Goshe, *op.cit*, pp. 136-137

৮৩. শ্রী প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপধ্যায়, *পূর্বোক্ত, পৃ. ৮০*

৮৪. উদ্ধৃতি অরুণা চট্টোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, পৃপৃ. ১২-১৩

ধর্মশিক্ষা, গার্হস্থ্য বিদ্যা ও সূচীকর্ম ইত্যাদি। এতে পাঠদান করা হতো বোধোদয়, আখ্যানমঞ্জরী, কালিদাসপ্রণতি রঘুবংশ সাবিত্রীচরিতকাব্য, সীতারবনবাস, প্রাথমিক পর্যায়ের বাংলা ব্যাকরণ, নীতি ও ধর্ম, ভারতবর্ষের ইতিহাস, ইংল্যাণ্ডের ইতিহাস, ভূগোল, পাটিগণিত, ধাত্রিবিদ্যা, শিশুপালন, সংগীত, চিত্রবিদ্যা ইত্যাদি।[৮৫] অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষার পাঠক্রম অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের পাঁচটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়েছিল। গোলাম মুরশিদ তাঁর গ্রন্থে এ পাঠক্রমের শ্রেণিভিত্তিক একটি তালিকা সন্নিবেশন করেছেন।[৮৬] অন্তঃপুর শিক্ষার পাঠ্যসূচি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এতে পারিবারিক প্রয়োজন এবং সাধারণ জ্ঞান শিক্ষাকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছিল। এর কারণ কেশবচন্দ্র সেনসহ অনেকেই মনে করতেন যে, যেহেতু মেয়েদের প্রকৃত কর্মক্ষেত্র গৃহকোন, তাই তাদের গৃহকর্ম শিক্ষা এবং সুনীতি শিক্ষা প্রদানই যথেষ্ট। এর সাথে বড়জোর সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল, মনোবিদ্যা ইত্যাদি কিছু বিষয় শিক্ষা দেয়া যেতে পারে। বস্তুত, তারা এমনভাবে পাঠ্যসূচি নির্ধারণ করেছিলেন, যাতে মেয়েরা শিক্ষা লাভের সুযোগ পেলেও সামাজিক নিয়মের বেড়াজাল ভাঙতে না পারে।

ব্রাহ্মদের পরিচালিত অন্তঃপুর বা জেনানা শিক্ষার সাফল্য প্রভাব সম্পর্কে পণ্ডিতদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। কেউ কেউ এর ইতিবাচক ফলের কথা বললেও অনেকে মনে করেন, এই শিক্ষা ছিল ধনিক শ্রেণির কুক্ষিগত। এ শিক্ষা ব্যবস্থাটি ব্যয়বহুল হওয়ায় এ ব্যবস্থা সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে ছিল।[৮৭] তবে এ কথা সত্য যে, অনেক নারী তখন কোনো গৃহ শিক্ষক ছাড়াই নিজের ভাই বা স্বামীর কাছেও শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। এদের মধ্যে ব্রহ্মময়ী দেবী, জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, স্বর্ণকুমারী দেবী, প্রসন্নময়ী দেবী, কৈলাসবাসিনী দেবী প্রমুখ বিখ্যাত লেখিকা ও সমাজ সেবিকারা ছিলেন অন্যতম।[৮৮] গোলাম মুরশিদও তাঁর গ্রন্থে অন্তঃপুরে শিক্ষাগ্রহণ করে সমাজে সুপরিচিতি লাভকারী কয়েকজন বিখ্যাত নারীর তথ্য পরিবেশন করেছেন।[৮৯] তাঁর পরিবেশিত তথ্যে দেখা যায় যে, উল্লিখিত নারীদের অধিকাংশই তাদের ব্রাহ্ম স্বামীর কাছে পড়াশুনা শিখেছিলেন। সার্বিক বিচারে বলা যায় যে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মেয়েদের পাঠানোতে অনীহার কারণে আগ্রহী পরিবারগুলো বিকল্প হিসেবে অন্তঃপুর শিক্ষাকে গ্রহণ করায় এটি কিছুটা জনপ্রিয়তা পেয়েছিল।

উপরের আলোচনায় দেখা যায় যে, বাঙালি সমাজে অন্তঃপুর শিক্ষার প্রভাব ও পরিধি বেশি বিস্তৃত হয়নি। তবে উনিশ শতকের ষাটের দশক থেকে নারীশিক্ষার প্রতি ধীরে ধীরে বাঙালি জনমত অনুকূল হতে থাকে। এ জনমত তৈরিতে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মদনমোহন তর্কালঙ্কার ও তারাশঙ্কর তর্করত্নের মতো পণ্ডিত এবং অক্ষয়কুমার দত্ত, দ্বারকানাথ রায় ও প্যারিচাঁদ মিত্র প্রমুখ পাশ্চাত্য শিক্ষিত মনিষীদের নারীশিক্ষা বিষয়ক রচনা ও প্রয়াস বিশেষ ভূমিকা রেখেছিল। এক্ষেত্রে *মাসিক পত্রিকা*, *বামাবোধিনী* ও *অবলাবান্ধব* ইত্যাদি নারী বিষয়ক সাময়িকীর ভূমিকাও উল্লেখের দাবি রাখে। এছাড়াও এ বিষয়ে কয়েকজন বাঙালি মহিলা লেখিকারও

---

৮৫. সারদা ঘোষ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩

৮৬. গোলাম মুরশিদ, *সংকোচের বিহ্বলতা: আধুনিকতার অভিঘাতে বঙ্গনারীর প্রতিক্রিয়া ১৮৪৯-১৯০৫*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৯-৩০

৮৭. জেনানা শিক্ষা বিষয়ক একটি প্রস্তাবনা তথ্য থেকে জানা যায় যে, শহরাঞ্চলে এ শিক্ষার মাসিক ব্যয় ১৬ টাকা এবং মফস্বলে মাসিক ২৫ টাকা। সারদা ঘোষ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৩

৮৮. ভারতী রায় (সংকলন ও সম্পা.), *নারী ও পরিবার: বামাবোধিনী পত্রিকা*, ৩য় মুদ্রণ, কলকাতা, ২০১৪, পৃ. ৩

৮৯. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য গোলাম মুরশিদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৯-৩০

যথেষ্ট অবদান ছিল।[৯০] বস্তুত, এসব প্রচেষ্টার ফলে নব্য শিক্ষিত শহুরে ভদ্রলোক শ্রেণি নারীশিক্ষার আবশ্যকতা ব্যাপকমাত্রায় উপলব্ধি করতে শুরু করেন। এরূপ একটি বাস্তব পরিস্থিতিতে অন্যান্যদের মতো ব্রাহ্মসমাজও নারীশিক্ষার প্রসারে প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগে মানোনিবেশ করে।

ব্রাহ্ম নেতা কেশবচন্দ্র সেন ১৮৭০ সালে ইংল্যান্ড থেকে দেশে ফিরে Indian Reform Association বা 'ভারত সংস্কার সভা' নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। এর আগে ১৮৬৪ সালে তিনি 'ব্রাহ্মিকা সমাজ' নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে ব্রাহ্ম নারীরা যেন শিক্ষা ও অন্যান্য প্রয়োজন সম্পর্কে সচেতন হতে পারে এটিই ছিল ব্রাহ্মিকা সমাজের উদ্দেশ্য। কেশবচন্দ্র সেন এবার যে ভারত সংস্কার সভা প্রতিষ্ঠা করেন, এ সভার অন্যতম কর্মসূচি ছিল নারী সমাজের উন্নতি ও নারীশিক্ষা বিস্তার। *বামাবোধিনী পত্রিকাকে* ভারত সংস্কার সভার নারীশিক্ষা বিভাগের মুখপত্র করা হয়েছিল। এ সংগঠনটি বাংলায় প্রাতিষ্ঠানিক নারীশিক্ষা প্রসারে নানা উদ্যোগ নিয়েছিল।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, নারীশিক্ষার পথিকৃৎ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর গ্রামাঞ্চলে নারীদের মধ্যে শিক্ষার প্রসারের উদ্দেশ্যে বাংলার বিভিন্ন জেলায় 'স্ত্রীশিক্ষা বিধায়নী সম্মেলনী' প্রতিষ্ঠা ছাড়াও ব্যক্তিগত উদ্যোগে নদীয়া, বর্ধমান, হুগলি ও মেদিনীপুর জেলায় ৩৫ টি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বিদ্যাসাগরের মতো নারীশিক্ষা হিতৈষী আরও অনেকেই বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বালিকা বিদ্যালয় সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব দেখা দেয়। কেননা তখনো স্কুলগুলোতে পুরুষ শিক্ষকের কাছে পাঠ গ্রহণের জন্য নিজেদের কন্যাদের পাঠাতে অনেক অভিভাবক দ্বিধান্বিত ছিলেন। উপযুক্ত নারী শিক্ষকের অভাবে এমনকি অন্তঃপুর শিক্ষাও যে ব্যাহত হচ্ছিল তা *বামাবোধিনী পত্রিকার* প্রতিবেদন থেকেও জানা যায়। এ অবস্থায় নারীশিক্ষা প্রসারের স্বার্থে উনিশ শতকের ষাটের দশকের শেষ দিকে বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য উপযুক্ত শিক্ষক তৈরির লক্ষ্যে শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবি ওঠে। *বামাবোধিনী পত্রিকার* ১২৭৪ বঙ্গাব্দের আশ্বিন-কার্তিক সংখ্যায় এ প্রসঙ্গে একটি লেখাও প্রকাশিত হয়। ১৮৬৬ সালে ইংল্যান্ডের বিখ্যাত সমাজকর্মী মানবহিতৈষী মেরি কার্পেন্টার কলকাতায় এসে শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় বা নর্মাল স্কুল প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগ নিতে সরকারকে অনুরোধ করেন। কার্পেন্টারের সাথে সহমত পোষণ করেন ব্রাহ্মনেতা কেশবচন্দ্র সেন, ব্যারিস্টার মনমোহন ঘোষ ও দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ। ব্রাহ্মদের মুখপত্র *বামাবোধিনী পত্রিকায়* 'স্ত্রী শিক্ষকের প্রয়োজন' শিরোনামে একটি নিবন্ধ প্রকাশ করে কার্পেন্টারকে সমর্থন দেয়া হয়। এ পরিস্থিতিতে সরকারি উদ্যোগে বেথুন স্কুলের সাথে নারী শিক্ষয়িত্রী প্রশিক্ষণের জন্য একটি নর্মাল স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়। তবে নানা কারণে তিন বছরের মাথায় সেটি বন্ধ হয়ে যায়। এ অবস্থায় ব্রাহ্ম নেতা কেশবচন্দ্র সেনের উদ্যোগে তাঁর 'ভারত সংস্কার সভা'র তত্ত্বাবধানে ১৮৭১ সালে পটলডাঙ্গায় একটি 'দেশীয় নারী শিক্ষক-

৯০. নারী লেখিকাদের মধ্যে কৈলাসবাসিনী দেবী, সৌদামনী দেবী, মধুমতি গাঙ্গুলি, কৃষ্ণকামিনী, কামিনী সুন্দরী ও তাহেরন নেসা প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। এদের মধ্যে শেষোক্ত তাহেরন নেসা ছিলেন প্রথম বাঙালি মুসলমান গদ্য লেখক।

শিক্ষণ বিদ্যালয়' বা Netive Ledies Normal and Adult School প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ বিদ্যালয়টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয় যে,

> First to impart a liberal education to Hindu ladies, who have so few opportunities of acquiring useful knowledge, on account of the peculiar customs of the country; and secondly, to train up a number of female teachers for education of girls[৯১]

মিস নিকলসন, মিস উইন্স, মিস মুখার্জী, ব্রাহ্মনেতা শিবনাথ শাস্ত্রী (সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা), অঘোরনাথ গুপ্ত, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী এবং গৌরগোবিন্দ উপাধ্যায় প্রমুখ এ বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন। শিক্ষয়িত্রীদের হাতে-কলমে শিক্ষণ প্রদানের জন্য নরমাল স্কুলের সাথে একটি শিশু বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। এ বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচিতে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, ইংরেজি ভাষা, ইতিহাস, ভূগোল, দর্শন ও গণিত অন্তর্ভুক্ত ছিল।[৯২] প্রথম বছরেই নরমাল স্কুলে ২৪ জন শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছিলেন।

ব্রাহ্মদের দেশীয় নারী শিক্ষক-শিক্ষণ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা কেশবচন্দ্রের উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায় 'বামাহিতৈষিণী সভা' নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। কেশবচন্দ্র নিজে এর সভাপতি এবং রাধারাণী লাহিড়ী এ সভার সম্পাদক ছিলেন। নারী সমাজের সর্বাঙ্গীন কল্যাণসাধন, নারী জীবনের উদ্দেশ্য কী এবং কী প্রকারের শিক্ষা দ্বারা নারী জাতির জীবনমানের উন্নতি হতে পারে-এসব বিষয়ে আলোচনা ও জনমত তৈরি এ সংগঠনটির কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পুরুষ ব্রাহ্ম ছাড়াও সেকালে বিখ্যাত ব্রাহ্ম পরিবারের অনেক নারীও এ সভার সভ্য হয়েছিলেন।[৯৩]

উনিশ শতকের সত্তরের দশকে ধর্ম বিশেষ করে সমাজ সংস্কারকে কেন্দ্র করে ব্রাহ্মনেতা কেশবচন্দ্রের সাথে তাঁর তরুণ অনুগামী ব্রাহ্মদের মতবিরোধ দেখা দেয়। শিবনাথ শাস্ত্রী, আনন্দমোহন বসু এবং বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রমুখ কেশবচন্দ্রের সংস্কার কাজকে যথেষ্ট প্রাগ্রসর ও প্রগতিশীল মনে না করে তাঁর দল থেকে বের হয়ে যান এবং ১৮৭৮ সালে "সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ" প্রতিষ্ঠা করেন। অন্যদিকে কেশবচন্দ্র ও তাঁর অনুসারীগণ ব্রাহ্মদের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক উন্নতি বিধানের জন্য গঠন করেন "নববিধান" নামক ব্রাহ্ম সংগঠন। নববিধানের উদ্যোগে নারী কল্যাণের জন্য 'আর্যনারী সমাজ' নামেও একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৮৮০ সালে কেশবচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত 'মেট্রোপলিটন ফিমেল স্কুল' এর পরিচালনার ভার আর্যনারী সমাজের উপর ন্যস্ত করা হয়। আর্যনারী সমাজের চেষ্টায় স্কুলটি সুচারুরূপে পরিচালিত হয় এবং ১৮৮৩ সালে এর নতুন নামকরণ

---

৯১. Asim Kumar Datta, 'The Barhmo Samaj and Women's Education' in Mira Bhattacharjee & Santana Sen (ed.) , *Bethun College Centenary Volume, 1879-1979*, Calcutta, 1980, p. 148

৯২. সারদা ঘোষ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫০

৯৩. সদস্যদের নামের জন্য দ্রষ্টব্য, অরুণা চট্টোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৫

হয় 'ভিক্টোরিয়া মহিলা কলেজ।'[৯৪] এ কলেজটি এখনও কলকাতায় নারীশিক্ষাপ্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলছে।

শিবনাথ শাস্ত্রী প্রতিষ্ঠিত সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের উদ্যোগে ১৮৭৯ সালে 'বঙ্গ মহিলা সমাজ' নামে একটি নারীশিক্ষাব্রতী সংগঠন আত্মপ্রকাশ করে। বেথুন স্কুলের শিক্ষক রাধারাণী লাহিড়ী এবং আনন্দমোহন বসুর স্ত্রী স্বর্ণপ্রভা বসু ছিলেন যথাক্রমে এর সভাপতি ও সম্পাদক। প্রধানত বিদ্যাচর্চা এবং সেই সাথে ধর্মীয় সেবাকার্য পরিচালনা এবং বিবিধ উপায়ে নারীদের অবস্থার পরিবর্তন–ছিল বঙ্গ মহিলা সমাজের উদ্দেশ্য। এ সংগঠন বাঙালি নারীদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় উদ্বুদ্ধকরণসহ নারীদের পাঠোপযোগী একটি 'প্রবন্ধ-লতিকা' প্রকাশ করেছিল।

বরানগরের শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন একজন সংস্কারবাদী ব্রাহ্মনেতা। ব্রাহ্মনারীদের পাঠ-পঠনের সুবিধার্থে তিনি ফিমেল সার্কুলেটিং লাইব্রেরি নামক একটি গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ১৮৬৪ সালে হিন্দু বিধবা নারীদের শিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠা করেন একটি বিদ্যালয়।[৯৫] পরে এটি 'হিন্দু বিধবা শিল্পাশ্রমে' রূপান্তরিত হয়। এতে হিন্দু বিধবা নারীদের আর্থিক পুনর্বাসনের জন্য কারিগরি শিক্ষা দানের ব্যবস্থা ছিল। একই সাথে তাদের সেলাই, রন্ধন ও গৃহকর্মের উপযুক্ত শিক্ষা প্রদানেরও ব্যবস্থা ছিল। বস্তুত, "যাহাতে স্ত্রী লোকেরা সুশিক্ষিতা হইয়া সুশৃঙ্খলরূপে গৃহকর্মাদি করিতে পারেন তা এই বিদ্যালয়ের অপর একটি উদ্দেশ্য" ছিল।[৯৬]

ব্রাহ্মদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত বালিকা বিদ্যালয়ের মধ্যে 'হিন্দু মহিলা বিদ্যালয়' ছিল অন্যতম উল্লেখযোগ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। দুর্গামোহন দাস (১৮৪১-১৮৯৭ খ্রি.) ও দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের (১৮৪৪-১৮৯৮ খ্রি.) উদ্যোগ এবং ব্রাহ্ম প্রগতীবাদী দলের সহায়তায় ব্যারিস্টার মনোমোহন ঘোষের অর্থানুকূল্যে কলকাতার বালিগঞ্জে হিন্দু মহিলা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, স্কুলের উদ্যোক্তাদের মধ্যে দ্বারকানাথ গঙ্গোপধ্যায় ছিলেন পূর্ব বাংলার বিক্রমপুরবাসী একজন স্কুল শিক্ষক। ব্রাহ্ম নেতা কেশবচন্দ্রের নারীমঙ্গল বিষয়ে ধীরগতিতে অসন্তুষ্ট হয়ে শিবনাথ শাস্ত্রীসহ যে প্রগতিবাদী দল এদেশে নারী প্রগতি আন্দোলনে নেতৃত্ব দানে এগিয়ে আসেন তিনি ছিলেন তাঁদের অন্যতম নেতৃস্থানীয়। পশ্চাদপদ বঙ্গীয় নারী জাতির দুর্দশা দূর এবং তাদের আলোর পথ নির্দেশনার জন্য তিনি পাক্ষিক *অবলা-বান্ধব* পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। এ পত্রিকাটি ব্রাহ্ম সমাজে নারী স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলন করেছিল বলে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর *আত্মজীবনী*তে উল্লেখ করেছেন।[৯৭] ভুবনমোহন দাস (দুর্গামোহন দাসের ভাই ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের বাবা) সম্পাদিত *Brahmo Public Opinion* পত্রিকার তথ্য অনুযায়ী বিচারপতি ফিয়ারের পত্নী মিসেস

৯৪. সারদা ঘোষ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫০

৯৫. Sivnath Sastri, *History of Brahmo Samaj*, Vol. I, p. 434

৯৬. স্বর্ণকুমারী দেবী, 'বরাহনগর মহিলা আশ্রম' , *ভারতী ও বালক*, পৌষ, ১২৯৬ বঙ্গাব্দ, উদ্ধৃত সরদা ঘোষ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭০

৯৭. শিবনাথ শাস্ত্রী, *আত্মচরিত*, পুনমুদ্রণ, সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ, বিধান সরণি, কলকাতা, ২০০০, পৃ. ১২৯

ফিয়ার, মিস অ্যাকরয়েড (ইতিহাসবিদ বেভারিজের স্ত্রী) এবং বিদ্যালয়ের প্রধান উদ্যোক্তা দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ এ স্কুলের শিক্ষক ছিলেন।[৯৮] দুর্গামোহন দাসের কন্যা সরলা দাস (আচার্য ডা. পি কে রায়ের পত্নী), অবলা বসু (বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুর স্ত্রী) এবং পূর্ব বাংলা থেকে ব্রাহ্ম নেতাগণ কর্তৃক কলকাতায় প্রেরিত ঢাকার কুলীন ব্রাহ্ম পরিবারের মেয়েরা হিন্দু মহিলা বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ছিলেন।[৯৯] ১৮৮৩ সাল পর্যন্ত হিন্দু মহিলা বিদ্যালয়টি শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করে। পরে এটি বন্ধ হয়ে যায়।

বাংলায় নারীশিক্ষা প্রসারে বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। এ বিদ্যালয়টিরও প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন দ্বারকানাথ গঙ্গোপধ্যায়। ১৮৭৬ সালে দ্বারকানাথ বালিগঞ্জের একটি ভাড়া করা বাড়িতে বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয়ের কার্যক্রম শুরু করেন। শিক্ষকতা ছাড়াও দ্বারকানাথ এ স্কুলটির সার্বিক উন্নতির জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলেন বলে শিবনাথ শাস্ত্রী উল্লেখ করেছেন।[১০০] এ বিদ্যালয়টির অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন ব্রাহ্মনেতা দুর্গামোহন দাসের স্ত্রী শ্রীমতি ব্রহ্মময়ী দাস। তিনি এ বিদ্যালয়টির পরিচালনার্থে মাসিক এক'শ টাকা করে প্রদান করতেন। এ বিদ্যালয়ের উল্লেখযোগ্য ছাত্রীদের মধ্যে ছিলেন স্বর্ণপ্রভা বসু (জগদীশ চন্দ্রের বোন ও আনন্দমোহন বসুর স্ত্রী), দুর্গামোহন দাসের কন্যা সরলা দাস ও অবলা দাস, হরসুন্দরী দত্ত, স্বর্ণময়ী দত্ত, স্বর্ণময়ী চ্যাটার্জী, বিনোদমনি বসু (ব্যারিস্টার মনোমোহন ঘোষের বোন), কাদম্বিনী বসু (দ্বারকানাথ ঠাকুরের স্ত্রী), হেমলতা (শিবনাথ শাস্ত্রীর কন্যা) এবং গিরিজা কুমারী সেন প্রমুখ।[১০১]

বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচি সম্পর্কে বিস্তারিত কোনো তথ্য জানা যায় না। তবে এতে সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের গৃহকর্মে নিপুণ করার জন্য রন্ধন ও সেলাই শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল বলে জানা যায়। শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্যতত্ত্ব সম্পর্কেও শিক্ষা দেয়া হতো। তথ্যসূত্র থেকে জানা যায় যে, এ বিদ্যালয়ে পাঠরত শিক্ষার্থীদের গণিত, ভূগোল ও স্বাস্থ্যতত্ত্ব শিক্ষা দেয়ার মতো কোনো উপযুক্ত বাংলা বই না থাকায় দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় নিজেই এসব বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেন। শিক্ষার্থীদের দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধকরণ এবং তাদের মধ্যে জাতীয় চেতনার উন্মেষ সাধনের লক্ষ্যে দ্বারকানাথ "জাতীয় সঙ্গীত" নামে একটি জাতীয় ভাবোদ্দীপক সঙ্গীত সংকলন গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। ১৮৭৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রকাশিত এ গ্রন্থটি ছিল বাংলা ভাষার জাতীয়

---

৯৮. শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর *History of the Brahmo Samaj* ও *আত্মচরিত* গ্রন্থে দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে হিন্দু মহিলা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রধান উদ্যোক্তা বলে উল্লেখ করেছেন।

৯৯. বর্ণাশ্রাতি হিন্দু সমাজে কুলীন পরিবারের মেয়েদের যথা সময়ে উপযুক্ত পাত্রের সাথে বিয়ে দিতে না পারলে সামাজিক অসম্মানের ভয়ে অভিভাবকগণ তাদের উপর নানা নির্বতনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ, এমনকি অনেকক্ষেত্রে তাদেরকে হত্যা করার মতো নির্মম পথেরও আশ্রয় নিতেন। বিক্রমপুরবাসী অবলাবান্ধব পত্রিকার সম্পাদক ও তাঁর কতিপয় ব্রাহ্ম বন্ধু জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কুলীন কন্যাদের উদ্ধার করে কলকাতায় ব্রাহ্মদের কাছে পাঠিয়ে দিতেন। সেখানে তাদের পড়াশুনার ব্যবস্থা করে উপযুক্ত পাত্রের সাথে বিয়ের ব্যবস্থা করা হতো। শ্রী প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপধ্যায়, *পূর্বোক্ত*. পৃ. ৫৭-৫৯

১০০. *শিবনাথ শাস্ত্রী*, *আত্মচরিত*, *পৃ. ১৫৫*

১০১. শ্রী প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপধ্যায় *পূর্বোক্ত*. পৃ. ৬৫

সঙ্গীতের প্রথম পুস্তক।[১০২] দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় এ স্কুলের শিক্ষার্থীদের মধ্যে সরলা দাস ও কাদম্বিনী বসু এন্ট্রান্স পরীক্ষা প্রদানের যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন। তবে তখন পর্যন্ত নারীশিক্ষার্থীদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার উন্মুক্ত না হওয়ায় তারা এন্ট্রান্স পরীক্ষা দেয়ায় প্রবল বাধার মুখে পড়েন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ভারতীয় নারীদের মধ্যে চন্দ্রমুখী নামক একজন ধর্মান্তরিত খ্রিস্টান বাঙালি নারী প্রথম তাঁর স্কুলের অধ্যক্ষ রেভারেন্ড হেরনের মাধ্যমে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে এন্ট্রান্স পরীক্ষার অনুমতি প্রার্থনা করেন।[১০৩] এ অবস্থায় ১৮৭৬ সালের ২৫ নভেম্বর অনুষ্ঠিত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সভা তাঁকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনিয়মিত রেজিস্টার্ড শিক্ষার্থী হিসেবে পরীক্ষা দেয়ার অনুমতি দেয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী চন্দ্রমুখী মিসৌরী স্কুলের প্রধান শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে পরীক্ষায় অংশ নিয়ে এন্ট্রান্স পাশ করেন। তবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের তালিকায় তাঁর নাম প্রকাশ করা হয়নি। এরূপ একটি বাস্তবতায় ব্রাহ্ম নেতা দ্বারকানাথ নারীদের বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পরীক্ষা দানের সুযোগের দাবিতে আন্দোলন শুরু করেন। তিনি কতিপয় প্রভাবশালী ব্রাহ্ম নেতার সহযোগিতায় এ বিষয়ে আলোচনার জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন উপাচার্য স্যার আর্থার হবহাউসের (Sir Arthur Hobhouse) সাথে সাক্ষাৎ করেন। নারী হিতৈষী উপাচার্য দ্বারকানাথের বক্তব্যে সন্তুষ্ট হয়ে একটি প্রাক-যোগ্যতা যাচাই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার শর্তে বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী সরলা ও কাদম্বিনীকে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় অংশ গ্রহণের অনুমতি দেন। ১৮৭৭ সালে অনুষ্ঠিত প্রাক-যোগ্যতা যাচাই পরীক্ষায় সরলা ও কাদম্বিনী সাফল্যের সাথে উত্তীর্ণ হন।[১০৪] এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কয়েকটি বিশেষ বিধি ব্যবস্থার অধীনে সরলা ও কাদম্বিনীকে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় অংশগ্রহণের অনুমতি দেয়।[১০৫]

১৮৭৮ সালের ১ আগষ্ট ব্রাহ্মদের পরিচালিত বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয়টি বেথুন স্কুলের সাথে একীভূত হয়ে যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ইতোমধ্যে বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয় নারীশিক্ষা প্রসারে যথেষ্ট অগ্রগতি অর্জন করেছিলেন। ১৮৭৬-৭৭ সালে Director of Public Instruction -এর প্রকাশিত রিপোর্টে উল্লেখ রয়েছে যে, “The latter (Banga Mohila Vidyalay) is in every sense the most advanced school in Bengal.”[১০৬] National Indian Association নামক সংগঠন আয়োজিত এক সভায় ‘বাংলায় নারীশিক্ষার ত্রিশ বছর’ বিষয়ে বক্তৃতা দিতে গিয়ে বেথুন স্কুলের তদানীন্তন সম্পাদক মদনমোহন ঘোষ বলেছিলেন যে, বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয় বেথুন স্কুলের সাথে মিলিত হবার পূর্বে

---

১০২. শ্রী প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপধ্যায় *পূর্বোক্ত*. পৃ. ৬৬

১০৩. চন্দ্রমুখী ছিলেন ভারতের উত্তর পশ্চিম প্রদেশের (বর্তমান যুক্ত প্রদেশ) ভুবনমোহন বসু নামক একজন বাঙালি খ্রিস্টানের কন্যা। তিনি দেরাদুনের Dera School for Native Christian Girls থেকে এন্ট্রাস পরীক্ষায় দেয়ার যোগ্যতা অর্জন করেন।

১০৪. প্রাক-যোগ্যতা যাচাই পরীক্ষায় মি. পোপ ইংরেজি, মি. গ্যারেট গণিত, কৃষ্ণমোহন বন্দোপধ্যায় ইতিহাস ও মদনমোহন তর্কালঙ্কার পরীক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

১০৫. বিধিসমূহ ছিল: তাদেরকে পুরুষ শিক্ষার্থীদের মতো একই পুস্তক ও প্রশ্নে পরীক্ষা দিতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক মনোনীত একজন মহিলা তত্ত্বাবধায়িকার তত্ত্বাবধানে স্বতন্ত্র পরীক্ষা হলে তাদের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

১০৬. উদ্ধৃতি, শ্রী প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপধ্যায়, *বাংলার নারী-জাগরণ*, পৃ. ৬৬

নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে বেথুন স্কুল অনেকাংশে বলতে গেলে Infant Nursery School ছিল। ১৮৬৮ সালে *বামাবোধিনী* পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে বেথুন স্কুলের শিক্ষার দুরবস্থা বিষয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছিল। পত্রিকাটির প্রতিবেদন মতে, তখন বেথুন স্কুলে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল মাত্র ৩০ জন। এ স্বল্পসংখ্যক শিক্ষার্থীর জন্য সরকারের বিপুল অর্থ ব্যয়কে পত্রিকাটি অপচয়েরই নামান্তর বলে অভিহিত করেছিল।[১০৭] এ সব তথ্য প্রমাণের আলোকে বলা যায় যে, সে সময় ব্রাহ্মদের পরিচালিত বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয়ে যেরূপ শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, তা সরকারি বেথুন স্কুল অপেক্ষা অনেক উন্নত ছিল। সম্ভবত এ কারণেই বেথুন স্কুল পরিচালনা পর্ষদের তৎকালীন সভাপতি বিচারপতি Richard Garth বেথুন স্কুল ও বঙ্গ মহিলা স্কুলকে একত্র করার উদ্যোগ নেন। কিন্তু রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ এ উদ্যোগের বিপক্ষে ঘোর আপত্তি তোলেন। রক্ষণশীলদের মুখপত্র *Indian Mirror*, *নব বিভাকর*, *সুলভ সমাচার*, *National Paper* এবং এমনকি বাঙালি খ্রিস্টানদের মুখপত্র *Christian Herald* পত্রিকাও এ মিলনের তীব্র বিরোধিতা করে। এসব পত্রিকায় বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের হিন্দু ঐতিহ্য বিরোধী বিবিয়ানা পোষাক পরিচ্ছদ পরিধান, তাদের অহিন্দু আচার-আচরণ এবং মাংসাহারের কথা উল্লেখ করে তাদের সাথে বেথুন স্কুলে পাঠরত রক্ষণশীল হিন্দু ছাত্রীদের একত্র করা অসঙ্গত বলে মত প্রকাশ করা হয়। রক্ষণশীল হিন্দু ও তাদের সমর্থক সংবাদপত্রসমুহের বিরোধিতা ও সমালোচনার জবাবে *Brahmo Public Opinion* পত্রিকাও পাল্টা আবস্থান নেয়। একত্রীকরণের পক্ষে ব্রাহ্মদের সরব অবস্থান এবং বিচারপতি রিচার্ড গার্থের অনমনীয় মনোভাবের ফলে রক্ষণশীল হিন্দুদের বিরোধিতা সত্ত্বেও ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয়কে বেথুন স্কুলের সাথে একত্র করা হয়।[১০৮] সরকারি বেথুন স্কুল ও ব্রাহ্মদের বঙ্গ মহিলা স্কুলের সম্মিলন নিঃসন্দেহে বাঙালি নারীশিক্ষার জন্য একটি ইতিবাচক অগ্রগতি ছিল। এর ফলে নারীশিক্ষার ইতিহাসে এক নব অধ্যায়ের সূচনা হয়।

ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয়ের ছাত্রী সরলা ও কাদম্বিনী বসু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় অংশগ্রহণের অনুমতি লাভ করেছিলেন। বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয় বেথুন স্কুলের সাথে যুক্ত হয়ে যাওয়ায় কাদম্বিনী বেথুন স্কুল থেকেই এন্ট্রান্স পরীক্ষায় অংশ নিয়ে দ্বিতীয় বিভাগে (মাত্র ১ নম্বর কম পাওয়ায় তিনি প্রথম বিভাগ পাননি) উত্তীর্ণ হন। তিনি ছিলেন বাঙালি মেয়েদের মধ্যে প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনুষ্ঠিত নিয়মিত এন্ট্রাস পরীক্ষার্থী। ১৮৭৯ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন বক্তৃতায় উপাচার্য আলেকজেন্ডার আরবুথনট (Sir Alexander Arbuthnot) কাদম্বিনী বসুর কৃতিত্বপূর্ণ সাফল্যের উচ্ছসিত প্রশংসা করেছিলেন।[১০৯] বাংলার তদানিন্তন লেফট্যানেন্ট গভর্নর Sir Steuart Colvin Bayley কিছু পুস্তক ও উপহার সামগ্রী প্রেরণ করে কাদম্বিনী বসুকে সম্মান জানান। কাদম্বিনী বসুর এ কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফলে বাংলার নারীশিক্ষা অনুরাগীরা উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। ঢাকার ভাওয়ালের জমিদার কুমার রাজনারায়ণ কাদম্বিনী বসুকে বেথুন স্কুল কমিটির

১০৭. উদ্ধৃতি, সুনীতি বন্দোপাধ্যায়, *আধুনিকতার অভিমুখে বঙ্গনারী*, পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, ২০০৫, পৃ. ১৪০

১০৮. *The Brahmo Public Opinion*, 4th July, 1878; Indian Daily News, 8th March, 1882; Dr Kalidas Nag (ed.), *op.cit.* p. 36

১০৯. দ্রষ্টব্য The Minutes of the Calcutta University for the year 1878-79 cited in Dr Kalidas Nag (ed.), *op.cit.*, p. 38

মাধ্যমে উপহার হিসেবে একটি স্বর্ণপদক ও কিছু পুস্তক উপহার দেন। বিচারপতি গার্থের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত একটি আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কাদম্বিনীর হাতে এ পুরস্কার তুলে দেয়া হয়েছিল।[১১০] কাদম্বিনী বসুর সাফল্যের সংবাদ ভারতীয় নারীশিক্ষাব্রতীদেরও মধ্যে প্রবল উৎসাহের সঞ্চার করেছিল। এ সময় বাংলার বাইরে উত্তর পশ্চিম প্রদেশ, বোম্বে ও মাদ্রাজের নারীশিক্ষার্থীরা তাদের জন্য বিশ্বদ্যিালয়ের দ্বার উন্মোচনের দাবিতে সোচ্চার হলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো মাদ্রাজ ও বোম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ও নারীদের জন্য দ্বার উন্মুক্ত করতে বাধ্য হয়।

কাদম্বিনী বসু এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ায় বেথুন স্কুলের সাথে কলেজ স্থাপনের দাবি উত্থাপিত হয়। এসময় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসেবে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ চন্দ্রমুখীও কলেজে পড়ার দাবি জানাচ্ছিলেন। উদ্ভুত পরিস্থিতিতে ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে বেথুন স্কুলের কলেজ শাখা খোলা হয় এবং কটক কলেজের শশীভূষণ দত্তকে এর প্রথম লেকচারার নিয়োগ করা হয়। এদিকে চন্দ্রমুখী Free Church of Scotland কলেজে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পেয়ে গেলে প্রথম ও একমাত্র ছাত্রী কাদম্বিনী বসুকে নিয়েই বেথুন কলেজের যাত্রা শুরু হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বেথুন স্কুল হিন্দু মেয়েদের স্কুল হওয়ায় এতে অন্য ধর্মাবলম্বী মেয়েদের ভর্তির সুযোগ ছিল না। কিন্তু বেথুন কলেজের শিক্ষার দ্বার সকল ধর্মমতের শিক্ষার্থীদের জন্য উন্মুক্ত করায় মাদ্রাজের খ্রিস্টান কুমারী ডি আব্রু এ কলেজে ভর্তির সুযোগ পান।[১১১]

কাদম্বিনী বসুর সাথে এন্ট্রান্স পরীক্ষা দেয়ার অনুমতি পেলেও ইতোমধ্যে বিয়ে হয়ে যাওয়ায় বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয়ের কৃতি শিক্ষার্থী সরলা দাস এন্ট্রান্স পরীক্ষায় অংশ নিতে পারেননি। প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রথম ভারতীয় অধ্যক্ষ প্রসন্নকুমার রায়ের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়েছিল। তবে নিজে এন্ট্রান্স পাশ না করতে পারলেও এ ব্রাহ্ম নারী আজীবন নারীশিক্ষা প্রসারে চেষ্টা করে গেছেন।[১১২] স্বামীর সঙ্গে ঢাকায় বসবাসকালীন তিনি এখানে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এ বিদ্যালয়টির নাম কি ছিল তা জানা যায় না। পরে তিনি কলকাতার হরিশ মুখার্জি রোডে ‘গোকলে মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল’ নামে একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ও ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামী গোপাল কৃষ্ণ গোকলের নামে প্রতিষ্ঠিত এ বালিকা বিদ্যালয়টি ১৯৩৮ সালে কলেজে রূপান্তরীত হয়। বিখ্যাত ভারতীয় শিক্ষাবিদ ড. ই সি রাণী ঘোষ ছিলেন এ কলেজের প্রথম প্রিন্সিপাল। নারীদের যোগ্য নাগরিক, দক্ষ গৃহ-নির্মাতা এবং বিবেকবান কর্মী হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করাই ছিল গোকলে মেমোরিয়াল স্কুল প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য।

---

১১০. *The Brahmo Public Opinion*, 4th September, 1878

১১১. Dr Kalidas Nag (ed.), *op.cit.*, p. 40

১১২. শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর সাংগঠনিক দক্ষতার স্বীকৃতি হিসেবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সরলা দাসকে (পরে রায়) সিনেট সদস্য করেছিলেন। তিনিই ছিলেন প্রথম বাঙাল নারী সিনেট সদস্য। দ্রষ্টব্য, সারদা ঘোষ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬৮

শিবনাথ শাস্ত্রীর কন্যা হেমলতা সরকারও (১৮৬৮-১৯৪৩ খ্রি.) একজন শিক্ষাব্রতী নারী ছিলেন। শিক্ষা বিশেষ করে নারীশিক্ষা প্রসারে তিনি বিশেষ ভূমিকা রেখেছিলেন। নারীশিক্ষা বিস্তারের জন্য তিনি দার্জিলিং-এ মহারণী গার্লস স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। দার্জিলং মিউনিসিপ্যালিটির প্রথম নারী কমিশনার হেমলতা সরকার ভারতবর্ষে ইতিহাস নামক একটি পাঠ্যপুস্তকও রচনা করেছিলেন।[১১৩]

নারীশিক্ষার জন্য ব্রাহ্মদের প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত আরেকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়। এ বিদ্যালয়টির প্রধান উদ্যোক্তা ও প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন অবলাবান্ধব নামে খ্যাত এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নেতা দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়। ১৮৮২ সালে শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ও অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায় প্রমুখের সহায়তায় কলকাতাস্থ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রধান কার্যালয়ের পাশ্ববর্তী ব্রাহ্মপল্লীতে তিনি ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বলা হয় যে, এ সময় দ্বারকানাথ উপলব্ধি করেছিলেন যে, নীতি ও ধর্ম শিক্ষা বর্জিত পার্থিব শিক্ষা নারীদের জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে না। তাছাড়া একজন সুগৃহিণীর জন্য গার্হাস্থ্য শিক্ষা গ্রহণ অপরিহার্য। স্বাস্থ্যতত্ত্ব, রন্ধনবিদ্যা, শিশুপ্রতিপালন, গার্হাস্থ্য চিকিৎসাবিদ্যা প্রভৃতি নারীশিক্ষালয়গুলোর পাঠক্রমে থাকা বাঞ্ছনীয়। ইতোপূর্বে তাঁর প্রতিষ্ঠিত বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচিতে এতদবিষয়ে কিছু কিছু অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয় বেথুন স্কুলের সাথে যুক্ত হয়ে যে সরকারি স্কুল ও কলেজ হলো তাতে কেবল সরকারি শিক্ষা বিভাগ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্ধারিত পাঠ্যসূচি অনুসরণে নারীদের শিক্ষা দেয়া হচ্ছিল। এরূপ একটি পরিস্থিতিতে ব্রাহ্ম বালিকাদের সুশিক্ষার জন্য ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করা হয়।[১১৪] শিবনাথ শাস্ত্রীর বর্ণনা মতে, এটি সরাসরি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ পরিচালিত স্কুল ছিল না, তবে এটি পরিচালনায় এ সমাজের নীতি আদর্শ অনুসরণ করা হতো।[১১৫]

ব্রাহ্মসমাজ আন্দোলন ও দেশে নারী জাগরণের সাক্ষ্য ধাত্রী হিসেবে বিবেচনা করা হয় ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়কে। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের উদ্যোগে আনন্দমোহন বসু ও শিবনাথ শাস্ত্রীর প্রচেষ্টায় ১৮৯০ সালে ১৬ই মে ব্রাহ্মসমাজের মেয়েদের শিক্ষার জন্য এই স্কুলটির যাত্রা শুরু হয় কলকাতার কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটে (অধুনা বিধান সরণী)। তারপর মির্জাপুর স্ট্রীট (এখনকার সূর্যসেন স্ট্রীট) ঘুরে শেষ পর্যন্ত ১৯০৩ সালে এটি লোয়ার সার্কুলার রোডে স্থায়ী হয়। স্কুলটির প্রথম সম্পাদিকা ছিলেন সরলা রায়। স্কুল সংলগ্ন একটি বোর্ডিং স্থাপন করা হয়েছিল, যাতে মফঃস্বল থেকে আগত মেয়েরা স্বল্প খরচে এখানে থেকে সুশিক্ষা লাভ করতে পারে। প্রথমে স্কুলটিতে চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত পাঠদান করা হতো। অবশ্য ১৮৯৩ সালে দ্বারকানাথকে স্কুলটির সম্পাদক নিযুক্ত করা হলে তাঁর প্রচেষ্টায় এটি এন্ট্রান্স স্ট্যান্ডার্ড স্কুলে উন্নীত হয়। এক সময় স্কুলটি

---

১১৩. সারদা ঘোষ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬৮

১১৪. শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃপৃ ৯০-৯১

১১৫. Sivnath Sastri, *History of Brahmo Samaj*, Vol. II, p. 161

পরিচালনায় প্রচণ্ড অর্থ সঙ্কট দেখা দিলে দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, কালিনারায়ণ রায়, মেরি কার্পেন্টার ট্রাস্ট এবং অসংখ্য নাম না জানা সাধারণ মানুষ এর সাহায্যার্থে এগিয়ে আসেন এবং স্কুলটিকে রক্ষা করেন। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়সহ বাংলার বহুবরেণ্য ব্যক্তি এ স্কুলে শিক্ষকতা করেছেন।

পশ্চিমবঙ্গে যেমন ব্রাহ্মদের উদ্যোগে নারীশিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠেছিল তেমনি পূর্ববঙ্গেও। ১৮৬৭-৭৭ সালের মধ্যে পূর্ব বাংলায় ব্রাহ্মদের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত বেশ ক'টি বালিকা বিদ্যালয়ের কথা জানা যায়। এসব বিদ্যালয়ের মধ্যে ঢাকা অন্তঃপুর বিদ্যালয়, রাজশাহী বালিকা বিদ্যালয়, কুমিল্লা বালিকা বিদ্যালয়, ফরিদপুর বালিকা বিদ্যালয়, অন্তঃপুর স্ত্রী শিক্ষা, হিতকরী সভা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।[১১৬] তবে পূর্ববঙ্গে নারীশিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়গুলো মধ্যে ইডেন স্কুল ছিল সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। ইডেন স্কুলের প্রতিষ্ঠার ইতিহাস বিষয়ে কিছুটা মতপার্থক্য রয়েছে।[১১৭] একটি সূত্র মতে, ঢাকার গেণ্ডারিয়ার ব্রাহ্ম দীননাথ সেন তাঁর মেয়ে সুশীলার পড়ার জন্য ১৮৬৩ সালে স্কুলটি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন। সে মোতাবেক সূত্রাপুরে রামচন্দ্র বাবুর বাসায় একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়। সুশীলা, রামচন্দ্রের তিন মেয়ে এবং আরও দু'জন- মোট ছয় জন ছাত্রী নিয়ে স্কুলটির যাত্রা শুরু হয়।[১১৮] ইডেন স্কুল প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত দ্বিতীয় ভাষ্যটি পাওয়া যায় ব্রাহ্মসমাজের নেতা নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের আত্মজীবনীতে। তাঁর ভাষ্য মতে, তিনি নিজে এবং বাবু প্রাণকুমার দাস ও কয়েকজন ব্রাহ্মযুবক মিলে অভয়চন্দ্র দাসের বাড়িতে একটি বালিকা স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। পরে এটি তাঁর এবং বাবু বঙ্গচন্দ্র রায়, বিহারীলাল সেন ও কৈলাসচন্দ্র নন্দী প্রমুখের চেষ্টায় 'যুবতী বিদ্যালয়ে' রূপান্তরিত হয়। এ যুবতি বিদ্যালয়টি এবং আনন্দমোহন দাসের প্রতিষ্ঠিত আরেকটি বালিকা বিদ্যালয় যুক্ত হয়ে 'ঢাকা ইডেন ফিমেল স্কুল' নামে পরিচিত হয়।[১১৯] ইডেন স্কুল নামকরণ হয়েছিল সম্ভবত ১৮৭৮ সালে। এ সময় স্কুলটিকে সরকারি অনুদানভূক্ত করতে তদানীন্তন বাংলার লেঃ গভর্নর স্যার এশলি ইডেনের সম্মতি পাওয়ায় তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থে স্কুলটির নামকরণ করা হয়েছিল 'ইডেন ফিমেল স্কুল'। এরপর নানা রকম চড়াই উৎরাই অতিক্রম করে ইডেন কলেজ আজকের অবস্থানে আসে। এটি এখন বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ মহিলা কলেজ। বাংলাদেশের নারীশিক্ষায় অগ্রগণ্য এ মহিলা কলেজটি প্রতিষ্ঠা ব্রাহ্মসমাজের একটি বড় অবদান।

---

১১৬. মালেকা বেগম, 'বাংলাদেশের নারী: শিক্ষা থেকে কর্মক্ষেত্রে উত্তরণ', উইমেন্স স্টাডিজ সেন্টার, লেডি ব্রেবোন কলেজ কলকাতা, এবং ডায়মন্ড হারবার উইমেন্স ইউনিভার্সিটি, কলকাতার যৌথ উদ্যোগে ২০১৭ সালের ২৪ আগস্ট সেন্ট্রাল উইমেন্স ইউনির্ভাসিটি, ঢাকায় অনুষ্ঠিত "পর্দা ভেঙ্গে এশীয় মুসলিম নারীর অগ্রযাত্রা" শীর্ষক সেমিনারে পঠিত প্রবন্ধ।

১১৭. এতদবিষয়ে বিস্তারিত তথ্যের জন্য দ্রষ্টব্য মুনতাসীর মামুন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৬২-১৬৫

১১৮. আদিনাথ সেন, *স্বর্গীয় দীননাথ সেন ও তৎকালীন পূর্ববঙ্গ*, প্রথমখণ্ড, কলকাতা, ১৯৪৮, পৃ. ১৩২; মুনতাসীর মামুন, পূর্বোক্ত পৃ. ১৬২-১৬৩

১১৯. উদ্ধৃতি, মুনতাসীর মামুন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৬৩

শুরুর দিকে নারী স্বার্থানুকূল সংগঠনসমূহ ছিল পুরুষদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত। উনিশ শতকের শেষদিকে নারীদের নিজস্ব উদ্যোগে ও পরিচালনায় গড়ে ওঠা নারী সংগঠনের দিকে ঝোঁক বাড়তে থাকে। নারীচেতনা বিস্তার ও অধিকার সংরক্ষণের প্রশ্নে নারী সংগঠনগুলোর উপযোগিতা ছিল অনস্বীকার্য। প্রথম বাঙালি যে নারীবাদী সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয় সেটি হলো ‘সখী সমিতি’। ১৮৮৬ সালে স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৫-১৯৩২ খ্রি.) প্রতিষ্ঠা করেন ‘সখি সমিতি’। এই সমিতিকে ঔপনিবেশিক বাংলার প্রাথমিক পর্যায়ের নারী সংগঠনগুলির দিক নির্দেশিকা বলা যায়। স্বর্ণকুমারী দেবী ছিলেন কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বড় বোন। তিনি উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাঙালি নারী সাহিত্যিকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। তাঁর রচনায় সমকালীন সামাজিক সমস্যাগুলো বিশেষ করে বাঙালি নারী সমাজের দুঃখ-দুর্দশা ও শোষণ থেকে মুক্তি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে নিয়েছিলেন। তাঁর বহুমুখী প্রতিভা ও বৈচিত্রময় জীবনের আরও একটি উল্লেখ্য দিক ছিল পত্রিকার সম্পাদনা। প্রথমে তিনি ‘ভারতী’ এবং পরে ‘ভারতী ও বালক’ পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে দীর্ঘ ১৮ বছর কাজ করেন। ১৮৮২-১৮৮৬ সাল পর্যন্ত তিনি Theological Society’র সভানেত্রী ছিলেন। উল্লেখ্য যে, স্বর্ণকুমারী দেবী সমাজ ও নারী উন্নয়ন বিষয়ক তাঁর ভাবনাকে কেবল তাত্ত্বিক গণ্ডির মধ্যেই সীমাবদ্ধ না রেখে এর মূর্তরূপ দিতে প্রতিষ্ঠা করেন সখি সমিতির মতো নারীবাদী সংগঠন। হিরন্ময়ী দেবী ও গিরিন্দ্রমোহনী দেবীর মতো সাত জন সম্ভ্রান্ত নারীর সহায়তায় তিনি এ সংগঠনটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সংগঠনের উদ্যোক্তা নারীরা ছিলেন পরস্পরের আত্মীয়-বন্ধু (সই)। তাই তাদের প্রতিষ্ঠিত সংগঠনটির নামকরণ করা হয়েছিল ‘সখি সমিতি’। জানা যায় যে, স্বয়ং রবীবন্দ্রনাথ ঠাকুর এ নামকরণ করেছিলেন। স্বর্ণকুমারী দেবী ছিলেন এর সম্পাদিকা। এ ছাড়াও সখি সমিতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন স্বর্ণলতা ঘোষ, বরদাসুন্দরী ঘোষ, চন্দ্রমুখী বসু, মৃণালিনী দেবী, গিরিন্দ্রমোহিনী দাসী, সৌদামিনী গুপ্তা, শৈলবালা দেবী (সমাজসংস্কারক দুর্গামোহন দাসের কন্যা ও বিখ্যাত হোমিও চিকিৎসক ডি এন রায়ের স্ত্রী) ও সরলা রায় প্রমুখ বিশিষ্ট নারীরা। কুমিল্লার জমিদার নবাব ফয়জুন্নেসা চৌধুরাণীও এ সমিতির সভ্য ছিলেন বলে জানা যায়।[১২০] তিনি সমিতি পরিচালনার জন্য আর্থিক সহযোগিতাও করেছিলেন। স্বর্ণকুমারী দেবীর আপার সার্কুলার রোডের কাশিয়াবাগান বাড়িতে সখি সমিতির কার্যালয় স্থাপন করা হয়েছিল।

সখি সমিতির মূল উদ্দেশ্য ছিল- (ক) সমাজের সম্ভ্রান্ত নারীদের একত্রিকরণ, তাঁদের মধ্যে সদ্ভাব বৃদ্ধি এবং তাঁদের জনহিতকর কাজে নিযুক্ত করা; (খ) অনাথা কিংবা সঙ্গতিহীনা বিধবা অথবা কুমারী নারী-যারা সখি সমিতির বিভিন্ন অনুষ্ঠান এবং ব্রতপালনে ইচ্ছুক তাদের আশ্রয় ও শিক্ষা প্রদান এবং ক্ষেত্রবিশেষে অনাথাদের আর্থিক সাহায্য দান করা; এবং (গ) সমিতির পালিতারা সুশিক্ষিত হলে তাদের বেতন দিয়ে অন্তঃপুরে স্ত্রী-

১২০. উত্তরা চক্রবর্তী, ‘আমাদের গৃহ নাই- রোকেয়া হোসেন’, শেখর ভৌমিক (সম্পা.) *সাম্প্রতিক ইতিহাস চর্চা*, কলিকাতা ২০০৫, পৃ. ১৯৭-২০৬

শিক্ষা সম্প্রসারণের জন্য অন্তঃপুরের শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করা।[১২১] সখি সমিতি তার কার্যক্রম সম্পর্কে ব্যাপক প্রচারণা চালাতো স্বর্ণকুমারী দেবী সম্পাদিত *ভারতী ও বালক* পত্রিকায়। আর্থিক সংকটসহ নানা সমস্যার মধ্য দিয়ে সখি সমিতির কার্যক্রম পরিচালিত হয়। সমিতি তার বিঘোষিত কর্মসূচির অংশ হিসেবে বিধবা নারীদের শিক্ষা ও পুনর্বাসন ব্যবস্থা করেছিল।[১২২] সরলা দেবী চৌধুরাণী লিখেছেন, "---বাঙলার বিভিন্ন জেলা থেকে শিল্প সংগ্রহ করে মেলা করা, তাতে মেয়েদের দিয়ে অভিনয় করান প্রভৃতি নানা আয়োজনে 'সখি সমিতি' বিখ্যাত হয়ে উঠল।"[১২৩] নানা কারণে উনিশ শতকের শেষপ্রান্তে এসে সখি সমিতির কার্যক্রম ক্রমশ সংকুচিত হতে থাকে এবং ১৯০৬ সালে এটি হিরন্ময়ী দেবীর (স্বর্ণকুমারী দেবীর কন্য) প্রতিষ্ঠিত বিধবা শিল্পাশ্রমের সাথে একীভূত হয়ে যায়। উল্লেখ্য যে, হিরন্ময়ী দেবী জেনানা শিক্ষা ব্যবস্থাকে জনপ্রিয় করার জন্য বিধবা শিল্পাশ্রম নামক সংগঠনটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য বাস্তবায়নে পুরোপুরি সফল না হলেও সখি সমিতির গুরুত্বকে কোনোভাবেই খাটো করে দেখার অবকাশ নেই। বস্তুত উনিশ শতকের শেষার্ধের কলকাতা কেন্দ্রিক এ নারী সংগঠনটি নারীশিক্ষাসহ তার অন্যান্য কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে অন্যান্য সংগঠনের মধ্যে অনুপ্রেরণা সঞ্চার করতে পেরেছিল। আর এখানেই সংগঠনটির সার্থকতা।

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, উনিশ শতককে বলা হয় সংস্কারের যুগ, মানব সমাজে নব চেতনা উন্মেষের যুগ। এ যুগের সমাজ সংস্কারের একটি উল্লেখযোগ্য ধারা ছিল নারী সমাজের অবস্থার উন্নয়ন। নারীরাও যে মানুষ, তারাও যে মানবীয় অধিকার লাভের অধিকারী এবং এ অধিকার পূরণের মাধ্যমে তাদের অবস্থার উন্নতি না ঘটালে যে সমগ্র সমাজের কল্যাণ সম্ভব নয়–তা বাঙালি ভদ্রলোকেরা এ সময় উপলব্ধি করেছিলেন। এ উপলব্ধি থেকেই নারী সমাজের উন্নতির লক্ষ্যে যে সব কর্মসূচি বাঙালি সমাজপতিরা গ্রহণ করেছিলেন, তন্মধ্যে নারীশিক্ষা অন্যতম। উনিশ শতকে বাংলায় নারীশিক্ষার প্রথম পর্বটি খ্রিস্টান মিশনারীদের দ্বারা সূচিত হলেও অচিরেই এক্ষেত্রে দেশীয় উদ্যোগ শুরু হয়। এক্ষেত্রে বেসরকারি প্রয়াসই ছিল প্রধান। বেসরকারি প্রয়াসের মধ্যে যেমন ব্যক্তি উদ্যোগ ছিল তেমনি ছিল ঐক্যবদ্ধ সাংগঠনিক উদ্যোগও। ইয়ং বেঙ্গল, তত্ত্ববোধিনী সভা, সর্ব্বশুভকরী সভা থেকে শুরু করে ব্রাহ্মসমাজ এবং এর সাথে সম্পর্কযুক্ত বিভিন্ন সংগঠন রক্ষণশীল বাঙালি সমাজে নারীশিক্ষার প্রতি আগ্রহ ও সচেতনতা সৃষ্টিসহ নারীশিক্ষার প্রসারে নানা ভূমিকা ও কার্যক্রম পরিচালনা করে।

বাংলায় নারীশিক্ষার একটি অন্যতম প্রধান অন্তরায় ছিল বাল্য বিবাহসহ নানা সামাজিক কুসংস্কার। ব্রাহ্মসমাজসহ নারীশিক্ষা প্রসারে ব্রতী সংগঠনসমূহ এসব কুসংস্কার দূরকরণসহ নানা কর্মসূচি পালন করে। তবে সমকালীন

---

১২১. অরুণা চট্টোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৬; সারদা ঘোষ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৮৬-৮৮

১২২. এতদবিষয়ে বিস্তারিত দ্রষ্টব্য সারদা ঘোষ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৮৮-৯১

১২৩. সরলা দেবী চৌধুরাণী, *জীবনের ঝরাপাতা*, কলকাতা, ১৯৭৫, পৃ. ৫৯

সমাজ বাস্তবতাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা তাদের মত প্রগতিমনস্কদের পক্ষেও সম্ভব ছিল না। এরূপ করতে গেলে যে তীব্র সামাজিক প্রতিরোধ তাঁদের মহতী প্রয়াসকে ব্যর্থ করে দিতে পারে, সেটি তারা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। উল্লেখ্য যে, তৎকালীন বাঙালি সমাজের নারীশিক্ষার সমর্থকগণ পরিবার ও সমাজের নারীদের চিরাচরিত সামাজিক শৃঙ্খলার মধ্যে রেখেই শিক্ষা দানের পক্ষপাতী ছিলেন। তাই তারা প্রথমে মেয়েদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নয়, বরং নিজ গৃহেই শিক্ষা দান সঙ্গত বলে মনে করতেন। এরূপ শিক্ষাকে বলা হয় অন্তঃপুর বা জেনানা শিক্ষা ব্যবস্থা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, পাশ্চাত্য জীবনবোধ দ্বারা বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত ব্রাহ্মসমাজের সভ্যসহ প্রগতিবাদীরা তাদের নিজেদের পরিবারের নারীদের শিক্ষিত করাকে সভ্য হওয়ার মাপকাঠি বলে মনে করতেন। এভাবেই তৈরি হয়েছিল পরিবারে শিক্ষিত স্ত্রী, শিক্ষিত কন্যা ও শিক্ষিত পুত্রবধূর ধারণা। একজন শিক্ষিত মা একজন সুসন্তানের জন্মদিতে পারে, সন্তানের শিক্ষার দায়িত্ব নিতে পারে, সংসারের আয়-ব্যয়ের হিসেব রাখতে পারে এবং এসব কাজের মাধ্যমে স্বামীর সাংসারিক দায়-দায়িত্ব লাঘবে সহযোগিতা করতে পারে–এমন নানাবিধ ভাবনা বাঙালি সমাজকে নারীশিক্ষার ব্যাপারে আগ্রহী করেছিল। এসব ভাবনাকে উনিশ শতকে বাংলার নারীশিক্ষার সমর্থকদের নারীশিক্ষার প্রতি আগ্রহের অন্তর্নিহিত তাগিদ বলে অনেকেই মনে করেন। কিন্তু তখন পর্যন্ত বাঙালি মনন প্রাতিষ্ঠানিক নারীশিক্ষার জন্য তৈরি না হওয়ায় নারীশিক্ষার সমর্থক ব্যক্তি ও সংগঠনসমূহ তাদের নিজেদের পরিবারের এবং সাধারণ বাঙালি সমাজের অবিবাহিত ও বিবাহিত নারীদের জন্য জেনানা শিক্ষা ব্যবস্থাকে উপযোগী মনে করে এর বিস্তার সাধনে উদ্যোগ নেয়। তবে জেনেনা শিক্ষা ব্যবস্থার পাঠ্যসূচি পর্যালোচনা করলে বুঝা যায় যে, এ শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল যুগ বাস্তবতা অনুযায়ী পারিবারিক প্রয়োজন মেটানোতে নারীকে উপযোগী করে তোলা। নারীদের মধ্যে আধুনিক চেতনার বিকাশের জন্য তাদের উপযোগী করে তোলার তাগিদ ব্রাহ্মদের মধ্যে ছিল বলে মনে হয় না।

সময়ের অগ্রগতির সাথে সাথে বাঙালি সমাজের মনোজগতে রূপান্তর দৃশ্যমান হয়। তাই উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাঙালি সমাজের একদল মানুষ নারীদের আজন্মলালিত কুসংস্কারের গণ্ডি থেকে মুক্ত করে সভ্যতার আলোকে সুশিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান করে তোলায় আগ্রহী হন। তাঁরা মনে করতেন যে, নারীদের কুসংস্কারের আচ্ছন্নতা থেকে মুক্তিদানের একমাত্র উপায় হলো তাদের যথোপযুক্ত শিক্ষা দান।[১২৪] কিন্তু জেনানা বা অন্তঃপুর শিক্ষা এ চাহিদা পূরণে সক্ষম নয়। এ অবস্থায় প্রাতিষ্ঠানিক নারীশিক্ষার প্রয়োজনীতার কথা বলা হয় এবং বেথুন স্কুল প্রতিষ্ঠার পর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরসহ এদেশীয় সমাজ ও নারী হিতৈষীদের কেউ কেউ নারীশিক্ষা প্রসারে নারীশিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ার কাজে মনোযোগী হন। এ পর্যায়ে ব্রাহ্মসমাজসহ অন্যান্য নারীশিক্ষাব্রতী সংগঠনসমূহও প্রাতিষ্ঠানিক নারীশিক্ষা প্রসারে ব্রতী হয় এবং তাদের উদ্যোগে অবিভক্ত বাংলার বিভিন্ন স্থানে নারীশিক্ষা প্রসারে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়।

১২৪. *বামাবোধিনী পত্রিকা*, চৈত্র, ১২৭৭

নারীদের প্রকৃত কর্মক্ষেত্র গৃহকোণকে ধরে নিয়েই তদুপযোগী শিক্ষা প্রদানকেই উনিশ শতকের নারীশিক্ষা প্রয়াসীদের শিক্ষা নীতিতে প্রাধান্য পেয়েছিল।[১২৫] এ অভিযোগ পুরোপুরি অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। ব্রাহ্ম নেতা কেশবচন্দ্রের মতো নারী হিতৈষীও নারীদের জন্য পুরুষদের ন্যায় উচ্চশিক্ষা প্রদানে পক্ষপাতী ছিলেন না। তবে এ কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, তাদের উনিশ শতকীয় বাঙালি সমাজ বাস্তবতাকে পুরোপুরি অস্বীকার করা সম্ভব ছিল না। তাই তাদের কাছ থেকে নারীশিক্ষা সম্পর্কে বৈপ্লবিক উদ্যোগ প্রত্যাশা করা যায় না। তবে সার্বিক বিবেচনায় একথা বলা অসঙ্গত হবে না যে, উনিশ শতকের বাঙালি সমাজ বাস্তবতায় তারা বাংলায় নারীশিক্ষা প্রসারে যে অবদান ও ভূমিকা রেখেছেন, তা নিঃসন্দেহে অনন্য ও প্রশংসনীয়। এ সময় নারীশিক্ষার প্রসার প্রয়াসীগণ শুধু নারীশিক্ষা সম্পর্কে বাঙালি সমাজের মনন জগতে আলোড়ন সৃষ্টি এবং অন্তঃপুর শিক্ষা বিস্তারেই তাদের শ্রম ও তৎপরতা সীমাবদ্ধ রাখেননি, প্রাতিষ্ঠানিক নারীশিক্ষা প্রসারেও তারা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। এ শতকেই বাঙালি নারীদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় তথা উচ্চশিক্ষার দ্বার উন্মোচিত হয়। আর এ অর্জনের কৃতিত্বের দাবিদার হলেন ব্রাহ্মরা। তাই বাংলার নারীশিক্ষার অগ্রগতিতে উনিশ শতকীয় বাঙালি ব্যক্তি ও বেসরকারি সংগঠনের অবদানকে অস্বীকার বা খাটো করে দেখার কোনো অবকাশ নেই।

১২৫. দ্রষ্টব্য, সারদা ঘোষ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫০-৫৩

পঞ্চম অধ্যায়

উনিশ শতকে বাঙালি মুসলিম সমাজে নারীশিক্ষা প্রসারে বেসরকারি প্রয়াস: গতি-প্রকৃতি অনুসন্ধান

পূর্ববর্তী অধ্যায়সমূহের আলোচনায় দেখা যায় যে, উনিশ শতকে প্রথমার্ধেই রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩ খ্রি.) এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১ খ্রি.) প্রমুখ হিন্দু মনীষীগণ নিজেদের সমাজের নারীদের দুরবস্থা দূরীকরণে নানাভাবে প্রয়াস চালিয়েছিলেন। নারী সমাজকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে আসার প্রচেষ্টার ফলে তারা কেবল শিক্ষার আলো দ্বারা আলোকিত হয়নি, তাদের সামাজিক ও আইনগত অবস্থারও অনেকখানি উন্নতি হয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ বাঙালি মুসলিম সমাজে তখনো এমনটি হয়নি। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে সকল ক্ষেত্রেই মুসলমান সমাজের অধোগতি অব্যাহত ছিল। এ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে অবস্থার পরিবর্তন শুরু হয়। বাঙালি মুসলিম সমাজেও পুনর্জাগরণ সূচিত হয়। অর্থাৎ উনিশ শতকের প্রথমার্ধে হিন্দু সমাজের মধ্যে যে জাগরণ শুরু হয়েছিলো, মুসলমান সমাজে সে জাগরণের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে দ্বিতীয়ার্ধে। পরিবর্তিত বাস্তবতায় উনিশ শতকের শেষার্ধে এসে মুসলিম সমাজ সংস্কারক ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণি স্বজাতীয় নারী সমাজের হীনাবস্থা ও এর প্রতিকারে করণীয় সম্পর্কে চিন্তাভাবনা শুরু করেন। এরই ধারাবাহিকতায় মুসলিম নারীদের শিক্ষার প্রসঙ্গটিও উঠে আসে। সংখ্যায় কম হলেও উনিশ শতকের শেষার্ধে মুসলিম সমাজের কিছু মানুষ নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্বারোপ করে এর প্রসারে উদ্যোগী হন। নানা প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবিলা করে বাংলায় মুসলিম নারীশিক্ষা ক্রমবিস্তার শুরু হয়। সরকারি উদ্যোগে সূচিত নারীশিক্ষার সামান্য সুফল মুসলিম নারীদের ভাগ্যেও জোটে। নারীশিক্ষা প্রসঙ্গে সরকারি উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা বর্তমান গবেষণার বিষয়বস্তু না হওয়ায় এদিকে বিশেষ আলোকপাতের অবকাশ নেই। আলোচ্য অধ্যায়ে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলার মুসলিম নারীশিক্ষার বেসরকারি প্রয়াস সম্পর্কে অনুসন্ধানী আলোচনা-পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণের প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে।

৫. ১. ক: **বাঙালি মুসলিম সমাজে নারীশিক্ষার প্রসারে বেসরকারি প্রচেষ্টা: উনিশ শতক**

উনিশ শতকের প্রথমার্ধ ছিল বাঙালি মুসলিম সমাজের জন্য এক চরম ক্রান্তিকাল। এ সময় রাজক্ষমতা হারানো মুসলিম সমাজ শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে প্রতিবেশি হিন্দু সম্প্রদায়ের তুলনায় অনেক পশ্চাৎপদ অবস্থায় নিপতিত হয়েছিল। বাঙালি মুসলমানরা এ সময় নিজেদের অতীত গৌরবের মহিমায়

মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়ায় যুগ বাস্তবতা উপলব্ধি করতে অনেকটাই ব্যর্থ হন। ফলে নিজেদের দুঃখ-দুর্দশা লাঘব এবং জীবনমানের সার্বিক উন্নতির জন্য তারা বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেননি। এ সময় পাশ্চাত্য শিক্ষা ও ভাবধারার প্রভাবে কলকাতা কেন্দ্রিক হিন্দু সমাজে রেনেসাঁস বা পুনর্জাগরণ সংঘটিত হলেও মুসলিম সমাজে এর কোনো বিশেষ প্রভাব দেখা যায়নি। এ সময় মুসলমানরা অতীতমুখী মানসিকতা নিয়ে প্রধানত ধর্মশুদ্ধি আন্দোলনে ব্যস্ত থাকেন। জিহাদী মনোভাব ও তৎপরতা প্রদর্শন করে ইংরেজ সরকারের রোষানলে পতিত হয়ে সরকারি সুবিধাদি থেকে বঞ্চিত হয়ে এক চরম দুর্দশাগ্রস্থ জাতিতে পরিণত হয়। উইলিয়াম হান্টারসহ অনেকের রচনায় এ বিষয়টির প্রতিফলন দেখা যায়।[১]

১৮৫৭-৫৮ সালের মহাবিদ্রোহের পর ভারতীয় তথা বাঙালি মুসলিম সমাজে পরিবর্তনের সূচনা হয়। এ সময় বাংলার নবাব আবদুল লতিফ (১৮২৮-১৮৯৩ খ্রি.), সৈয়দ আমীর আলী (১৮৪৯-১৯২৮ খ্রি.) এবং উত্তর ভারতে স্যার সৈয়দ আহমদ খান (১৮১৭-১৮৯৮ খ্রি.) প্রমুখ মুসলিম বুদ্ধিজীবী ও সংস্কারকবৃন্দ মুসলিম সমাজের পুনর্জাগরণের একটি নতুন ধারা সৃষ্টি করেন। মুসলিম সমাজকে আধুনিকতার ধারায় ধাবিত করার জন্য এ সময় নানামুখী উদ্যোগ ও তৎপরতা দেখা যায়। তবে তাঁদের কর্মকাণ্ডেও ইংরেজ সরকারের সাথে আপসমূলক মনোভাবের সাথে ইসলামি ভাবধারা ও চেতনার সমন্বয়ের প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। পাশ্চাতের উদারনীতিবাদ ও যুক্তিবাদ দ্বারা মুসলিম সমাজ যেন প্রভাবিত না হয়, সে বিষয়েও তাঁদের কেউ কেউ সচেষ্ট ছিলেন। তাঁদের মানস জগত ইসলামি চেতনা, ব্রিটিশদের সঙ্গে সহযোগিতার নীতি, রক্ষণশীলতা, উদার চিন্তা ও ইসলামি চেতনা প্রভৃতি বিপরীতধর্মী ধারণা দ্বারা প্রভাবিত থাকায় পূর্বোক্ত সংস্কারকগণ হিন্দু সমাজের সংস্কারকদের মতো নারী সমন্ধীয় বিশেষ করে নারীশিক্ষার মতো বিষয়ে উদার দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিতে পারেননি।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ঐতিহ্যিক মুসলিম সমাজে নারীরা পুরুষের অধীন এবং বাইরের পৃথিবী থেকে বলতে গেলে বিচ্ছিন্ন ছিল। নানাবিধ সামাজিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বাধা-বিপত্তি তাদের অবস্থানকে হীন পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিল। পাশ্চাত্যকরণ ও আধুনিকীকরণের অভিঘাত যখন এ দেশের হিন্দু নারীদের আন্দোলিত করেছিল, সে সময় মুসলিম নারী ঐতিহ্যিক বাধা নিষেধের বেড়াজালে আবদ্ধ ছিল। মুসলিম সমাজে জাগরণের ধারা বিলম্বিত হওয়ায় নারী সম্প্রদায়কে মুক্তির চিন্তার জন্য অপেক্ষা করতে হয় অনেক দিন।

এ বিষয়ে বিতর্কের অবকাশ নেই যে, উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাঙালি মুসলিম সমাজে নারীশিক্ষার দৃশ্যমান সূচনা হয়। তবে সাধারণভাবে মুসলিম সমাজে নারীশিক্ষার প্রতি অনাগ্রহ ও অনীহা সত্ত্বেও উনিশ শতকের প্রথমার্ধেও নারীশিক্ষার একটি ক্ষীণধারা প্রচলিত ছিল বলে বিভিন্ন তথ্যসূত্র থেকে জানা যায়। *সমাচার দর্পণ*

১. দ্রষ্টব্য William Wilson Hunter, The Indian Musalmans, Trübner and Company, London 1872

পত্রিকার ভাষ্য অনুযায়ী, ১৮২০ সালে খ্রিস্টান মিশনারী সংগঠন 'ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি' কলকাতার গৌড়ীবাড়িতে যেসব বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিল, সেসব বিদ্যালয়ে বেশ কয়েকজন মুসলমান ছাত্রী পড়াশুনা করতেন। ১৮২১ সালেও পরীক্ষার্থী হিসেবে মুসলিম ছাত্রীদের অংশগ্রহণের তথ্য পাওয়া যায়।[২] *Hidu Female Education* (1839) গ্রন্থে প্রিসিলা চ্যাপম্যান উল্লেখ করেছেন যে, মিস কুক যখন আঠারো শতকের বিশের দশকে কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করছিলেন তখন শ্যামবাজারের একজন মুসলিম নারী প্রচণ্ড উৎসাহ এবং আগ্রহ নিয়ে তাঁর কাজে সহায়তা করেছিলেন। তিনি বাড়ি বাড়ি গিয়ে ছাত্রী সংগ্রহ করতেন এবং নিজেই ১৮ জন ছাত্রী নিয়ে নিজ পাড়ায় একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। শীঘ্রই এই স্কুলের ছাত্রী সংখ্যা ৪৫ জনে উন্নীত হয়েছিল।[৩] সমকালে কলকাতার মুসলিম পুরুষরাই যেখানে ইংরেজ প্রবর্তিত নতুন শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি আগ্রহ দেখাননি, সেখানে একজন নারীর পক্ষে খ্রিস্টান নারীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হওয়া এবং নারীশিক্ষা সম্প্রসারণে উদ্যোগী হওয়াকে গবেষকগণ নিঃসন্দেহে একটি বিস্ময়কর ঘটনা বলে মন্তব্য করেছেন। দুর্ভাগ্যজনকভাবে তাঁর স্কুলটি দীর্ঘস্থায়ী হয়নি এবং এ উদ্যোক্তা নারীর নাম কিংবা পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়নি।

১৮২৭ সালে কলকাতা লেডিস এসোসিয়েশন যে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করে তাতে, তাদের প্রতিষ্ঠিত দশটি বালিকা বিদ্যালয়ে ১৬০ জন ছাত্রী অধ্যায়নরত ছিল বলে উল্লেখ করা হয়। আর এসব ছাত্রীদের অধিকাংশই মুসলমান ছিল বলে এ প্রতিবেদনে তথ্য রয়েছে।[৪] শ্যামলী আকবর ও অন্যান্যরা তাঁদের গ্রন্থে সূত্র নির্দেশ না করেই বলেছেন শ্রীরামপুরের মিশনারিরা মুসলমান মেয়েদের জন্য পাঁচটি স্কুল তৈরি করেছিলেন, যেখানে হিন্দু মেয়েরাও পড়ত।[৫] এ সময়ে পূর্ব বাংলায় মিশনারিদের প্রতিষ্ঠিত স্কুলসমূহে কোনো মুসলমান মেয়ে পড়ত কি-না, জানা যায় না। তবে সার্বিক অবস্থা মূল্যায়ন করে মুসলমান প্রধান এলাকায় প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয় সংখ্যায় কম হলেও মুসলিম পরিবারের মেয়েদের পড়তে যাওয়া একেবারে অস্বাভাবিক ছিল না।

মিশনারীদের এসব বিদ্যালয়ের পড়ালেখার মান যাই হোক না কেন এবং ছাত্রীদের উপস্থিতি যেমনই থাকুক না কেন, আলোচ্য সময়ে যেখানে ধর্মান্তরিত হওয়ার ভয়ে মিশনারি স্কুলে, ছাত্ররাই পড়তে যেত না সেখানে

---

২. বজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, *সংবাদপত্রে সেকালের কথা,* বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলিকাতা, ১৩৫৯ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৫৬; সোনিয়া নিশাত আমিন, *বাঙলি মুসলিম নারীর আধুনিকায়ন* (অনু. পাপড়ীন নাহার), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০২, পৃ. ১১১

৩. সোনিয়া নিশাত আমিন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১১২

৪. আরিফা সুলতানা, *ঔপনিবেশিক বাংলার নারী*, অবসর প্রকাশন, ঢাকা, ২০২৩, পৃ. ৬৪

৫. *ঐ*

মেয়েদের উপস্থিতি বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। সেই সঙ্গে এই সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে যে, হয়ত নিম্নশ্রেণির হিন্দুদের মতো নিম্ন বংশীয় দরিদ্র মুসলমান পরিবারের মেয়েরা কিছু আর্থিক সুবিধা প্রাপ্তির আশায় মিশনারিদের স্কুলে ভর্তি হতো।

৫. ১. খঃ নারীশিক্ষা প্রসঙ্গে মুসলিম মনন

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, উনিশ শতকে বাঙালি মুসলিম সমাজের পুনর্জাগরণের অগ্রদূত ছিলেন নবাব আবদুল লতিফ (১৮২৮-১৮৯৩ খ্রি.)। নবাব আবদুল লতিফ নারী শিক্ষার ব্যাপারে কোনো বাস্তব পরিকল্পনা গ্রহণ করেননি। সমকালীন আধুনিক মানসের সার্বজনীন আদর্শ তাঁর মনে বিশেষ কোনো প্রভাব সৃষ্টি করেছিলো বলে মনে হয় না। তাই মুসলমান মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে তাঁর মনোভাব ছিল রক্ষণশীল। এক্ষেত্রে সম্ভবত তিনি যুগধর্ম ও যুগ মানসিকতার প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারেননি। কাজেই তাঁর প্রতিষ্ঠিত *Mohammedan Literary Society*'র কার্যক্রমে শিক্ষা বা সংস্কারের মাধ্যমে মুসলিম নারীর সামাজিক অবস্থা উন্নতি বিধানে কোন প্রচেষ্টাই পরিলক্ষিত হয় না। স্মর্তব্য যে, নবাব আবদুল লতিফ ১৮৬৩ সালে মোহামেডান লিটারারি সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করে মুসলিম সমাজে আধুনিক শিক্ষার প্রচলনের প্রয়াস চালিয়েছিলেন। তবে নারীশিক্ষার ব্যাপারে তাঁর কোনো আগ্রহ ছিল, এমন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। নবাব আবদুল লতিফের চার পুত্রই উচ্চশিক্ষা লাভ করেছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁর একমাত্র কন্যাকে শিক্ষা দিয়েছিলেন কিনা এমন তথ্য জানা যায় না।[৬] ১৮৬৭ সালে নওয়াব আবদুল লতিফ *Bengal Social Science Association*- এ Mohammedan Education in Bengal শিরোনামে মুসলমানদের শিক্ষার উপর একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রবন্ধটিতে নারীশিক্ষার কোন উল্লেখমাত্র ছিল না। প্রবন্ধ পাঠ শেষে *আলালের ঘরে দুলাল* গ্রন্থের রচয়িতা প্যারিচাঁদ মিত্র উক্ত প্রবন্ধের আলোচনায় অংশগ্রহণ করে জানতে চেয়েছিলেন "হিন্দুদের মধ্যে স্ত্রীশিক্ষার যেরূপ প্রচেষ্টা চলছে, মুসলমানদের মধ্যে অনুরূপ প্রচেষ্টা চলছে কিনা?" নবাব আবদুল লতিফ এ প্রশ্নে কোনো উত্তর দেননি। উক্ত প্রশ্নের জবাবে তৎকালীন কলকাতা মাদ্রাসার মৌলবী জনাব আবদুল হাকিম উর্দু ভাষায় যা বলেন, তার মর্মার্থ এরূপ:

> নারীশিক্ষা মুসলমান সমাজে অপ্রচলিত নয় এবং এর জন্য মুসলমানদের বাহির হতে কোনরূপ অনুপ্রাণিত বা উৎসাহিত করে তোলার প্রয়োজনও নেই, তাদের ধর্মেই অনুরূপ নির্দেশ রয়েছে। মুসলমানদের নবীও সমভাবে নারী পুরুষের মধ্যে জ্ঞান বিতরণের উপদেশ দিয়েছেন, তাঁর স্ত্রী কন্যাগণ উচ্চশিক্ষিত ছিলেন, তাঁদের কেহ কেহ বিখ্যাত কবিও ছিলেন, সেসব লেখা অদ্যাবধি বেঁচে আছে। অনুরূপভাবে বাগদাদ, দামেস্ক ও কর্ডোভার

৬. আনোয়ার হোসেন, *স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার মুসলিম নারী*, (পুনর্মুদ্রণ), প্রগতিশীল প্রকাশক, কলকাতা, ২০০৯, পৃ. ৫০

> খলিফাদের স্ত্রী কন্যারাও উচ্চশিক্ষিত ছিলেন। দিল্লীর বেগম বাদশাহজাদীদের লেখা গ্রন্থ বর্তমানেও নিষ্প্রভ হয়ে যায়নি। মনে হয় মুসলিম সমাজের মতো অন্য কোন সম্প্রদায় নারীশিক্ষার প্রয়োজন ও গুরুত্ব উপলব্ধি করে নাই। তারা জানে শিশুরা তাদের মায়েদের নিকট হতে প্রাথমিক ধ্যানধারণা লাভ করে থাকে, তাই শিশুরা যাতে নষ্ট হতে না পারে সেজন্য পূর্ব থেকেই তার প্রতিকারের ব্যবস্থা করে রেখেছে। অধিকন্তু একজন শিক্ষিত নারী পারিবারিক বিষয়ে তার স্বামীকে কত বেশী সাহায্য করতে সক্ষম সে সম্পর্কেও তারা ওয়াকেবহাল। তবে যে কাজটি মুসলমানরা করতে সক্ষম নয় তা হলো, অন্য জাতির মতো তারা তাদের নারীদের স্কুল কলেজে পাঠাতে পারে না। কারণ ধর্মত তারা তাদের নারীদের পর্দা পুষিদামতো রাখতে বাধ্য।[৭]

উপর্যুক্ত বক্তব্যের মধ্যে সমকালীন মুসলিম সমাজের শিক্ষিত ও অগ্রণী মানুষদের নারীশিক্ষার ব্যাপারে অনুদার ও রক্ষণশীল মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়।

নারীশিক্ষা বা সমাজে নারীর মর্যাদা উন্নয়নে নবাব আবদুল লতিফের সমসাময়িক মুসলিম সমাজ সংস্কারক ও মুসলিম সমাজে আধুনিকতার জনক বলে পরিচিত সৈয়দ আহমেদ খান (১৮১৭-১৮৯৮ খ্রি.) এরও কোন সক্রিয় ভূমিকা ছিল না। নারীদের প্রতি তার উপদেশ ছিল নিম্নরূপঃ

> তোমরা পুরানো শিক্ষা পদ্ধতি গ্রহণ করতে চেষ্টা করো। সেটাই বহন করে আনবে তোমাদের ইহকালীন ও পরকালীন মঙ্গল।... সেটাই রক্ষা করবে কষ্ট থেকে.... তোমরা ঘরের শঙ্খলার দায়িত্ব আপন কাধে তুলে নেবে। ঘরের মালিক হয়ে থাকবে।...[৮]

স্যার সৈয়দ আহমদ খান ভারতীয় মুসলিম সমাজে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারের জন্য নিরলসভাবে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু মুসলিম নারীর শিক্ষার ব্যাপারে তিনি ছিলেন দ্বিধাগ্রস্থ। মুসলিম নারীর জগৎ তার গৃহেই হোক, এটাই তিনি মনেপ্রাণে কামনা করেছেন। নারীশিক্ষা বিষয়ে স্যার সৈয়দ আহমদ খান সম্ভবত যুগের চাহিদা উপলব্ধি করতে পারেননি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বাঙালি না হলেও বাঙালি মুসলিম সমাজে স্যার সৈয়দ আহমদ খানের সংস্কার আন্দোলনের যথেষ্ট প্রভাব পড়েছিল। তাই তিনি যদি নারীশিক্ষার প্রসারে কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করতেন এর দ্বারা বাঙালি মুসলিম সমাজও উদ্বুদ্ধ হতো।

হাজী মুহম্মদ মহসীন (১৭৩২-১৮১২ খ্রি.) ছিলেন বাংলার একজন প্রখ্যাত মুসলিম জনহিতৈষী, ধার্মিক, উদার ও জ্ঞানী ব্যক্তি, যিনি তাঁর নিজের দানশীলতার মহৎ গুণাবলীর জন্য দানবীর খেতাবে ভূষিত হয়েছেন। অকৃতদার হাজী মহসীন তাঁর বিপুল সম্পত্তি দ্বারা 'মহসীন ফান্ড' নামে যে ওয়াকফ প্রতিষ্ঠা করেন, এর আয় থেকে মুসলিম সমাজের শিক্ষা বিস্তারে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হলেও, এতে নারীশিক্ষার জন্য কোনো অর্থ বরাদ্দ ছিল না।[৯]

---

৭. M Mohar Ali (ed.), *Nawab Abdul Luteef Khan Bahadur: Atubiography and other Writings*, The Mehrab Publication, Dacca, 1968, p. 104; দ্রষ্টব্য, কাজী আবদুল ওদুদ, *বাংলার জাগরণ*, কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৯৫৬, পৃ. ২২

৮. উদ্ধৃতি, তাহ্‌মিনা আলম, *বাংলার সাময়িকপত্রে বাঙালি মুসলিম নারী সমাজ*, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৮, পৃ. ৬০

৯. আরিফা সুলতানা, *পূর্বোক্ত*, ৬৩

বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য উপাত্ত বিচার বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, শুধু নবাব আবদুল লতিফ বা স্যার সৈয়দ আহমদ খান নয়, উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধেও নারীশিক্ষা প্রসঙ্গে বাঙালি মুসলিম মনন অনেকক্ষেত্রেই উদার হতে পারেনি। তখন এ বিষয়ে রক্ষণশীলদের প্রভাবই প্রধান ছিল। *বামাবোধিনী* পত্রিকায় এতদবিষয়ে প্রকাশিত বহু প্রবন্ধ ও নিবন্ধ থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়।[১০]

তবে সংখ্যায় কম হলেও নারীর মর্যাদা উন্নতিকরণ ও নারী শিক্ষার প্রসার বিষয়ে উদার মনোভাবের মুসলিম বুদ্ধিজীবীদেরও উপস্থিতি পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে সৈয়দ আমীর আলী (১৮৪৯-১৯২৮ খ্রি.)-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নারীশিক্ষার ব্যাপারে তাঁর মধ্যে সচেতন মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। উল্লেখ্য যে, আমীর আলী নিজে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন এবং একজন ব্রিটিশ নারীর সাথে বৈবাহিক সম্পর্কের সুবাদে তিনি বহু শিক্ষিত নারীর সংস্পর্শে আসার সুযোগ লাভ করেছিলেন। ফলে নারীশিক্ষার ব্যাপারে তাঁর মধ্যে এক রকমের ইতিবাচক ও প্রগতিশীল মনোভাব দেখা যায়। আমীর আলীর প্রতিষ্ঠিত সংগঠন *The Central National Mohammedan Association-* এর কর্মসূচিতে নারীর প্রতি বৈষম্য দূর করা এবং নারী প্রগতির বিষয়ে কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল। জানা যায় যে, নারীশিক্ষার পক্ষে এ সংগঠন একটি প্রস্তাব দিলে রক্ষণশীলদের বিরোধিতার কারণে তা নাকচ হয়ে যায়।[১১] এমতাবস্থায় নারীশিক্ষা বিষয়ে একটি গ্রহণযোগ্য পন্থা উদ্ভাবনের জন্য এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে একটি স্ট্যান্ডিং কমিটি করা হয়েছিল। তবে এর শেষ পরিণতি কি হয়েছিল, সে সম্পর্কে কোনো তথ্য পাওয়া যায় না।

সৈয়দ আমীর আলীর এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে ১৮৮২ সালে তৎকালীন ভাইসরয় লর্ড রিপনকে একটি স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছিল। এতে বাংলার মুসলিম সমাজের শিক্ষার উন্নতির জন্য সরকারের কাছে বিভিন্ন দাবি ও পরামর্শ প্রদান করা হয়। অবশ্য এতে আমীর আলী নারীশিক্ষার প্রসঙ্গটি যুক্ত করেননি। ১৮৯৯ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় শিক্ষা-সম্মেলনে সৈয়দ আমীর আলী সভাপতিত্ব করেন। সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে আমীর আলী বলেন,

> --- আমাদের নারীরা কী? --- এমন একসময় ছিল যখন আমাদের ধর্মে নারীদের বলা হতো মানুষের মা। --- এখন কী আমরা তাহাদের সে নাম দিতে পারি? --- এটি সত্য যে, যদি আমরা সভ্যতায় অগ্রগামী হতে চাই, সভ্যজগতের সম্মান অর্জন করতে ইচ্ছুক হই, তা হলে উচিৎ হবে তাদিগকে পূর্বে সমাজে তাদের যে স্থান ছিল, সে স্থানে উন্নিত করা।

তিনি আরো বলেন,

---

১০. *বামাবোধিনী* পত্রিকা, ২৫ সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ১৮৬৫; ৫০ সংখ্যা, অক্টোবর ১৮৬৭। বিস্তারিত তথ্যের জন্য দ্রষ্টব্য Sahanara Husain 'Glimpes in the condition of Bengali Muslim women during the latter half of the 19th century: Aa study based on the *Bamabodhini Patrika*', The Journal of the institute of Bangladesh Studies, University of Rajshahi, volume III, 1978 pp. 20 21

১১. মোঃ আবদুল্লাহ আল- মাসুম, *বাংলার মুসলিম শিক্ষার অগ্রগতি (১৮৮৫-১৯২১)*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ১৮০

--- মেয়েদের শিক্ষা ছেলেদের শিক্ষার সমান্তরালভাবে চলা উচিৎ। তাতেই সমাজে একটা সুসামঞ্জস্য প্রভাব প্রতিফলিত হতে পারে। পুরুষ নারী যদি সমভাবে উন্নতি করতে না পারে, তবে কোনো সার্থক সুফল পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। সমাজের একজনকে শিক্ষিত করে অন্যজনকে নিরক্ষর রাখলে ফল হবে মারাত্মক। সমাজের এক অংশ যদি শিক্ষিত হয় আর অন্য অংশ থাকে নিরক্ষর তবে ফল দাঁড়ায় এরূপ- শিক্ষিতেরা হয় আনন্দ উপভোগের জন্য নীতিবিরোধী, সমাজ যায় অধপতনের চরম প্রদেশে। আমার এ কথার সত্যতা দেখতে পারেন অতীতের বা ইসলামের পূর্বেকার মক্কায়।[১২]

আমীর আলীর তাঁর উপর্যুক্ত বক্তব্যের মাধ্যমে বলতে চেয়েছেন যে, নারী-পুরুষের সমান শিক্ষার সুযোগ না থাকলে কোনো সমাজ অগ্রসর হতে পারে না। নারীরা যদি পিছিয়ে থাকে তবে সে সমাজের ভারসাম্য বিঘ্নিত হয়। কারণ, সমাজ দুপক্ষের অংশগ্রহণেই প্রবহমান থাকে। ১৮৯৯ সালেই *The Nineteenth Century* পত্রিকায় প্রকাশিত ‘The Influence of Women in Islam’ শিরোনামে এক নিবন্ধে আমীর আলী বহু ঐতিহাসিক তথ্যের উপর ভিত্তি করে ইসলামি স্বর্ণযুগের বর্ণনা উপস্থাপন করেন। তাঁর মতে, মুসলিম নারীর জন্য তা নিঃসন্দেহে এক উজ্জ্বল যুগ ছিল। সে যুগে সেখানে নারীরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতেন, কূটনৈতিক দায়িত্ব পালন, ভোজের আয়োজন ছাড়াও নতুন ফ্যাশন চালু করেছেন। তাঁর মতে, এর কোনোটিই ইসলামি নীতিমালার বিরুদ্ধে নয়। ভারত প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এখানে প্রচলিত সনাতনী শিক্ষা নারীদের কখনোই খুব বেশি দূর এগিয়ে নিয়ে যাবে না। সৈয়দ আমীর আলী ভারতের মুসলিম সমাজকে পরামর্শ দিয়ে বলেছিলেন, তারা তাদের সুহৃদ কন্সটান্টিনোপলকে অনুসরণ করতে পারে, যেখানে মেয়েরা সহজে বাইরে ঘোরাফেরা, সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ, পত্রিকা সম্পাদনা এবং ইতিহাস রচনার অধিকারপ্রাপ্ত। নারী সমাজের উন্নতি বিধানের জন্য ব্রাহ্মদের সংস্কারের বিষয়গুলো হৃদয়াঙ্গম করার জন্যও তিনি বাঙালি মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন।[১৩]

তবে লক্ষণীয় যে, সৈয়দ আমীর আলী নারী শিক্ষা বিষয়ে একজন তাত্ত্বিক ছিলেন। তিনি বাঙালি মুসলিম সমাজে নারীশিক্ষার প্রসারে কোনো প্রয়োগিক ভূমিকা পালন করেননি। সভা-সমিতি, আলাপ-আলোচনা এবং দু’একটি প্রবন্ধ নিবন্ধে নারীশিক্ষার সপক্ষে বক্তব্য প্রদানের মাধ্যমেই তাঁর কার্যক্রম সীমাবদ্ধ ছিল। নারীশিক্ষা বাস্তবায়নে তিনি কোনো প্রাতিষ্ঠানিক বা সাংগঠনিক উদ্যোগ গ্রহণ করেননি।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে নারীশিক্ষার ব্যাপারে বাঙালি মুসলিম সমাজের মনোভাব কিছুটা পরিবর্তন হলেও এ সময়কালে বাঙালি মুসলিম নারীদের শিক্ষার অগ্রগতি মোটেই সন্তোষজনক ছিল না। *বামাবোধিনী* পত্রিকায় ১৮৭১-৭২ সালে শিক্ষা বিভাগের একটি রিপোর্ট উল্লেখ করে বলা হয় যে, এ সময় কলকাতার ১১০টি

---

১২. উদ্ধৃতি, রওশন আরা বেগম, *নবাব ফয়জুন্নেছা ও পূর্ববঙ্গের মুসলিম সমাজ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ৩৪-৩৫

১৩. সোনিয়া নিশাত আমিন, *বাঙালি মুসলিম নারীর আধুনিকায়*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৬

সরকারি এবং ১৪টি বেসরকারি বালিকা বিদ্যালয়ে সর্বমোট ছাত্রী সংখ্যা ছিল ৭৩২ জন এবং এদের মধ্যে মুসলিম ছাত্রী ছিল মাত্র ৫৮ জন।[১৪] একই পত্রিকা ১৮৮২ সালে লোকগণনা ভিত্তিতে কলকাতার নারীশিক্ষার অগ্রগতির চালচিত্র পর্যালোচনা করে সম্পাদকীয় নিবন্ধে লিখে, "স্ত্রী শিক্ষার সর্বাপেক্ষা উন্নতি পারসী সমাজে এবং সর্বাপেক্ষা দুর্গতি মুসলমানদের মধ্যে।"[১৫] *বামাবোধিনী*র সম্পাদকীয় নিবন্ধের প্রমাণ পাওয়া যায় ১৮৮২ সালে ঢাকার ইডেন বালিকা বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্রীদের পরিসংখ্যানে। এ বছর বিদ্যালয়টিতে অধ্যয়নরত ১৫৩ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে মাত্র ১জন মুসলিম ছাত্রী ছিলেন।[১৬] এ তথ্য সে সময়কার বাঙালি মুসলিম সমাজে নারীশিক্ষার চরম দৈন্য চিত্রের আরো প্রমাণ মিলবে নিম্নোক্ত সারণিটিতে[১৭]:

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	মোট ছাত্রী সংখ্যা	মুসলিম ছাত্রী সংখ্যা	শতকরা হার
উচ্চ ইংরেজি বালিকা বিদ্যালয়	১৮৪	-	-
মাধ্যমিক ইংরেজি বালিকা বিদ্যালয়	৩৪০	৪	১.১
দেশীয় মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়	৫২৭	৬	১.১৩
দেশীয় প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়	১৭, ৪৫২	১,৫৭০	৮.৯
শিক্ষয়িত্রী প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়	৪১	-	-

উপরের সারণীতে দেখা যায় যে, উনিশ শতকের শেষার্ধেও বাংলার মুসলিম সমাজে নারীশিক্ষার অগ্রগতি মোটেই সন্তোষজনক ছিল না। নারীশিক্ষার প্রসার যেটুকু হয়েছিল সেটুকুও প্রাথমিক শিক্ষার স্তরেই সীমাবদ্ধ ছিল।

৫. ১. গঃ মুসলিম সমাজে নারীশিক্ষার প্রসারঃ ব্যক্তি ও সাংগঠনিক উদ্যোগ

পূনশ্চ উল্লেখ্য যে, উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলার মুসলিম সমাজে নবজাগরণ শুরু হয়েছিল। নবজাগরণের এ পর্যায়ে বাংলার মুসলমান শিক্ষিত সমাজের নেতৃবৃন্দ প্রধানত পুরুষদের সমস্যাবলি নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন। এ নেতাদের কেউ কেউ নারী সমাজের উন্নতি বিশেষ করে তাদের শিক্ষার সপক্ষে কথা বললেও তার বাস্তব রূপ দেবার কোন পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে আসেনি। তাই এ সময়ে নারীশিক্ষার দৃশ্যমান কোনো অগ্রগতি হয়নি।

১৪. *বামাবোধিনী পত্রিকা*, ১২০ সংখ্যা, আগস্ট ১৮৭৩, পৃ. ১৪৩
১৫. ঐ, ২০৪ সংখ্যা, জানুয়ারি ১৮৮২, পৃ. ২৬২
১৬. তাহ্‌মিনা আলম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬২
১৭. Report of the Indian Education Commission 1882, Calcutta, 1883, Chapter X, p. 490; M. Azizul Haque, *History and Problems of Moslem Education in Bengal*, Calcutta, 1917, p. 20

এরূপ বাস্তবতায় বাঙালি মুসলিম নারীদের শিক্ষা প্রসারে নবাব ফয়জুন্নেছা[১৮] (মৃ. ১৯০৩ খ্রি.)সহ কয়েকজন মহিয়সী নারী এগিয়ে আসেন। সমকালে কয়েকটি সংগঠনও নারীশিক্ষার প্রসারে উদ্যোগী ভূমিকা পালন করে।

নবাব ফয়জুন্নেছা ছিলেন কুমিল্লার একজন জমিদার। তাঁর কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছিল না। এ মহিয়সী নারী পারিবারিক পরিবেশে গৃহশিক্ষকের তত্ত্বাবধানে বাড়িতেই শিক্ষালাভ করেছিলেন। গৃহশিক্ষক তাজউদ্দীনের নিকট তাঁর হাতে খড়ি হয়েছিল। *রূপজালাল* গ্রন্থে তিনি লিখেছেন, "আমি বাল্যাবস্থায় বয়স্যদিগের সহিত ক্রীড়া কৌতুকে নিমগ্ন থাকিয়াও যথাসময়ে শিক্ষক সান্নিধানে অধ্যয়নাধি সম্পন্ন করিতাম।"[১৯] তিনি আরবি, ফারসি ও উর্দুর পাশাপাশি বাংলা ও সংস্কৃত ভাষায়ও ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন। নবাব ফয়জুন্নেছা ছিলেন নারী শিক্ষার প্রবর্তক, সমাজসেবক এবং কবি ও সাহিত্যসেবী।[২০] তিনি নারীদের মধ্যে প্রথম 'নবাব' খেতাব প্রাপ্ত হয়েছিলেন। বিদুষী ফয়জুন্নেছা উপলব্ধি করেছিলেন যে, পশ্চাৎপদ মুসলিম সমাজের উন্নতির প্রধান অবলম্বন হলো শিক্ষা। আর এ কারণে মুসলিম সমাজে শিক্ষার প্রসারে তিনি বিশেষ অবদান রাখেন। তবে লক্ষণীয় যে, নবাব আবদুল লতিফ, এবং স্যার সৈয়দ আহমদ খানের মতো তিনি কেবল পুরুষদের শিক্ষার কথাই চিন্তা করেননি, তিনি নারী-পুরুষ উভয়ের শিক্ষার গুরুত্ব সমভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। আর এ কারণেই তিনি নিজ জমিদারি এলাকায় ধর্মীয় শিক্ষা ও পুরুষদের জন্য শিক্ষা প্রসারের ব্যবস্থা করার পাশাপাশি নারীশিক্ষারও প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। শিক্ষানুরাগী নওয়াব ফয়জুন্নেছা তাঁর জমিদারি এলাকার চৌদ্দটি মৌজায় একটি করে প্রাথমিক বিদ্যালয়, মক্তব, পাঠশালা স্থাপন করেন। নারীশিক্ষার ব্যাপারে সমসাময়িক হিন্দু সমাজের চিন্তার সাথে তাঁর চিন্তার মিল পাওয়া যায়।

নবাব ফয়জুন্নেছার খ্যাতির অন্যতম কারণ ছিল নারীশিক্ষার প্রসারে বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা। যখন বাঙালি মুসলমান পুরুষদের শিক্ষার উন্নয়নের জন্য মুসলিম নেতৃবর্গ নিজেদের জীবন উৎসর্গ করছেন, সে সময়ে ফয়জুন্নেছা শুধু নারী শিক্ষার কথা ভাবেননি তাদের জন্য স্বতন্ত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের মাধ্যমে এক দুঃসাহসী ভূমিকাও পালন করেছেন। কুমিল্লা শহরে তিনি ১৮৭৩ সালে মেয়েদের জন্য দুটি প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। এর একটি ছিল কুমিল্লার নানুয়া দিঘির পশ্চিমপাড়ে এবং অন্যটি কান্দিরপাড়ে। নানুয়া

---

১৮. নবাব ফয়জুন্নেছা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যের জন্য দ্রষ্টব্য রওশন আরা বেগম, *নবাব ফয়জুন্নেছা ও পূর্ববঙ্গের মুসলিম সমাজ*, ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ১৯৯৩

১৯. ফয়জুন্নেছা চৌধুরানী, 'রূপজালাল', আবদুল কুদ্দুস সম্পাদিত, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ. ৬

২০. তিনি গদ্যে-পদ্যে রচনা করেছিলেন তাঁর *রূপজালাল* (১৮৭৬ খ্রি.) গ্রন্থটি। রূপকের আশ্রয়ে এটি ছিল তাঁর একটি আত্মজীবনীমূলক রচনা। এছাড়া *সঙ্গীতসার* ও *সঙ্গীতলহরী* নামে তাঁর দুখানি কাব্য গ্রন্থের কথাও জানা জানা যায়। উল্লেখ্য যে, নবাব ফয়জুন্নেছা এমন এক সময়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা করেন যখন অভিজাত মুসলমানদের মধ্যে এই ভাষা সাধারণত ব্যবহৃত হতো না। নবাব ফয়জুন্নেছা সংবাদপত্র ও সাময়িকীরও পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। *বান্ধব, ঢাকা প্রকাশ, মুসলমান বন্ধু, সুধাকর, ইসলাম প্রচারক* প্রভৃতি বাংলা পত্রপত্রিকা তাঁর আর্থিক সহায়তা লাভ করেছিল। জ্ঞানপিপাসু নবাব ফয়জুন্নেছা তাঁর নিজ বাড়িতে অতি যত্নে ও সাধনায় গড়ে তুলেছিলেন 'ফয়জুন পুস্তকালয়'।

দিঘির পাড়ের স্কুলটি বর্তমানে শৈলরাণী উচ্চবালিকা বিদ্যালয়ের প্রাথমিক বিভাগ হিসেবে পরিচালিত হচ্ছে।[২১] কুমিল্লার কান্দিরপাড়ে ফয়জুন্নেছা কর্তৃক স্থাপিত অন্য বালিকা বিদ্যালয়টি পরবর্তীতে 'ফয়জুন্নেছা উচ্চ ইংরেজি বালিকা বিদ্যালয়' নামে বিদ্যমান থাকে। ১৮৮৯ সালে নবাব খেতাব প্রাপ্তির পর উৎসাহিত হয়ে এটিকে তিনি জুনিয়র উচ্চবিদ্যালয়-এ উত্তীর্ণ করেন (অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত)। ফয়জুন্নেছার মৃত্যুর অনেক পরে আনুমানিক ১৯৩১ সালে স্কুলটি উচ্চবিদ্যালয়ে পরিণত হয়। দীর্ঘদিন যাবৎ 'ফয়জুন্নেছা উচ্চ ইংরেজি বালিকা বিদ্যালয়' হিসেবে কুমিল্লায় বুকে বিদ্যমান ছিল। পরবর্তীকালে সরকারিকরণের মাধ্যমে বিদ্যালয়টির নামকরণ করা হয় ফয়জুন্নেছা সরকারি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়। 'নবাব ফয়জুন্নেছা মেমোরিয়াল ট্রাস্ট' এবং বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা ও অন্যান্যদের প্রচেষ্টায় সরকারের অনুমতিক্রমে কয়েক বছর আগে স্কুলটির নামের সাথে 'নবাব' শব্দটি সংযুক্ত হয়ে এর নামকরণ করা হয়েছে 'নবাব ফয়জুন্নেছা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়।'[২২]

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, উপর্যুক্ত বালিকা বিদ্যালয়টি নবাব ফয়জুন্নেছার এক অনন্য কীর্তি। তিনি যে প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন, তাঁর জীবদ্দশাতেই সেটিকে জুনিয়র হাইস্কুলে উন্নীত করা হয়েছিল। তাছাড়া এটি ছিল 'ভার্নাকুলার' স্কুল। তিনি সমাজের নিম্নস্তরের বাংলা ভাষাভাষীদের প্রতি লক্ষ্য রেখেই স্কুলটি করেছিলেন বলে অনুমিত হয়। নবাব ফয়জুন্নেছার এ স্কুলটির সাথে ছাত্রীদের আবাসন ব্যবস্থা এবং ছাত্রীদের মাসিক বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থাও ছিল। ১৮৮০-৮১ সালের সরকারি শিক্ষা প্রতিবেদনে এ স্কুলটি বেসরকারি পর্যায়ে 'the best girls school' (ইডেন স্কুল ব্যতীত) বলে প্রশংসিত হয়েছিল। উল্লেখ্য যে, ১৮৭৩ সালে কুমিল্লায় ফয়জুন্নেছা বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের ৩৮ বছর পরে অর্থাৎ ১৯১১ সালে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন কলকাতায় 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল প্রাথমিক স্কুল' স্থাপন করেন।

উল্লেখ্য যে, মুসলিম মেয়েদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত ফয়জুন্নেছা বালিকা বিদ্যালয়ে প্রথম অবস্থায় কতজন মুসলিম মেয়ে পড়ালেখার জন্য ভর্তি হয়েছিল, তার সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। ধারণা করা হয় যে, বিশ শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত হিন্দু এবং ব্রাহ্ম পরিবারের মেয়েরাই স্কুলটিতে অধিক সংখ্যায় পড়াশুনা করতেন। সমকালীন সরকারি এক প্রতিবেদনে দেখা যায় ১৮৭৭-৭৮ সালে ত্রিপুরা জেলায় ছয়জন ছাত্রী প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় এবং তাদের মধ্যে একজন ছিল মুসলমান কৃষক পরিবারের সন্তান। ধারণা করা হয় যে, এ ছাত্রীটি উক্ত ফয়জুন্নেছা বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী ছিল।

২১. তথ্যসূত্র থেকে জানা যায় যে, ১৯৩১ সালে কুমিল্লার ধনাঢ্য ও প্রভাবশালী আয়কর আইনজীবী অত্যন্ত গোপনে সরকারকে মাত্র দশ হাজার টাকা প্রদানের বিনিময়ে স্কুলটির নাম তাঁর স্ত্রী শৈলরাণী দেবী নামকরণ করেন। এ বিষয়ে দ্রষ্টব্য, রওশন আরা বেগম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৮

২২. রওশন আরা বেগম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৯

নারীশিক্ষার জন্য নবাব ফয়জুন্নেছার প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগটি নিঃসন্দেহে একটি দুঃসাহসিক কাজ ছিল। যে যুগে বাঙালি মুসলিম সমাজের ছেলেরাই শিক্ষা গ্রহণে অনেক পশ্চাৎপদ ছিল, সে সময় নবাব ফয়জুন্নেছা রক্ষণশীল মুসলিম সমাজপতিদের ভ্রুকুটি উপেক্ষা করে বালিকা বিদ্যালয়ই শুধু প্রতিষ্ঠা করেননি, শিক্ষার্থীদের আবাসনের জন্য হোস্টেল নির্মাণ, তাদের বৃত্তি প্রদানের মতো মহতী উদ্যোগও নিয়েছিলেন। এ কারণেই অনেকে তাঁকে উনিশ শতকে বাঙালি মুসলিম সমাজে নারীশিক্ষার অগ্রণী বলে বিবেচনা করেন। ফয়জুন্নেছার জীবনী রচয়িতা আবদুল কুদ্দুসের ভাষ্যটি এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। তিনি লিখেছেন,

> নওয়াব আব্দুল লতিফ আর সৈয়দ আহম্মদ যখন ভেবেছেন তরুণ মুসলমান ছাত্রদের পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষার কথা, তখনই ফয়জুন্নেসা মেয়েদের ইংরেজী শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন। একই বছর ১৮৭৩ সালে কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে মুসলমান ছেলেদের উচ্চশিক্ষার পথও উন্মুক্ত হয়। ফয়জুন্নেসার লক্ষ্য ছেলে ও মেয়েদের সমভাবে শিক্ষাদান। জাগরণের অগ্রদূত নামে অভিহিত প্রাগুক্ত দুই নেতার চেয়ে ফয়জুন্নেছার দূরদৃষ্টি ছিল অধিক প্রসারী। যুগ ও গতির সঙ্গে চলার পথের দিশারিনী ছিলেন তিনি।[২৩]

এ প্রসঙ্গে মনিরুজ্জামানের বক্তব্য নিম্নরূপ:

> ফয়জুন্নেসার আন্তরিকতা ও চেষ্টাটি ছিল সমকালীন নারীশিক্ষার ইতিহাসে এক আশ্চর্যকর ও অনন্য ঘটনা। শুধু বাংলাদেশেই নয়, সম্ভবত তৎকালীন সমগ্র ইউরোপ মহাদেশেই নারীশিক্ষা ও নারীজাগরণের ইতিহাসে তা ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। কোন প্রকার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য বা সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলনের প্রবাহের সাথে যুক্ত না থেকেও ব্যক্তিগত প্রয়াসেই তিনি যা করে গেছেন তা তুলনারহিত। বেগম রোকেয়ার বহু পূর্বেই তিনি নিজেকে এভাবে উৎসর্গীত করেছিলেন; এ জন্য কোনও সম্মুখ আদর্শের অপেক্ষা তাঁর ছিল না।[২৪]

নারীশিক্ষা ও জাগরণে নবাব ফয়জুন্নেছার প্রচেষ্টা নিষ্কণ্টক ছিল না। ধর্মীয় রক্ষণশীল ফতোয়া প্রপীড়িত মুসলিম সমাজে তাঁকে তাঁর এ কাজের জন্য প্রচণ্ড বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছে। তবে তিনি এতে পিছপা হননি, বা অবদমিত হয়ে লক্ষ্যচ্যুত হননি। বস্তুত, নবাব ফয়জুন্নেছা নিজে যে জ্ঞানের আলো এবং মুক্তির স্বাদ পেয়েছিলেন, তা সমকালে নারী সমাজে ছড়িয়ে দিতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। তাঁর এই স্বতোৎসারিত চিন্তাশক্তি লেখনীর মাধ্যমে কিংবা অন্য কোনোভাবে আন্দোলনের আকার দিতে পারেনি বটে, সম্ভবত তাঁর এরূপ চেষ্টাও ছিল না। তবে বাঙালি মুসলিম নারী জাগরণ বা নারীশিক্ষার ইতিহাসে ফয়জুন্নেছার কাজের গুরুত্ব কোনোভাবেই উপেক্ষা করার অবকাশ নেই।

শাহানারা হোসেন 'বামাবোধিনী পত্রিকা' অবলম্বনে রচিত তাঁর একটি প্রবন্ধে উনিশ শতকের শেষ প্রান্তে বাংলার মুসলিম নারীশিক্ষা সম্পর্কে কিছু তথ্য উপস্থাপন করেছেন। এ প্রবন্ধটি থেকে তাহেরুন্নেছা নামক

২৩, মোহাম্মদ আবুদল কুদ্দুস, *ফয়জুন্নেসা চৌধুরাণী*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৪, পৃ. চৌদ্দ

২৪. মনিরুজ্জামান, *ফয়জুন্নেসা চৌধুরাণী*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৪, পৃ. ১৪

এক বাঙালি মুসলিম মহিয়সী নারীর কথা জানা যায়। তিনি বোদা বালিকা বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণির ছাত্রী ছিলেন। ১৮৬৫ সালে তিনি বামাবোধিনী পত্রিকায় মুসলিম নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব দিয়ে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। এটি ছিল *বামাবোধিনী* পত্রিকায় লেখা বাঙালি মুসলিম নারীর এ বিষয়ে প্রথম রচনা। তিনি নারী শিক্ষার উপর জোর দিয়ে বলেন,"যদি এই ধরাধামে প্রকৃতই সুখধাম দেখিতে ইচ্ছা থাকে তবে অগ্রে আপনাদের স্ত্রীগণকে বিদ্যায় ভূষিত করিতে চেষ্টা করুন।"[২৫]

করিমুন্নেছা খানম (১৮৫৫-১৯২৬ খ্রি.) ছিলেন রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের বড় বোন এবং টাঙ্গাইলের জমিদার পরিবারের পত্নী। তিনি একজন স্বভাব কবি ছিলেন। করিমুন্নেছা কাব্যচর্চা করতেন। তাঁর রচিত কিছু কবিতা সাবের বংশের জনৈকা 'কন্যা' নামে পত্রিকায় ছাপা হয়েছিলো। বাংলা ছাড়াও তিনি আরবি, ইংরেজি এবং ফারসি ভাষা জানতেন। ছোট বোন রোকেয়াসহ নিজের পরিবারের নারীদের শিক্ষার উন্নতি বিধানে এ মহিয়সী নারী বিশেষ অবদান রেখে গেছেন। রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন লেখাপড়া এবং সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে তাঁর বড় বোনের অবদানের কথা উল্লেখ করে লিখেছেন:

> তিনি জ্ঞান লাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষার প্রোজ্জ্বলিত শিখা অন্তরে ঢাকিয়া রাখিয়া নীরবে দগ্ধ হইয়াছে। তিনি নিজের শিক্ষালাভের জন্য কষ্ট সহিয়াছেন, পুত্রদ্বয়কে উচ্চশিক্ষা দিবার জন্যে লাঞ্ছনা সহিয়াছেন। শেষে আমাকে দু-হরফ বাঙ্গালা পড়াইবার জন্যও নিন্দা ও ভ্রূকুটি সহিয়াছেন। ধন্য সমাজ। তবু তিনি পশ্চাৎপদ হন নাই। আমাকে সাহিত্য চর্চায় তিনিই উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন। বলিতে কি, তিনি উৎসাহ না দিলে এবং আমার শ্রদ্ধেয় স্বামী অনুকূল না হইলে আমি কখনই প্রকাশ্য সংবাদপত্রে লিখিতে সাহসী হইতাম না।[২৬]

করিমুন্নেছা খানমের অর্থানুকূল্যে টাঙ্গাইল থেকে আব্দুল হামিদ খান ইউসুফজয়ীর সম্পাদনায় 'আহমদী' (১৮৮৬ খ্রি.) পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল। পরে এটির নাম হয় 'আহমদী ও নবরত্ন' (১৮৮৯ খ্রি.)। নারীশিক্ষা বিস্তারে করিমুন্নেছা খানম নবাব ফয়জুন্নেছার মতো দৃশ্যমান অবদান রাখতে পারেননি, তবে রোকেয়ার মতো নারীর জ্ঞানালোক জগতের বিস্তারে তাঁর যে অবদান সেটি বিবেচনায় নিলে বাংলার মুসলিম নারীশিক্ষার প্রসারে তাঁর ভূমিকাকে খাটো করে দেখার কোনো অবকাশ নেই।

আলোচ্য সময়ে ব্যক্তিগত উদ্যোগের বাইরে সাংগঠনিক পর্যায়েও বাঙালি মুসলিম নারীসমাজে শিক্ষার প্রসারে কাজ করা হয়। এসব সংগঠনের মধ্যে প্রথমে যে সংগঠনটির নামোল্লেখযোগ্য সেটি হলো 'ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী'। এ প্রসঙ্গে ওয়াকিল আহমদ লিখেছেন,

---

২৫. গোলাম মুরশিদ, "প্রথম মুসলমান গদ্য লেখিকা: বিবি তাহেরুন্নেছা", *বাংলা একাডেমি পত্রিকা*, ২য় সংখ্যা শ্রাবণ- আশ্বিন, সংবিংশ বর্ষ, ১৩৮৯, পৃ. ৭১-৭৬

২৬. রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন, "লুকানো রতন", *রোকেয়া রচনাবলী*, উদ্ধৃত, মাসুমা খানম, *নজরুল চেতনায় নারী ও নারীত্ব*,

মুসলমান নারীশিক্ষার অগ্রদূত নবাব ফয়জুন্নেছা চৌধুরাণী ১৮৭৩ সালে কুমিল্লা বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন, ঐ সময় কলিকাতাতেও মুসলমানদের স্বতন্ত্র বালিকা বিদ্যালয় ছিল না। মুসলমান মেয়েদের ব্যাপারে ফয়জুন্নেছার পরেই ঢাকার মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনীর স্থান।[২৭]

'ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী' ছিল মুসলমানদের একটি সংস্কারবাদী সংগঠন। সংগঠনটি ১৮৮৩ সালে ঢাকা কলেজের মুসলিম ছাত্রদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন হিম্মত আলী এবং প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক আবদুল আজিজ। উদার ও প্রগতিমনস্ক শিক্ষার্থী ফজলুল করিম, ফজলুর রহিম, আবদুল মজিদ প্রমুখ সংগঠনটি ভাষাভেদে 'আঞ্জুমান-ই-আহবাব-ই-ইসলামিয়া' এবং 'Dacca Muhammadan Friends Union' নামেও পরিচিত ছিল।[২৮] সংগঠনটির প্রতিষ্ঠাতাগণ সকলেই ছিলেন ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসার তৎকালীন সুপারিন্টেন্ড ওবায়দুল্লাহ আল ওবায়দী সোহরাওয়ার্দী[২৯] (১৮৩২-১৮৮৫ খ্রি.)-এর অনুসারী। সুহৃদ সম্মিলনীর প্রধান লক্ষ্য ছিল বঙ্গীয় মুসলমানদের সর্ব প্রকার উন্নতি সাধন করা। পতনোন্মুখ মুসলিম সমাজকে পুনর্জাগরণের পথে এগিয়ে নেয়ার মহান ব্রত নিয়ে এই স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনটি যাত্রা শুরু করেছিল। তবে সমিতির প্রথম কার্যবিবরণী থেকে জানা যায় যে, এর কার্যাবলির মধ্যে মূখ্য ছিল নারী শিক্ষার প্রসার। এই প্রসঙ্গে বলা হয় "বঙ্গদেশবাসী মুসলমানগণের হিত সাধান করাই এই সভার মুখ্যোদ্দেশ্য। আপাততঃ এই সভা এদেশীয় মুসলমান সম্প্রদায়ে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার করিতে যত্নবতী হইবেন।"[৩০] সমিতি কেন নারীশিক্ষাকে তাদের অন্যতম প্রধান কর্মসূচি হিসেবে গ্রহণ করেছিল এ বিষয়ে বলা হয়, "প্রধানত শিক্ষা-বিস্তার এবং তদ্বারা সমাজ-উন্নয়ন সম্মিলনীর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। পুরুষদের শিক্ষা গ্রহণে বাধা ছিল না, কিন্তু নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে মুসলমান সমাজে ঘোরতর অবজ্ঞার ভাব রয়েছে। ভদ্র পরিবারের মেয়েদের সামান্য গৃহশিক্ষা ছাড়া অন্য শিক্ষা ছিল না।"[৩১]

সমকালীন সমাজ বাস্তবতায় পর্দাপ্রথার কঠোরতার কারণে বিদ্যালয়ের মাধ্যমে মেয়েদের শিক্ষাদান অসম্ভব ভেবে এ সম্মিলনী জেনানা (অন্তঃপুর) বা গৃহশিক্ষাকে অবলম্বন করে ছাত্রীদের গৃহশিক্ষক দ্বারা নিজেদের বাড়িতে পড়ানো এবং বার্ষিক পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করে। ১৮৬৫ সালে *বামাবোধিনী* পত্রিকার এক তথ্য

---

২৭. ওয়াকিল আহমদ, 'বাংলার বিদ্বৎসভাঃ ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী', *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা*, ৭ম সংখ্যা, ১৯৭৮, পৃ. ১২৪-১২৫

২৮. https://bn.banglapedia.org/index.php/ _ _ _
Retrieved 15.10.2022

২৯. ওবায়দুল্লাহ আল ওবায়দী সোহরাওয়ার্দী ছিলেন একজন শিক্ষাবিদ ও লেখক। ধর্মীয় শিক্ষিত হলেও তিনি ছিলেন একজন অসাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন, যুক্তিবাদী, উদারপন্থি শিক্ষাবিদ ও সমাজসংস্কারক। তিনি আবদুল লতিফ ও সৈয়দ আহমদ খানের চিন্তাধারার অনুসারী ছিলেন। ওবায়দুল্লাহ আল ওবায়দী উর্দু, আরবি, ফারসি ও ইংরেজি ভাষায় একাধিক মৌলিক ও অনুবাদ গ্রন্থের প্রণেতা। জ্ঞান, শিক্ষা ও সমাজসংস্কারে তাঁর অবদানের জন্য ভারত সরকার তাঁকে 'বাহার-উল-উলম' (বিদ্যাসাগর) উপাধিতে ভূষিত করেছিল।

৩০. ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনীর প্রথম বার্ষিক কার্যবিবরণী, ১৮৮৩, ঢাকা ১৮৮৪, পৃ. ৫-৬

৩১. ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী, ১৮৮৬-৮৭ সালে অনুষ্ঠানপত্র, ঢাকা, ১৮৮৭, পৃ. ১-২

থেকে জানা যায় যে, সে সময় বাঙালি মুসলমানগণ তাদের মেয়েদের স্কুলে পড়তে দিতে আগ্রহী ছিলেন না।[৩২] কাজেই সুহৃদ সম্মিলনী প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় না গিয়ে ১ম থেকে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন করে 'উন্মুক্ত বিদ্যালয়' পদ্ধতিতে বাংলা ও উর্দুতে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করে। সম্মিলনী কর্তৃক শিক্ষার্থীদের জন্য শ্রেণিভিত্তিক পাঠ্যসূচি ও পুস্তক নির্ধারিত ছিল। ছাত্রীরা নির্ধারিত পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তক[৩৩] পাঠ করে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিতেন এবং এরপর সম্মিলনীর পরীক্ষক বাড়িতে গিয়ে অভিভাবকদের সহায়তায় পরীক্ষা গ্রহণ করতেন। বস্তুত এটি কোনো বিদ্যালয়ের সাথে যুক্ত না হয়ে স্বাধীন ও স্বয়ংসম্পূর্ণ শিক্ষাপদ্ধতি ছিল।

প্রতিষ্ঠার বছর থেকে সুহৃদ সম্মিলনী নিয়মিত মাসিক ও বার্ষিক সভার আয়োজন করে এবং বার্ষিক সভার কার্যবিবরণীও প্রকাশ করে। সমিতির একটি বার্ষিক কার্যবিবরণী থেকে এর পরীক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে জানা যায়:

> বংগবাসী যে কোন মহিলা নির্বাচিত পুস্তকের পরীক্ষা নিয়মিত দিতে ইচ্ছা করেন তিনিই পরীক্ষা দিতে পারিবেন। মহিলাগণ আপন আপন অন্তঃপুরে থাকিয়া স্ব স্ব অভিভাবকের তত্ত্বাবধানে পরীক্ষা দিতে পারিবেন। মৌখিক পরীক্ষক অভিভাবকের সম্মতিক্রমে সম্মিলনী কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন।[৩৪]

এ সময় মুসলমান সমাজে গ্রহণযোগ্য বাংলা পাঠ্যপুস্তকের অভাব ছিল। সুহৃদ সম্মিলনী এ বিষয়ে উদ্যোগ নেয়। মৌলবী মোহাম্মদ রেয়াজউদ্দীন আহমদকে[৩৫] দিয়ে সম্মিলনী *তোহফাতুল মোসলেমিন* নামে একটি গ্রন্থ রচনা করায়। সম্মিলনীর পক্ষ থেকে পুস্তকটির আংশিক প্রকাশনা ব্যয়ও বহন করা হয়েছিল।[৩৬] সুহৃদ সম্মিলনীর মাসিক সভার ব্যবস্থা ছিল। প্রথম বছর চারটি মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং চতুর্থ সভায় 'স্ত্রী শিক্ষার আবশ্যকতা' বিষয়ে বরিশালের মনোরঞ্জন গুহ একটি বক্তৃতা করেছিলেন।

ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনীর শিক্ষাদান পদ্ধতি সম্পর্কে ওয়াকিল আহমদ লিখেছেন:

> সম্মিলনীর গৃহীত শিক্ষা পদ্ধতিটি ছিল অভিনব-অশিক্ষার মরুভূমিতে সামান্য বারি সিঞ্চনের প্রয়াস মাত্র। ১ম শ্রেণী থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ্য তালিকা নির্বাচন করে তদনুসারে মেয়েদের পরীক্ষা নেয়ার ব্যবস্থা হয়। বাংলা ও উর্দু উভয় ভাষায় পরীক্ষা নেয়া হতো। প্রথম বছর ঢাকা, বরিশাল, নোয়াখালী, ময়মনসিংহ ও কলিকাতা

---

৩২. *বামাবোধিনী* পত্রিকা, ২৫ সংখ্যা, সেপ্টেম্বর, ১৮৬৫, পৃ. ৮৬

৩৩ সম্মিলনীর নির্ধারিত পাঠ্যপুস্তকের অন্যতম ছিল।

৩৪. মোহাম্মদ আবদুল কাইউম, "ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী", *মাহে নও*, ১৩৭৪ উদ্ধৃতি, ওয়াকিল আহমদ, *উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানের চিন্তা ও চেতনারধারা*, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৭, পৃ. ১৫১

৩৫. মৌলবী মোহাম্মদ রেয়াজউদ্দীন আহমদ (১৮৬১-১৯৩৩ খ্রি.) একজন প্রখ্যাত সাংবাদিক এবং সাহিত্যিক ছিলেন। তিনি মাসিক *ইসলাম প্রচারক* পত্রিকার প্রকাশক ও সম্পাদক ছিলেন। এছাড়াও তিনি *ছোলতান*, *নবযুগ*, *রায়তবন্ধু* এবং *মিহির ও সুধাকর* পত্রিকা সম্পাদনা করেছিলেন। তিনি নারীশিক্ষারও একজন সমর্থক ছিলেন।

৩৬. মোহাম্মদ ইদরিস আলী, 'মুন্সী রেয়াজুদ্দীন আহমদ' বাংলা একাডেমী পত্রিকা, বৈশাখ শ্রাবণ, ১৩৬৫, ওয়াকিল আহমদ, *উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানের চিন্তা ও চেতনারধারা*, পৃ. ১৫১-১৫২

থেকে মোট ৩৭ জন বালিকা পরীক্ষা দেয়। তাতে বাংলায় ২৩ জনে ২২, এবং উর্দুতে ১৪ জনে ১২ জন উত্তীর্ণ হয়।[৩৭]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, সম্মিলনীর কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য হেমায়েত উদ্দীনের স্ত্রী হাসিনা খাতুন এবং সাধারণ সম্পাদক আবদুল আজিজের স্ত্রী রাবেয়া খাতুন সম্মিলনী আয়োজিত পরীক্ষায় অংশ নিয়ে ৪র্থ শ্রেণি থেকে ৫ম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন।[৩৮] প্রথমে পরীক্ষকগণ উর্দু ও বাংলা এ দু'ভাষায় পরীক্ষা নেয়ার ব্যবস্থা করেন। কয়েক বছর পর উর্দু-বাংলা শিক্ষার মিশ্রিত বিভাগের মাধ্যমেও পরীক্ষা গ্রহণ শুরু হয় এবং ষষ্ঠ শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার স্তর বৃদ্ধি করা হয়।[৩৯] সম্মিলনী পরিচালিত পরীক্ষার তত্ত্বাবধায়ক ও পরীক্ষক হিসেবে মৌলবি আবদুল করিম (কলকাতা), এমদাদ আলী (কলকাতা) নওয়াজেস আলী (ময়মনসিংহ) ফয়েজউদ্দীন (বরিশাল) সহ আরো কয়েকজন দায়িত্ব পালন করেন। পরীক্ষায় উত্তীর্ণদেরকে সম্মিলনীর পক্ষ থেকে সার্টিফিকেট ও পুরস্কার প্রদান করা হতো।[৪০] ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনীর অন্তঃপুর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ মুসলিম নারীশিক্ষার্থীদের নাম পাওয়া যায় বিনয়ভূষণ রায় এর *অন্তঃপর স্ত্রীশিক্ষা* গ্রন্থে।[৪১]

ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনীর কার্যক্রম ছিল সাময়িক এবং সীমিত আকারের। সম্মিলনীর কাজ প্রায় এক দশক চলেছিল বলে প্রতীয়মান হয়। এরপর এর কার্যক্রমে ভাটা পড়ে। সম্মিলনীর নেতৃত্বও ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে শহরে বিদ্বৎসমাজের হাতে স্থানান্তরিত হয়। ১৯০৪ সালের ২৫ জানুয়ারি *মোসলেম ক্রনিকেল* পত্রিকায় প্রকাশিত একটি পত্র থেকে জানা যায়, বলিয়াদির জমিদার কাজেমুদ্দীন আহমদ সিদ্দিকীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সুহৃদ সম্মিলনীর এক সভায় ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। এরপর এই সংগঠনের কোনো অস্তিত্ব আর খুঁজে পাওয়া যায় না। সম্ভবত ১৯০৫ সালের ১৬ ডিসেম্বর বঙ্গভঙ্গের দিন ঢাকায় 'মহামেডান প্রভিন্সিয়াল ইউনিয়ন' স্থাপিত হলে ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী বিলুপ্ত হয়ে যায়। দীর্ঘদিন টিকে না থাকলেও মুসলিম নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে সুহৃদ সম্মিলনীর প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় উদ্যোগ ছিল। নওশের আলী খাঁ ইউসুফজী (১৮৬৪-১৯২৪ খ্রি.) ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনীর কার্যক্রমের বিশেষ প্রশংসা করেছেন। উল্লেখ্য যে, নওশের আলী খাঁ এক বিশিষ্ট লেখক ও সমাজহিতৈষী

---

৩৭. ওয়াকিল আহমদ, 'বাংলার বিদ্বৎসভা: ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী', পৃ. ১২৬-১২৭

৩৮. সোনিয়া নিশাত আমীন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১২১

৩৯. ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনীর ১৮৮৬-৮৭ সালের অনুষ্ঠানপত্র, ঢাকা, ১৮৮৮, পৃ. ১৪-১৬

৪০. ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী, প্রথম বার্ষিক কার্যবিবরণী, ১৮৮৪, পৃ. ১১-১৮

৪১. ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী আয়োজিত বাংলা ও উর্দু বিভাগে যাঁরা সফলতার সঙ্গে উত্তীর্ণ হন, তাঁরা হলেন জেবুন্নেসা (কলকাতা), খয়রুন্নেসা (বরিশাল), হাফিজুন্নেসা (বরিশাল), আশরফুন্নেসা (কলকাতা), ফতেমা ওরফে কুলসুম (বরিশাল), নাজমুন্নেসা (কলকাতা), নূরজাহান বিবি (কলকাতা), কামরুন্নেসা (কলকাতা), বিবি হামিদুন (কলকাতা), অহিদুন্নেসা (কলকাতা), রাবেদুন্নেসা (বরিশাল), নাজমুন্নেসা (বরিশাল), আজিজুন্নেসা খাতুন (বরিশাল) জেরাজুন্নেসা (বরিশাল), জোবেদা খাতুন (বরিশাল), মালেকা খাতুন (ময়মনসিং), আরফজান (বরিশাল), সাথউন্নেসা (বরিশাল), গোলচেহারা (বরিশাল), জানাউন্নেসা (বরিশাল), সিদ্দিকা খাতুন (নোয়াখালি), নাজমুন্নেসা খাতুন (নোয়াখালি), রাবেয়া খাতুন (নোয়াখালি), নূরজাহান (ঢাকা), রোকেয়াতুন্নেসা (বরিশাল), আশরফুন্নেসা (ঢাকা), নুরুন্নেসা (ঢাকা), মাসুমা খাতুন (নোয়াখালি), নাজিবন (ঢাকা), সামসুন্নেসা প্রমুখ। দ্রষ্টব্য, বিনয়ভূষণ রায়, *অন্তঃপর স্ত্রীশিক্ষা*, নয়া উদ্যোগ, কলকাতা, পৃ. ৫৬-৫৭।

ছিলেন। তিনি নিজ জন্মস্থান টাঙ্গাইলের স্থানীয় ও কলকাতার সমাজ-শিক্ষামূলক বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পশ্চাৎপদ মুসলমান সমাজের উন্নয়ন ছিল তাঁর চিন্তার কেন্দ্রবিন্দু। তিনি নারীশিক্ষার একজন উদার সমর্থক ছিলেন। তাঁর রচিত অন্যতম গ্রন্থ হলো *বঙ্গীয় মুসলমান*। এ গ্রন্থটিতে তিনি নারীশিক্ষার সমর্থনে তাঁর অবস্থান তুলে ধরেছেন।[৪২] নওশের আলী খাঁন ইউসুফজী তাঁর পূর্বোক্ত গ্রন্থে ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনীর সাফল্যের কথা উল্লেখ করে লিখেন

> পূর্ববঙ্গের কেন্দ্রস্থল ঢাকা নগরীতে তত্রত্য শিক্ষিত মুসলমান যুবকগণ তাহাদের "মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী সভা" হইতে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহাদের চেষ্টায় ফল নিরতিশয় সন্তোষজনক হইয়াছে, বংগের নানা জেলার মুসলমান বালিকাগণ তাহাদের সভায় গৃহীত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেছে। সাধারণের সাহায্য পাইলে তাহারা সমাজের মহোপকার সাধন করিতে পারিবে।[৪৩]

ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী সম্পর্কে সোনিয়া নিশাত আমিন লিখেছেন:

> এই সংগঠনটি ছিল সনাতনী 'অন্দরমহল শিক্ষা' এবং 'আধুনিক প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার' মধ্যে সমঝোতাকারী মঞ্চ–এমন একটি সংগঠন– যেখানে উদ্যোক্তারা পুরাতন এবং নতুন পথের মাঝে দাঁড়াতে পারে। এখানেই এই ক্ষুদ্র অথচ ব্যতিক্রমী সংগঠনের বৈশিষ্ট্য লুকিয়ে ছিল।[৪৪]

মোতাহার হোসেন সুফী লিখেছেন:

> সুহৃদ সম্মিলনীর মাধ্যমে তারা স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা সম্পর্কে মতবাদ প্রচার করতে শুরু করেন। 'যে নিয়মে বিশ্ববিদ্যালয় সমস্ত দেশ জুড়িয়া স্কুল-কলেজে হাজার হাজার শিক্ষার্থীর শিক্ষা নিয়ন্ত্রণ করেন, ঠিক সেই নিয়ম ইহারা বাংলাদেশের বিভিন্ন অংশে মেয়েদের জন্য গৃহে গৃহে অন্তঃপুর শিক্ষা প্রচলন করিয়াছিলেন।'[৪৫]

ঢাকার মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনীর অনুরূপ 'শ্রীহট্ট সম্মিলনী' নামক আরেকটি সংগঠন বাঙালি নারীদের শিক্ষার প্রসারে অবদান রেখেছিল। শ্রীহট্ট সম্মিলনী ছিল একটি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান। স্বাধীনতা সংগ্রামী বিপিনচন্দ্র পাল (১৮৫৮-১৯৩২ খ্রি.), ডাঃ সুন্দরীমোহন দাস (১৮৫৭-১৯৫০ খ্রি.) ও তারাকিশোর চৌধুরী প্রমুখ কলকাতায় বসবাসকারী স্বনামধন্য কতিপয় সিলেটবাসী ১৮৭৬ সালে এ সংগঠনটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। নিরাজুল ইসলাম (১৮৪৮-১৯২৩ খ্রি.), আব্দুল করিম, মৌলবি আহমদ উল্লাহ সম্মিলনীর সভ্য ছিলেন। বাবু জয় গোবিন্দ সোম এ সংগঠনটির প্রেসিডেন্ট ছিলেন।[৪৬] কলকাতায় বসবাসকারী শ্রীহট্ট বা সিলেটের যুবকদের মধ্যে ঐক্য ও প্রীতির সম্পর্ক স্থাপন, সিলেটের ভাষা, সংস্কৃতিচর্চা এবং এর বৈশিষ্ট্য, স্বকীয়তা ও ঐতিহ্য রক্ষা

৪২. নওশের আলী খাঁ ইউসুফজয়ী, *বঙ্গীয় মুসলমান*, কলিকাতা, ১৩২১ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৪০-৪৩

৪৩. নওশের আলী খাঁ ইউসুফজয়ী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪২

৪৪. সোনিয়া নিশাত আমিন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১২১

৪৫. মোতাহার হোসেন সুফী, *বেগম রোকেয়া: জীবন ও সাহিত্য*, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ঢাকা, সুবর্ণ, ২০০৯, পৃ. ৫৩

৪৬. Bipin Candra Pal, *Memories of my Life and Time,* Calcutta, Modern Book Agency, 1932, উদ্ধৃত, ফারুক আহমেদ, 'সিলেটে নারীশিক্ষা', *দৈনিক প্রথম আলো*, ২২ মে , ২০২২

করাসহ শ্রীহট্টবাসীর সার্বিক কল্যাণ সাধন এ সংগঠনটি প্রতিষ্ঠার মূল লক্ষ্য ছিল। তবে শিক্ষার প্রসার বিশেষ করে নারী শিক্ষা প্রসারও এ সংগঠনটির অন্যতম লক্ষ্য ছিল।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের মতো সিলেটেও নারীশিক্ষার দ্বার, বিশেষ করে মুসলিম নারীদের মধ্যে বলতে গেলে অনেকটাই রুদ্ধ ছিল। নারীশিক্ষার এ অচলায়তন ভাঙার জন্য শ্রহিট্ট সম্মিলনী নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল। সংগঠনটির পক্ষ থেকে সরকারকে বুঝিয়ে জেলার বিভিন্ন এলাকায় বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের চেষ্টা করা হয়। একই সঙ্গে বেসরকারিভাবে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়গুলোকে শ্রীহট্ট সম্মিলনীর পক্ষ থেকে বার্ষিক সাহায্য দানেরও ব্যবস্থা করা হয়। এরপর নারীদের লেখাপড়ায় উৎসাহিত করার জন্য সংগঠনটির পক্ষ থেকে জেনানা বা অন্তঃপুর শিক্ষা ও পরীক্ষা গ্রহণেরও উদ্যোগ নেওয়া হয়। এ জন্য সম্মিলনীর পক্ষ থেকে সিলেটের বিভিন্ন স্থানে পরীক্ষাকেন্দ্রের ব্যবস্থা করা হয়। জানা যায় যে, সম্মিলনীর এসব প্রচেষ্টায় স্থানীয় শিক্ষানুরাগীদের পাশাপাশি সরকারি কর্মচারীরাও সাহায্য করতেন। নারীশিক্ষার প্রসারে শ্রীহট্ট সম্মিলনীর আন্তরিক প্রয়াসে সন্তোষ্ট হয়ে তৎকালীন আসাম সরকারের আদেশে ডেপুটি ইন্সপেক্টর অব স্কুলস'কে সম্মিলনীর আয়োজিত এসব পরীক্ষা তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব প্রদান করা হয়।[৪৭] সে সময়কার শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিদের সঙ্গে পরামর্শ করে সম্মিলনীর পাঠ্যতালিকাও প্রস্তুত করা হয়েছিল। দেশের বিশিষ্ট পণ্ডিতবর্গ যেমন– রিপন কলেজের অধ্যাপক বিপিনবিহারী গুপ্ত ও সতীনাথ তত্ত্বভূষণ, সিটি কলেজের অধ্যাপক ব্রজসুন্দর রায় প্রমুখ স্বেচ্ছায় সম্মিলনীর গৃহিত পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়ন করে দিতেন। মৌলভী মোহাম্মদ ওয়াসিল এবং স্কুল ইন্সপেক্টর মৌলভী গোলাম গফুরও সম্মিলনীর পরীক্ষা কার্যক্রমের সাথে যুক্ত ছিলেন। এমনকি আসামের চিফ কমিশনার স্যার চার্লস ইলিয়েটের স্ত্রী নিজে বালিকাদের হস্তশিল্প পরীক্ষার দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন। সম্মিলনী আয়োজিত পরীক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীদের লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা দিতে হতো। বাংলা অথবা উর্দু- যে কোনো ভাষায় পরীক্ষা দেওয়া যেতো।[৪৮]

শ্রীহট্ট সম্মিলনীর নারী শিক্ষা আন্দোলন শুধু সমাজের উচ্চস্তরের মেয়েদের মধ্যে নয়, বরং সাধারণ হিন্দু-সমাজের সর্বস্তরে বিস্তার লাভ করেছিল। সম্মিলনীর শিক্ষা কার্যক্রম বিশেষ করে জেনানা বা অন্তঃপুর শিক্ষা বাঙালি মুসলমান নারীদের ও অংশগ্রহণের প্রমাণ পাওয়া যায়। অন্তঃপুর শিক্ষা পরিচালনার ফলে চার বছরের বালিকা থেকে ৩৫ বছরের নারীদের ও সম্মিলনীর আয়োজিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ ছিল। এমনকি কোনো কোনো সময় ৫৫ বছর বয়সের নারীরাও এ পরীক্ষায় অংশ নিয়েছেন। এ সকল পরীক্ষায় যে সব বালিকা ও নারী কৃতিত্ব দেখাতেন, তাঁদের পদক, পুরস্কার ও প্রশংসাপত্র দেওয়া হতো। ১৮৮৯ সালে সম্মিলনীর সদস্য ও কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী মৌলভী সিরাজুল ইসলাম খান বাহাদুর মুসলিম

৪৭. ফারুক আহমেদ, *পূর্বোক্ত*

৪৮. আনোয়ার হোসেন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭৫

নারীদের শিক্ষাগ্রহণে উৎসাহিত করার জন্য ১০ টাকা মূল্যের পুরস্কার প্রদান করেন। হাতের কাজে বিশেষ দক্ষতা প্রদর্শন করে ঐ বছর ছুরতুন্নেসা নামক একজন নারী একটি বিশেষ সম্মাননা পুরস্কার লাভ করেছিলেন।[৪৯] সিলেট জেলার পাইলগাঁওয়ের জমিদার ও বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ব্রজেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী 'শ্রীহট্টের স্ত্রীশিক্ষার প্রারম্ভ' শীর্ষক একটি প্রবন্ধে লিখেছেন,

> শ্রীহট্ট সম্মিলনীর সঙ্গে আমার পরিচয় বাল্যে প্রায় ৪৫ বছর পূর্বে। তখনকার দিনে জেঠিমা, মা, খুড়িমা শ্রীহট্ট সম্মিলনীর পরীক্ষা দিতেন এবং হাতবাক্স ইত্যাদি পুরস্কার পাইতেন। তাঁদের পুরস্কারপ্রাপ্ত কাঠের একটি হাতবাক্স এখনো আমার কাছে আছে। জ্ঞাতি এক খুড়া মহাশয় পরীক্ষা নিতেন।[৫০]

১৯০০ সাল পর্যন্ত এভাবে শ্রীহট্ট সম্মিলনীর পরীক্ষায় অংশ নিয়ে পুরস্কার প্রাপ্ত বালিকা ও নারীদের সংখ্যা ছিল প্রায় ২ হাজার ৫০০ জন। তাদের মধ্যে অন্তত ১০০ জন ছিলেন মুসলমান নারী ও বালিকা।[৫১] পরে অবশ্য মুসলিম শিক্ষার্থীর সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পেয়েছিল।

উনিশ শতকে মুসলিম নারীদের মধ্যে শিক্ষার আলো বিস্তারে 'ত্রিপুরা অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষাসভা' বিশেষ ভূমিকা রেখেছিল বলে জানা যায়। এ সংগঠনটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছির ১২৭৮ বঙ্গাব্দে এবং নামকরণ থেকেই বুঝা যায় যে, অন্তঃপুর শিক্ষার মাধ্যমে নারীদের শিক্ষার ব্যবস্থা করাই ছিল সংগঠনটির মূল লক্ষ্য। এ সভার শিক্ষা কার্যক্রম হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সকল নারীর জন্যই উন্মুক্ত ছিল। জানা যায় যে, এ সভা কর্তৃক আয়োজিত পরীক্ষায় অংশ নিয়ে অনেক মুসলিম নারী উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। ১২৯০ বঙ্গাব্দে ত্রিপুরা অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষাসভা কর্তৃক আয়োজিত পরীক্ষায় ১১২ জন নারী অংশ নিয়ে ৯৮ জন পরীক্ষায় কৃতকার্য হয়েছিলেন। উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে ৮ জন ছিলেন মুসলিম নারী।[৫২]

উনিশ শতকের একেবারে শেষপ্রান্তে কলকাতায় বেসরকারি প্রয়াসে একটি মুসলিম বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এ বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠায় কিছুসংখ্যক নেতৃস্থানীয় মুসলমানের উদ্যোগ ছিল। উল্লেখ্য যে, ১৮৪৯ সালে বেথুন স্কুল প্রতিষ্ঠিত হলেও তখন পর্যন্ত এ স্কুলটি মুসলিম বালিকাদের পড়ার কোনো সুযোগ ছিল না। ১৮৯৬ সালে কলাকাতার প্রভাবশালী চিকিৎসক ডাঃ জাহিরুদ্দিন আহমদ তাঁর কন্যাকে বেথুন স্কুলে ভর্তির জন্য

---

৪৯. সুন্দরীমোহন দাস, *শ্রীহট্ট সম্মিলনীর জন্মকথা*, শ্রীহট্ট, ১৩৩৬; মায়া ভট্টাচার্য, "শতাব্দী পূর্বে মুসলিম অন্তঃপুরবাসীদের বিদ্যাচর্চা", *বাংলা একাডেমি পত্রিকা*, ঢাকা, ১৩৮৮, পৃ. ৬৫-৬৭

৫০. উদ্ধৃতি, ফারুক আহমেদ, *পূর্বোক্ত*

৫১. তথ্য সূত্রে জানা যায় যে, ১৮৮৩ সালে শ্রীহট্ট সম্মিলনী আয়োজিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ মুসলিম নারী শিক্ষার্থীরা ছিলেন: আচার বিবি, রামিজা বিবি, নাছিরা বিবি, সারিজা বিবি, আরিজা বিবি, জামিয়া বিবি, আমুজা বিবি, আচিরা বিবি এবং নাছা বিবি প্রমুখ। ১৮৮৪ সালে এ সম্মিলনী আয়োজিত পরীক্ষা উত্তীর্ণদের মধ্যে ছিলেন সৈয়দ জিন্নাতুন্নেসা বিবি, আমুজা বিবি, সৈয়দা ফৈজুন্নেসা, ফারামজান বিবি, খুদেজা বিবি, শুনাই বিবি, বিদিজা বিবি, নাফিজা বিবি, রজনবিবি প্রমুখ। দ্রষ্টব্য, বিনয়ভূষণ রায়, *পূর্বোক্ত*; আনোয়ার হোসেন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১০৩

৫২. কৃতকার্য মুসলিম নারী পরীক্ষার্থীদের মধ্যে ছিলেন সামসুন্নাহার, ফাতেমা খাতুন, বলকিস বানু, এবং গোলাপজান বানু এবং এরা চতুর্থ শ্রেণির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। পঞ্চম শ্রেণির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন আলতা বানু এবং সহর বানু, ইয়ার বানু ও রাহাতারান্নেসা পাশ করেছিলেন ষষ্ঠ শ্রেণির পরীক্ষায়। বিনয়ভূষণ রায়, *পূর্বোক্ত*; আনোয়ার হোসেন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭৬

আবেদন করে প্রত্যাখ্যাত হন।[৫৩] এতে কলকাতার নেতৃস্থানীয় মুসলিম নেতৃবৃন্দ ক্ষুব্ধ হন এবং বিক্ষুব্ধ সুধী মুসলিম নেতৃবৃন্দ কলকাতায় একটি মুসলিম বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্দেশ্যে আলোচনার জন্য ব্যারিস্টার ই. এ. খোন্দকারের বাড়িতে এক সভায় মিলিত হন। এ সভায় অন্যান্যদের মধ্যে বখতিয়ার শাহ্, ইউসুফ খান বাহাদুর, শেখ মোহাম্মদ জিলানী, আব্দুল কাদের, ডাঃ জহিরুদ্দিন আহমদ, মির্জা সুজাত আলী বেগ এবং সৈয়দ ওয়াহেদ হোসেন প্রমুখ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন। সভায় বখতিয়ার শাহকে সভাপতি, সুজাত আলী বেগ ও ওয়াহেদ হোসেনকে যুগ্ম-সম্পাদক করে বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য একটি অস্থায়ী কমিটি গঠন করা হয়। এ সভা থেকে মুর্শিদাবাদের জমিদার শিক্ষানুরাগী নবাব শামসি জাহান ফেরদাউস মহলকে বালিকা বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠায় পৃষ্ঠপোষকতা দানের জন্য অনুরোধ জানানো হয়। এ আহ্বানে সাড়া দিয়ে নবাব ফেরদৌস মহল সহায়তা নিয়ে এগিয়ে আসেন। তাঁর উৎসাহ ও সাহায্য পেয়ে উদ্যোক্তার কলকাতায় একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৯৭ সালের ১৯ জানুয়ারি ‘মুসলিম বালিকা বিদ্যালয়’ নামে ২৫ জন ছাত্রী নিয়ে কলকাতায় স্কুলটির যাত্রা শুরু হয়। বাংলার তৎকালীন লেফটেনেন্ট গভর্নরের পত্নী লেডি ম্যাকেঞ্জি বিদ্যালয়টির উদ্বোধন করেন। উল্লেখ্য যে, বেগম শামসি ফেরদৌস মহল বিদ্যালয়ের গৃহনির্মাণের খরচ প্রদান করা ছাড়াও এর পরিচালনা ব্যয় নির্বাহের জন্য মাসিক ১৫০ টাকা করে অনুদানের ব্যবস্থা করেন। ঢাকার বিশিষ্ট ব্যক্তি নবাব আহসানুল্লাহ (১৮৪৬-১৯০১ খ্রি.) খানবাহাদুর বিদ্যালয়টি পরিচালনার জন্য ১০০০ টাকা দান করেন।[৫৪] কলকাতায় যখন এ বালিকা বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়, সে বছরই কলকাতার ক্যাম্পবেল মেডিকেল স্কুল[৫৫] থেকে শাহজাদপুর নিবাসী লতিফুন্নেসা নামে একজন মুসলিম শিক্ষার্থী Licentiate of Medical Faculty (L.M.F.) পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে উত্তীর্ণ হন।[৫৬] তাঁর সম্পর্কে বিস্তারিত কোনো তথ্য পাওয়া না গেলেও এটুকু নিশ্চিত যে, তিনি ছিলেন বাঙালি মুসলিম নারীদের মধ্যে প্রথম চিকিৎসক।

পূর্বোক্ত মুসলিম বালিকা বিদ্যালয়টি ছিল মুসলমানদের উদ্যোগে কলকাতায় স্থাপিত প্রথম বেসরকারি বালিকা বিদ্যালয়। তবে এ স্কুলটি স্থাপন মোটেই সহজ কাজ ছিল না। কারণ খোদ মুসলিম সমাজের রক্ষণশীল অংশ এ বিদ্যালয়টি স্থাপনে প্রচণ্ড বিরোধিতা করেছিলেন। *The Moslem Chronicle* পত্রিকার ভাষ্য মতে,

---

৫৩. *The Moslem Chronicle*, March, 24, 1896, p. 142; *বামাবোধিনী পত্রিকা*, ৩৪ বর্ষ, ৩৮৭ সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি ১৮৯৭, পৃ. ২৯৮

৫৪. আনোয়ার হোসেন, *পূর্বোক্ত*, পৃ.৮৩

৫৫. ক্যাম্পবেল মেডিকেল স্কুল ছিল একটি সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। তবে প্রথম দিকে এতে মেয়েদের ভর্তির সুযোগ ছিল না। ১৮৮৮ সালে সরকার স্কুলটিতে মেয়েদের ভুর্তির অনুমতি দেয়।

৫৬. *বামাবোধিনী পত্রিকা*, ৩৪ বর্ষ, ৩৭৬ সংখ্যা, মে, ১৮৯৬, পৃ. ৩

বিদ্যালয়টি স্থাপনের প্রাক্কালে মুসলিম সমাজের তরফ থেকে আপত্তি উঠেছিল, কিন্তু সৈয়দ ওয়াহেদ হোসেনের অদম্য ইচ্ছা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে শেষ পর্যন্ত এটি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়েছিল।[৫৭]

সমকালীন লেখক ও বুদ্ধিজীবীদের আরো অনেকেই নারীশিক্ষার সমর্থক ছিলেন। এদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন প্রসিদ্ধ কবি ও ঔপন্যাসিক ও সাংবাদিক মোজাম্মেল হক (১৮৬০-১৯৩৩ খ্রি.)। তিনি ১৮৯৯ সালে 'পদ্যশিক্ষা' নামে বালক বালিকাদের পাঠোপযোগী একটি বই প্রকাশ করেন। তাঁর রচিত উপন্যাস 'জোহরা'য় তিনি নারীশিক্ষার উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। সাহিত্যিক নজিবর রহমান (১৮৬০-১৯২৩ খ্রি.) ও নারীশিক্ষার বিশেষ সমর্থক ছিলেন। ময়মনসিংহ জেলার সাব-ডেপুটি নওশের আলী খাঁ ইউসুফজী (১৮৬৪-১৯২৪ খ্রি.) ও নারীশিক্ষার জোরালো সমর্থক ছিলেন এ কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। *বঙ্গীয় মুসলমান* নামে ১৮৯০ সালে তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থে মুসলিম নারীদের কথা বলতে গিয়ে তিনি তাদের শিক্ষার দৈন্য অবস্থা নিয়ে হতাশা ব্যক্ত করে লিখেন:

> আমরা স্ত্রীলোকদিগকে বিদ্যা শিক্ষা হইতে বঞ্চিত করিয়া তাহাদের প্রতি যে বিষম অত্যাচার করিতেছি, তাহা মনে করিলে শরীর শিহরিয়া উঠে। এ অত্যাচারের কি কোনো প্রতিকার নাই? ---কত শত বালিকাগণ পুরুষাপেক্ষা উন্নত প্রাণ লাভ করিয়াও শিক্ষার অভাবে আত্মার বিকাশ করিতে পারিতেছে না। বড়ই দুঃখের বিষয়, আমাদের মহিলাগণ তাহাদের সরলতা, স্বভাবের কোমলতা- জীবনের পবিত্রতা এবং হৃদয়ের উচ্চতার জন্যে সমাজে কোনোই পুরস্কার পাইতেছে না।[৫৮]

নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বাঙালি মুসলমানদের উৎসাহিতকরণের উদ্দেশ্যে নওশের আলী খাঁ ইউসুফজায়ী লিখেন,

> যখন বঙ্গীয় মুসলমান স্ত্রীজাতির অবস্থা পর্যালোচনা করি, তখন প্রথমেই তাহাদের শিক্ষার কথা মনে পড়ে। সমাজে স্ত্রী- শিক্ষার এত প্রয়োজন রহিয়াছে যে, সমাজের মঙ্গলামঙ্গল সম্পূর্ণ- রূপে না হইলেও অধিক ভাগে স্ত্রী-শিক্ষার উপরে নির্ভর করে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। --- সাধারণতঃ দৃষ্ট হয় পিতার অপেক্ষা মাতার দোষ গুণ সন্তানে অধিক পরিমণে বর্ত্তিয়া থাকে, এবং ঐ সকল দোষ গুণ সন্তানের সমস্ত জীবনে ক্রিয়া দর্শায়। যদি মাতা বিদুষী হন, তবে সন্তান তাঁহার যে গুণাবলী উত্তরাধিকার করে, তাহা সন্তানের পক্ষে বড়ই ফল-প্রদ হইয়া থাকে, অন্যথায় ইহার পরিণাম বড়ই শোচনীয়।[৫৯]

তিনি আরো লিখেন,

> গৃহকার্য্য একজন শিক্ষিতা স্ত্রীলোকের দ্বারা যত সুন্দররূপে সম্পন্ন হইয়া থাকে, একজন অশিক্ষিতা স্ত্রীলোকের দ্বারা তদনুরূপ হওয়া একরূপ অসম্ভব।--- স্ত্রীগণ শিক্ষিতা হইলে গৃহ-শিক্ষা (Home Education) তাহাদের দ্বারাই সম্পাদিত হইতে পারে,---যাহারা গৃহ-শিক্ষার আবশ্যকতা স্বীকার করিবেন, তাহারা স্ত্রীশিক্ষার আবশ্যকতা অবশ্যই স্বীকার করিবেন। দুঃখের বিষয় আমাদের সমাজের স্ত্রীগণ অশিক্ষিতা

---

৫৭. *The Moslem Chronicle*,23 January, 1897. p. 621; আবদুল্লাহ আল-মাসুম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৮২

৫৮. নওশের আলী খাঁন ইউসুফজী, *পূর্বোক্ত*; উদ্ধৃতি, আবদুল্লাহ আল- মাসুম, *ব্রিটিশ আমলে বাংলার মুসলিম শিক্ষা সমস্যা ও প্রসার*, ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ২০০৮, পৃ. ৫৩৮

৫৯. নওশের আলী খাঁ ইউসুফজী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪১

বলিয়া এই গৃহ-শিক্ষা একেবারেই হইতেছে না। --- স্ত্রীগণ শিক্ষিতা হইলে গৃহ-শিক্ষা (Home Education) তাহাদের দ্বারাই সম্পাদিত হইতে পারে,---যাহারা গৃহ-শিক্ষার আবশ্যকতা স্বীকার করিবেন, তাহারা স্ত্রীশিক্ষার আবশ্যকতা অবশ্যই স্বীকার করিবেন।দুঃখের বিষয় আমাদের সমাজের স্ত্রীগণ অশিক্ষিতা বলিয়া এই গৃহ-শিক্ষা একেবারেই হইতেছে না।[৬০]

নারীশিক্ষায় মুসলিম সমাজের পশ্চাৎপদতা সম্পর্কে নওশের আলী খাঁ ইউসুফজায়ী আরো লিখেন, "---কিঞ্চিৎ মনোযোগ দিয়া দেখিলে সহজেই সকলে বুঝিতে পারিবেন যে, স্ত্রীশিক্ষার অভাব আমাদের সামাজিক উন্নতির পথে এক দুর্লঙ্ঘ্য পর্ব্বতাকারে দণ্ডায়মান রহিয়াছে।"[৬১] তৎকালীন সমাজ বাস্তবতার নিরিখে তিনি লিখেন,

বঙ্গীয় মুসলমান সমাজ আর এখন স্ত্রীজাতির এ অভাব মোচনে অমনোযোগী থাকিতে পারে না। বঙ্গীয় সমস্ত মুসলমান ভ্রাতাদের এখন একমন একপ্রাণে সমাজের এ অভাব দূরীকরণে বদ্ধ পরিকর হওয়া আবশ্যক। সত্য কথা বলিতে কি, স্ত্রীজাতির এই এক প্রধান অভাব মুসলমান সমাজকে অবনতির দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন না হইলে আমরা কখনও দেশস্থ অন্তাজ সমাজের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে সমক্ষ হইব না। [৬২]

মুসলিম সমাজের প্রতি নওশের আলী খাঁ ইউসুফজী প্রশ্ন রাখেন, "যে স্ত্রীজাতি সমাজের দুঃখ, সম্পদ বিপদের সহকারিণী, তাহাদিগকে বিদ্যালেকে বঞ্চিত রাখা কি উচিৎ? আমাদেরই স্নেহপাত্রী ভগিনি ও বাৎসল্যাধার কন্যাগণকে অজ্ঞান তিমিরে আবৃত রাখার ইচ্ছা মনে পোষণ করার অপেক্ষা অধিকতর ভ্রান্তি আর কি হইতে পারে?"[৬৩]

নওশের আলী খাঁ ইউসুফজীর মতো নারীশিক্ষার ব্যাপারে ইতিবাচক মনোভাব পোষণকারী মনীষীর সংখ্যা যদি তৎকালীন বাঙালি মুসলিম সমাজে আরো বেশি পরিমাণে পাওয়া যেতো তবে, উনিশ শতকের শেষ দিকেই এক্ষেত্রে আরো বেশি অগ্রগতি অর্জন সম্ভব হতো। কিন্তু দুঃখজনক হলো বাঙালি মুসলিম সমাজে তখন সেরূপ বাস্তবতা ছিল না।

৫.২ বাঙালি মুসলিম সমাজে নারীশিক্ষার অগ্রগতির চালচিত্র

পুনশ্চ উল্লেখ্য যে, বাঙালি হিন্দুনারীদের শিক্ষা ও জাগরণের ক্ষেত্রে হিন্দু বুদ্ধিজীবী মহল নিজেরা সংযুক্ত থেকে অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ দিয়ে যে মহতী ভূমিকা পালন করেছিলেন, অনুরূপভাবে উনিশ শতকে মুসলিম নারীদের জাগরণের ক্ষেত্রে মুসলিম বুদ্ধিজীবী ও সমাজ প্রধানদের নিকট থেকে আশাব্যঞ্জক সহযোগিতা আসেনি। এ প্রসঙ্গে সৈয়দ আমীর আলী, সাংবাদিক *মিহির ও সুধাকর* পত্রিকার সম্পাদক পণ্ডিত রেয়াজউদ্দীন ও মৌলবী শেখ আবদুর রহিম এবং নওশের আলী খাঁ ইউসুফজী প্রমুখ বাঙালি মুসলিম বুদ্ধিজীবীগণ নারীশিক্ষার প্রসারে

---

৬০. নওশের আলী খাঁন ইউসফজী, *পূর্বোক্ত*, প. ৪১-৪২

৬১. *ঐ*, পৃ. ৪২

৬২. নওশের আলী খাঁ ইউসুফজী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪২

৬৩. নওশের আলী খাঁ ইউসুফজী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৩

যতটা সদিচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন, সে ইচ্ছাকে বাস্তবে রূপ দিতে গেলে যে আন্দোলনের প্রয়োজন, সেদিকে তাঁরা বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি। এতদসত্ত্বেও মুসলিম মননের কিঞ্চিত পরিবর্তন, সমকালীন উদারমনা লেখক ও প্রগতিবাদী মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের নারীশিক্ষার সপক্ষে প্রবন্ধ-নিবন্ধ রচনা এবং মুসলমান সভা-সমিতির প্রচেষ্টা এবং ব্যক্তি ও সামষ্টিক উদ্যোগে বালিকা বিদ্যলয় প্রতিষ্ঠা ইত্যাদির ফলে উনিশ শতকের শেষ পাদে নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে মুসলমান সমাজে কিছুটা অগ্রগতি সাধিত হয়েছিল। প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে ১৮৮১-৮২ সালে দেশীয় প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়ে (সরকারি-বেসরকারি) অধ্যয়নরত ১৭,৪৫২ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে মুসলিম ছাত্রী সংখ্যা ছিল ১,৫৭০। একই সময়ে মধ্য ইংরেজি বালিকা বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ৩৪০ জন ছাত্রীর মধ্যে মুসলিম ছাত্রী সংখ্যা ছিল ৪ জন। কিন্তু উচ্চ ইংরেজি বালিকা বিদ্যালয়ের ১৮৪ জন ছাত্রীর মধ্যে একজনও মুসলিম ছাত্রী ছিল না।[৬৪] অবশ্য এরপর ক্রমান্বয়ে মুসলিম ছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় যে, ১৮৮৬-৮৭ সালে বাংলার প্রাথমিক শিক্ষায় মোট ছাত্রী সংখ্যা ছিল ৪১,৮৯৭ জন। এদের মধ্যে মুসলিম ছাত্রী ছিল ৫,৬০৩ জন। ১৮৯৬-৯৭ সালে মুসলিম ছাত্রী সংখ্যার কিছুটা পরিবৃদ্ধি ঘটে এবং তাদের সংখ্যা ৭৯৮২ জনে উন্নীত হয়।[৬৫] ১৮৮৬-৮৭ সালে বাংলার মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে মোট ৪,৫৩১ জন ছাত্রীর মধ্যে মুসলিম ছাত্রী ছিল মাত্র ১১ জন। ১৯০১-০২ সালে মাধ্যমিক শিক্ষায় মোট ৫,৬০০ জন ছাত্রীর মধ্যে মুসলিম ছাত্রী ছিল মাত্র ১৪ জন।[৬৬] ১৯০১ সালের আদম শুমারির রিপোর্টে জেনানা শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষা লাভকারী ৪০০ মুসলমান ইংরেজি শিক্ষিত নারী কথা কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

উপরের তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, উনিশ শতকের শেষদিকে নারীশিক্ষায় মুসলমানদের মধ্যে কিছুটা অগ্রগতি হয়েছিল। তবে যে বিষয়টি বিশেষভাবে লক্ষণীয় তা হলো বাঙালি মুসলিম পরিবারের মেয়েদের শিক্ষার হার মুখ্যত প্রাথমিক স্তরেই বলতে গেলে সীমাবদ্ধ ছিল। মাধ্যমিক স্তর বা উচ্চশিক্ষার স্তরে মুসলিম নারীদের শিক্ষার হার একেবারেই সন্তোষজনক ছিল না। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মুসলিম বালিকাদের অবস্থা ও স্কুলের পরিস্থিতি সম্পর্কে সরকারি শিক্ষা রিপোর্টে বলা হয়, ‘স্কুলে মুসলিম ছাত্রীদের উপস্থিতি একেবারেই কম এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে মোট ছাত্রীর মধ্যে মাত্র ৯% মুসলিম ছাত্রী পড়াশুনা করতেন। মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রতি ৬৮ জন ছাত্রীর মধ্যে মুসলিম ছাত্রী ছিলেন মাত্র ১জন।[৬৭] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, মাধ্যমিক স্তরে অধ্যয়নকারী মুসলিম ছাত্রীদের অধিকাংশই ছিল মধ্যম ভার্নাকুলার বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত।

---

৬৪. বিনয় ঘোষ, *বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা ১৮০০-১৯০০*, ৫ম খণ্ড,, কলিকাতা, পাঠভবন, ১৯৬৮, পৃ. ২১৯

৬৫. *Report of the Moslem Education Advisory Committe*, Calcutta, 1934, P.15 ; আবদুল্লাহ আল-মাসুম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৮২

৬৬. ঐ

৬৭. Progress of Education in Bengal, 1902-03 to 1906-07. *Third Quinquennial Review*, p. 128; আবদুল্লাহ আল-মাসুম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৮৩

উনিশ শতকে মুসলিম সমাজে নারীশিক্ষা মুখ্যত প্রাথমিক স্তরেই সীমাবদ্ধ থাকার পিছনে নানাবিদ কারণ ছিল। এসব কারণের মধ্যে পর্দাপ্রথা, বাল্যবিবাহ, নারীশিক্ষার বিষয়ে মুসলমান সমাজের রক্ষণশীল মনোভাব এবং এমনকি যুগের চাহিদা মোতাবেক নারী শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে না পারাও অন্যতম ছিল। বাল্য বিবাহের কারণে মুসলিম নারীদের প্রাথমিক শিক্ষার স্তর অতিক্রম করতে পারতো না এবং পর্দা প্রথার কঠোরতার কারণে বয়স্ক মেয়েদের বিদ্যালয়ে প্রেরণে অভিভাবকদের অনীহার কথা ব্রিটিশ নারী স্কুল পরিদর্শক মিস ব্রুকের ১৯০৫-০৬ সালে প্রদত্ত এক রিপোর্টেও ওঠে এসেছে।

মুসলিম সমাজের উপযোগী মূল পাঠ্যক্রমের অভাব, আর্থিক অসচ্ছলতা, উপযুক্ত নারী শিক্ষকের অভাব ইত্যাদিও মাধ্যমিক বা উচ্চমাধ্যমিক স্তরে মুসলিম নারীশিক্ষার প্রসারে অন্তরায় সৃষ্টি করেছিল বলেও পূর্বোক্ত রিপোর্টে উদ্ধৃত হয়েছে। মিস ব্রুকের রিপোর্টে বালিকা বিদ্যালয়গুলোর জন্য সরকারের ব্যয়বৃদ্ধিসহ প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা দিয়ে নারী শিক্ষক নিয়োগ করলে আরো বেশি করে মুসলিম মেয়েরা পড়াশুনায় এগিয়ে আসবে বলেও অভিমত ব্যক্ত করা হয়।[৬৮]

উপরের নারীশিক্ষা বিষয়ে যে সব তথ্য উল্লেখিত হলো তা ছিল সরকারি-বেসরকারি প্রয়াসে নারীশিক্ষার অগ্রগতির চিত্র। বেসরকারি পর্যায়ে পৃথকভাবে নারীশিক্ষার সার্বিক অগ্রগতি সম্পর্কিত তথ্য পরিবেশনের মতো পর্যাপ্ত তথ্য-উপাত্ত পাওয়া যায় না। তবে এটুকু বলা যায় যে, উনিশ শতকে বেসরকারি ও ব্যক্তি পর্যায়ে উদ্যোগের ফলে বাঙালি মুসলিম সমাজে নারীশিক্ষার একটি অনুকূল পরিবেশ তৈরি হতে শুরু করে। অবশ্য এ সময় নারীশিক্ষার বেসরকারি প্রচেষ্টা দু'একটি ব্যতিক্রম দৃষ্টান্ত ছাড়া জেনেনা বা অন্তঃপুর শিক্ষার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। তবে লক্ষণীয় ব্যাপার হলো অন্তঃপুর শিক্ষায় উনিশ শতকের শেষপাদে বাঙালি মুসলিম নারীদের অংশগ্রহণ হিন্দুদের তুলনায় কম হলেও একেবারে অনুল্লেখ্য ছিল না। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ১৯০১ সালের আদম শুমারি প্রতিবেদনে জেনেনা শিক্ষা ব্যবস্থায় ৪০০ জন মুসলিম নারী ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণের তথ্য পাওয়া যায়। উনিশ শতকে বাঙালি মুসলিম নারীশিক্ষা যেখানে প্রাথমিক এবং ভার্ণাকুলার শিক্ষার মধ্যে মুখ্যত সীমাবদ্ধ ছিল, সেখানে অন্তঃপুর শিক্ষার মাধ্যমে ৪০০ মুসলিম নারীর ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ নিঃসন্দেহে কৌতুহল উদ্দীপক। শুমারি প্রতিবেদন প্রকাশিত হওয়ার পর এ প্রসঙ্গে *মিহির ও সুধাকর* পত্রিকায় 'মুসলমান সমাজে স্ত্রীশিক্ষা' নামক একটি নিবন্ধে বলা হয়,

> আমরা কখনও স্বপ্নেও ভাবি নাই, ১৯০১ সালের আদম শুমারী আমাদের নিকট ৪০০ মুসলমান স্ত্রীলোকের ইংরাজী শিক্ষার কথা প্রচার করিবে।--- যদি অন্তপুরে ইংরাজী শিক্ষার প্রচলন সম্ভব, তবে স্কুল স্থাপন করিয়া বালিকাগণকে শিক্ষা দিতে অপাত্তি কি? যেসব স্কুলে মুসলমান বালিকার প্রবেশাধিকার আছে, তথায়

৬৮. *Progress of Education in Bengal*, 1902-03 to 1906-07, p. 128;

> তাহাদিগকে ইংরাজী শিক্ষা প্রদানে ক্ষতি কি? --- বিশেষ আমাদের বালিকা মাদ্রাসাগুলিতে ইংরেজী শিক্ষার বন্দোবস্ত করিলে সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা অবলম্বন হয়। [৬৯]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, উনিশ শতকের শেষ দিকে নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে যেমন বাঙালি মুসলিম সমাজে বিতর্ক ছিল, তেমনি নারীশিক্ষার বিষয়বস্ত বা পাঠ্যক্রম কী-হবে, সে বিষয়েও বিতর্ক বিদ্যমান ছিল। মুসলিম সমাজে মেয়েদের আধুনিক ও ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাদান করা উচিত কী-না- এ নিয়ে বাঙালি মুসলিম সমাজ ছিল দ্বিধা-বিভক্ত। তাদের এ বিভক্ত মনোভাব সমকালীন পত্র-পত্রিকায় বিতর্ক আকারে প্রকাশিত হয়। এসব বিতর্কে অধিকাংশেরই মনোভাব মুসলিম নারীদের আধুনিক শিক্ষার বিপক্ষে ছিল। *মিহির ও সুধাকর* পত্রিকার দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেই বিষয়টি স্পষ্ট করা যায়। বিশ শতকের শুরুতে ১৩০৯ বঙ্গাব্দে *মিহির ও সুধাকর* পত্রিকা যুক্তি দেখায় যে, মুসলিম সমাজে নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা আছে ঠিকই, কিন্তু তার পরিসর বেঁধে দেওয়া উচিত। এ পত্রিকার মতে, কোরআন শিক্ষা এবং উর্দু ও বাংলা ভাষা শিক্ষা মেয়েদের পক্ষে বর্তমানে অত্যন্ত জরুরি। *মিহির ও সুধাকর* এ অভিমত ব্যক্ত করে যে, মেয়েদের 'ললনা সুহৃদ' এর মত বাংলা পাঠ্যপুস্তক পাঠ করতে পারার ক্ষমতা অবশ্যই থাকা উচিত, যাতে করে তারা গৃহস্থালি কাজ গোছানো, স্বাস্থ্য রক্ষা, সন্তান লালন-পালন এবং স্বামী ও পরিবারের অন্যান্য বয়োজ্যেষ্ঠদের সেবা-যত্ন করার মৌলিক জ্ঞান অর্জন করতে পারে। উচ্চশিক্ষার দ্বার মেয়েদের কাছে উন্মুক্ত করার বিরোধিতা করে পত্রিকাটি মেয়েদের মাদ্রাসায় ইংরেজি শিক্ষাদানের ব্যবস্থা সুপারিশ করে। ইতোমধ্যেই এ ব্যাপারে *মিহির ও সুধাকর পত্রিকায়* প্রকাশিত একটি সুপারিশ উদ্ধৃতি আকারে উল্লেখ করা হয়েছে।

উপরের উল্লিখিত ভাষ্য থেকে দেখা যায় যে, *মিহির ও সুধাকর* পত্রিকা নারীশিক্ষার জোরালো সমর্থক হয়েও তাদের জন্য আধুনিক ও উচ্চশিক্ষাকে সমর্থন করেনি। তারা নারীদের জন্য প্রাথমিক স্তরের এমন শিক্ষার সুপারিশ করেছে যা গ্রহণের মাধ্যমে একজন নারী সুগৃহিণী হতে পারে, একজন ভালো মা হয়ে যথাযথভাবে সন্তানের লালন-পালন করতে পারে এবং সর্বোপরি একজন আদর্শ স্ত্রী হিসেবে স্বামী ও পরিবারের বড়দের সেবা-যত্ন করতে পারে। এরূপ মনোভাবের মধ্যে আর যাই হোক নারীর নিজের আত্মোন্নয়ন ও আত্মবিকাশের জন্য যে শিক্ষা লাভ করা জরুরি, সে সত্যের স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। পুরুষতান্ত্রিক এরূপ মানসিকতার কারণেই উনিশ শতকের শেষপাদ অব্দি বাঙালি মুসলিম নারীশিক্ষা প্রাথমিক স্তর অতিক্রম করে মাধ্যমিক বা উচ্চমাধ্যমিক স্তরে খুব একটা যেতে পারেনি। এ সময়ে বেসরকারি সাংগঠনিক ও ব্যক্তি পর্যায়ে যারা নারীশিক্ষার প্রসারে উদ্যোগ নিয়েছিলেন, তাদের প্রয়াসও মুসলিম নারীদের প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এ ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা অপেক্ষা জেনেনা বা অন্তঃপুর শিক্ষার উপরই তারা জোর

---

৬৯. *মিহির ও সুধাকর*, ২৩ মাঘ, ১৩০৯ বঙ্গাব্দ

দিয়েছিলেন। এ কারণেই উনিশ শতকে বাঙালি মুসলিম নারীর শিক্ষার গণ্ডি বলতে গেলে প্রাথমিক স্তর অতিক্রম করতে পারেনি। তবে তৎকালীন সমাজ বাস্তবতার নিরিখে এ প্রচেষ্টার গুরুত্বকে উপেক্ষা করার অবকাশ নেই। বস্তুত বাঙালি মুসলিম সমাজে নারীশিক্ষার প্রসারে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বেসরকারি পর্যায়ে যে ব্যক্তি ও সাংগঠনিক উদ্যোগের সূচনা হয়েছিল, বিশ শতকের এর গণ্ডি আরো প্রসারিত হয় এবং ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির পূর্বেই বাঙালি মুসলিম সমাজে নারীশিক্ষা প্রাথমিক স্তরের সীমা অতিক্রম করে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষার স্তরে উন্নীত হয়। পরবর্তী অধ্যায়ে এতদবিষয়ে আলোকপাত করা হবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বাংলায় মুসলিম নারীশিক্ষার প্রসারে ব্যক্তি ও বেসরকারি প্রচেষ্টাঃ মধ্য বিশ শতক পর্যন্ত

উনিশ শতকের শেষ দিকে নারীশিক্ষা বিষয়ে মুসলিম সমাজের আধুনিক ও প্রগতিমনস্ক অংশের পরিবর্তিত মনোভাব ও কার্যক্রম ইত্যাদির ফলে বাংলার মুসলিম সমাজে নারীশিক্ষার যে শুভ সূচনা হয়েছিল, বিশ শতকে এর গতি প্রবাহ আরো বৃদ্ধি পায়। বিশ শতকের প্রারম্ভ হতেই বাংলার মুসলিম সুধী সমাজে নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতনতাবোধ আরো সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। সমকালীন বাংলার পত্র-পত্রিকা সাক্ষ্য দেয় যে, বিশ শতকের প্রথম দশক থেকেই বাঙালি মুসলিম সমাজ নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন হতে শুরু করে। সমসাময়িক মুসলিম লেখক ও বুদ্ধিজীবীদের অনেকেই নারীশিক্ষার সমর্থনে গ্রন্থ রচনা এবং পত্র-পত্রিকায় প্রবন্ধ-নিবন্ধ লিখে মুসলিম সমাজে নারীশিক্ষার স্বপক্ষে জনমত তৈরির চেষ্টা করেন। এ সময়কাল হতে সমসাময়িক পত্র-পত্রিকায় বাঙালি মুসলিম নারীশিক্ষা বিষয়ে সম্পাদকীয়, অভিমত ও প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রকাশ করে বাঙালি মুসলিম নারী সমাজের শিক্ষা সম্পর্কে জনমতকে প্রভাবিত করার চেষ্টা চলে।[১] ব্যক্তি উদ্যোগের বাইরে সাংগঠনিক পর্যায়েও মুসলিম নারীশিক্ষার প্রসারে নানা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। নারীশিক্ষার প্রসারে তাত্ত্বিক আলোচনা, জনমত সৃষ্টির ব্যক্তিগত ও সাংগঠনিক প্রচেষ্টার সাথে সাথে নারীশিক্ষার প্রসারের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক প্রচেষ্টা জোরদার হয়। এসব উদ্যোগ ও প্রচেষ্টার ফলে এ সময় সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও মুসলিম পরিবারের মেয়েদের শিক্ষা গ্রহণের প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। সার্বিক বিচারে উনিশ শতকের তুলানায় বাংলার মুসলিম সমাজে নারীশিক্ষার অনেক বেশি অগ্রগতি অর্জিত হয়। বর্তমান অধ্যায়ে নির্ধারিত আলোচ্য সময়ে বাঙালি মুসলিম নারীরা প্রাথমিক শিক্ষার স্তরেই নিজেদের গণ্ডিভুত করে রাখেনি, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিকের সীমা অতিক্রম করে অল্প সংখ্যক হলেও উচ্চশিক্ষার দ্বার স্পর্শ করে। এ অধ্যায়ে বিশ শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত বাঙালি মুসলিম সমাজে নারীশিক্ষার ধরন ও গতি-প্রকৃতি বিচার-বিশ্লেষণের প্রয়াস চালানো হবে।

৬. ১: নারীশিক্ষার পক্ষে মুসলিম সমাজে জনমত তৈরিতে বৌদ্ধিক প্রয়াস

---

১. এসব পত্র-পত্রিকার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল: *মিহির ও সুধাকর* (১৮৮৯), *নবনূর* (১৯০৩), *মোহাম্মদী* (১৯০৩), *কোহিনূর* (১৯১৫), *সওগাত* (১৯১৮), *সাধনা* (১৯১৯), *ধূমকেতু* (১৯২২), *বঙ্গীয়-মুসলিম সাহিত্য পত্রিকা* (১৯১৮), *শিখা* (১৯২৭), *মাসিক মোহাম্মদী* (১৯২৭), *ইসলাম প্রচারক* (১৮৯১), *নূরুল ঈমান* (১৯০০), *ছোলতান* (১৯০১), *আল এসলাম* (১৯১৫), *ইসলাম দর্শন* (১৯২০), এবং *মুয়াজ্জিন* (১৯২৮) ইত্যাদি।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, বিশ শতকের শুরুতে নারীশিক্ষার সপক্ষে মুসলিম সমাজে জনমতকে ত্বরান্বিত করার জন্য সমকালীন লেখক ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে প্রাগসর অংশ আরো তৎপর হয়ে ওঠেন। তারা নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও তাৎপর্য সম্পর্কে মুসলিম সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণে তাঁদের লেখনিকে কাজে লাগান। এ প্রসঙ্গে কবি মোজাম্মেল হকের কথা ইতোমধ্যেই উল্লেখ করা হয়েছে। যশোরের মুনসী মহম্মদ মেহেরউল্লা (১৮৬১-১৯০৭ খ্রি.) মূলত একজন ধর্মপ্রচারক ছিলেন। তবে সমকালীন বাঙালি মুসলিম নারীর পশ্চতাৎপদতা ও দুরবস্থা নিরসনেও তিনি নানাভাবে অবদান রেখে গেছেন। তাঁর বক্তৃতা ও রচনায় নারী সমাজের সার্বিক উন্নতি ও কল্যাণের জন্য নারীশিক্ষার প্রতি সমর্থন ব্যক্ত হয়েছে। ১৯০২ সালে ৪ মে খুলনার দৌলতপুরে স্কুল ছাত্রদের এক সভায় বক্তৃতা দিতে গিয়ে নারীশিক্ষা সম্পর্কে তিনি বলেন:

> স্ত্রীলোকেরাই আমাদের কঠিনতম পাশ। স্ত্রী সমাজের কুশিক্ষার বিষাক্ত প্রভাবে আমাদের সমাজ জর্জরিত হইয়া গিয়াছে। স্ত্রীলোকগণই মানবকূলের মাতা; তাঁহারাই আবার সমাজের উন্নতি বা অবনতির প্রসূতি। স্ত্রীগণ অশিক্ষিত থাকিলে সমাজের অর্দ্ধাঙ্গ বিকল হইয়া পড়ে, সুতরাং সে সমাজ দ্বারা কোন কর্ম্মই সুসাধিত হয়না। --- মাতা যদি মূর্খতা ও কুসংস্কারের ভরা পাইয়া আপনার ক্ষুদ্র অজ্ঞানান্ধকার গন্ডীর ভিতর বিচরণ করিতে থাকেন, তাহা হইলে তাহার সন্তানের পক্ষে সে গন্ডী কাটিয়া উঠা দুষ্কর হইয়া পড়িবে।[২]

প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও সাংবাদিক কাজী ইমদাদুল হক (১৮৮২-১৯২৬ খ্রি.) 'আমাদের শিক্ষা' নামে *নবনূর* পত্রিকায় একটি নিবন্ধে লিখেন:

> যতদিন আমাদের মাতৃসমাজ সুশিক্ষিত হইয়া উপযুক্ত না হইবে, ততদিন আমাদের উন্নতির আশা নাই। আমাদের সময়ে যাহা হইবার তাহা ত এক প্রকার হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে আমাদের সন্তানগণ যাহাতে সুসংস্কৃত ও সুশিক্ষিত হইতে পারে তাহার চেষ্টা করা কি আমাদের উচিৎ নহে? এবং স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার ভিন্ন আর কি উপায় আছে?[৩]

নারীশিক্ষার ধরন, পরিধি ও প্রকৃতি বিষয়ে মুসলিম সমাজের প্রচলিত বিতর্ক সম্পর্কে বলতে গিয়ে একই নিবন্ধে কাজী ইমদাদুল হক লিখেছিলেন, "এই 'উচ্চশিক্ষা, নিম্নশিক্ষা' ইত্যাদির ব্যাপারে তার ধৈর্য্য নেই। শিক্ষা তা নারী অথবা পুরুষ যার জন্যই হোক না কেন সেটা হওয়া উচিত যথার্থ শিক্ষা।"[৪] একই বছর একই পত্রিকায় প্রকাশিত ভিন্ন আরেকটি নিবন্ধে কাজী ইমদাদুল লিখেন:

> এখন আমরা নারী জাতিকে গৃহকোণে সাবধানে লুকাইয়া রাখি, বহুমূল্য মনিকাঞ্চনের ন্যায় সাবধানে, অথবা ভঙ্গুর কাচ দ্রব্যের ন্যায় যত্নে লোহার সিন্দুকে বন্ধ করিয়া রাখি, শিক্ষা দিই না, অজ্ঞান করিয়া রাখি, কোনোক্রমে ফেতাহুল জান্নাত খানা পড়াইয়া, ধর্ম্মের নিয়ম কানুনগুলি সাড়ম্বরে ঘড়ির কলের ন্যায় পালন করিয়া যাইতে অভ্যস্ত করিয়া দিই, এবং মনে করি ইহাই যথেষ্ট স্ত্রীলোকের পক্ষে, আর অধিক আবশ্যক কি?[৫]

---

২. শেখ হবিবর রহমান, *কর্ম্মবীর মুনশী মেহেরুল্লাহ*, কলিকাতা, ১৩৩৪, উদ্ধৃতি আবদুল্লাহ আল-মাসুম, *ব্রিটিশ আমলে বাংলার মুসলিম শিক্ষা সমস্যা ও প্রসার*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ৫৩৮

৩. কাজী ইমদাদুল হক, 'আমাদের শিক্ষা', *নবনূর*, ১মবর্ষ ২য় সংখ্যা, জৈষ্ঠ্য, ১৩১০ বঙ্গাব্দ, উদ্ধৃতি, তাহ্‌মিনা আলম, *বাংলার সাময়িকপত্রে বাঙালি মুসলিম নারী সমাজ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃ. ৬৫-৬৬

৪. দ্রষ্টব্য সোনিয়া নিশাত আমিন, *বাঙলি মুসলিম নারীর আধুনিকায়ন* (অনু. পাপড়ীন নাহার), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০২, পৃ. ১৫০

৫. কাজী ইমদাদুল হক, 'ধর্ম্ম এবং শিক্ষা বিস্তার' *নবনূর*, ১ম বর্ষ ১১শ সংখ্যা, ফাল্গুন, ১৩১০ বঙ্গাব্দ, (১৯০৪), পৃ. ৪০৬

নারী জাগরণ, নারীমুক্তি এবং নারীশিক্ষার প্রসারে বাঙালি নারীদের মধ্যে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন (১৮৮০-১৯৩২ খ্রি.)-এর নাম সুবিদিত এবং এক্ষেত্রে তিনি অগ্রণী ভূমিকা ও অবদান রেখে ইতিহাসে অমর স্থান নিশ্চিত করে গেছেন। তবে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন ছাড়াও বিশ শতকের শুরুতে বাঙালি মুসলিম সমাজে কয়েকজন মহিয়সী নারীর পরিচয় পাওয়া যায় যারা মুসলিম সমাজে নারীশিক্ষার প্রসারে জনমত তৈরিসহ অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিতে অবদান রেখেছেন। এদের মধ্যে খায়রুন্নেসা খাতুন (১৮৮০-১৯১২ খ্রি.) এর নাম প্রথমেই উল্লেখ করা যায়। তিনি ছিলেন সিরাজগঞ্জের প্রখ্যাত মুসলিম লেখক মুনশী মেহেরুল্লাহর কন্যা। তিনি স্থানীয় হোসেনপুর বালিকা বিদ্যালয়ের (১৮৯৫ সালে প্রতিষ্ঠিত) প্রধান শিক্ষিকা ছিলেন।[৬] বাংলার পল্লী অঞ্চলে নারীশিক্ষার প্রসার ছিল তাঁর জীবনের অন্যতম ব্রত। হোসেনপুর বালিকা বিদ্যালয়টি পরিচালনা করতে গিয়ে তিনি এর ব্যয় নির্বাহার্থে গ্রামের বাড়ি বাড়ি গিয়ে মুষ্টিচাল সংগ্রহ করতেন। এমনকি তাঁর স্বামী সাব-রেজিস্টার আসিরউদ্দিন আহমেদের বেতনের একটি উল্লেখযোগ্য অংশও তিনি স্কুল পরিচালনার জন্য ব্যয় করতেন। নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও যে, তিনি কেবল একটি বালিকা বিদ্যালয় পরিচালনা করেছেন তা নয়, তিনি তাঁর লেখালেখির মাধ্যমেও নারীশিক্ষার প্রতি মুসলিম জনমতকে আগ্রহী করার চেষ্টা করেছেন। ১৯০৪ সালে (১৩১১ বঙ্গাব্দে) *নবনূর* পত্রিকায় প্রকাশিত 'আমাদের শিক্ষার অন্তরায়' শিরোনামে এক নিবন্ধে তিনি লিখেন:

> বর্ত্তমান সময়ে আমাদের (স্ত্রীজাতির) বিদ্যা শিক্ষার জন্য সমাজে বড়ই আগ্রহ দেখা যাইতেছে। অনেক কৃতবিদ্য ও সদাশয় মহাত্মা এ সম্বন্ধে ঘোরতর আন্দোলন করিতেছেন। দেশের সংবাদপত্রসমূহও এ বিষয়ে নীরব নহেন। সকলেই এক বাক্যে বলিতেছে, আমাদের রীতিমত শিক্ষা না হইলে সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির আশা নাই। বাস্তবিক কথাটা যে একান্ত যুক্তিসিদ্ধ, সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। বিদ্যাহীন জীবন আর সূর্য্যহীন জগৎ উভয়ই তুল্য। মূর্খ ব্যক্তি পশুর সঙ্গেই তুলনীয় হইতে পারে। যে বিদ্যা পুরুষকে সৌন্দর্য্যশালী ও গুণবান করে, সে বিদ্যারূপ অলঙ্কারে স্বভাবসুন্দরী নারীজাতির রূপ ও গুণগরিমা বর্দ্ধিত হইবে না, ইহা কোন্ কথা? চরিত্রবতী রমণী বিদ্যাবতী হইলে মণিকাঞ্চন-যোগের ন্যায় আরও সৌন্দর্য্যশালিনী হওয়ার কথাই বটে। মলয় পবন পরিমলসহ প্রবাহিত হইলে যেরূপ মানবগণকে অধিকতর সন্তোষ প্রদান করিতে সমর্থ হয়, সেইরূপ সুশীলা নারী বিদুষী হইলেও সংসারকে অধিকতর সুখময় করিয়া তুলিতে পারেন। পুরুষ ও নারী উভয় জাতিরই বিদ্যাশিক্ষা করা যে একান্ত কর্তব্য ('ফরজ') তাহা আমাদের হাদিস শরীফেও দেখা যায়; যথা 'তালেবল এলমে ফরিজাত আলা কুল্লে মোসলেমিন ও মোসলেমাৎ।' হিন্দু শাস্ত্রেও নারীজাতির বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে যথেষ্ট বিধান আছে; যথা,কন্যাপোবং পালনীয়া শিক্ষনীয়াতিযত্নতঃ। অতএব যেদিক দিয়াই দেখুন না কেন, আমাদিগের বিদ্যাশিক্ষা করা যে একান্ত কত্তব্য ও আবশ্যক, তাহাতে আর সন্দেহের অবকাশ নাই।[৭]

৬. খায়রুন্নেসা খাতুন সম্পর্কে আরো বিশদ জানার জন্য দ্রষ্টব্য সৈয়দ আবুল মকসুদ, *পথিকৃত নারী খায়রুন্নেসা খাতুন*, ঢাকা, সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯২

৭. খায়রুন্নেসা খাতুন, 'আমাদের শিক্ষার অন্তরায়' *নবনূর*, ২য় বর্ষ, অষ্টম সংখ্যা, অগ্রহায়ণ, ১৩১১, পৃ. ৩৬৯-৩৭০

একই নিবন্ধে তিনি নারীশিক্ষার অন্তরায়সমূহ চিহ্নিত করে তা নিরসন এবং মুসলিম সমাজে নারীশিক্ষার প্রসারে কয়েকটি সুপারিশ করেন। তাঁর সুপারিশগুলো ছিল:

১. ইসলামের বিধিব্যবস্থা তথা পর্দাপ্রথা অনুসরণ করেও মুসলিম বালিকারা যাতে পড়াশুনা করতে পারে, সেরকম উপযুক্ত স্থানে বিদ্যালয় স্থাপন করা একান্ত প্রয়োজন।

২. ঐ সকল স্কুলে সচ্চরিত্রা মুসলমান মেয়েরা শিক্ষিকা হিসেবে কাজ করবেন, যেখানে পুরুষদের প্রবেশাধিকার থাকবে না। ছাত্রীরা দাসী বা চাকরানীর সঙ্গে স্কুলে যাবে অথবা চার পাঁচজন একত্রিত হয়ে স্কুলে গমন করবে। বয়স্কা মহিলাদের জন্য গাড়ির ব্যবস্থা থাকবে।

৩. মহিলা শিক্ষিকার অভাবে বয়োবৃদ্ধ, নিষ্ঠাবান মুসলমান পুরুষ শিক্ষকের দ্বারা গ্রাম্য বিদ্যালয়ের কাজ চলতে পারে। অভিভাবকগণ এই সমস্ত স্কুলে প্রাপ্তবয়স্কদের পাঠাতে সম্মতি না হলেও অল্পবয়স্কা মেয়েদের পড়াতে নিশ্চয়ই রাজী হবেন।[৮]

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন ছিলেন বাঙালি মুসলিম নারীমুক্তি আন্দোলনের অগ্রদূত।[৯] শৈশবে পিতৃগৃহে সামান্য প্রাথমিক শিক্ষা ছাড়া রোকেয়ার কোনো আনুষ্ঠানিক বা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছিল না। তাঁর নিজের লেখায় শৈশবে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা লাভ না করতে পারার বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনা রয়েছে।[১০] তবে অধ্যবসায়ী রোকেয়া নিজ চেষ্টাতেই নিজেকে একজন স্বশিক্ষিত যোগ্য মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে অনন্য নজির স্থাপন করেন। মাতৃভাষা বাংলা ছাড়াও উর্দু, ফারসি এমনকি ইংরেজি ভাষায়ও তিনি আয়াসলব্ধ অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এভাবে নিজেকে যথাযথভাবে তৈরি করে বাংলার জাগরণ তথা নারী জাতির মুক্তির ব্রত গ্রহণ করেন। আধ্যাত্মবাদের জায়গায় ধর্মনিরপেক্ষতা এবং অন্ধবিশ্বাসের জায়গায় যুক্তিপূর্ণ বিশ্লেষণ ছিল রোকেয়ার চিন্তা দর্শনের মূলভিত্তি। তিনি সৃজনশীল ও যুক্তিপূর্ণ লেখনি, সাংগঠনিক কার্যক্রম ও বালিকা বিদ্যালয় পরিচালনার মাধ্যমে নারীমুক্তি আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যান। রোকেয়ার প্রথম সম্পূর্ণ গ্রন্থ *মতিচূর*। এছাড়া তাঁর অন্যান্য রচনার মধ্যে *পদ্মরাগ*, *অবরোধবাসিনী*, *সুলতানার স্বপ্ন* প্রভৃতি প্রধান। তাঁর সাহিত্যকর্মের সংখ্যা বিপুল না হলেও তা অত্যন্ত তাৎপর্যবহ। তিনি লেখনীর মাধ্যমে নারীমুক্তির বাণী প্রচার করেন। বস্তুত তাঁর এ সমস্ত লেখায় প্রধানত স্থান পেয়েছে অবরোধবাসিনী নারী জীবনের দুঃখ-বেদনার যুক্তিপূর্ণ বিশ্লেষণ ও সমাধানের পথ। ব্রিটিশ মহিয়সী নারী মিস ব্রুকের ন্যায় রোকেয়ারও বিশ্বাস ছিল যে, উপযুক্ত শিক্ষা লাভের মাধ্যমেই নারীর প্রকৃত স্বাধীনতা ও মুক্তি

---

৮. খায়রুন্নেসা খাতুন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৬৯-৩৭০; সৈয়দ আবুল মকসুদ, *পূর্বোক্ত* পৃ. ৩৬-৩৮; আবদুল্লাহ আল-মাসুম, *ব্রিটিশ আমলে বাংলার মুসলিম শিক্ষা: সমস্যা ও প্রসার*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫৩৮

৯. রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন এর জীবন সাহিত্য চর্চা এবং নারী জাগরণ বিষয়ে তাঁর কার্যাবলি সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দ্রষ্টব্য: মুহম্মদ শামসুল আলম, *রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন: জীবন ও সাহিত্যকর্ম*, ঢাকা বাংলা একাডেমি, ১৯৮৯; আবদুল মান্নান সৈয়দ, *বেগম রোকেয়া*, ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ১৯৮৩; মোতাহার হোসেন সুফী, *বেগম রোকেয়া: জীবন ও সাহিত্য*, ঢাকা, ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৬; শামসুন্নাহার, *রোকেয়া-জীবনী*, কলিকাতা, বুলবুল পাবিলিশিং হাউস, ১৯৩৭; মোরশেদ শফিউল হাসান, *বেগম রোকেয়া সময় ও সাহিত্য*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৯; মোশফেকা মাহমুদ, *পত্রে রোকেয়া পরিচিতি*, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৬৫; শহীদ আখন্দ, *বেগম রোকেয়া*, চট্টগ্রাম, শিশুসাহিত্য বিতান, ১৯৮০; মেরিনা জাহান, *রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন*, পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা, বাংলা আকাদেমি, ১৯৯৮ ইত্যাদি গ্রন্থ।

১০. উদ্ধৃতি, মুহম্মদ শামসুল আলম, *রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন: জীবন ও সাহিত্যকর্ম*, ঢাকা বাংলা একাডেমী, ১৯৮৯, পৃ. ৮১

নিশ্চিত করা সম্ভব। রোকেয়া অনুধাবন করেছিলেন যে, যে ধর্মীয় ঢাল এবং সামাজিক সংস্কারের নামে বাঙালি নারী সমাজ বিশেষ করে মুসলিম নারীদের পশ্চাৎপদ করে রাখা হয়েছে তা থেকে উত্তরণের একমাত্র পথ হলো নারীকে শিক্ষার আলোকে আলোকিত করা। তিনি মনে করতেন, কেবল শিক্ষা লাভের মাধ্যমেই নারী তাঁর মানবীয় এবং অন্যান্য ন্যায্য অধিকার আদায় করতে পাবে। আর এ কারণেই নারীশিক্ষার প্রসারে রোকেয়া তাঁর সমগ্র জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। ইতোপূর্বে বিভিন্ন সমাজকর্মী ও লেখকের মধ্যে নারীশিক্ষা সম্পর্কে সচেতনতা লক্ষ্য করা গেলেও রোকেয়ার পূর্বে আর কেউ এ বিষয়ে বলিষ্ঠ চেতনা ও এত বেশি কর্মকুশলতার পরিচয় দিতে পারেননি।

বিশ শতকের সূচনায় বাঙালি মুসলিম সমাজে নারীশিক্ষার করুণ চিত্র রোকেয়াকে পীড়িত করেছিল। তাই তিনি *নবনূর* পত্রিকায় 'অর্দ্ধাঙ্গী' শিরোনামে এক নিবন্ধে লিখেন:

> আমাদের জন্য এদেশে শিক্ষার বন্দোবস্ত সচরাচর এইরূপ– প্রথমে আরবীয় বর্ণমালা, অতঃপর কোরান শরীফ পাঠ। কিন্তু শব্দগুলির অর্থ বুঝাইয়া দেওয়া হয় না, কেবল স্মরণশক্তির সাহায্যে টিয়াপাখির মত আবৃত্তি করা।... বঙ্গদেশেও বালিকাদিগকে রীতিমত বঙ্গভাষা শিক্ষা দেওয়া হয় না। কেহ কেহ উর্দু পড়িতে শিখে, কিন্তু কলম ধরিতে শিখে না। ইহাদের উন্নতির চরমসীমা সলমা চুমকির কারুকার্য, উলের জুতা মৌজা ইত্যাদি প্রস্তুত করিতে শিক্ষা পর্যন্ত।[১১]

শুধু সমাজে নয়, পরিবারেও নারীকে পুরুষ অপেক্ষা হীন ও অবহেলার দৃষ্টিতে দেখা হতো। এ বিষয়ে *নবনূর*, আশ্বিন ১৩১১ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত 'অর্দ্ধাঙ্গী' শীর্ষক প্রবন্ধে বেগম রোকেয়া প্রতিবাদের সুরে লিখেন:

> পিতার স্নেহ, যত্ন ইত্যাদি অপার্থিব সম্পত্তি। এখানেও পক্ষপাতিতার মাত্রা বেশি। ঐ যত্ন, স্নেহ, হিতৈষিতার অর্দ্ধেক আমরা পাই কই? যিনি পুত্রের সুশিক্ষার জন্য চার জন শিক্ষক নিযুক্তি করেন, তিনি কন্যার জন্য দুই জন শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করেন কি? যেখানে পুত্র তিনটা (বি.এ পর্যন্ত) পাস করে, সেখানে কন্যা দেড়টা পাস (এন্ট্রান্স পাস ও এফ.এ. ফেল) করে কি? পুত্রদের বিদ্যালয়ের সংখ্যা করা যায় না, বালিকাদের বিদ্যালয় সংখ্যায় পাওয়াই যায় না। যেস্থলে ভ্রাতা "শমস্-উল-ওলামা" সেস্থলে ভগিনী "নজম্-উল-ওলামা" হইয়াছেন কি? তাঁহাদের অন্তঃপুর গগনে অসংখ্য "নজমন্নেসা" "শাম্‌সন্নেসা" শোভা পাইতেছেন বটে। কিন্তু আমরা সাহিত্য গগনে "নজম-উল-ওলামা" দেখিতে চাই।[১২]

নারীশিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করে *নবনূর* পত্রিকায় একটি নিবন্ধ রচনার মাধ্যমে মাধ্যমে রোকেয়া পুরুষ সমাজের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন:

> এখন ভ্রাতাদের সমীপে নিবেদন এই, তাহারা যে টাকার শ্রাদ্ধ করিয়া কন্যাকে জড় স্বর্ণ-মুক্তার অলঙ্কারে সজ্জিত করেন, ঐ টাকা দ্বারা তাহাদিগকে জ্ঞান ভূষণে অলঙ্কৃত করিতে চেষ্টা করিবেন। একখানা জ্ঞানগর্ভ পুস্তক পাঠে যে অনির্বচনীয় সুখ লাভ হয়, দশখানা অলঙ্কার পরিলে তাহার শতাংশের একাংশ সুখও পাওয়া যায় না। অতএব শরীর শোভন অলঙ্কার ছাড়িয়া জ্ঞানভূষণ লাভের জন্য ললনাদের আগ্রহ বৃদ্ধি হওয়া বাঞ্ছনীয়। এ অমূল্য অলঙ্কার-
>
> অনলে না পারে ইহা করিতে দহন,

---

১১. মিসেস আর এস হোসেন 'অর্দ্ধাঙ্গী', *নবনূর*, ২য় বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা, আশ্বিন, ১৩১১ বঙ্গাব্দ, (১৯০৪), পৃ. ২৮৬

১২. *ঐ*

সলিলে না পারে ইহা করিতে মগন,
অনন্ত অক্ষয় ইহা অমূল্য রতন–
এই ভূষা সঙ্গে থাকে যাবত জীবন।[১৩]

পুরুষদের উপর নির্ভর না থেকে নিজেদের শিক্ষিত বা উচ্চশিক্ষা গ্রহণে এগিয়ে আসার জন্য রোকেয়া নারীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন–তাঁর ভাষায়, "আমরা উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত না হইলে সমাজও উন্নত হইবে না। যতদিন আমরা জগতে পুরুষদের সমকক্ষ না হই, ততদিন পর্যন্ত উন্নতির আশা দুরাশা মাত্র। আমাদিগকে সকলপ্রকার জ্ঞানচর্চা করিতে হইবে।"[১৪] শুধু প্রবন্ধ নিবন্ধ নয়, রোকেয়া তাঁর রচিত গ্রন্থগুলোতেও নারীমুক্তির উপায় হিসেবে তাদের শিক্ষার কথা বলেছেন। তিনি তাঁর বিভিন্ন অভিভাষণেও নারীশিক্ষার বিষয়ে জোরের সাথে কথা বলেছেন। রক্ষণশীল পুরুষদের নারীশিক্ষা বিরোধী অবস্থানের কথা বলতে গিয়ে তিনি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে উচ্চারণ করেছিলেন যে, "নারী বিদ্বেষী পুরুষগণ স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধে যতই দীর্ঘ বক্তৃতা ঝাড়ুন না কেন, সত্যের জয় অনিবার্য। শিক্ষা-স্ত্রীলোক পুরুষ নির্বিশেষে সর্বদা বাঞ্ছনীয়।"[১৫]

ধর্মের দোহাই দিয়ে যারা নারীকে শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখতে চায় তাদের ব্যাপারেও রোকেয়া সোচ্চার প্রতিবাদ করেছেন। *সওগাত*[১৬] পত্রিকায় প্রকাশিত 'বঙ্গীয় নারীশিক্ষা সমিতি' শীর্ষক প্রবন্ধে নারীশিক্ষা বিষয়ে ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক মহানবী (সা.) এর বিধানের কথা উল্লেখ করে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন লিখেন:

> ---পৃথিবীতে যিনি সর্বপ্রথমে পুরুষ স্ত্রীলোককে সমভাবে সুশিক্ষা দান করা কর্তব্য বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, তিনি আমাদের রসূল মকবুল (অর্থাৎ পয়গম্বর সাহেব)। তিনি আদেশ করিয়াছেন যে, শিক্ষালাভ করা সমস্ত নরনারীর অবশ্য কর্তব্য। তের শত বৎসর পূর্বে আমাদের জন্য এই শিক্ষাদানের বাধ্যতামূলক পাস হইয়া গিয়াছে। কিন্তু আমাদের সমাজ তাহা পালন করে নাই, পরন্তু ঐ আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছে এবং তদ্রূপ বিরুদ্ধাচরণকেই বংশ গৌরব মনে করিতেছে। এখনও আমার সম্মুখে আমাদের স্কুলের কয়েকটি ছাত্রীর অভিভাবকের পত্র মজুত আছে-যাহাতে তাহারা লিখিয়াছেন যে, তাঁহাদের মেয়েদের যেন সামান্য উর্দু ও কোরান শরীফ পাস ছাড়া আর কিছু-বিশেষতঃ ইংরাজী শিক্ষা দেওয়া না হয়। এই ত আমাদের সামাজিক ব্যবস্থা।[১৭]

একই নিবন্ধে রোকেয়া আরো লিখেন:

> মুসলমান– যাহারা স্বীয় পয়গম্বরের নামে (কিম্বা ভগ্ন মসজিদের এক খণ্ড ইষ্টকের অবমাননায়) প্রাণদানে প্রস্তুত হয়, তাহারা পয়গম্বরের সত্য আদেশ পালনে বিমুখ কেন? গত অন্ধকার যুগে যাহা হইবার, হইয়া

---

১৩. মিসেস আর এস হোসেন ' বোরকা', *নবনূর*, ২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, বৈশাখ, ১৩১১ বঙ্গাব্দ, (১৯০৪), পৃ. ২০

১৪. মিসেস আর এস হোসেন ' বোরকা', *পূর্বোক্ত*

১৫. উদ্ধৃতি, মুহম্মদ শামসুল আলম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৭৩

১৬. *সওগাত* ছিল একটি সচিত্র মাসিক পত্রিকা। ১৯১৮ সালের নভেম্বর/ডিসেম্বরে (১৩২৫ বঙ্গাব্দ, অগ্রহায়নে) মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীনের সম্পাদনায় কলকাতা থেকে এ পত্রিকাটি প্রথম প্রকাশিত হয়। *সওগাত* বাংলার মুসলিমদের সাংবাদিকতায় পথিকৃতের ভূমিকা পালন করে।

১৭. মিসেস আর এস হোসেন, 'বঙ্গীয় নারীশিক্ষা সমিতি', *সওগাত*, ৪র্থ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, চৈত্র, ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ, (১৯২৭), পৃ. ৬৯৪

> গিয়াছে; তাঁহারা যে এমন করিয়াছেন, তাহাও ক্ষমা করা যাইতে পারে, কিন্তু এই বিংশ শতাব্দীতে যখন বারংবার স্ত্রীশিক্ষার দিকে তাঁহাদের মনোযোগ আকর্ষণ করা যাইতেছে যে, কন্যাকে শিক্ষা দেওয়া আমাদের প্রিয় নবী "ফরয" (অবশ্য পালনী কর্ত্তব্য) বলিয়াছেন, তবু কেন তাঁহারা কন্যার শিক্ষায় উদাসীন।[১৮]

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের উপর্যুক্ত লেখা থেকে বিশ শতকের তৃতীয় দশকে এসেও নারীশিক্ষা সম্পর্কে বাঙালি মুসলিম সমাজের রক্ষণশীল মনোভাবের কথা জানা যায়।

নারীশিক্ষার প্রতি মুসলিম সমাজে জনমত তৈরি এবং তাদের উদ্বুদ্ধ করার জন্য বর্তমান গবেষণায় নির্ধারিত সময়কালে আরো অনেক মুসলিম মহিয়সী নারী ভূমিকা রেখেছেন। তাঁদের মধ্যে কাসেমা খাতুন, বেগম আহসানউন্নিসা, নূরন্নেছা, বদরুন্নেছা খাতুন, মোসাম্মৎ রহিমা খাতুন, খুরশীদ জাঁহা বেগম, বেগম ফজিলাতুন্নেসা, রিজিয়া খাতুন, সৈয়দা জয়নব খাতুন, মিসেস এম রহমান, রহিমা খাতুন মিলকী, মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা, শামসুন নাহার মাহমুদ, সৈয়দা সিদ্দিকা বানু, মোসাম্মৎ মোমেনা খাতুন প্রমুখ।

সওগাত পত্রিকায় প্রকাশিত একটি নিবন্ধে কাসেমা খাতুন নারী-পুরুষকে সমাজ দেহের দুটি অঙ্গ হিসেবে আখ্যায়িত করে বলেন যে, নারীদের অশিক্ষিত রেখে পুরুষ সমাজ শিক্ষিত হলেও এতে করে সমাজের বিশেষ উন্নতি হবে না। কারণ তাঁর ভাষায়:

> নারীজাতি অশিক্ষার অন্ধকারে পড়িয়া কাতরাইতে থাকিলে তাহাকে আলোকে লইয়া যাইবার জন্যই আলোক-প্রাপ্ত পুরুষের সমস্ত শক্তি ব্যায়িত হইবে; সে সামাজিক উন্নতি সাধনের সম্মুখে অগ্রসর হইবে কখন? কাজেই মনুষ্য সমাজের উন্নতি স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের সমভাবে শিক্ষাচর্চ্চার উপরেই নির্ভর করিতেছে।[১৯]

মানব জাতির অর্ধেক নারী জাতিকে অশিক্ষা ও অজ্ঞানতার তিমিরে আচ্ছন্ন রাখলে যে, সমাজের সার্বিক অগ্রগতি সাধিত হয় না, উন্নতির গতি শ্লথ বা মন্থর হয়ে পড়ে বাঙালি মুসলিম সমাজকে এ সত্য উপলব্ধির আহ্বান জানিয়ে *নবনূর* পত্রিকার এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে জনাব আলী আহমদ লিখেছিলেন, সমাজের উন্নতির "বেগ বর্ধিত করিতে হইলে স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন করিতে হইবে।"[২০]

সওগাত পত্রিকায় প্রকাশিত একাধিক নিবন্ধে লেখকগণ পরিবার ও সমাজের সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য নারীদের শিক্ষার ব্যবস্থা করার জন্য মুসলিম সমাজকে উদ্বুদ্ধকরণের চেষ্টা করেছেন। *সওগাত* পত্রিকায় প্রকাশিত 'তরুণের কাজ' শিরোনামে একটি নিবন্ধে *দ্যা মুসলমান* পত্রিকার সম্পাদক মৌলভী মুজীবুর রহমান লিখেন:

---

১৮. মিসেস আর এস হোসেন, 'বঙ্গীয় নারীশিক্ষা সমিতি', *সওগাত*, ৪র্থ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, চৈত্র, ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ, (১৯২৭), পৃ. ৬৯৪

১৯. কাসেমা খাতুন, 'নারীর কথা', *সওগাত*, ৪র্থবর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, শ্রাবণ, ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ (১৯২৬), পৃ. ৯৯, উদ্বৃত তাহমিনা আলম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬৫

২০. *নবনূর*, ৩য়বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, আষাঢ়, ১৩১২, (১৯০৫), পৃ. ১০৪

> সমাজের অর্ধেক অজ্ঞান-তিমিরে মগ্ন থাকিলে সমাজের উন্নতি সম্ভবপর হয় না। ---স্ত্রী পুরুষ উভয়েই উভয়ের পরিপূরক; ইহাদের একজন ব্যতীত অন্যজন পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না। সুতরাং আপনারা স্ত্রী লোকদিগকে শিক্ষা দান করুন, তাহাদিগকে জ্ঞানলাভে সহায়তা করুন।[২১]

একই পত্রিকায় অন্য একটি নিবন্ধে বলা হয় যে, "বাঙ্গালী মুসলমান যদি শিক্ষা ও সভ্যতার সব দিক উন্নতি করিতে চান–একটা সুসভ্য জাতিরূপে বাচিয়া থাকিতে চান, তবে নারীজাতির উন্নতি ও শিক্ষার প্রতি তাহাদের বিশেষ নজর প্রদান করিতে হইবে।"[২২] "স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার না হইলে মুসলমান সমাজ কখনই সত্যিকারভাবে জাগিবে না–সমাজ যে তিমিরে আছে, চিরকাল সেই তিমিরে রহিবে।"-এরূপ বক্তব্য উঠে এসেছে *সওগাত* পত্রিকার অন্য একটি নিবন্ধেও।[২৩]

মুসলিম মেয়েদের উপযুক্ত করে গড়ে না তোলা পর্যন্ত সমাজের উন্নতি অসম্ভব। তাই চাই নারীশিক্ষা। এজন্য নারীকে নিজে সচেষ্ট হতে হবে। সমাজে নারীর নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য পুরুষের উপর নির্ভর করলে চলবে না। পুরুষের নিকট অনুনয় বিনয় না করে, সাহসিকতা প্রদর্শন করে নারীকে নিজ অধিকার অর্জন করতে হবে। কিন্তু শিক্ষার অভাবে নারীর সে অধিকার অর্জনের সাহস নেই। তাই নারীকে সেই শিক্ষা অর্জন করতে হবে। এ কথাগুলো জোর দিয়ে বলেছেন বাঙালি মুসলিম নারীশিক্ষা ও জাগরণের আরেক দূত ফজিলাতুন্নেসা জোহা (১৮৯৯-১৯৭৭ খ্রি.)। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ফজিলাতুন্নেসা ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মুসলমান ছাত্রী এবং প্রথম বাঙালি মুসলমান নারী যিনি উচ্চশিক্ষার্থে বৃত্তি নিয়ে ইংল্যান্ড গিয়েছিলেন। কর্মজীবনে তিনি ১৯৪৮-৫৭ সাল পর্যন্ত ঢাকা ইডেন কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন এবং সে হিসেবে তিনি ছিলেন দেশের প্রথম মুসলিম নারী অধ্যক্ষ। ফজিলাতুন্নেসা কেবল শিক্ষাগ্রহণ ও শিক্ষাদানে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেননি, বাঙালি নারী সমাজে শিক্ষার আলোকবর্তিকা প্রজ্জ্বলন এবং সামাজিক কুপমণ্ডুকতার বেড়াজাল থেকে নারী সমাজকে মুক্তির দিশা দানে প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেন। স্বজাতীয় নারী সমাজের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার সপক্ষে অবস্থান নিয়ে জনমত সৃষ্টির লক্ষ্যে তিনি কলম ধরেছিলেন। নারীশিক্ষা ও নারীমুক্তি প্রসঙ্গে তিনি *শিখা*, *সওগাত* ইত্যাদি পত্রিকায় অনেক নিবন্ধ রচনা করেন।[২৪] ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রগতিশীল মুসলিম শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সংগঠন *আল মামুন ক্লাবে* ফজিলাতুন্নেসা একটি বক্তৃতা করেছিলেন। তাঁর এ বক্তৃতাটি 'মুসলিম নারী-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা' শিরোনামে *সওগাত* পত্রিকার অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪ সংখ্যায়

---

২১. মজীবুর রহমান, 'তরুণের কাজ', *সওগাত*, ৫মবর্ষ, ৫ম সংখ্যা, কার্ত্তিক, ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ (১৯২৭), পৃ. ৪৪৯

২২. মোহাম্মদ আবদুল হাকীম, 'বঙ্গ সাহিত্যে মুসলমান মহিলা', *সওগাত*, ৪র্থ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ভাদ্র, ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ (১৯২৬ খ্রি.), পৃ. ১৭৩

২৩. রিজাউল করীম, 'গৌরবের যুগে মুসলিম নারী', *সওগাত*, ৫ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, আষাঢ়, ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ (১৯২৭ খ্রি.), পৃ. ২৭

২৪. ফজিলাতুন্নেসার রচিত 'মুসলিম নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা' (১৩৩৪ বঙ্গাব্দ), 'নারী জীবনে আধুনিক শিক্ষার আস্বাদ' (১৩৩৫ বঙ্গাব্দ), এবং 'মুসলিম নারীমুক্তি' (১৩০৬) ইত্যাদি বাংলার নারী বিশেষ করে মুসলিম নারীজাগরণে অনুপ্রেরণা সঞ্চার করেছিল।

প্রকাশিত হয়। এতে তিনি বাঙালি মুসলিম নারীর শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে তাঁর ভাবনা ও দর্শন ব্যক্ত করেন।[২৫] তাঁর মতে, শিক্ষা বলতে শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি লাভের শিক্ষা বুঝায় না। তৎকালীন সমাজ বাস্তবতায় তিনি সেই শিক্ষার কথা বলেছেন, যে শিক্ষা মানব মনের সঙ্কীর্ণতা দূর করে মনকে প্রশস্ত করে তুলে এবং যা মানুষকে মানবতাবোধের শিক্ষা দেয় এবং যা মানুষকে ন্যায় বিচারের ক্ষমতা দেয়। তাঁর মতে, এইরূপ শিক্ষা নারী-পুরুষ সকলেরই প্রয়োজন। তবে এ কথা তিনি স্পষ্টরূপেই বলেছেন, "এইরূপ শিক্ষার প্রয়োজন মেয়েদেরই বেশি, কারণ The hand that rocks the cradle rules the world. এটা বহুদিনের এবং সর্ববাদীসম্মত সত্য।"[২৬]

ফজিলাতুন্নেসা মা রূপী নারীর শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে বলেন, "সুশিক্ষিত জননীর প্রভাব যেমন সমাজকে উন্নতির পথে লইয়া যাইতে সাহায্য করে, তেমনি অশিক্ষিত জননীর প্রভাব সমগ্রভাবে সমাজকে পশ্চাতের দিকে টানিয়া রাখে।" শিশুর শিক্ষা যেহেতু মায়ের হাত ধরেই শুরু হয়, সেই জন্য উপযুক্ত শিক্ষিত জননীর প্রয়োজন বলে তিনি উল্লেখ করেন। শুধু মাতৃরূপে নয়, স্ত্রী, ভগ্নী ও কন্যারূপেও নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা তিনি ব্যক্ত করেছিলেন। তাঁর ভাষ্য মতে:

> ইহারা (পুরুষরা) যখন বাহিরের সংঘাতে ক্লান্ত হইয়া অবসন্ন হৃদয়ে গৃহে আসেন, তখন তাঁহাদের এই অবসাদের বোঝা নামাইয়া দিয়া চিত্তকে উৎসাহিত করিয়া রাখিতে না পারিলে তাঁহারা ভাঙ্গিয়া পড়িবেন। তাঁহারা তখন কামনা করেন আন্তরিক সহানুভূতি এবং অদম্য উৎসাহ-তাঁহারা তখন চান ভালোবাসার আদান-প্রদান। তাঁহাদের এই প্রাণের কামনাকে পূর্ণতার পথে লইয়া যাইতে, তাঁহাদের নিরুৎসাহ চিত্তে আশা জাগাইয়া দিতে, তাঁহাদের পরিশ্রান্ত মনকে শক্তি দিয়া সজীব করিয়া রাখিতে পারে কে? পত্নীরূপেই হউক, কি দুহিতা বা ভগ্নীরূপেই হউক, এ কাজ সম্পন্ন করিতে পারেন শুধুই উপযুক্ত শিক্ষিতা নারী। তাঁহাদের অভাবই আজ সমগ্র দেশের সমাজকে কর্মকীর্তি হীন করিয়া রাখিয়াছে।[২৭]

বিশ শতকে মুসলিম সমাজের একদল প্রগতিশীল সমাজ নায়ক একথা উপলব্ধি করেন যে, মুসলিম নারীদের উপযুক্ত করে গড়ে তোলা না গেলে সমাজের উন্নতি ও প্রগতি অসম্ভব। এজন্য নারীকে শিক্ষিত হতে হবে। আর এ শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে নারীর নিজের মুক্তি ও উন্নতির পথ তৈরি হবে। তবে একই সাথে নারীদেরকে বুঝতে হবে যে, তার মুক্তি ও অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে পুরুষদের উপর কেবল নির্ভর করলে চলবে না,

---

২৫. আলোচ্য প্রবন্ধটি দেবশ্রী মুখার্জি তাঁর অপ্রকাশিত পিএইচ.ডি অভিসর্ন্দভের পরিশেষ্টে ২৭ নং সংযোজন হিসেবে সংকলন করেছেন। দেবশ্রী মুখার্জি, 'ফজিলাতুন্নেসাজোহা ও তৎকালীন বাংলার মুসলমান নারী সমাজ (১৯০৫-১৯৪৭ খ্রি.)', অপ্রকাশিত পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৮, পৃ. ১২১

২৬. ফজিলাতুন্নেসা, 'মুসলিম নারী-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা' উদ্ধৃত দেবশ্রী মুখার্জি, 'ফজিলাতুন্নেসাজোহা ও তৎকালীন বাংলার মুসলমান নারী সমাজ (১৯০৫-১৯৪৭)'; মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন (সম্পা.), *বাংলা সাহিত্যে সওগাত যুগ*, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ. ৫৮১

২৭. ফজিলাতুন্নেসা, 'মুসলিম নারী-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা' উদ্ধৃতি, দেবশ্রী মুখার্জি, 'ফজিলাতুন্নেসাজোহা ও তৎকালীন বাংলার মুসলমান নারী সমাজ (১৯০৫-১৯৪৭)', পৃ. ১২৩

নিজের অধিকার আদায়ে নিজেকে সচেষ্ট হতে হবে। আর এজন্য শিক্ষার্জনের মাধ্যমে নিজেকে উপযুক্ত করে তুলতে হবে। রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের মতো ফজিলাতুন্নেসার নিজের ভাবনাও ছিল এমনই। তাঁর এ মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর রচিত "মুসলিম নারীর মুক্তি" নামক নিবন্ধে। এ নিবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল *সওগাত* পত্রিকার ভাদ্র, ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ সংখ্যায়।[২৮] বিশ শতকে পরিবর্তনশীল বিশ্ব ব্যবস্থার জাগরণী হাওয়া যে বাঙালি মুসলিম নারীদের মনে কম্পন ধরিয়েছিল ফজিলাতুন্নেসা তাঁর নিবন্ধে এ কথা উল্লেখ করে বলেন, "সমস্ত নারী-মন আজ বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। কিন্তু যুদ্ধ করার যে প্রধান অস্ত্র-শিক্ষা ও জ্ঞান তাই তাদের নাই-আছে কেবল দারুন একটা আত্ম-গ্লানি, মর্ম্মভেদী একটা অনুশোচনা, আর সর্ব্বোপরী মুক্তির জন্য দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা।" আর এজন্য সর্বাগ্রে শিক্ষার উপর তিনি গুরুত্বারোপ করেছিলেন। ফজিলাতুন্নেসার ভাষায়:

> মুসলিম মেয়েদের উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে না পারলে, এ সমাজের উন্নতি কোন জন্মেও হবে না। পুরুষের উপর সব কর্তৃত্বের ভার দিয়ে বসে থাকলে আর মেয়েদের চলবে না। এবার নিজেদের হাতেই শিক্ষার ভার নিতে হবে। নিজেকে মানুষ বলে সভ্য সমাজে পরিচিত করতে হবে। ভিক্ষুকের মতো কেঁদে, পায়ে ধ'রে চেয়ে, প্রত্যাখান অপমানের পশরা না বয়ে বীরের মতো নিজের ন্যায্য অধিকার জোর করে আদায় করে নারীত্বের বন্ধন মুক্ত করতে হবে। শিক্ষা নেই, তাই সাহসও নেই, কিন্তু সে শিক্ষা অর্জন করতে হবে।[২৯]

কেবল ব্যক্তি জীবনের জন্য নয়, সমাজের উন্নতি ও প্রগতির জন্যও নারীশিক্ষা প্রয়োজন এ কথা উল্লেখ করে ফজিলাতুন্নেসা বলেন, "যেম্নি গতিতে পুরুষের শিক্ষার প্রয়োজন, তেম্নি গতিতে নারীশিক্ষার প্রয়োজন। একজনকে বাদ দিয়ে চলতে গেলেই আছাড় খেতে হবে। সমাজ গড়ার চেয়ে ভাঙবার সম্ভাবনাই বেশি।"[৩০] পুরুষদের লক্ষ্য করে তিনি আরো বলেন,

> যদি সত্যিকার সমাজপ্রিয় হন, তবে নারীশিক্ষার মন্দির গড়ে তুলুন। কত জায়গায় কত স্কুল গড়ে উঠছে--- মুসলমান মেয়ে নিয়ে একটাও গড়ে উঠলো না এ পর্যন্ত। --- জগৎ কর্ম্মক্ষেত্রে কেবল ভাবলে বা লিখলে কিছু হবে না। কাজ করতে হবে। সমাজ গড়ে তুলতে যদি চান, নারীকে আত্মপ্রতিষ্ঠা করে তুলুন আগে, পরে সমাজ আপনিই গড়ে উঠবে।"[৩১]

মানবজাতির উন্নতির জন্য যে নারীশিক্ষা একান্ত আবশ্যক এ কথা *শরীয়তে-এসলাম* পত্রিকায় প্রকাশিত 'স্ত্রীশিক্ষা' নামক এক নিবন্ধে মোঃ আহাদ আলী লিখেছিলেন। তিনি লিখেন, "স্ত্রী শিক্ষার উপর যে জাতি বা সমাজের লক্ষ্য নাই, তাহারা উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে না।" ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করে তিনি

---

২৮. এ নিবন্ধটিও দেবশ্রী মুখার্জি তাঁর পূর্বোক্ত অপ্রকাশিত পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভের পরিশিষ্টে ২৮নং সংযোজন হিসেবে সংকলন করেছেন। দেবশ্রী মুখার্জি, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২২১-২২৭ ।

২৯. ফজিলাতুন্নেসা, 'মুসলিম নারীর মুক্তি', *সওগাত*, ৭ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ভাদ্র, ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ (১৯২৯), পৃ. ২; দেবশ্রী মুখার্জি, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২২৪-২২৫ ।

৩০. উদ্ধৃত, দেবশ্রী মুখার্জি, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৬০-২৬১

৩১. উদ্ধৃত, দেবশ্রী মুখার্জি, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৬১

লিখেন, “যে জাতি বা সমাজ সভ্যতার আলোক ধরিতে পারিয়াছেন, স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন---যখন যে জাতি অজ্ঞনতার আঁধারে ডুবিয়া গিয়াছেন, তাহারই স্ত্রীশিক্ষার ঘোর বিরোধী ছিলেন।”[৩২]

‘মা’ হলো একজন নারীর অন্যতম প্রধান পরিচয়। শুধু সন্তানের লালন-পালন নয়, সন্তানের মানস ও চরিত্র গঠনের মায়ের অসামান্য ভূমিকা থাকে। সন্তানের শিক্ষার প্রাথমিক পাঠ শুরু হয় মায়ের হাতে। রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন মা'কে সন্তানের প্রথম, প্রধান ও প্রকৃত শিক্ষয়িত্রী হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।[৩৩] তিনি লিখেন যে, ইতিহাসে যত মহৎ লোকের নাম শুনা যায়, তাঁহারা প্রায় সকলেই সুমাতার পুত্র ছিলেন। তাই সন্তানের শিক্ষার প্রয়োজনে মায়ের শিক্ষিত হওয়া বিশেষভাবে প্রয়োজন। তৎকালীন বাঙালি মুসলিম সমাজকে এ বিষয়ে সচেতন করার জন্য নানাভাবে চেষ্টা করা হয়। নারীশিক্ষার সমর্থকগণ পত্র-পত্রিকায় প্রবন্ধ ও নিবন্ধ রচনা করে এ ব্যাপারে মুসলিম জনমতকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করেন। এ প্রসঙ্গে *সাধনা* পত্রিকায় এক নিবন্ধে বলা হয়: “যতদিন মাতা শিক্ষিতা না হইবে ততদিন পুত্র শিক্ষিত হইবে না। যতদিন এইরূপে সমাজ শিক্ষিত হইতে না পারিবে ততদিন আমরা আমাদের পূর্ব্বগুণাধিকারীও হইতে পারিব না। আমরা ভীরু, মূর্খ, হিতাহিত জ্ঞান-হীন, ইহার জন্য দায়ি কে?” নিবন্ধে আরো বলা হয়, সুশিক্ষিত হওয়ায় ইংরেজ মায়েরা তাদের পুত্রদের অতি শৈশব কালেই শিক্ষা দিতে পারে এবং তাদের বিশ্বজয়ে উদ্বুদ্ধ করতে পারে। আর আমাদের মায়েরা অশিক্ষিতা হওয়ায় তাদের সন্তানদের শিক্ষা দিতে পারে না, তাদের মধ্যে কোনো উচ্চাকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করতে পারে না। বরং শিশু মনে “কাঁদিসনারে যাদুমনি, ভূত এসে নিয়ে যাবে” মন্ত্রের বীজ অঙ্কুরিত করিয়া দেয়। এরূপ বাস্তবতায় নিবন্ধকার লিখেন, গুণহীনা মাতার সন্তান হিসেবে আমরা কিভাবে উন্নত জাতি হতে পারি? মুসলিম সমাজকে হতাশাজনক অমানিশার অন্ধকার থেকে মুক্ত করে আলোর পথে আনার লক্ষ্যে নারীশিক্ষার প্রসারে মুসলিম সমাজপতিদের এগিয়ে আসার জন্য নিবন্ধকার আহ্বান জানিয়ে লিখেন, নারী শিক্ষিত হলে “নিজের সাহায্যে, দশের সাহায্যে, এমনকি রাজার সাহায্যেও নিজেকে লাগাইতে পারিবে। অমানিশা কাটিয়া যাইবে।”[৩৪]

মাকে বলা হয় একজন শিশুর শিক্ষার প্রধান পরিচালক। কারণ শিশুকাল হতে ৫/৬ বৎসর পর্যন্ত সন্তান মাতার নিকটই বেশির ভাগ সময় কাটায়। কাজেই শিশু বয়সে সন্তান মাতার নিকট হতে যেরূপ শিক্ষা পায়, শিশুর চিত্তে চিরকাল তা স্থায়ী হয়। *নবনূর* পত্রিকায় প্রকাশিত ‘আমাদের অবনতি’ শীর্ষক এক নিবন্ধে ইমদাদুল হক

---

৩২. মোঃ আহাদ আলী, *শরীয়তে এসলাম*, ভাদ্র, ১৩২০ বঙ্গাব্দ

৩৩. *রোকেয়া রচনাবলী*, আবদুল কাদির (সম্পাদিত), ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫, পৃ. ৫৩

৩৪. এম আহমদ, ‘ওহদের যুদ্ধ ও মোসলেম রমণী’, *সাধনা*, ১মবর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ১৩২৬ (১৯১৯), পৃ. ২৪২

বিষয়টি সম্পর্কে মুসলিম সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নারীশিক্ষায় মনোযোগী হওয়ার জন্য তাদের প্রতি আহবান জানান।[৩৫]

নর-নারী সমাজের ধারা রক্ষার জন্য সন্তান উৎপাদন করেন। সেই সন্তানকে এমনভাবে শিক্ষা দেয়া উচিত, যাতে সে সন্তান মানসিক ও শারীরিক শক্তি দ্বারা সমাজের ও নিজের উন্নতি করতে পারে। আর এমন শিক্ষার শুরুটা হবে শৈশবে মায়ের নিকট থেকে। কিন্তু মা নিজে সুশিক্ষিত না হলে, কি করে তিনি সন্তানকে সুশিক্ষা দিবেন? অতএব যে নারী ভবিষ্যতে মা হবেন- সন্তানের মা হয়ে সেই সন্তানের উপযুক্ত লালন-পালনের পাশাপাশি তাকে যেন সুশিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করতে পারেন, সেরূপ শিক্ষা তাকে দেয়ার আহবান জানানো হয়েছিল *ভারতবর্ষ* পত্রিকায় প্রকাশিত অন্য একটি নিবন্ধে।[৩৬] মাতৃশিক্ষা হলো শিশু শিক্ষার মূল। তাই মায়ের শিক্ষার প্রতি গুরুত্বারোপ করে *মাসিক মোহাম্মদী* পত্রিকায় প্রকাশিত এক নিবন্ধে বলা হয়:

> যে শিশু দশমাস দশদিন ধরে অশিক্ষিতা অজ্ঞ নারীর শোণিতপান পূর্বক ভুমিষ্ঠ হয়ে আবার ৪/৫ বৎসর পর্য্যন্ত একাধারে তাকেই অনুকরণ করতে থাকবে, তার যে অশিক্ষা বা অজ্ঞ মাতার কুশিক্ষাই মজ্জাগত হয়ে যাবে, তা আর বিচিত্র কি? এই জন্মগত বস্তুটি কি ৩/৪ বৎসরের প্রাথমিক শিক্ষাতেই দূরীভূত হয়ে যাবে বলে মনে হয়? বলতে পারেন, উচ্চশিক্ষার আলোতে এই আঁধার দাঁড়াতে পারে না। কিন্তু কয়জনের ভাগ্যে সেই উচ্চশিক্ষা জুটবে!--- শিশুর মহত্ত্ব ও বীরত্ব সবই মাতার শিক্ষা ও কমকুশলতার উপর নির্ভর করে। এক কথায় মাতৃশিক্ষায় শিশুশিক্ষার মূল।[৩৭]

সন্তানের আদি গুরু মায়ের কোলে বসে সন্তান যা কিছু শিক্ষালাভ করে তা তার জীবনে স্থায়ীভাবে থেকে যায়। এ প্রসঙ্গে *সহচর* পত্রিকায় প্রকাশিত 'স্ত্রীশিক্ষা' প্রবন্ধে[৩৮] বিষয়টি উল্লেখ করে শিশুর ভবিষ্যত মঙ্গল চিন্তা করে হলেও মায়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা করার জন্য বাঙালি মুসলিম সমাজের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। এ প্রসঙ্গে *সওগাত* পত্রিকায় প্রকাশিত 'শিক্ষকতা কাজে নারী' শিরোনামের নিবন্ধে বলা হয়, "মা-ই সন্তানের মনে জ্ঞানের আকাঙ্খা ও পিপাসা জাগাতে পারেন। এই দিক থেকে আধুনিক শিক্ষায় পুরুষের চেয়ে নারীর উপযোগিতাই বেশি।"[৩৯] মা'দের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে মুসলিম সমাজকে সচেতন ও আগ্রহী করার উদ্দেশ্যে *সওগাত* পত্রিকাসহ সমকালীন অনেক পত্রিকায় এমন অনেক প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রকাশ করা হয়েছিল।[৪০] এ বিষয়ে কেবল পুরুষদের উপর নির্ভর না করে নারী সমাজকেও যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যও আহ্বান জানানো হয়। এ প্রসঙ্গে *শরিয়তে-এসলাম* পত্রিকার একটি নিবন্ধে বলা হয়, "ভগ্নিগণ! তোমরাও আর নীরব

৩৫. মৌলভী ইমদাদুল হক, 'আমাদের অবনতি, *নবনূর*, প্রথমবর্ষ , ২য় সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩১০, পৃ. ৪৭

৩৬. *ভারতবর্ষ*, ৫ম বর্ষ, ১ম খণ্ড, তৃতীয় সংখ্যা, ১৩২৪ (১৯১৭), পৃ. ৪৪৫

৩৭. মিসেস এ আর নিজাম, 'পল্লী জাগরণ', *মাসিক মোহাম্মদী*, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪০ (১৯৩৩), পৃ. ৫৬১

৩৮. মোহাম্মদ কসিমউদ্দিন বসিরী, 'স্ত্রীশিক্ষা', সহচর, ২য়বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, শ্রাবণ, ১৩৩০, পৃ. ৩৮৮

৩৯. আনোয়ারা চৌধুরী, বি.এ. বি. টি 'শিক্ষকতা কাজে নারী', *সওগাত*, ২৬শ বষ, ৩য় সংখ্যা, পৌষ, ১৩৫০ (১৯৪৩-৪৪), পৃ. ২২৭

৪০. দ্রষ্টব্য, তাহমিনা আলম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭০-৭২

থাকিও না, যদি তোমরা সন্তানকে শিক্ষিত ও ধার্মিক দেখিতে চাও তাহা হইলে তোমরা একবার একযোগে খোদার ওয়াস্তে লেখাপড়া শিক্ষা করিতে যত্নবতী হও।"[৪১]

শুধু সন্তানের শিক্ষা, উন্নয়ন এবং কল্যাণের জন্য যে কেবল নারীশিক্ষা অত্যাবশ্যক নয়, এর যে আরো বহুমুখী প্রয়োজনীয়তা রয়েছে সে ব্যাপারেও বাঙালি মুসলিম সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাদের সচেতন করার প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। মানুষের প্রথম আশ্রয় হলো তার পরিবার বা সংসার। একজন শিক্ষিত নারীর পক্ষেই একটি পরিবার বা সংসারকে সুখময় করে তোলা সম্ভব। একজন বিদুষী নারী যে সংসার জীবনকে অধিকতর সুখময় করে তুলতে পারে- সে কথা উল্লেখ করে খায়রুন্নেসা খাতুন *নবনূর* পত্রিকায় লিখিত এক নিবন্ধে মুসলিম সমাজকে নারীশিক্ষায় অধিকতর মনোযোগী হওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন।[৪২] প্রায় একই রকম বক্তব্য দেখা যায় *জাগরণ* পত্রিকায় প্রকাশিত খুরশিদ জাহা বেগমের নিবন্ধেও। তাঁর মতে নারী শিক্ষিত হলে "সংসারের শান্তি সৌন্দর্য্য সহস্র প্রকারে বাড়িবার সম্ভাবনা।"[৪৩] ফররোখ আহমেদ নেজামপুরী *সাধনা* পত্রিকায় 'মোসলমান স্ত্রীশিক্ষা' নামক একটি নিবন্ধে পারিবারিক কল্যাণ ও মঙ্গলের জন্য নারীশিক্ষার উপর বিশেষ জোর দেন। তিনি বলেন, "স্ত্রী যদি শিক্ষিত হয় তবে নিজ হাতে জমা খরচ লিখিয়া রাখে এবং সকল উপলক্ষে পরিণাম ভাবিয়া খরচ করে। ইহাতে মানুষ ধনবান হইতে পারে।"[৪৪] এ প্রসঙ্গে মোসাম্মৎ রিজিয়া খাতুন লিখেন "সাংসারিক কর্মে স্ত্রীজাতির যথারীতি সাহায্য না পাইলে সংসার সুচারুরূপে নির্বাহ করা সুকঠিন। এমনও দেখা যায় যে, সুশিক্ষিত পত্নী দুষ্ক্রিয়াক্রান্ত পতিকেও পাপ পঙ্ক হইতে উদ্ধার করিয়া থাকেন।"[৪৫] সুখী ও সমৃদ্ধ দাম্পত্য জীবন মানুষের জীবনে পরম আরাধ্য। এই দাম্পত্য জীবনকে সুখী ও স্বাচ্ছন্দ্যময় করার জন্যও নারীশিক্ষার প্রয়োজন নারী ও পুরুষের অসম শিক্ষার ফলে স্বামী-স্ত্রী একে অপরকে যথাযথভাবে বুঝতে পারে না। এর ফলে দাম্পত্য জীবন যে সুখময় হয় না এই বিষয়ে ইঙ্গিত করে *নারায়ণ* পত্রিকায় 'নারীর উক্তি' নামক একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়।[৪৬]

দাম্পত্য জীবনে সুখ ও পরিবারের সামগ্রিক কল্যাণের জন্য হলেও নারীশিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন বলে *সওগাত* পত্রিকায় এক নিবন্ধে উল্লেখ করা হয়। নিবন্ধটির ভাষ্য মতে, "ঘরে কি নারীর কর্ত্তব্য শুধু সন্তান পালন, সন্তান উৎপাদন, আর রাঁধা বাড়া করা। আর কি কোন কর্ত্তব্য নাই।" স্ত্রী বিচক্ষণ বুদ্ধিমান ও শিক্ষিত না হলে পারিবারিক জীবনে অনেক অসুবিধা হয়। পূর্বোক্ত নিবন্ধে আরো বলা হয়, "পুরুষের সাম্রাজ্য আপন পরিবার,

---

৪১. মোসাম্মৎ রহিমা খাতুন, 'স্ত্রীশিক্ষা ও সমাজ', *শরিয়তে-এসলাম*, ২য়বর্ষ, ১ম সংখ্যা, মাঘ, ১৩৩৩, পৃ. ১২

৪২. খায়রুন্নেসা খাতুন, 'আমাদের শিক্ষার অন্তরায়', *নবনূর*, ২য়বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ১৩১১, পৃ. ৩৬৮

৪৩. উদ্ধৃতি, তাহ্‌মিনা আলম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭২-৭৩

৪৪. তাহ্‌মিনা আলম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭২-৭৩

৪৫. মোসাম্মৎ রিজিয়া খাতুন, 'স্ত্রীশিক্ষা, *শরিয়ত*, ২য়বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, শ্রাবণ, ১৩৩২, পৃ. ৮৫

৪৬. 'নারীর উক্তি', *নারায়ণ*, ৭ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ফল্গুন, ১৩২৭, পৃ. ৪০৮

পত্নী পরিবারের সম্রাজ্ঞী, পুরুষ অর্থ সঞ্চয় করেন, নারী রক্ষণাবেক্ষণ করেন। ঘরে যদি গৃহিণী উপযুক্তা না হন, তবে পুরুষের শান্তি কোথায়?"[৪৭] দাম্পত্য ও পারিবারিক জীবনকে সুখ ও স্বচ্ছন্দ্যময় করার জন্য নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে নুরুন্নেসা খাতুন লিখেন, "অশিক্ষিত নারী গৃহে যে কতখানি অশান্তি আনয়ন করে এবং শিক্ষিতাদের দ্বারা সংসার যে কতটা সুনিয়ন্ত্রিভাবে চলে, তা বলাই বাহুল্য।"[৪৮] একই নিবন্ধে তিনি আরো লিখেন, মেয়েদের লেখাপড়া শেখানো প্রত্যেক পিতামাতার অবশ্য কর্ত্তব্য। কারণ মানুষকে আল্লাহ প্রদত্ত বুদ্ধি বা বিবেকের বিকাশ সাধনের জন্যই জ্ঞানচর্চা আবশ্যক। *মহিলা সওগাত* পত্রিকায় 'মুসলিম সমাজের উন্নতির অন্তরায়' শিরোনামে এক নিবন্ধে আয়েষা আহমদ লিখেন, "শিক্ষিতা গৃহিণী, শিক্ষিতা জননী যেমন গৃহের শ্রীবর্দ্ধন করিবেন, পরিজনগণের কল্যাণ বিধান করিবেন, জননীরূপে সন্তানের জীবনগঠনে সহায়তা করিবেন, তেমনই তাহারা বহুমুখী কার্য্যকুশলতা দ্বারা নিজ সমাজের মঙ্গলের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকিবেন।"[৪৯]

সে সময় বাঙালি মুসলিম সমাজে এ ধারণা বদ্ধমূল ছিল যে, নারীর বিচরণ ক্ষেত্র হলো পরিবার। তাদের চাকুরি বা অর্থ উপার্জনের প্রয়োজন নাই। আর যেহেতু তারা ঘরেই থাকবে এবং অর্থ উপার্জন করবে না, তাই তাদের শিক্ষারও কোনো প্রয়োজন নাই। বাঙালি মুসলিম সমাজের বিশেষ করে, পুরুষদের এই মানসিকতার বিরোধিতা করে নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে সমাজকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য অনেকেই পত্রিকায় নিবন্ধ লিখেন। এসব নিবন্ধের মূল সুর ছিল, লেখা পড়ার উদ্দেশ্য কেবল উপার্জন করাই নয়, গৃহকার্য সুসম্পন্ন করা, বিশেষ করে মনের অন্ধকার দূর এবং মনুষ্যত্বের বিকাশের জন্যও শিক্ষার প্রয়োজন।[৫০] শিক্ষার উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে নারী জাগরণের অগ্রদূত রোকেয়া বলেন, "টাকা উপার্জন করাই যে শিক্ষালাভের মূল উদ্দেশ্য, ইহা আমি কোনকালেই স্বীকার করি নাই। শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য মানুষকে মানুষ করিয়া গড়িয়া তোলা। আবার কেবল বি.এ., এম.এ. পাশ করিলেও অনেক স্থলে প্রকৃত শিক্ষা হয় না। লেখাপড়া পরীক্ষা পাশের জন্য না হইয়া জ্ঞান লাভের জন্য হওয়া উচিত।"[৫১] শিক্ষা যে শুধু জীবিকা উপার্জনের মাধ্যম নয় রোকেয়ার উপরোক্ত বক্তব্য থেকে বোঝা যাচ্ছে। শুধু পুঁথিগত বিদ্যাই নয়, মেয়েদের নানাভাবে দেশ ও জাতির সেবা এবং পরোপকার ব্রতে উদ্বুদ্ধ করে তোলাও শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্যের অন্যতম হাওয়া উচিত বলে তিনি মনে করতেন। উপার্জন করবে না বলে নারীর শিক্ষার প্রয়োজন নেই এরূপ ধারণাকে ভ্রান্ত উল্লেখ করে *সহচর* পত্রিকায় লিখিত একটি নিবন্ধে কসিমউদ্দিন লিখেন:

---

৪৭. সৈয়দা জয়নব খাতুন, 'বঙ্গ-মুসলিম পল্লী-নারী', *সওগাত*, ভাদ্র, ১৩৩৬, পৃ.৭-৮

৪৮. নুরুন্নেসা খাতুন, 'স্ত্রীশিক্ষা', *মহিলা সওগাত*, ভাদ্র, ১৩৩৬; উদ্ধৃত, মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন (সম্পা.), *বাংলা সাহিত্যে সওগাত যুগ*, পৃ. ৫০৬

৪৯. উদ্ধৃত, মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন (সম্পা.), *বাংলা সাহিত্যে সওগাত যুগ*, পৃ. ৫০৫

৫০. মোঃ আহাদ আলী,' শ্রীশিক্ষা', *শরিয়তে-এসলাম*, ৫ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, বৈশাখ, ১৩৩৭, পৃ. ৮৪; 'চিন্তাধারা (স্ত্রীশিক্ষা)', *নূর*, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, মাঘ, ১৩১৬ (১৯৯০), পৃ. ৭০-৭১

৫১. উদ্ধৃত শামসুন্নাহার মাহমুদ, *রোকেয়া জীবনী*, ঢাকা, ১৯৫৮,পৃ. ৫৬

উপার্জ্জন করিবার নিমিত্তই কি কেবল শিক্ষার প্রয়োজন?--- শিক্ষা প্রাপ্ত না হইলে চরিত্রে মাহাত্ম্যের সমাবেশ হইবে কি প্রকারে? ভাল-মন্দ জ্ঞান জন্মাইবে কোথা হইতে? আমরা নারী জাতিকে নিরক্ষর করিয়া অন্তঃপুর মধ্যে সংঘবদ্ধ করিয়া রাখি। কোন প্রকার মহৎ ভাব তাহাদের চরিত্রে ফুটিতে পারে না, মানব জীবনের উচ্চ লক্ষ্য উচ্চাকাঙ্খা তাহারা আদৌ ধারণা করিতে পারে না, ধর্মের অমিয় মাধুর্য্য তাহারা বুঝিতে সমর্থ নহে।[৫২]

নারীশিক্ষা সম্পর্কে রক্ষণশীল পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার বিরোধিতা করে *মাসিক মোহাম্মদী* পত্রিকায় প্রকাশিত 'নারীশিক্ষা' শীর্ষক প্রকাশিত এক রচনায় বেগম আহসানউন্নিসা লিখেন:

আমাদের মুসলমান পুরুষরা চান নারীকে শুধু ঘরের মধ্যে সন্তান আর সংসার দিয়ে আবদ্ধ রাখতে। অর্থাৎ তারা মনে করেন যে, বাইরের কোন কাজে বা শিক্ষাক্ষেত্রে নারীর আদৌ অধিকার নেই। পৃথিবীতে নারী পুরুষের বিশেষতঃ শিক্ষাক্ষেত্রে যে সমান অধিকার, কোরানের এই কথাটি আমাদের সমাজের স্বার্থপর পুরুষরা আদৌ জানে না। বা জেনে থাকলেও সম্পূর্ণ ভুলে গেছেন বলে মনে হচ্ছে।--- আমি আমার মুসলিম ভাইদের মতের বিরুদ্ধে না গিয়ে তাদের সুরেই বলছি যে, "নারীর কাজ ঘর সন্তান- সংসার নিয়ে, সমরক্ষেত্রে নয়" কিন্তু প্রশ্ন করি, এই সংসার সন্তান নিয়ে, সুখের ও আদর্শ জীবনযাপন করার শিক্ষাই বা আজ আমাদের মুসলিম নারী পাচ্ছে কোথায়? আজও তো শত শত ঘর বা পরিবার ভেঙ্গে যাচ্ছে আদর্শ নারীশিক্ষার অভাবে, আদর্শ জীবনযাত্রা নির্বাহ করার শিক্ষার অভাবে।[৫৩]

নারী শিক্ষিত হলে চারিত্রিক স্খলন ঘটবে, সংসারে অনাচার ও অনর্থ হবে, এরূপ সামাজিক মানসিকতা বিশ শতকেও বাঙালি মুসলিম মননে বিদ্যমান থাকায় নারীশিক্ষা ব্যাহত হচ্ছিল। এ অবস্থায় নারীকে শিক্ষার সুযোগ বঞ্চিত রেখে, গৃহাবদ্ধ করে রেখে তার চারিত্রিক নিষ্কলুষতা বজায় রাখার প্রয়াসের মধ্যে যে কোনো কৃতিত্ব নেই এমন বক্তব্যও নারীশিক্ষার সমর্থকদের মধ্যে দেখা যায়। এ প্রসঙ্গে মিসেস এম. রহমান লিখিত একটি নিবন্ধের কিছু অংশ উদ্ধৃত করা যায়। তিনি লিখেন:

কয়েদ রেখে যে সতীত্ব বজায় রাখতে হয়, সেই সতীত্বের মূল্য কি? মূর্খ মানুষের পদস্খলন হলে সে পাপের শেষ সীমাও ছাড়াইয়ে যায়, শিক্ষিত মানুষ, যার পাপকে পাপ জ্ঞান করবার ক্ষমতা আছে সে পাপ থেকে নিজেকে উদ্ধার করতে পারে। নারীর আত্মায় জাগরণ দিয়ে অন্ধকারে পাঠাইয়া দাও, নিজেই সে নিজেকে রক্ষা করবে। নারীও মানুষ, শুদ্ধ জীবনের মর্য্যাদা বোঝবার ক্ষমতা তারও আছে।[৫৪]

তিনি আরো লিখেন, জ্ঞানের আলোয় নারীকে আলোকিত করে যদি উপযুক্ত করে গড়ে তোলা যায়, তবে সে যেমন নিজের জীবিকার ব্যবস্থা করতে পারবে এবং কখনই সে এমন কাজ করবে না, যাতে তাকে বিবেকের কাছে লজ্জিত হতে হবে।[৫৫] বিদ্যা যে মানুষকে পঙ্কিলতার পথে নেয় না, বরং সুপথে চালিত করে। এ বিষয়টি উল্লেখ করে *সাধনা* পত্রিকায় প্রকাশিত একটি নিবন্ধে বলা হয় যে, "এলেম এমন একটি নূর যাহা মূর্খতার

---

৫২. মোহাম্মদ কসিমউদ্দিন, *নারী*, *সহচর*, ২য় বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩০, পৃ. ২৬৪

৫৩. বেগম আহসানউন্নিসা, 'নারীশিক্ষা', *মাসিক মোহাম্মদী*, ১৯শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ভাদ্র, ১৩৫৩, পৃ. ১৪৫

৫৪. মিসেস এম রহমান, 'নারীর কথা', *সহচর*, ২য় বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, বৈশাখ, ১৩৩০ (১৯৯৩), পৃ. ২২

৫৫ ঐ

তিমির রাশি দূর করিয়া মানুষকে গোমরাহীর পঙ্কিল কূপ হইতে বাঁচাইয়া মনুষ্যত্বের রাস্তায় চালিত করে।”[৫৬] শিক্ষিত হলে নারীর কমনীয়তা, নমনীয়তা, লজ্জাশীলতা প্রভৃতি গুণ নষ্ট হয়ে যাবে এবং ভালো করতে যেয়ে বিপরীত ফলবে অর্থাৎ অশান্তি ও অনাচারের আঘাতে সমাজে নৈরাজ্য তৈরি হবে-রক্ষণশীল পুরুষ সমাজের এরূপ মনোভাবের বিরোধিতা করে *মাসিক মোহাম্মদী* পত্রিকায় প্রকাশিত এক নিবন্ধে এ মনোভাবকে নিতান্ত ভুল ও জঘন্য অনিষ্টকর বলে আখ্যায়িত করা হয়। এর মাধ্যমে ক্রমশ “সমাজকে ঘোর অন্ধকারের দিকেই টেনে” নেয়া হচ্ছে বলে নিবন্ধে উল্লেখ করা হয়। নিবন্ধে নারীকে “সহধর্ম্মীনী, সহকর্ম্মিনী ও অর্দ্ধাঙ্গিনী” মনে করে তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করার জন্য পুরুষদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়।[৫৭] এ প্রসঙ্গে একটি নিবন্ধে বলা হয়, “পুরুষের এই ধারণা একেবারে অমূলক। ইসলামের অতীত যুগের আদর্শ শিক্ষিতা মহিলাদের সকলেই আদর্শ জননী, ভগিনী ও জায়া রূপেই প্রসিদ্ধ লাভ করিয়াছিল। তাদের কারও চরিত্রে যে কলঙ্কের কোন ছায়া স্পর্শ করিয়াছিল ইতিহাস তেমন সাক্ষ্য অবশ্য বহন করে না।”[৫৮] “শিক্ষার আলো পাইলে নারীর মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা দিবে, পতি-ভক্তি কমিয়া যাইবে, এই ধারণা অমূলক”- এমন মন্তব্য করেছেন ফিরোজা বেগম। তিনি লিখেন, “তাহারা এ কথা ভাবিয়া দেখেন না যে, নারী জাতিকে প্রকৃত শিক্ষা দেয়া হইলে তাহারা শুধু উপযুক্ত গৃহিনী বা মাতা হইয়া উঠে না, সঙ্গে সঙ্গে তাহার স্বামীর উপযুক্ত পরামর্শ দাত্রী ও সত্যিকার সহধর্ম্মিনী হইয়া ওঠে। আজ মুসলিম মাতা-ভগিনীদের শিক্ষা চাই মুক্তি চাই।” তিনি আরো লিখেন, “মোসলেম নারী-সমাজের প্রয়োজনীয় কথা অনেক। কিন্তু নারীশিক্ষার বাণীই তাদের মর্ম্মবাণী।”[৫৯] শিক্ষিত হলে নারী জাতি বিপথে পরিচালিত হবে- নারীদের শিক্ষার ব্যাপারে এরূপ মনোভাব ত্যাগ করে সমাজ ও জাতির কল্যাণে তাদের শিক্ষার সুবন্দোবস্ত করার জন্য আরো অনেকেই তাদের লেখনির মাধ্যমে মুসলিম সমাজকে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করেন।[৬০]

সমকালীন বিশ্বে যখন নারী জাগরণ এবং নারীশিক্ষায় বিপ্লব ঘটে যায়, এমনকি ভারতের হিন্দু সমাজেই যখন নারীশিক্ষায় বিশেষ অগ্রগতি সাধিত হয়েছে, সে সময় বাঙালি মুসলিম সমাজে নারীশিক্ষার পশ্চাদপদতা বাংলার প্রগতিশীল মুসলিম মননকে ব্যাথিত করে ছিল। এ প্রসঙ্গে কবি কাজী নজরুল ইসলাম লিখেন, “কন্যাকে পুত্রের মতই শিক্ষা দেওয়া যে আমাদের ধর্মের আদেশ তাহা মনেও করিতে পারি না। আমাদের কন্যা-জায়া-জননীদের শুধু অবরোধের অন্ধকারে রাখিয়াই ক্ষান্ত হই নাই, অশিক্ষার গভীরতর কূপে ফেলিয়া

---

৫৬. ফররোখ আহমদ নেজামপুরী, ‘মোসলমান স্ত্রীশিক্ষা’, *সাধনা*, ১ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ভাদ্র, ১৩২৬, পৃ. ১৫২-১৫৩

৫৭. বেগম আহসানউন্নিসা, ‘নারীশিক্ষা’, *মাসিক মোহাম্মদী*, ১৯শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ভাদ্র, ১৩৫৩, পৃ. ১৪৫

৫৮. ‘নারীর উক্তি’, *নারায়ণ*, ৭ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ফাল্গুন, ১৩২৭, পৃ. ৪১৪

৫৯. ফিরোজা বেগম, ‘আমাদের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা’, মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন (সম্পা.), *বাংলা সাহিত্যে সওগাত যুগ*, পৃ. ৫০৬

৬০. এসব লেখনির কয়েকটি দৃষ্টান্তের জন্য দ্রষ্টব্য, তাহমিনা আলম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৮৩-৮৫

হতভাগিনীদের চিরবন্দিনী করিয়া রাখিতেছি।"[৬১] নজরুল বাঙালি মুসলিম নারীর এই অবস্থা দেখে আক্ষেপ করেছিলেন। এরূপ বাস্তবতায় অনেকেই নিজেদের লেখনির মাধ্যমে নারীশিক্ষার প্রসারে বাঙালি মুসলিমদের সচেতন করার চেষ্টা করেন। এর প্রমাণ পাওয়া যায় *আল-এসলাম, সওগাত, মাসিক মোহাম্মদী, শরিয়তে এসলাম ও হেদায়েত* ইত্যাদি জনপ্রিয় পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন নিবন্ধে।[৬২] এসব নিবন্ধে নারীশিক্ষা সম্পর্কে মহানবী হজরত মোহাম্মদ (সা.) এর নির্দেশনা এবং ইসলামের প্রাথমিক যুগে নারীশিক্ষার দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে তুরস্কসহ সমকালীন মুসলিম বিশ্বের কোনো কোনো দেশে নারীশিক্ষার বাস্তব চিত্র তুলে ধরে বাঙালি মুসলিম সমাজকে এ বিষয়ে মনোযোগী হওয়ার পরামর্শ দেয়া হয়। এ প্রসঙ্গে *সওগাত* পত্রিকার একটি নিবন্ধের উদ্ধৃতি উল্লেখ করা যেতে পারে। এতে বলা হয়:

> স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধেও মুসলমান সমাজ বর্ত্তমানে অবিকল সেই ভুলই করিতেছে। স্ত্রীজাতিকে পুরুষের অনুরূপ শিক্ষাদান করিতে হইবে ইহা শরীয়তের সুস্পষ্ট নির্দেশ; ---পৃথিবীর সমস্ত মুসলমানই জাগিয়া নূতন কর্মক্ষেত্রে ঝাপাইয়া পড়িয়াছে। স্ত্রীজাতিকে জীবন-সঙ্গিনী করিয়াই তাহারা আজ নূতন সংগ্রামের সম্মুখীন হইয়াছে। তাই আমরা আজ দেখিতেছি,- তুরস্ক, মিশর, পারস্য, আফগানিস্তানে স্ত্রীশিক্ষার বিপুল সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। --- কিন্তু আমাদের পরাধীন ভারতবর্ষে কি হইতেছে?[৬৩]

বাঙালি মুসলিমদের কল্যাণের জন্য নারীশিক্ষার ব্যবস্থা করার প্রতি সচেষ্ট হওয়ার আহবান জানিয়ে একই নিবন্ধে বলা হয়, "স্ত্রীজাতির শিক্ষার ব্যবস্থা করিতেই হইবে, অন্যথায় কোন জাতিরই কল্যাণ হয় নাই– বাঙ্গালী মুসলমানেরও হইবে না।" অনুরূপ বক্তব্য পাওয়া যায় *শরিয়তে-এসলাম* পত্রিকায় প্রকাশিত 'স্ত্রীশিক্ষা ও সমাজ' নামক একটি নিবন্ধে। এতে মুসলিম সমাজকে রক্ষার জন্য 'মাতৃজাতিকে' শিক্ষিত করার জন্য আহ্বান জানানো হয়। এতে নারী সমাজকে শিক্ষিত করার জন্য পাড়া ও গ্রামে গ্রামে বালিকা মক্তব ও নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করে অথবা গৃহ শিক্ষক নিযুক্ত করে নারীদের শিক্ষার ব্যবস্থা করার জন্য পরামর্শ প্রদান করা হয়।[৬৪] তুলনামূলকভাবে অস্বচ্ছল মুসলিম পরিবারের নারীদের শিক্ষার বন্দোবস্ত করার জন্য এ সময় অনেকেই সরকারের আর্থিক আনুকূল্যও দাবি করেছিলেন।[৬৫]

বিশ শতকেও বাল্য বিবাহ, পর্দা বা অবরোধ প্রথা এবং মোল্লাতন্ত্রের বিরোধিতা ইত্যাদি বাঙালি মুসলিম সমাজে নারীশিক্ষার অন্তরায় ছিল। এসব যে বাঙালি মুসলিম নারীদের শিক্ষার পথে দুর্ভেদ্য প্রাচীর রূপে দাঁড়িয়েছিল এ কথা রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন ও ফজিলাতুন্নেসাসহ সমকালীন অনেক লেখকের লেখায়

---

৬১. কাজী নজরুল ইসলাম, 'তরুণের সাধনা', *নজরুল রচনাবলী*, (আনিসুজ্জামান ও অন্যান্য সম্পা.), চতুর্থ খণ্ড, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩, পৃ. ৯৬

৬২. এতদবিষয়ে বিস্তারিত দ্রষ্টব্য তাহ্‌মিনা আলম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭৬-৭৯

৬৩. 'বিবিধ প্রসঙ্গ (স্ত্রী শিক্ষা)', *সওগাত*, ৪র্থ বর্ষ ১১শ সংখ্যা, বৈশাখ, ১৩৩৪, পৃ. ৮১২

৬৪. মোসাম্মৎ রহিমা খাতুন, 'স্ত্রীশিক্ষা ও সমাজ, *শরিয়তে-এসলাম*, ২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, মাঘ, ১৩৩৩, পৃ. ৯৫

৬৫. শামসুন্নাহার মাহমুদ, 'মুসলিম বঙ্গে স্ত্রীশিক্ষা, *মাসিক মোহাম্মদী*, ১৫শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, কার্ত্তিক, ১৩৪৭, (১৯৪০), পৃ. ৫

পাওয়া যায়।[৬৬] এ সব লেখায় কতগুলো সামাজিক কুপ্রথাকে ধর্মের অঙ্গ হিসেবে আখ্যায়িত করে মুসলিম নারীদের শিক্ষার পথকে রুদ্ধ করার অপচেষ্টার প্রতিবাদ করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, নারীশিক্ষার অন্তরায় সামাজিক কুপ্রথাগুলোকে উপড়ে ফেলে নারীশিক্ষার প্রসারে কাজ করার জন্য অনেকেই তরুণ সমাজের প্রতি আহ্বান জানান। এর যে কিছু ইতিবাচক ফল মুসলিম সমাজে পড়েছিল, এতে কোনো সন্দেহ নেই। ফজিলাতুন্নেসা ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মুসলিম ছাত্রী। *সওগাত* পত্রিকার সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন তাঁকে "মুসলিম সমাজের অগ্রপথিক ও দুঃসাহসী মেয়ে" বলে আখ্যায়িত করেন।[৬৭] তৎকালীন বাঙালি মুসলিম সমাজের ভ্রুকুটি উপেক্ষা করে তিনি বোরকা ও ঘোমটা ছাড়াই বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস করতেন। পর্দার অন্তরালে নারীদের আবদ্ধ করে রাখার ব্যাপারে তিনি ছিলেন এক প্রতিবাদী কণ্ঠ। সমাজের অর্ধেক নারীদের উপেক্ষা করে, অস্তিত্বহীন রেখে বাঙালি মুসলিম সমাজের উন্নতির প্রচেষ্টায় তিনি হতাশা ব্যক্ত করেছেন। তিনি মনে করতেন, বন্দীখানায় মেয়েদিগকে জগতের আলো-বাতাসের সৌন্দর্য থেকে বঞ্চিত করে, নারীর মনের দ্বারে জ্ঞানের আলো প্রবেশ করতে দিচ্ছে না। তাঁর মতে, মুসলিম ধর্মশাস্ত্রে নারীকে খাঁচার ভেতর আবদ্ধ করে রাখার কথা বলা হয়নি, বরং তাকে তার প্রাপ্য অধিকার দেয়ার কথা বলা হয়েছে। তিনি বাঙালি মুসলিম নারীদের সুশিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে তার অধিকার বুঝে নেয়ার এবং তদানুসারে ভালো-মন্দ বুঝে চলার স্বাধীনতা অর্জনের পরামর্শ দেন।[৬৮] তিনি লিখেন: "যে কারা-শৃঙ্খল মুসলমান নারীর পায়ে পরিয়ে তাকে আজ সমস্ত সভ্য জগতের নারীর সামনে দীন হীনা করে রাখা হয়েছে, সে-শৃঙ্খল ভেঙ্গে ফেলতে হবে, চূর্ণ-বিচুর্ণ করতে হবে। হয়ত তার পা কেটে ক্ষত বিক্ষত হবে, তবু অপমানের হাত থেকে- লজ্জার হাত থেকে নারী মুক্ত হবে, এই তার জয়-গর্ব্ব।"[৬৯]

ফজিলাতুন্নেসার মতে, কারা- শৃঙ্খল যে কেবল নারীকেই তার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রেখেছে, তা নয়; সমস্ত মুসলিম সমাজকেও এটি ধ্বংসের মুখে টেলে দিচ্ছে। নারী জাতির অগ্রগতির পথে অন্তরায়সমূহ অপসারণে দেশের তরুণ সমাজকে এগিয়ে আসতে অনুরোধ করে তিনি লিখেন: "নারীর উন্নতির পথে এই যে শিক্ষার অভাবজনিত বিরাট বাধা, এটা ভেঙ্গে ফেলে দিতে সাহায্য করুন, প্রয়োজন হবে শুধু সাহস ও উৎসাহের; কিন্তু নবীনদের মধ্যে তো এর একটিরও অভাব নেই।"[৭০]

---

৬৬. এতদবিষয়ে কিছু দৃষ্টান্তের জন্য দ্রষ্টব্য, তাহ্‌মিনা আলম, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৪-৮৬

৬৭. মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন (সম্পা.), *বাংলা সাহিত্যে সওগাত যুগ*, পৃ. ৫৮২

৬৮. দ্রষ্টব্য দেবশ্রী মুখার্জি, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২২৪-২২৫

৬৯. ফজিলাতুন্নেসা, 'মুসলিম নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা', উদ্ধৃতি মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন, *বাংলা সাহিত্যে সওগাত যুগ*, পৃ. ৫০৩; দ্রেবশ্রী মুখার্জি, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২২৫

৭০. ফজিলাতুন্নেসা, 'মুসলিম নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা', উদ্ধৃত মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন, *বাংলা সাহিত্যে সওগাত যুগ*, পৃ. ৫৮২-৮৩

মহিলা সওগাত পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় 'পর্দা বনাম প্রবঞ্চনা' শিরোনামে মিসেস এম রহমানের একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। এতে তিনি লিখেন, "ইসলাম আমাদেরকে কারা প্রাচীরের ভিতর আবদ্ধ থাকতে, জড় পুত্তলিকার মত গৃহ সজ্জার উপরণ হয়ে থাকতে বলেনি, জ্ঞান লাভ অবশ্য কর্ত্তব্য বলে নির্দ্দেশ দিয়েছে।" তিনি ধর্মের দোহাই দিয়ে দুর্বল ও অসহায় নারী সমাজকে অবদমিত করে রাখার অপচেষ্টায় লিপ্ত সমাজপতিদের "ভন্ড, নরকের শয়তান" বলে আখ্যায়িত করেন।[৭১]

১৯২৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম হলের ছাত্ররা 'পর্দা বিরোধী সংঘ' নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।[৭২] সংগঠনটির মূল লক্ষ্য ছিল তৎকালীন সমাজে প্রচলিত পর্দপ্রথার উচ্ছেদ করে মুসলিম নারীদের মধ্যে শিক্ষা ও জাগরণের বিকাশ সাধন করা। বলা বাহুল্য যে, সমকালীন রক্ষণশীলসমাজ ব্যবস্থার রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে এ ধরনের পর্দপ্রথা বিরোধী একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা এবং মুসলিম নারী সমাজের শিক্ষা ও সামাজিক পরিবর্তন সাধনের প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে একটি দুঃসাহসী এবং নির্ভীক প্রয়াস ছিল।

এ সময় প্রগতিশীল বাঙালি মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের বক্তব্য এবং লেখনিতে নারীশিক্ষার বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণকারী ধর্মীয়গোষ্ঠী বা মোল্লা সমাজেরও কঠোর সমালোচনা করা হয়। নারীশিক্ষার বিরুদ্ধে ফতোয়াদানকারী মোল্লাদের রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন "ছদ্মবেশী শয়তান" বলে আখ্যায়তি করেছিলেন।[৭৩] 'আমাদের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা' শিরোনামে ফিরোজা বেগম নামক একজন মুসলিম লেখিকা মোল্লা সমাজকে বাংলার মুসলিম শিক্ষার সর্বাপেক্ষা প্রতিবন্ধক শক্তি হিসেবে আখ্যায়িত করেন।[৭৪] শুধু তারাই নন, সমকালীন মুসলিম প্রগতিশীল চিন্তক ও লেখক বুদ্ধিজীবীদের অনেকেই রক্ষণশীল মোল্লা সমাজের নারীশিক্ষা ও নারীকেন্দ্রিক বিভিন্ন বিষয়ে নানা অপপ্রচার ইত্যাদির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। 'কোন মোল্লায় অভক্তি' শিরোনামে এক নিবন্ধে ওমদাতুন্নেছা খাতুন লিখেন: যে সব মোল্লা চিন্তাশীল বিজ্ঞ ব্যক্তিদের প্রগতিশীল সমাজ হিতৈষণামূলক কাজের বিরোধিতা এবং নারীশিক্ষার বিরুদ্ধে ফতোয়া জারি করেন, সে সব অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত ধর্মব্যবসায়ী মোল্লাদের প্রতি তাঁর অভক্তি প্রকাশ করে তাঁদের বিনাশ কামনা করেছেন।"[৭৫]

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের শিষ্য বেগম শামসুন নাহার মাহমুদ নারীশিক্ষা প্রসারে অনন্য ভূমিকা পালন করেন। নারীশিক্ষা ও নারীমুক্তি বিষয়ে রোকেয়া যে নতুন আশার আলো জ্বালিয়েছিলেন শামসুন নাহার মাহমুদ তাঁকে প্রজ্জ্বলিত রেখেছিলেন। শিক্ষক ও সাহিত্যিক শামসুন নাহার মাহমুদ নারীশিক্ষা ও জাগরণের মুখপত্র

---

৭১. উদ্ধৃত, মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন, *বাংলা সাহিত্যে সওগাত যুগ*, পৃ. ৫০৬-৫০৭

৭২. মাসুমা খানম, *নজরুল চেতনায় নারী ও নারীত্ব*, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ২০০১, পৃ. ১৫

৭৩. শামসুন্নাহার মাহমুদ, *রোকেয়া জীবনী*, কলিকাতা, ১৯৪৯, পৃ. ৪৬

৭৪. ফিরোজা বেগম, 'আমাদের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা', মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন, *বাংলা সাহিত্যে সওগাত যুগ*, পৃ. ৫০৬

৭৫. ওমাদাতুন্নেছা খাতুন, 'কোন মোল্লায় অভক্তি', *মহিলা সওগাত*, ভাদ্র, ১৩৩৬; উদ্ধৃত, মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন, *বাংলা সাহিত্যে সওগাত যুগ*, পৃ. ৫০৬

বুলবুল পত্রিকা সম্পাদনার সাথেও যুক্ত ছিলেন। ছাত্রীদের শিক্ষা দেয়া র সময় শামসুন নাহার মাহমুদ শুধু পুঁথিগত শিক্ষা দিতেন না, ছাত্রীদের উদ্বুদ্ধ করতেন জ্ঞানের পথে, আলোর পথে এবং জাগরণের পথে। তিনি তাঁর শিক্ষার্থীদের নিজের পূর্ণসত্তাকে বিকশিত করতে উৎসাহিত করতেন। বস্তুত শামসুন্নাহর মাহমুদের প্রয়াস এবং সংগ্রাম ছিল নারীশিক্ষা ও জাগরণে সচেতনতা সৃষ্টির সংগ্রাম।[৭৬]

উপরের আলোচনায় দেখা যায় যে, বিশ শতকের প্রথমার্ধেও যখন বাঙালি মুসলিম সমাজে নারীশিক্ষার অগ্রগতি মোটেই সন্তোষজনক ছিল না, তখন মুসলিম সমাজের কতিপয় সচেতন নারী-পুরুষ নারীশিক্ষার প্রতি জনমত তৈরির লক্ষ্যে নিরবিচ্ছিন্নভাবে লেখনী ও বক্তৃতা-বিবৃতির মাধ্যমে প্রচারণা অব্যাহত রেখেছিলেন। শিক্ষাসহ নারীকেন্দ্রিক নানা সমস্যা ও সামাজিক কুপমন্ডুকতার বিরুদ্ধে সচেতন মুসলমানগণ রীতিমতো কলমযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। সমকালীন প্রগতিশীল জনমতের কণ্ঠস্বর বা মুখপত্র হিসেবে পরিচিত পত্র-পত্রিকা ও সাময়িকী এসব লেখা প্রকাশ করে সমাজের প্রতি তাঁদের দায়িত্ববোধ ও কর্তব্য নিষ্ঠার পরিচয় দেয়। এ ক্ষেত্রে মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন সম্পাদিত *সওগাত* পত্রিকা অসামান্য অবদান রাখে। ১৯২৯ সাল হতে *সওগাত* পত্রিকায় 'মহিলা সংখ্যা' শিরোনামে একাধিক বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল। এসব সংখ্যায় নারী বিষয়ক নানা প্রসঙ্গের সাথে নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা এবং এতদবিষয়ে মুসলিম সমাজকে উদ্বুদ্ধকরণে প্রয়াস ছিল। *সওগাত* ছাড়াও অন্যান্য পত্রিকাতেও নারী বিষয়ক বিশেষ পাতা প্রকাশ করা হতো। সাধারণভাবে পাতাগুলোর শিরোনাম দেয়া হতো 'মহিলা মাহফিল', 'মহিলা মহল', 'জেনেনা মহাফেল', এবং মাতৃমঙ্গল' ইত্যাদি। এসব পত্র-পত্রিকায় নারীশিক্ষার পক্ষে সহায়ক জনমত তৈরির লক্ষ্যে পুরুষ শাসিত সমাজের পুরুষদেরই উদ্বুদ্ধ করা হতো, এমনটা নয়, যুগের দাবি অনুযায়ী নারীরাও যেন নিজেদের শিক্ষার আলোয় আলোকিত করে নারীত্বের, ব্যক্তিত্বের সর্বোপরি মনুষত্বের বিকাশ সাধনে সচেষ্ট হয় সে ব্যাপারে তাদের সচেতন করার চেষ্টাও করা হতো। এ প্রসঙ্গে দৃষ্টান্ত হিসেবে *মহিলা সওগাত* পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত আয়েষা আহমদ এর লেখা একটি নিবন্ধ থেকে উদ্ধৃতি দেয়া যেতে পারে। তাঁর ভাষায়:

> আমার ভগিনীদের অনুরোধ করি, যেন তাহারা আত্মশক্তিতে বিশ্বাস স্থাপন করেন, যেন তাঁহারা মানবীরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াও পশু-পক্ষীর ন্যায় জীবন যাপন করিয়া আল্লার অপরিসীম দয়ার অমর্যাদা না করেন। জগতের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত জাগরণের শুভ আহ্বান ধ্বনিত হইতেছে। এই আহ্বান সুপ্তি-আচ্ছন্ন আমাদের বন্ধ দুয়ার হইতে যেন নিশ্চল করাঘাত পূর্ব্বক চলিয়া না যায়।[৭৭]

প্রায় একই রকম আহ্বান ধ্বনিত হয়েছিল মিসেস এম. রহমানের কণ্ঠে। নারী সমাজকে নিজেদের সার্বিক মুক্তির লক্ষ্যে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়ে তিনি লিখেন:

---

৭৬. আনোয়ার হোসেন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৪৬

৭৭. আয়েষা আহমদ, 'মুসলিম সমাজে উন্নতির অন্তরায়', মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন, *বাংলা সাহিত্যে সওগাত যুগ*, পৃ. ৫০৫

এসো আমার অবহেলিতা উপেক্ষিতা ভগিনীগণ। গর্জে ওঠো, ইসলাম-সুতা সিংহীনীগণ, চণ্ডালী-মুক্তির মুলোচ্ছেদ করতে প্রতিহিংসারূপে শাণিত তরবারি হস্তে এসো। --- শক্তিরূপীগণ, শক্তি সঞ্চয় করো, মহিমাময়ী, বীর্যবর্তী মোসলেম-নন্দিনীরূপে জেগে ওঠো, সেবাশীলা সেনারূপে অভয়বাণী ঘোষণা কর, তপঃস্বিনী রাবেয়া রূপে ধর্মোপদেশ দান কর। ধীরে ধীরে ফিরে আসবে আমাদের লুপ্ত গৌরব।[৭৮]

নারীকে আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে শিক্ষাসহ নিজের অধিকার অর্জনে সচেষ্ট হতে আহ্বান জানিয়ে ফজিলাতুন্নেসা জোহা লিখেন:

যারা নারীর জ্ঞানের আলোক বন্ধ করেছেন, জেগে ওঠে আজ তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করেই জ্ঞানার্জন এবং জ্ঞান মন্দিরের দ্বার চির অবারিত করতে হবে। আগে মানুষ-পরে জননী, ভগ্নি, দ্বারা, সুত। মনুষ্য পদবাচ্য হতে হলে সবকিছু অধিকার নারীকে পেতেই হবে। তা সে বিদ্রোহ করে বা আত্মা বলিদান করে যে প্রকারেই হোক।[৭৯]

৬.২: নারীশিক্ষার পক্ষে জনমত তৈরিতে বেসরকারি সাংগঠনিক উদ্যোগ

বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি

নারীশিক্ষার প্রসারে মুসলিম সমাজে জনমত জোরালো করণে কেবল ব্যক্তি উদ্যোগেই চেষ্টা করা হয়নি, সাংগঠনিকভাবেও কিছু কাজ করা হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে ১৯০৩ সালে প্রতিষ্ঠিত 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি'র নাম প্রথমেই স্মরণযোগ্য।[৮০] "নারীশিক্ষার প্রসার ও তজ্জন্য বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা"- এ সমিতির বিঘোষিত লক্ষ্য ও উদ্দেশের মধ্যে অন্যতম ছিল। সমিতিটি প্রতিষ্ঠার সূচনালগ্নে নারীশিক্ষা প্রসারের পরিকল্পনায় বলা হয়, "আমাদের সমাজে স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তার করাও শিক্ষা-সমিতির এক প্রধান উদ্দেশ্য। স্ত্রী শিক্ষার জন্য পৃথক বিদ্যালয় স্থাপন করা, এবং যাহাতে মুসলমান বালিকাগণ ধর্ম্ম ও নীতিশাস্ত্র সম্যকরূপে অধ্যয়ন করিতে পারে, তাহার বিশেষ বন্দোবস্ত করা একান্ত বাঞ্ছনীয়।"[৮১]

সমিতির সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ ওয়াহেদ হোসেন (১৮৭০-১৯৩৪ খ্রি.) নারীশিক্ষার প্রসঙ্গটি সমর্থন করে মুসলমান মেয়েদের জন্য পৃথক বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা জরুরি বলে উল্লেখ করেন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতির প্রথম বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল রাজশাহীর বোয়ালিয়ায়। দু'দিনব্যাপী

---

৭৮. মিসেস এম রহমান, 'পর্দা ও প্রবঞ্চনা', সহচর, ২য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, চৈত্র, ১৩২৯, পৃ. ১৪০

৭৯. ফজিলাতুন্নেসা, 'মুসলিম নারীর জাগরণ', দ্রষ্টব্য দেবশ্রী মুখার্জি, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২২৪-২২৫

৮০. বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি প্রতিষ্ঠায় কলিকাতা মহামেডান ইউনিয়নের বিশেষ উদ্যোগ ছিল। সৈয়দ ওয়াহেদ হোসেন, মির্জা সুজাত আলী বেগ খান বাহাদুর, দেলওয়ার হোসেন আহমদ, সৈয়দ শামসুল হোদা প্রমুখ এ সংগঠনটির সাথে যুক্ত ছিলেন। বিদ্যাশিক্ষা ও সমাজ উন্নতির ব্রত নিয়ে প্রতিষ্ঠিত এই সমিতিটি বঙ্গীয় মুসলমান সমাজে বিপুলভাবে সমাদৃত হয়েছিল। প্রচার ও জনপ্রিয়তার দিক থেকে 'মহামেডান লিটারারি সোসাইটি, (১৮৬৩ খ্রি.) এবং 'সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশন'র পরই বঙ্গীয় মুসলমান শিক্ষা সমিতির অবস্থান ছিল বলে জানা যায়। সম্ভবত ১৯১৮ সাল পর্যন্ত সমিতি সক্রিয় ছিল। সংগঠনটির সম্পর্কে বিশদ বর্ণনার জন্য দ্রষ্টব্য, ওয়াকিল আহমদ, *উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানের চিন্তা ও চেতনারধারা*, পুনর্মুদ্রণ, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৩, পৃ. ১৮০-১৮৭

৮১. এস ডব্লিউ হোসেন, 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা-সমিতি', *ইসলাম-প্রচারক*, ৫ম বর্ষ, ১১শ-১২শ সংখ্যা, অগ্রহায়ণ-পৌষ, ১৩১০, পৃ. ৪১৮; মো. আবদুল্লাহ-আল মাসুম, *ব্রিটিশ আমলে বাংলার মুসলিম শিক্ষা: প্রসার ও সম্ভাবনা*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫৪২

অনুষ্ঠিত এ বার্ষিক অধিবেশনে খান বাহাদুর মির্জা সুজাত আলী বেগ ও মেসেরউদ্দিন আহমেদ প্রমুখ মুসলিম সমাজে নারীশিক্ষার ব্যাপারে অনাগ্রহ ও উদাসীনতার বিষয়টি উপস্থাপন করে উদ্বেগ প্রকাশ করেন।[৮২] সভায় বিস্তারিত আলাপ আলোচনার পর শিক্ষার উন্নয়নসহ মুসলিম সমাজের উন্নতি বিষয়ক মোট ১৫টি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছিল। এসব প্রস্তাবের মধ্যে পঞ্চম প্রস্তাবটি ছিল "অধুনা মুসলমান সমাজে স্ত্রীশিক্ষার প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শিত হইয়া থাকে, এই সমিতির মতে, মুসলমান সমাজে স্ত্রী শিক্ষার উৎসাহ প্রদানার্থে প্রত্যেক বৎসর কতক টাকা পৃথকরূপে প্রদত্ত হওয়া উচিত। গভর্ণমেন্টের উপর প্রাদেশিক তহবিল হইতে প্রতি বৎসর কিছু কিছু প্রদানের নিমিত্ত প্রার্থনা করা হউক।"[৮৩] নারীশিক্ষার ব্যাপারে অন্য একটি প্রস্তাবে বলা হয়, "পর্দার সহিত স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে মনযোগ দেওয়া আবশ্যক।"[৮৪] দশম প্রস্তাবে মুসলিম নারীশিক্ষার প্রসারে সরকারের নিকট অনুদান বরাদ্দের দাবি জানানো হয়।

১৯০৬ সালে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতির কলকাতার সম্মেলনে মুসলিম নারীশিক্ষার বিষয়টি ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়। এ অধিবেশনে বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ও সাহিত্যিক ইসমাইল হোসেন সিরাজী নারীশিক্ষার উপর একটি জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। সিরাজী তাঁর দীর্ঘ বক্তৃতায় বাঙালি মুসলিম নারীদের আর্থ-সামাজিক দুরবস্থা ও নারীশিক্ষার অন্তরায়গুলো নির্দেশ করেন। তিনি নারীশিক্ষা বিরোধী মোল্লাদের কঠোর সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, "---বহু বিবাহ, বাল্য-বিবাহ, তালাক স্ত্রী লোকদিগকে শিক্ষা ও স্বাধীনতা না দেওয়া প্রভৃতি জঘন্য অনিষ্টকর প্রথার বিরুদ্ধে মোল্লা মৌলবীরা একবারেই উদাসীন অথবা অজ্ঞ।"[৮৫] নারীশিক্ষার প্রতিবন্ধক অবরোধ প্রথারও নিন্দা করেন তিনি। পর্দা মেনে শিক্ষাসহ নারীরা সকল কর্মসম্পাদন করতে পারেন বলে তিনি মত দেন। উল্লেখ্য যে, সিরাজীর এ অভিভাষণটি ১৯০৯ সালে 'স্ত্রী-শিক্ষা' নামে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়। জানা যায় যে, ১৯১৬ সালের মধ্যে পুস্তিকাটির ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এ থেকে নারীশিক্ষা বিস্তারে বাঙালি মুসলিম সমাজে আগ্রহ বৃদ্ধির প্রমাণ পাওয়া যায়। ১৯২৫ সালে সিরাজগঞ্জে আয়োজিত বঙ্গীয় মোসলেম মহাসভার এক রাজনৈতিক সম্মেলনে সিরাজী বলেন, বর্তমানে স্ত্রীশিক্ষার পশ্চাদপদতা গোটা মুসলিম জাতির জন্য লজ্জাজনক। নারীদের অন্ধকারে রেখে বা মুর্খতায় আবদ্ধ রেখে মুসলমানরা কখনো অগ্রগতি লাভ করতে পারবে না বলে তিনি সর্তক করেন।[৮৬]

---

৮২. আনোয়ার হোসেন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬৮

৮৩. *The Moslem Chronicle* পত্রিকার সম্পাদক আদুল হামিদ এ প্রস্তাবটি উত্থাপন করলে সমিতির সাধারণ সম্পাদক ওয়াহেদ হোসেনের সমর্থনে তা অনুমোদিত হয়। 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি', ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১ম ও ২য় মে-জুন ১৯০৪, পৃ. ৪৭৭; মো. আবদুল্লাহ-আল মাসুম, *ব্রিটিশ আমলে বাংলার মুসলিম শিক্ষা প্রসার ও সম্ভাবনা পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫৪২

৮৪. *ইসলাম প্রচারক*, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ, ১৩১১, উদ্ধৃত, ওয়াকিল আহমদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৮২

৮৫. ইসমাইল হোসেন সিরাজী, 'স্ত্রী-শিক্ষা', পৃ.৫৭-৫৮; মো. আবদুল্লাহ আল মাসুম, *ব্রিটিশ আমলে বাংলার মুসলিম শিক্ষা: সমস্যা ও প্রসার*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫৪৩

৮৬. দ্রষ্টব্য, ইসমাইল হোসেন সিরাজী, 'সিরাজগঞ্জে বঙ্গীয় মোসলেম মহাসভার অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতির অভিভাষণ', ইসলাম দর্শন, ৪র্থ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, শ্রাবণ, ১৩৩১, পৃ. ২৮

১৯০৬ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতির অধিবেশনে মুসলিম নারীশিক্ষার অগ্রগতির জন্য সরকারি অনুদান বৃদ্ধিসহ প্রয়োজনীয় ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। ১৯০৮ সালে এর ময়মনসিংহ ও ১৯১০ সালে বগুড়া অধিবেশনে স্থানীয় কমিটি গঠনের মাধ্যমে মুসলিম বালিকাদের জন্য বিদ্যালয় স্থাপনের দাবি জানায়।[৮৭] সমিতির এ প্রচেষ্টার ফলে কেবল মুসলিম সমাজই নারীশিক্ষার প্রতি আগ্রহী হয়নি, সরকারও মুসলিম নারীদের শিক্ষার বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় নেয়। সরকারি পর্যায়ে মুসলিম বালিকাদের জন্য উপযোগী পাঠ্যসূচি প্রণয়ন করা হয়। এসময় এ প্রদেশে বেশ কিছু প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়। ১৯১২ সালে ময়মনসিংহের আলেকজান্ডার বালিকা বিদ্যালয়কে[৮৮] সরকারিকরণ এবং এখানে একটি ছাত্রীনিবাস স্থাপন করা হলে ঐ অঞ্চলে নারীশিক্ষায় বিশেষ অগ্রগতি হয়। দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রীদের জন্য মাধ্যমিক ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বিভিন্ন স্তরে ১১৪টি বৃত্তির ব্যবস্থা করা হয়। উল্লেখ্য, এসব বৃত্তির মধ্যে মুসলিম ছাত্রীদের জন্য সংরক্ষিত ছিল ৭টি বৃত্তি।[৮৯]

নোয়াখালী সম্মিলনী

স্বদেশ চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে কতিপয় স্বদেশহিতৈষী ছাত্র ১৯০৫ সালে 'নোয়াখালী সম্মিলনী' নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলায় নারীশিক্ষা প্রসার এ সম্মিলনীর অন্যতম লক্ষ্য ছিল। নারীশিক্ষা প্রসারে এ সংগঠনটি বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছিল। জানা যায় যে, নারীশিক্ষাকে উৎসাহিত করার জন্য সম্মিলনীর পক্ষ থেকে ১৯১২ সালে ৬৫ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হয়। ১৯১৪-১৫ সালে সমিতির পক্ষ থেকে মেয়েদের জন্য একটি প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। এ প্রতিযোগিতায় কয়েকজন মুসলিম ছাত্রী বিজয়ী হয়ে পুরস্কার লাভ করেন। পুরস্কার বিজয়ীদের মধ্যে ছিলেন মাহমুদা খানম, তাহেরা খাতুন, আমিনা খাতুন, সালেহা খাতুন, খয়রুন্নেসা, আসরুফেন্নেসা, নাজিরুন্নেসা, আঞ্জুমা বিবি, তোহমা খাতুন এবং তোহারা খাতুন প্রমুখ।[৯০]

আঞ্জুমানে ওলামায়ে বাঙ্গালা

---

৮৭. *Report of the Second Session of the Provincial Muhammadan Education Conference*, Held at Mymensingh on the 18th and 19th April, 1908, Calcutta, p. 79, *Report of the Third Session of the Provincial Muhammadan Education Conference*, Held at Bogra on the 26th and 27th March, 1910, p. 122

৮৮. ১৯৭৩ সালে প্রতিষ্ঠিত এ বিদ্যালয়টির বর্তমান নাম 'বিদ্যাময়ী সরকারি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়'। মুক্তাগাছা, গৌরিপুর এবং কৃষ্ণনগরের জমিদার জগৎকিশোর আচার্য চৌধুরী স্কুল ভবন নির্মাণ এবং এর পরিচালনা ব্যয় নির্বাহে বিপুল অর্থ দান করেছিলেন। এ জন্য পরে এ স্কুলটির নাম আলেকজেন্ডার বিদ্যালয়ের পরিবর্তে তাঁর মায়ের নামে 'বিদ্যাময়ী স্কুল' নামকরণ করা হয়।

৮৯. মো. আব্দুল্লাহ আল-মাসুম, *ব্রিটিশ আমলে বাংলার মুসলিম শিক্ষা: সমস্যা ও প্রসার*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬৪৫

৯০. আনোয়ার হোসেন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭৬

'আঞ্জুমানে ওলামায়ে বাঙ্গালা' নামে বাংলার মুসলিম উলেমাদের একটি সংগঠন ছিল। আঞ্জুমানে ওলামায়ের সংগঠক ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে মাওলানা মুহাম্মদ আবুবকর সিদ্দিক (হুগলি), মাওলানা মুহাম্মদ মুসা (বর্ধমান), মাওলানা আকরাম খান, ওয়াহেদ হোসেন, মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, মাওলানা আব্দুল্লাহেল বাকী প্রমুখ বিশিষ্ট উলেমা ও রাজনীতিবিদগণ ছিলেন উল্লেখযোগ্য। মুসলিম নারীশিক্ষার প্রসারে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতির ন্যায় এ সংগঠনটিও বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ১৯১৩ সালে বগুড়ার জয়পুরহাটে অনুষ্ঠিত আঞ্জুমানে ওলামায়ের প্রথম অধিবেশনে গৃহীত দশম প্রস্তাবে বলা হয়, "এই সমিতির মতে, জাতীয় উন্নতি-সাধন ও এসলাম ধর্ম-বিধানের মর্যাদা রক্ষাকল্পে আলেমমণ্ডলী ও সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের পক্ষে সমাজে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের প্রতি মনোনিবেশ করা একান্ত কর্তব্য।"[৯১] তাঁরা ঐ অধিবেশনে নারীশিক্ষার লক্ষ্যে শুধু প্রস্তাব গ্রহণ করেই ক্ষান্ত হননি, সমিতির উদ্যোগে বাংলার বিভিন্ন স্থানে কয়েকটি বালিকা স্কুলও প্রতিষ্ঠা করেন বলে তথ্যসূত্রে জানা যায়।[৯২]

ভারত মুসলিম মহিলা সম্মেলন

১৯১৩ সালে নিখিল ভারত মুসলিম মহিলা সম্মেলন আয়োজন করা হয়। ভুপালের নবাব সুলতানা জাহান এ সম্মেলনটি আয়োজনে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেন। এ সম্মেলনে পর্দাপ্রর্থা, বাল্যবিবাহ এবং নারীর উত্তরাধিকার প্রভৃতি বিষয়সহ নারীশিক্ষা প্রসারের প্রসঙ্গটি বিশেষভাবে আলোচিত হয়। বিস্তারিত আলোচনার পর শিক্ষাসহ নারীর সামাজিক অধিকারের বিষয়ে বিভিন্ন প্রস্তাব গৃহীত হয়।[৯৩]

অঞ্জুমান-ই-খাওয়াতীন-ই-ইসলাম

ভারতীয় মুসলিম নারীদের একটি সংগঠনের নাম ছিল 'অঞ্জুমান-ই-খাওয়াতীন-ই-ইসলাম' বা মুসলিম মহিলা সমিতি। ১৯১৪ সালে আলীগড়ে এ সংগঠনটি প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯১৬ সালে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন কলকাতায় এর একটি শাখা সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন।[৯৪] মুসলিম নারীদের দেশ, জাতি এবং শিক্ষা ও সামাজিকতায় সচেতনতাবোধ জাগ্রত করার উদ্দেশ্যে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সংঘবদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে তিনি এ সংগঠনটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এটি ছিল বাঙালি মুসলিম নারীদের প্রথম সমিতি। প্রাতিষ্ঠানিক স্তরে সংঘবদ্ধভাবে বাঙালি মুসলিম নারীদের কল্যাণে এ অঞ্জুমানের ভূমিকা সর্বাগ্রেগণ্য। এ সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন মিসেস আব্দুল করিম এবং রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন সমিতির আজীবন অবৈতনিক

---

৯১. *আঞ্জুমানে ওলামায়ে বাঙ্গালার রিপোর্ট* (১৯১৩-১৬), কলিকাতা, ১৯১৭, পৃ. ৪; মোঃ আবদুল্লাহ আল মাসুম, *ব্রিটিশ আমলে বাংলার মুসলিম শিক্ষা:সমস্যা ও প্রসার*, পৃ. ৫৬৩

৯২. ঐ

৯৩. শামসুন্নাহার মাহমুদ, 'আজাদী সংগ্রামে নারী', *শতাব্দী পরিক্রমা*, (হাসান জামান সম্পাদিত), ঢাকা, ১৩৮১, পৃ. ১৬১

৯৪. সুফিয়া আহমেদ, মুসলিম নারীশিক্ষা ও বেগম রোকেয়া' *বেগম রোকেয়া ও নারী জাগরণ*, (ফরিদা প্রধান সম্পা.), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রোকেয়া হল, ২০০৫, পৃ. ১২২

সেক্রেটারি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। রোকেয়ার জীবনব্যাপী সাধনার অন্যতম বিশিষ্ট ক্ষেত্র ছিল এ সমিতি। সমিতির ইতিহাসের সঙ্গে বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট রয়েছে তাঁর সুদীর্ঘ কর্মজীবনের কাহিনী। এ বিষয়ে রোকেয়া নিজেই বলেছেন, "আঞ্জুমানের কাগজপত্র আলোচনা করিয়া দেখ, আমার কর্মজীবনের বহুকথা তাহারই মধ্যে খুজিয়া পাইবে।"[৯৫] অন্যান্য যাঁরা এ সমিতির সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, তাঁদের মধ্যে বেগম সলিমুল্লাহ, লেডি আব্দুর রহিম, মিসেস এ.কে. ফজলুল হক, লেডি শামসুল হোদা, মিসেস আজিজুল হক, মিসেস এম.এ. মোমিন, নবাব বেগম ফারুকী, এম ফাতেমা খানম, মিসেস সুফিয়া, শামসুন নাহার মাহমুদ, আনোয়ারা বাহার চৌধুরী এবং নুরুন্নেছা খাতুন প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।[৯৬] এছাড়াও সৈয়দা কানিজা সুগরা সারজওয়ারী, মিসেস এ. রেজাউর রহমান খান, মিসেস নূরুন্নবী চৌধুরী, মিসেস রেশাদ, বেগম আসিয়া খাতুন, মিসেস আর আহমদ, বেগম আসিয়া খাতুন, মিসেস রশীদ, মিসেস গফ্ফার প্রমুখ এ সমিতির সক্রিয় কর্মী ছিলেন।[৯৭] নারীশিক্ষা প্রসার এবং সামাজিক জীবনে নারীদের অংশগ্রহণ বিষয়ে সচেতন করা অঞ্জুমানের অন্যতম লক্ষ্য ছিল। আনোয়ারা বাহার চৌধুরী ছিলেন আঞ্জুমানের একজন নিবেদিত কর্মী। সংগঠনটির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে তিনি লিখেছেন:

> এই সমিতির উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম নারীদের মধ্যে শিক্ষা ও জাগরণের আলো ছড়িয়ে দেওয়া। এই সমিতি তখনকার দিনে কলকাতার মুসলিম মহিলাদের একত্র করে তাঁদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করার চেষ্টা করেছে, চেষ্টা করেছে পুরুষ শাসিত সমাজে নারী কি অসহায়, দুর্বল আর অজ্ঞ একথা বোঝাতে। শিক্ষা ছাড়া তাদের মুক্তি নেই, শিক্ষা না পেলে এ বন্ধন থেকে তারা মুক্ত হতে পারবে না - পারবে না তারা নিজেদের দাবী দাওয়া আদায় ও পূর্ণ করতে। ধর্ম তাদের অনেক সুবিধা দিয়েছে, কিন্তু অজ্ঞতা ও সংস্কারের বেড়ীতে তারা এমনি আবদ্ধ যে তারা তা জানেও না। প্রতি মাসে সমিতির সভা ডেকে মহিলাদের একত্র করে প্রচার করা হতো এই জাগরণের বাণী।[৯৮]

মুসলিম মহিলা সমিতি কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বিভিন্ন বস্তি এলাকায় কেন্দ্র স্থাপন করে নারীদের একত্র করতো। এসব কেন্দ্রে নারীদের প্রাথমিক ও ধর্মীয় শিক্ষা প্রদানের পাশাপাশি তাদের সেলাই, শিশু পালন, স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় শিক্ষা প্রদান করা হতো।[৯৯] নারীর সামাজিক, শিক্ষাবিষয়ক ও আইনগত অধিকার নিয়ে এ সমিতি যে কাজ করেছে, তা একবারে নিরর্থক হয় নাই। সমিতির প্রতিষ্ঠাতা রোকেয়া ও অন্যান্য কর্মীদের আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলে মুসলিম নারী সমাজ সমিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করতে সক্ষম হন। এমনকি সরকারও এসব ব্যাপারে সমিতির মতামতকে যথেষ্ট গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে। ফলে বিশ

৯৫. শামসুন্নাহার মাহমুদ, *রোকেয়া জীবনী*, ঢাকা, ১৯৪৮, পৃ. ৬৭
৯৬. অঞ্জুমান-ই-খাওয়াতিন, *নিয়মাবলী*, কলকাতা, ১৯৩৪, পৃ. ৬; আনোয়ার হোসেন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৫৬-১৫৭
৯৭. অঞ্জুমান-ই-খাওয়াতিন, *নিয়মাবলী*, কলকাতা, ১৯৩৪, পৃ. ৪
৯৮. আনোয়ারা বাহার চৌধুরী, *শামসুন্নাহার মাহমুদ*, (১৯০৮-১৯৬৪), ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৭, পৃ. ৩০
৯৯. Usha Chakrabarty, *Condition of Bengali Women around the 2nd half of the 19th Century*, Calcutta, 1961, p. 62

শতকের ত্রিশের দশকে বাংলার মুসলিম নারীদের মধ্যে শিক্ষা প্রসারে আঞ্জুমান-ই-খাওয়াতিন-ই-ইসলাম একটি প্রতিষ্ঠিত সমিতি হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়। বস্তুত বাংলার মুসলমান সমাজকে তাদের দুর্গতি সমন্ধে সচেতন করে ন্যায্য অধিকার আদায়ের জন্য আঞ্জুমানের কণ্ঠস্বর ছিল অত্যন্ত সোচ্চার।

বেঙ্গল উইমেন্স এডুকেশন কনফারেন্স

অঞ্জুমান-ই-খাওয়াতিন ছাড়াও রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন 'নিখিল ভারত মুসলিম মহিলা সমিতি'[১০০] ও 'বেঙ্গল উইমেন্স এডুকেশন কনফারেন্স'[১০১]-এর বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বেঙ্গল উইমেন্স এডুকেশন কনফারেন্স বা বঙ্গীয় নারীশিক্ষা সমিতি বাংলার নারীদের শিক্ষা ও আত্মোন্নয়ন সাধনে তাদের মধ্যে জাগরণ সৃষ্টির লক্ষ্যে ১৯২২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সংগঠনটির নেতৃত্ব শিক্ষিত হিন্দু নারীদের হাতে থাকলেও এর প্রবেশদ্বার সকল ধর্ম সম্প্রদায়ের নারীদের জন্য উন্মুক্ত ছিল। সমিতির বার্ষিক অধিবেশনগুলোতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মুসলিম নারীদের অংশগ্রহণের তথ্য পাওয়া যায়। ১৯২৬ সালে বঙ্গীয় নারীশিক্ষা সমিতির বার্ষিক অধিবেশনে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন সভানেত্রীর আসন অলঙ্কৃত করে ভারতীয় নারীদের দুরবস্থা, নারীশিক্ষা সম্পর্কে সামাজিক কুসংস্কার এবং ইসলামে নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি বিষয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেন। তাঁর এ ভাষণটি পরবর্তীকালে 'বঙ্গীয় নারীশিক্ষা সমিতি' নামে প্রথমে *সওগাত* পত্রিকায় প্রকাশিত হয় এবং পরে তা রোকেয়া রচনাবলীতে সংকলিত হয়। এ সভা থেকেই তিনি তাঁর প্রতিষ্ঠিত সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুলকে সরকারিকরণের দাবি করেছিলেন।[১০২] উল্লেখ্য যে, বঙ্গীয় নারীশিক্ষা সমিতির কার্যক্রমে সরকারের স্বীকৃতি ছিল এবং সংগঠনটির পরিচালিত শিক্ষা বিষয়ক কার্যক্রমে সরকারি অনুদান প্রদান করা হতো। ১৯৩১ সালে অনুষ্ঠিত বেঙ্গল উইমেন্স এডুকেশন কনফারেন্স'র অপর একটি বার্ষিক অধিবেশনে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন 'Education Ideals for the Modern Indian Girl' শিরোনামে একটি তথ্যবহু প্রবন্ধে নারীশিক্ষা বিষয়ে তাঁর মূল্যবান মতামত তুলে ধরেন।[১০৩]

বঙ্গীয় মুসলমান মহিলা সংঘ

১৯২৫ সালে বিশিষ্ট মুসলিম নারীদের উদ্যোগে 'বঙ্গীয় মুসলমান মহিলা সংঘ' নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সংগঠনটি মুসলিম নারীদের সর্বোতভাবে কল্যাণ সাধনের প্রয়াস নিয়েছিল। নারীশিক্ষা ছিল সংগঠনটির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি। এ সংগঠনের কর্মতৎপরতার মাধ্যমে সমকালীন বাঙালি মুসলিম

---

১০০. এটি ছিল একটি সর্বভারতীয় সংগঠন। নারীদের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য তাদের শিক্ষা, সামাজিক অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা আদায়, দুঃস্থ ও দুর্গত নারীদের সহায়তা ইত্যাদি এ সমিতির কর্মসূচির মধ্যে প্রধান ছিল। আনোয়ার হোসেন, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৮

১০১. মুখ্যত নারীশিক্ষার উন্নতি ও প্রসার ছিল এর মূল উদ্দেশ্য।

১০২. মিসেস আর এস হোসেন, 'বঙ্গীয় নারীশিক্ষা সমিতিঃ সভানেত্রীর অভিভাষণ', *সওগাত*, চতুর্থ বর্ষ, চৈত্র, ১৩৩৩, পৃ. ৬৯৩-৬৯৭

১০৩. এর আগে ১৯২৭ সালে একই সংগঠনের অন্য একটি বার্ষিক অধিবেশনে রোকেয়া 'The Scope of the Curriculum of a Primary School' নামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন। আনোয়ার হোসেন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৫৯

নারীগণ বিশেষভাবে উজ্জীবিত হয়েছিল।[১০৪] ১৯২৯ সালে কলকাতার ভবানীপুরে অঞ্জুমান-ই-খাওয়াতিনের একজন সক্রিয় সদস্য ছিলেন নুরুন্নেছা খাতুন বিদ্যাবিনোদিনী (১৮৯৪-১৯৭৫ খ্রি.)।[১০৫] তথ্যসূত্র থেকে জানা যায় যে, ১৯৩৩ সালে তিনি 'বঙ্গীয় মোসলেম মহিলা সংঘ' নামের একটি সংগঠনের বার্ষিক সভায় সভানেত্রী হিসেবে যোগদান করে এক অভিভাষণ প্রদান করেন। এতে তিনি নারীশিক্ষা সম্পর্কে তাঁর মনোভাব দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রকাশ করেন। তিনি বলেন যে, "শিক্ষিতা মাতা সন্তান অশিক্ষিত হবে না, এই ভাবটি আমাদের ভেতর দৃঢ়মূল করতে পারলে আমাদের উন্নতি অনিবার্য।" গর্ভাবস্থায় লেখালেখি এবং পাঠাভ্যাস কিভাবে তাঁর নিজের সন্তানের উপর প্রভাব ফেলেছিল তাঁর বাস্তব উদাহারণ উপস্থাপন করে নুরুন্নেছা খাতুন বলেন, "গর্ভাবস্থায় প্রসুতির মনের বৃত্তি সন্তানে স্বতঃই সংক্রামিত হয়ে থাকে।"[১০৬] রোকেয়ার একনিষ্ঠ ও অনুরাগী শিষ্যা এবং আঞ্জুমান-ই-খাওয়াতিনের অন্যতম সংগঠক শামসুন নাহার মাহমুদ 'নিখিল ভারত নারী সম্মেলন', 'ন্যাশনাল কাউন্সিল অব উইমেন ইন ইন্ডিয়া', 'বেঙ্গল উইমেন্স এডোকেশন লীগ', 'বেঙ্গল প্রভিন্সিয়ায়ল কাউন্সিল অব উইমেন' ইত্যাদি সংগঠনে সক্রিয়ভাবে যোগ দিয়েছিলেন। উল্লেখ্য যে, নারী সমাজের জীবনমানের সার্বিক কল্যাণ সাধনের জন্য অন্যান্য কর্মসূচির সাথে নারীশিক্ষা প্রসঙ্গটিও এসব সংগঠনের কার্যসূচিভুক্ত ছিল।

আল মামুন ক্লাব

১৯২৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'আল মামুন ক্লাব' নামে একটি ব্যতিক্রমধর্মী সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। উদারনীতি ও যুক্তিবাদী আব্বাসীয় খলিফা আল মামুন (৭৮৬-৮৩৩ খ্রি.)-এর নামে এ ক্লাবটির নামকরণ করা হয়েছিল। প্রগতিশীল মুসলিম মনীষীদের দ্বারা গঠিত ও পরিচালিত সংগঠনটি নারীমুক্তি ও নারীশিক্ষার বিশেষ সমর্থক ছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মুসলিম নারী শিক্ষার্থী ফজিলাতুন্নেসা যখন গণিতশাস্ত্রে এম এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে উত্তীর্ণ হন, তখন এ সংগঠনটির পক্ষ থেকে তাঁকে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। এর মাধ্যমে সংগঠনটি নারীশিক্ষার প্রতি বাঙালি মুসলিম সমাজকে উৎসাহিত করার প্রয়াস চালিয়েছিল। নারী সমাজের সামগ্রিক উন্নতির লক্ষ্যে চট্টগ্রাম থেকে ১৯২১ সালে *অন্বেষা* নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করা হয়। পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন সুফিয়া খাতুন। এটি ছিল একজন মুসলিম নারী সম্পাদিত প্রথম সাময়িকপত্র। বলা বাহুল্য যে, এ সাময়িক পত্রটিও নারীশিক্ষার সমর্থক ছিল।

নারী তীর্থ

---

১০৪. আনোয়ার হোসেন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৫৯

১০৫. নুরুন্নেছা খাতুন বিদ্যাবিনোদিনী ছিলেন একজন বাংলাদেশী লেখক এবং বাংলার প্রথম মুসলিম নারী ঔপন্যাসিক। তিনি বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম মুসলিম ঔপন্যাসিক হিসেবে বিবেচিত হন।

১০৬. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য, রশীদ আল ফারুকী, *নুরুন্নেছা খাতুন বিদ্যাবিনোদিনী*, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৭, পৃ. ২৭

রোকেয়ার সমসাময়িককালে ডা. লুৎফর রহমান 'নারী তীর্থ' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন। পুরুষ দ্বারা নির্যাতিত ও নিরাশ্রয় নারীদের আশ্রয় প্রদান এর প্রধান লক্ষ্য হলেও আশ্রিতা নারীদের উপার্জন সহায়ক শিক্ষার প্রয়োজনীয় বন্দোবস্ত করাও নারী তীর্থের অন্যতম কর্মসূচি ছিল। *নারীশক্তি* ছিল নারী তীর্থের মুখপত্র। আদর্শ ও উদ্দেশ্যগত ঐক্যের কারণে সংগঠনটির কর্মযজ্ঞের সাথে সানন্দে যুক্ত হয়েছিলেন। পরবর্তীতে তিনি নারী তীর্থের কার্যনির্বাহী কমিটির সভানেত্রীর দায়িত্বও পালন করেছেন।[১০৭] পতিতা, লাঞ্ছিতা নারীদের কেবল আশ্রয় দান করাই নয়, তাঁদের জীবন সহায়ক বিভিন্ন বিষয়ে উপযোগী শিক্ষা প্রদান করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার জন্য এ সংগঠনটি বিশেষভাবে কাজ করেছিল।[১০৮]

মুসলিম সাহিত্য-সমাজ

ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন যুক্তিবাদী ও প্রগতিশীল শিক্ষক ও ছাত্রের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত 'মুসলিম সাহিত্য-সমাজ' ছিল একটি প্রগতিশীল সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংগঠন।[১০৯] সংগঠনটির আত্মপ্রকাশকে বাঙালি মুসলমান সমাজের বিবর্তনের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। মুসলিম সাহিত্য-সমাজের প্রধান অভিষ্ঠ ছিল পশ্চাদপদ মুসলিম সমাজের চিন্তার জগতের বিস্তার ঘটিয়ে তাদের জাগতিক জীবনকে উন্নত করা এবং ধর্মীয় উপলব্ধিকে গভীরতর করা। মুসলিম সাহিত্য-সমাজের মূলমন্ত্র ছিল 'বুদ্ধির মুক্তি'। এর সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ বুদ্ধির মুক্তি মূলমন্ত্রকে সামনে রেখে বাঙালি মুসলিম সমাজকে অন্ধ সংস্কার, শাস্ত্রের আক্ষরিক অনুবর্তন এবং সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত করার জন্য এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তাঁদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছিল। এ সংগঠনটির মুখপত্র ছিল 'শিখা' পত্রিকা।

বাঙালি মুসলিম সমাজের উন্নতি বিধানার্থে মুসলিম সাহিত্য-সমাজের নানাবিধ কর্মসূচির মধ্যে নারীশিক্ষা ছিল অন্যতম। বাঙালি মুসলমান সমাজে আধুনিক শিক্ষার বিস্তারের জন্য মুসলিম সাহিত্য-সমাজ এর লেখকগণ নারীশিক্ষার ব্যাপক প্রচলনের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে এ বিষয়ে মুসলিম সমাজকে উদ্বুদ্ধকরণে চেষ্টা করেন। বাঙালি মুসলিম সমাজে নারীশিক্ষার প্রসারে অন্যতম প্রধান অন্তরায় ছিল পর্দা বা অবরোধ প্রথা। সাহিত্য-

১০৭. মুহম্মদ শামসুল আলম, *রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন*, পৃ. ১১৪

১০৮. আনোয়ার হোসেন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৫৮

১০৯. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম হল ইউনিয়ন কক্ষে বাংলা ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর সভাপতিত্বে ১৯২৬ সালের ১৯ জানুয়ারি মুসলিম সাহিত্য-সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। সংগঠনটির পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি ও বাণিজ্য বিভাগের শিক্ষক আবুল হুসেন, কাজী মোতাহার হোসে, মুসলিম হলের ছাত্র এ.এফ.এম আবদুল হক, ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজের ছাত্র আবদুল কাদির প্রমুখের উপর। এরাই ছিলেন প্রথম কার্যনির্বাহী সংসদের সদস্য। নেপথ্যে থেকে দায়িত্ব পালন করতেন ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক কাজী আবদুল ওদুদ ও যুক্তিবিদ্যার অধ্যাপক কাজী আনোয়ারুল কাদির। মুসলিম সাহিত্য-সমাজ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যের জন্য দ্রষ্টব্য খোন্দকার সিরাজুল ইসলাম, *মুসলিম সাহিত্য -সমাজ: সমাজচিন্তা ও সাহিত্যকর্ম*, ঢাকা, সূচীপত্র, ২০০৬

সমাজ এ অবরোধ প্রথার উচ্ছেদের দাবি তুলেছিল। ইতোমধ্যে আলোচনা করা হয়েছে যে, মুসলমান সমাজে নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা ব্যক্তি পর্যায়ে অনেকেই এবং সাংগঠনিক পর্যায়ে ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনীসহ আরো কিছু সংগঠন ভূমিকা রেখেছিল। তবু মুসলিম সাহিত্য-সমাজেরও এ ক্ষেত্রে কিছু করণীয় ছিল। কারণ উপর্যুক্ত প্রতিষ্ঠান ও লেখকদের প্রচেষ্টায় নারীশিক্ষার প্রচলন এবং অবরোধ প্রথার বিলোপ সাধন অনেকটা সহজ হয়ে এলেও বাংলার রক্ষণশীলগোষ্ঠী বিশ শতকের তৃতীয় দশকেও যে প্রগতিশীল কর্মপ্রচেষ্টার বিরুদ্ধে যথেষ্ট তৎপর ছিল, এর প্রমাণ পাওয়া যায় *সওগাত*সহ সমকালীন বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ-নিবন্ধ থেকে। রক্ষণশীল সমাজের বিরোধিতাকে মোকাবিলা করে বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে ব্যাপকভাবে নারীশিক্ষা বিস্তারের জন্য সঙ্ঘবদ্ধ প্রাতিষ্ঠানিক প্রয়াসের প্রয়োজন ছিল। প্রগতিশীল সংগঠন মুসলিম সাহিত্য-সমাজ-এর লেখক ও সংগঠকগণ সমাজের সেই প্রয়োজনেই সাড়া দিয়ে নারীশিক্ষার প্রসারে ভূমিকা রাখেন।

ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বাঙালি মুসলমান সমাজে নারীশিক্ষার ব্যাপক প্রচলনের পথে অন্যতম অন্তরায় ছিল অবরোধ ও পর্দাপ্রথা। মুসলিম সাহিত্য-সমাজ মনে করে যে, নারীশিক্ষার প্রসারের স্বার্থে এ ব্যবস্থার বিলোপ সাধন প্রয়োজন। কারণ তাদের মতে, বাইরের মুক্ত পৃথিবীর সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় ছাড়া প্রকৃত বিদ্যাশিক্ষা সম্ভব নয়। সম্ভবত একথা চিন্তা করেই মুসলিম সাহিত্য-সমাজের অন্যতম সংগঠক আবুল হুসেন 'নারীর অধিকার' শিরোনামে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করেন। এ প্রবন্ধে তিনি নারী স্বাধীনতার প্রায়োজনীয়তা এবং পর্দা-প্রথা সমালোচনা করেন।[১১০] আবুল হুসেন তাঁর 'আদেশের নিগ্রহ' নামক প্রবন্ধেও বাঙালি মুসলিম নারীদের উপর পর্দা বা অবরোধ প্রথা কুফল সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এ পর্দা প্রথা যে নারীশিক্ষার অন্যতম অন্তরায় তাঁর প্রাসঙ্গিক বক্তব্যে এটি উল্লেখ করা হয়েছে। আবুল হুসেনের ভাষায় "--- পর্দার অন্তরালে মুসলমান নারীর দুর্বলতা এরূপ লালিত হতে থাকে যে, তার ব্যক্তিত্ব একেবারে পুষ্টিলাভই করতে পারে না,---। এছাড়া অন্য বিষয়ে মনোনিবেশ করার সুযোগেও তার মিলে না; কারণ তাহলে পর্দা তুলতে হয়, যেমন তার বিদ্যাচর্চার পরিধি বাড়াতে হলে পর্দার সীমা অনেকখানি খর্ব করতে হয়।"[১১১] মুসলিম-সাহিত্য সমাজের আবুল ফজল, খান বাহাদুর নাসিরুদ্দিন আহমদ এবং কাজী মোতাহার হোসেন প্রমুখের লেখনীতেও সমকালীন বাঙালি মুসলিম নারী সমাজের দুর্দশা, অবরোধের কারণে তাদের মানসিক বিকাশ ও শিক্ষা ব্যাহত হওয়ার বিষয়গুলো স্থান পেয়েছে।[১১২] 'বাঙ্গালী মুসলমানের দৈন্য' শিরোনামে এক নিবন্ধে কাজী মোতাহার হোসেন, পুরুষের ন্যায় নারীর শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

---

১১০. আবুল হুসেন, 'নারীর অধিকার, *সাধনা*, ৩য় বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, আশ্বন, ১৩২৮, পৃ. ১৯১-১৯২; উদ্ধৃত, খোন্দেকার সিরাজুল ইসলাম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৬৯

১১১. আবুল হুসেন, 'আদেশের নিগ্রহ', আবুল হোসেন রচনাবলী, ১মখণ্ড, ঢাকা, ১৩৭৫,পৃ, ৭১-৭২; খোন্দেকার সিরাজুল ইসলাম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৭০

১১২. আবুল ফজল, 'তরুণ আন্দোলনের গতি', শিখা, ৩য় বর্ষ, ১৯২৯, পৃ, ১৩৭; খান বাহাদুর নাসিরুদ্দিন আহমদ,'নারীত্বের প্রতি নিধারুণ অপমান', শিখা, চতুর্থ বর্ষ, ১৩৩৭, পৃ. ১৪; কাজী মোতাহার হোসেন, 'বাঙলীর সামাজিক জীবন', *সঞ্চরণ*, সেগুন বাগান প্রকাশনী, ১৯৬৯, পৃ. ১৪৪, উদ্ধৃত, খোন্দেকার সিরাজুল ইসলাম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৭০-১৭১

তুলে ধরেছেন। তাঁর মতে, মনুষত্বের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্যই নারী-পুরুষের শিক্ষার প্রয়োজন। তিনি নারীদের মানসিক উন্নতির জন্য শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার উপর বিশেষভাবে জোর দিয়েছেন।[১১৩]

১৯২৮ সালে অনুষ্ঠিত মুসলিম সাহিত্য সমাজের দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন খান বাহাদুর আবদুর রহমান। সভাপতির অভিভাষণে তিনি মুসলিম নারীদের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা জোরালোভাবে উপস্থাপন করে বলেন:

> এস্থলে আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, স্ত্রী-শিক্ষা ইসলাম ধর্মের অবশ্য পালনীয় বিধান হওয়া সত্ত্বেও মুসলমানগণ তাহার প্রতি মারাত্মকরূপে উদাসীন; অথচ তাহাদের অনেক প্রতিবেশীর মধ্যে ইহার বিরুদ্ধে বহুকালের কুসংস্কার প্রচলিত থাকাতেও তাঁহারা ইহার প্রতি বেশী মনোযোগী। মুসলমানদের এ উদাসীনতা আত্মঘাতী। ইহা তাহাদের সর্বপ্রকার উন্নতির পরিপন্থী। যতদিন তাহারা ইহা ঝাড়িয়া না ফেলিবে ততদিন তাহাদের পদে পদে বিড়ম্বনা অবশ্যম্ভাবী।[১১৪]

৬. ৩: নারীশিক্ষা প্রসারে মুসলিম রাজনীতিবিদদের প্রয়াস

শুধু শিক্ষাবিদ ও বুদ্ধিজীবীদের পরিমণ্ডলেই নয়, আলোচ্য সময়ে মুসলিম রাজনীতিবিদগণও নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে এ বিষয়ে সাধারণ মানুষকে সচেতন ও উদ্বুদ্ধকরণের পাশাপাশি মুসলিম নারীশিক্ষার প্রসারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে সরকারের উপর অব্যাহত চাপ সৃষ্টি করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে নবাব স্যার সলিমুল্লাহর (১৮৭১-১৯১৫ খ্রি.) কথা প্রথমে উল্লেখযোগ্য। নারীশিক্ষার অন্যতম উদ্যোক্তা নবাব স্যার সলিমুল্লাহ ১৯০৫ সালে নব গঠিত পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের জনশিক্ষা পরিচালককে আশ্বাস দেন যে, তিনি নারীশিক্ষার প্রসার ও উন্নতি সাধনে যথাযথ সহযোগিতা করবেন। ১৯০৬ সালের ১৪ এপ্রিল নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহর উদ্যোগে তাঁর ঢাকাস্থ শাহবাগে তাঁর বাগানবাড়িতে 'প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি' নামে একটি সংগঠন আত্মপ্রকাশ করে। নবাব সলিমুল্লাহ ও নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী যথাক্রমে সমিতির সভাপতি ও সেক্রেটারি নির্বাচিত হন।[১১৫] নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকল মুসলমানকে শিক্ষিত ও আত্মসচেতন করা এ সমিতির মূল উদ্দেশ্য ছিল। তৎকালীন সামাজিক বাস্তবতায় এ সমিতির সম্মিলনগুলোতে নারীদের অংশগ্রহণ দেখা যায় না, তবে এতে নারীশিক্ষা, বিশেষ করে মুসলিম নারীদের শিক্ষার প্রসারে প্রয়োজনীয় করণীয় নির্ধারণে নানাবিধ আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। ১৯০৬ সালেই ঢাকায় প্রাদেশিক মুসলিম শিক্ষা সমিতির প্রথম সম্মিলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি খাজা মোহাম্মদ আজগর তাঁর স্বাগত ভাষণে নারীশিক্ষার বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও গঠনমূলক প্রস্তাবনা পেশ করেন।[১১৬]

---

১১৩. কাজী মোতাহার হোসেন, 'বাঙ্গালী মুসলমানের দৈন্য', *সওগাত*, ৮ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, মাঘ, ১৩৩৭

১১৪. খান বাহাদুর আবদুর রহমান, 'সভাপতির অভিভাষণ', *শিখা*, ২য় বর্ষ, ১৩৩৫, পৃ. ১৬

১১৫. সুফিয়া আহমেদ, 'পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশে মুসলমানদের শিক্ষার অগ্রগতিতে নবাব সলিমুল্লাহর অবদান', *মুহম্মদ সিরাজুল ইসলাম স্মারকগ্রন্থ*, নাজিমুদ্দীন আহম্মদ (সম্পাদিত), বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ৮৮

১১৬. *Proceedings of the Provincial Mohammedan Educational Conference, Eastern Bengal and Assam*, Dhaka, 1906, p.6

প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতির দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মিলন ১৯০৮ সালের ১৮-১৯ এপ্রিল ময়মনসিংহে অনুষ্ঠিত হয়। কলকাতার প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট মৌলবী আব্দুস সালাম এতে সভাপতিত্ব করেন। 'বিদ্যার্জন প্রত্যেক নর-নারীর জন্য ফরজ'- রসুলুল্লাহ (সা:)-এর এই অমীয় বাণীর উদ্ধৃতি দিয়ে সভাপতি তাঁর ভাষণে বলেন, ইসলামের গৌরবময় যুগে নারীরা শিক্ষা দীক্ষায় সুনাম অর্জন করেছিলেন। ১১শ খ্রি. পর্যন্ত মুসলিম ছাত্রদের শিক্ষার ভার মায়ের ওপর ছিল এবং সেজন্য মাতৃজাতিকে পবিত্র জ্ঞান শিক্ষা দেয়া হতো। আজ কুসংস্কার তাদেরকে অশিক্ষিত করে রেখেছে। তিনি বলেন, "শিক্ষা পেলেই নারীরা উপযুক্ত মা, বোন, স্ত্রী ও কন্যার কর্তব্য পালন করতে পারবে।" এ সম্মিলনে যে ২২ টি মন্তব্য প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল এর মধ্যে ৬ নং প্রস্তাবটি ছিল নারীশিক্ষা সংক্রান্ত। এতে বলা হয়, নারীশিক্ষার ব্যাপারে সরকারি উদ্যোগ বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে প্রদেশের সর্বত্র মুসলিম বালিকাদের আবশ্যকীয় শিক্ষার উপযোগী মক্তব স্থাপনের বিশেষ প্রচেষ্টা চালানোর কথা বলা হয়।[১১৭] সভায় উপস্থিত সরকারের জনশিক্ষা পরিচালক মি. এইচ শার্প নারীশিক্ষার বিষয়ে গৃহীত সমিতির প্রস্তাব এবং এর সপক্ষে অংশগ্রহণকারীদের বক্তব্যে সন্তোষ প্রকাশ করে কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়নে সরকারের পাশাপাশি মুসলমানদের বিশেষভাবে এগিয়ে আসার অনুরোধ জানান।

১৯১০ সালের ২৬-২৭ মার্চ প্রাদেশিক মুসলিম শিক্ষা সমিতির বগুড়া সম্মিলনে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় উকিল খান বাহাদুর তসলিম উদ্দিন। সভাপতির ভাষণে তিনি নারীশিক্ষা সম্পর্কে বলতে গিয়ে অল্প বয়স্কা বালিকাদের বিদ্যালয়ে পাঠ গ্রহণের সপক্ষে মত দেন। তবে বয়স্কাদের শিক্ষার জন্য তিনি অন্তঃপুর বা জেনানা শিক্ষা পদ্ধতির সমর্থন করেন। এ জন্য সরকার অন্তঃপুর শিক্ষার জন্য যে শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা করেছেন, তা থেকে লাভবান হওয়ার দিকে নজর দেয়ার জন্য মুসলিম সমাজের প্রতি আহ্বান জানান। নারী জাতির উপর ভবিষতের বহু কল্যাণ নির্ভরশীল উল্লেখ করে তিনি নারীশিক্ষার প্রতি মনযোগী হওয়ার জন্য মুসলিম সমাজকে অনুরোধ জানান।[১১৮] এসময় সমিতির সেক্রেটারি ছিলেন নবাব সলিমুল্লাহর ঘনিষ্ঠজন নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী। সম্মিলনে উপস্থাপিত সমিতির বার্ষিক রিপোর্টে সেক্রেটারি বাঙালি মুসলিম সমাজে নারীশিক্ষার তৎকালীন অবস্থা এবং এতদবিষয়ে সরকারের গৃহীত ব্যবস্থার ফলে অগ্রগতির চিত্র তুলে ধরেন। তিনি নারীশিক্ষার প্রসারের ব্যাপারে আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন যে, বিষয়টি এতই গুরুতর এবং নারীশিক্ষায় বাঙালি মুসলমানগণ এতই পশ্চাৎপদ যে সহসা উন্নতি দেখা যাবে না। তবে উন্নতির আকাঙ্খা সমাজে জাগরিত হলে ভবিষ্যতে আমরা অবশ্যই সুফল পাবো।[১১৯] উল্লেখ্য

১১৭. প্রস্তাবটির উপস্থাপক ছিলেন ঢাকার ব্যারিস্টার মি. এ. কবির, অনুমোদক টাঙ্গাইলের মৌলবী আবদুল গফুর এবং সমর্থক মৌলবী নওশের আলী খান। *Proceedings of the Provincial Mohammedan Educational Conference, Eastern Bengal and Assam*, Mymansingh, 1908, pp.20-31

১১৮. মোঃ আলমগীর, 'নারীশিক্ষা ও নওয়াব সলিমুল্লাহ', *ইতিহাস*, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা, ছেচল্লিশ বর্ষ, কার্তিক-চৈত্র ১৪১৯/ডিসেম্বর, ২০১২, পৃ. ১০৩

১১৯. নওয়াব আলী চৌধুরী তাঁর প্রতিবেদনে ১৯০৮-০৯ সালে বাংলায় সরকারি পর্যায়ে গৃহীত উদ্যোগের ফলে নারীশিক্ষার অগ্রগতির তথ্যচিত্র তুলে ধরে একে অত্যন্ত উৎসাহব্যঞ্জক বলে মন্তব্য করেন। তিনি কেবল বগুড়াতেই ৮৬ টি নতুন বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কথাও উল্লেখ করেন। দ্রষ্টব্য, মোঃ আলমগীর, 'নারীশিক্ষা ও নওয়াব সলিমুল্লাহ', *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১০৪

যে, প্রাদেশিক মুসলিম শিক্ষা সমিতির বগুড়া সম্মিলনে গৃহীত ২৬ টি মন্তব্য প্রস্তাবের মধ্যে ২০ নম্বর প্রস্তাবটি ছিল নারীশিক্ষা বিষয়ক। এতে বগুড়া জেলায় নারীশিক্ষার দ্রুত বিস্তার ঘটায় এখানে শিক্ষিকাদের পাঠের উপযোগী একটি বিদ্যালয় স্থাপন করার জন্য সরকারকে অনুরোধ করা হয়।[১২০]

মুসলিম শিক্ষা সমিতির ৪র্থ বার্ষিক সম্মিলন করোটিয়ার জমিদার ওয়াজেদ আলী খান পন্নীর সভাপতিত্বে **১৯১১** সালে **১৫-১৬** এপ্রিল রংপুরে অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতি তাঁর ভাষণে পুরুষদের পাশাপাশি নারীদের শিক্ষার ব্যবস্থা না করলে কোন জাতিই প্রকৃত উন্নতি লাভ করতে পারে না বলে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, ইসলামের গৌরবময় যুগে নারীশিক্ষা আদর্শ স্থানীয় ছিল। নারীশিক্ষার ব্যাপারে মসলিম সমাজে কিছুটা অগগ্রতি হচ্ছে মন্তব্য করে ওয়াজেদ আলী খান পন্নী বলেন পর্দা রক্ষা করে মেয়েদের শিক্ষা দেয়ার জন্য সরকার জেনানা স্কুলের ব্যবস্থা করেছে। মফস্বলে মুসলিম প্রধান এলাকায় এরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা করা মুসলমানদের কর্তব্য বলে তিনি উল্লেখ করেন।[১২১] এ সম্মিলনে সমিতির সেক্রেটারি মুসলিম নারীশিক্ষার বিষয়টা পৃথকভাবে আলোচনা করেন। এতে তিনি নিম্নপ্রাথমিক থেকে কলেজ পর্যায় পর্যন্ত বিভিন্ন উপ-শিরোনামে নারীশিক্ষা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। রিপোর্টে সরকারি ও বেসরকারি প্রয়াসে পরিচালিত বালিকা বিদ্যালয়ে মুসলিম ছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধির তথ্য তুলে ধরা হয়।[১২২]

উপরের আলোচনায় দেখা যায় যে, বঙ্গভঙ্গের প্রাক্কালে নবাব স্যার সলিমুল্লাহর উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত প্রাদেশিক মুসলিম শিক্ষা সমিতির উদ্যোগে বাংলায় নারীশিক্ষা সম্পর্কে মুসলিম সমাজে ইতিবাচক মনোভাব তৈরি ছাড়াও নারীশিক্ষার প্রসারে বেসরকারি প্রয়াসের সাথে সাথে সরকারকেও এ বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণে নানা উদ্যোগ ও কর্মসূচি গ্রহণ করে।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, নারীশিক্ষার ব্যাপারে নবাব স্যার সলিমুল্লাহ বিশেষভাবে আগ্রহী ছিলেন। তিনি মনে করতেন যে, মায়ের কাছেই শিশু প্রাথমিক শিক্ষা ও চরিত্র গঠনের শিক্ষা পায়। তাই নারীশিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন। **১৯০৮** সালে নবাব সলিমুল্লাহ পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক পরিষদে বক্তব্য দিতে গিয়ে নারীশিক্ষার উন্নতি কামনা করে বলেছিলেন,

---

১২০. এর প্রস্তাবক ছিলেন বগুড়ার জমিদার মৌলবী হাফিজুর রহমান চৌধুরী, অনুমোদক মুন্সি হামিদ আলী এবং সমর্থক মৌলবী জামাল উদ্দিন তালুকদার। *Proceedings of the Provincial Mohammedan Educational Conference, Eastern Bengal and Assam,* Bogra, 1910, pp.17-41

১২১. *Proceedings of the Provincial Mohammedan Educational Conference, Eastern Bengal and Assam,* Bogra, 1911; উদ্ধৃতি, মোঃ আলমগীর, 'নারীশিক্ষা ও নওয়াব সলিমুল্লাহ', *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১০৪

১২২. রিপোর্টে উল্লেখ করা হয় যে, ইতোমধ্যে পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশে ৪২৩১টি বালিকা বিদ্যালয়ে মোট ৯২,৫০৪ জন ছাত্রী অধ্যয়নরত আছে, তন্মধ্যে মুসলিম ছাত্রী সংখ্যা ৪৪,১৮৭ জন। এর আগের বছরের তুলনায় এ সংখ্যা শতকরা ২.৫ জন বেশি। রিপোর্টে আরো উল্লেখ করা হয় যে, বালিকা বিদ্যালয় ছাড়াও এ প্রদেশে ১২২ টি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। এসব বিদ্যালয়ে ছোট্ট বালক বালিকা উভয়ই সহশিক্ষা গ্রহণ করে। এধরণের বিদ্যালয়ে মুসলিম ছাত্রীর সংখ্যা ২০০৭ জন বলে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়।

> শিক্ষার কথা বলতে গিয়ে আমি দেখতে পাই আমাদের নারীরা দুঃখজনকভাবে এক্ষেত্রে পিছিয়ে আছে। তবে সুখের বিষয় হল, জটিল বিষয়টির দিকে সরকার বিশেষ আগ্রহ দেখাচ্ছে। শিশুরা তাদের মায়ের কাছেই প্রথম শিক্ষা পায় এবং মায়েরা সহজেই তাদের চরিত্রকে প্রভাবিত করতে পারে। আমরা আশা করব জনগণ সরকারের দেয়া এই নারীশিক্ষার সুযোগটি গ্রহণ করবেন এবং তাঁদের স্ত্রী ও কন্যাদের অশিক্ষা ও অজ্ঞতা দূর করতে সক্ষম হবেন।[১২৩]

কেবল বেসরকারি প্রয়াসই নয়, বিশ শতকের শুরুতে ব্রিটিশ সরকারও নারীশিক্ষার গুরুত্ব বিশেষভাবে উপলব্ধি করেছিল। এ সময় সরকার বাংলায় প্রচলিত নারীশিক্ষা অবকাঠামোর ব্যাপক সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। এ অবস্থায় ১৯০৭ সালে পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের জনশিক্ষা পরিচালক নবাব স্যার সলিমুল্লাহ এবং নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী প্রমুখ মুসলিম নেতৃবৃন্দের কাছে নারীশিক্ষা বিষয়ক কতগুলো প্রশ্ন প্রেরণ করে এর জবাব এবং এতদবিষয়ে তাদের পরামর্শ ও মতামত আহ্বান করেন।[১২৪] নবাব সলিমুল্লাহ জনশিক্ষা পরিচালকের প্রশ্নের উত্তরদানসহ নারীশিক্ষা প্রসারে সহায়ক সরকারি সকল উদ্যোগকে সর্বান্তঃকরণে সমর্থন ও স্বাগত জানানোর প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন।[১২৫]

১৯০৮ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রাদেশিক সরকার জনশিক্ষা পরিচালক স্যার রবার্ট নাথানকে প্রধান করে ‘Female Educational Committee’ গঠন করে। সম্ভবত পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রাদেশিক মুসলিম শিক্ষা সমিতির বার্ষিক অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবানুসারে নারীশিক্ষার উন্নতিকল্পে সরকার এ কমিটি গঠন করেছিল। এ কমিটির অন্যতম সদস্য ছিলেন নবাব স্যার সলিমুল্লাহ এবং নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী (১৮৬৩-১৯২৯ খ্রি.)।[১২৬] ঢাকাতে ১৯০৮ সালের ২৬, ২৭ ও ২৮ ফেব্রুয়ারি এ কমিটির প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিস্তারিত আলোচনার পর সরকারের কাছে উপস্থাপনের জন্য কমিটি কিছু প্রস্তাব গ্রহণ করে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল– প্রতিটি জেলায় মেয়েদের জন্য ১০টি করে উন্নতমানের বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন এবং প্রতি জেলাতে নারী শিক্ষকের জন্য একটি করে প্রশিক্ষণ বিদ্যালয় স্থাপন। যে সব কিশোরী ও নারী ঘরে বসে শিক্ষক দ্বারা কিংবা অভিভাবকের মাধ্যমে পর্দার আড়ালে থেকে লেখাপড়া চালিয়ে যাচ্ছে, তাদের পরীক্ষার

---

১২৩. *Report of the Legislative Council of Eastern Bengal and Assam, 6 April 1908, Part-6, p. 71;* উদ্ধৃতি, মোহাম্মদ আবদুল্লাহ, *নওয়াব সলিমুল্লাহ, পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৪৯

১২৪. প্রশ্নাবলী সম্পর্কে দ্রষ্টব্য ‘Questions relating to Female Education Reports’ *Proceedings & Papers Female Education Committee, Eastern Bengal and Assam,* 1908-12, Vol.I; সুফিয়া আহমেদ, ‘পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশে মুসলমানদের শিক্ষার অগ্রগতিতে নবাব সলিমুল্লাহর অবদান’, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৯৪

১২৫. M K U Mollah, *The New Province of Eastern Bengal and Assam* 195-1911, Institute of Bangladesh Studies, Rajshahi University, 1981, p. 203

১২৬. এ কমিটির অন্যান্য সদস্যগণ ছিলেন: ঢাকা বিভাগের কমিশনার; রায় দুলাল চন্দ্র দেব; এস. এস. মুখার্জী, ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট, পাবনা; বাবু জগবন্ধু লাহা, অবসরপ্রাপ্ত স্কুল ইনসপেকটর; মৌলবী আহসানুল্লাহ, স্কুল ইন্সপেক্টর, চট্রগ্রাম; গুরুদাস চক্রবর্তী, ঢাকা ব্রাহ্ম সমাজ; বাবু আনন্দ চন্দ্র রায়; যাত্রামোহন সেন, চট্টগ্রাম ; মিস ফ্রানসিস, ঢাকা ক্যাথলিক কনভেন্ট; মিস উইলিয়ামসন, ঢাকা ব্যাপটিস্ট জেনানা মিশন; মিস মুর, বরিশাল ব্যাপটিস্ট জেনানা মিশন; মিস লয়েড, শিবচর বালিকা মিশনারি স্কুল; মিসেস পি. চ্যাটার্জী; স্কুলসমূহের ইনসপেকট্রেস (সভার সম্পাদক)। *ঢাকা প্রকাশ*, ১৮ ফাল্গুন, ১৩১৪ বঙ্গাব্দ, ১ মার্চ ১৯০৮, পৃ. ৫

মাধ্যমে সার্টিফিকেট প্রদানের জন্য আলাদা বিদ্যালয় স্থাপন অতীব জরুরি বলেও কমিটির প্রস্তাবে উল্লেখ করা হয়।[১২৭] প্রস্তাবগুলো বাস্তবায়নের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানানো হলে সরকার কমিটির পেশকৃত এসব প্রস্তাবের বেশ কিছু গ্রহণ করে।

পুনশ্চঃ উল্লেখ্য যে, সে সময় মুসলিম সম্প্রদায়ের তুলনায় হিন্দু সম্প্রদায়ের নারী-পুরুষ বিশেষ করে নারীরা শিক্ষা-দীক্ষায় ছিল অনেক এগিয়ে ছিল। হয়তো সে বিবেচনায় একই বছর শিক্ষা ক্ষেত্রে মুসলিম নারীদের অগ্রগতি সাধনের উদ্দেশ্যে উল্লিখিত 'Female Educational Committee' এর অধীনে 'Sub-Committee for Mohammedan Female Education' নামে আরেকটি কমিটি গঠন করা হয়। এ সাব-কমিটির সভাপতি ছিলেন নবাব স্যার সলিমুল্লাহ এবং সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী।[১২৮] এ সাব কমিটির কাজ ছিল মুসলিম নারীদের শিক্ষার বিশেষ দিকগুলো বিচার বিবেচনা করা এবং করণীয় নির্ধারণপূর্বক সরকারের নিকট সুপারিশ আকারে সেগুলো উপস্থাপন করা। এ কমিটিটি ১৯১১ সালের ১২ ডিসেম্বর বঙ্গভঙ্গ বাতিল হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বহাল ছিল।

১৯০৮ সালের ২ মার্চ নবাব স্যার সলিমুল্লাহর সভাপতিত্বে সাব-কমিটি ফর মোহামেডান ফিমেল এডুকেশন-এর প্রথম যে সভাটি অনুষ্ঠিত হয়, তাতে নারীশিক্ষা বিষয়ক ৩টি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। প্রস্তাবে নারীদের প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্যসূচি প্রণয়নের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ, প্রাথমিক স্কুলের বিভিন্ন শ্রেণির জন্য পাঠোপযোগী বাংলা ও উর্দু ভাষায় উপযুক্ত পাঠ্যসূচি প্রণয়ন, শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করার জন্য পুরস্কার ও সনদ প্রদানের ব্যবস্থাসহ অন্তঃপুর বা জেনানা শিক্ষার প্রসারে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ, উন্নতমানের বালিকা বিদ্যালয় এবং শিক্ষক প্রশিক্ষণ বিদ্যালয় স্থাপন এবং টাঙ্গাইলের ধনবাড়িতে একটি নারী শিক্ষক প্রশিক্ষণ স্কুল প্রতিষ্ঠার সম্ভাব্যতা যাছাই ইত্যাদি বিষয়ে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কমিটির সেক্রেটারিকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়।[১২৯] সাব-কমিটির পরবর্তী সভা অনুষ্ঠিত হয় ৫ মার্চ এবং এ সভাতেও সভাপতিত্ব করেন নবাব সলিমুল্লাহ। এ সভাতেও মুসলিম নারীদের মধ্যে শিক্ষার প্রসারে উপযোগী কয়েকটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।[১৩০] নবাব সলিমুল্লাহর অনুরোধে সাব-কমিটির সভায় গৃহীত প্রস্তাবসমূহ সম্পর্কে অবহিতকরণ এবং মতামতের জন্য মুসলিম সমাজের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ ও বিভিন্ন মুসলিম সংগঠনের কাছে প্রেরণ করা হয়। সেক্রেটারি নবাব

---

১২৭. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, *আধুনিক শিক্ষা বিস্তারে বাংলার কয়েকজন মুসলিম দিশারী*, ঢাকা, ২০০০, পৃ. ৪৬-৪৭

১২৮. এ সাব-কমিটির অন্যান্য দু'জন সদস্য ছিলেন: খানবাহাদুর মৌলবী আহসানুল্লাহ, স্কুল ইন্সপেক্টর, চট্টগ্রাম এবং মৌলবী আব্দুল হামিদ বি.এ. এডিটর *মোসলেম ক্রনিকল*। সুফিয়া আহমেদ, 'পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশে মুসলমানদের শিক্ষার অগ্রগতিতে নবাব সলিমুল্লাহর অবদান', *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৯৪

১২৯. প্রস্তাবসমূহ সম্পর্কে বিস্তারিত দ্রষ্টব্য, *Proceedings of the Ist sitting of the Sub-Committee for Mohammedan Female Education,* 2 March, 1908; সুফিয়া আহমেদ, 'পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশে মুসলমানদের শিক্ষার অগ্রগতিতে নবাব সলিমুল্লাহর অবদান', *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৯৪; মোঃ আলমগীর, 'নারীশিক্ষা ও নওয়াব সলিমুল্লাহ', *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৯৭-৯৮

১৩০. দ্রষ্টব্য, *Proceedings of the Ist sitting of the Sub-Committee for Mohammedan Female Education, 5 March, 1908;* মোঃ আলমগীর, 'নারীশিক্ষা ও নওয়াব সলিমুল্লাহ', *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৯৮

নওয়াব আলী চৌধুরী সাব-কমিটির প্রস্তাব বিষয়ক তাঁর প্রেরিত পত্রের সাথে সংযুক্তি হিসেবে নারীশিক্ষা সংক্রান্ত কিছু তথ্য যুক্ত করেন। এতে উল্লেখ করা হয় যে, বাংলায় প্রায় ২২,৬৬,৩০৯ জন স্কুলে যাওয়ার যোগ্য বালিকা রয়েছে এবং এদের মধ্যে মাত্র ৬৮,৮০৬ জন বালিকা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ে। আর স্কুল পড়ুয়া এসব বালিকাদের মধ্যে মুসলিম ছাত্রী সংখ্যা মাত্র ২৫৬২ জন। এদের মধ্যে আবার অধিকাংশই 'কোরান শিক্ষা স্কুলে' পড়ে এবং অল্পসংখ্যক সাধারণ স্কুলে যায়। তাই বিদ্যমান কোরান শিক্ষা স্কুলে বাংলা ও উর্দু পাঠ্য প্রবর্তন করে যতদূর সম্ভব তা সাধারণ স্কুলে পরিণত করার জন্য তিনি মত দেন। তিনি আশ্বাস দেন যে, এজন্য সরকার থেকে অর্থ ও মুসলিম শিক্ষিকা দেয়ার ব্যবস্থা করা হবে। এছাড়া প্রতিটি জেলায় ১০ টি করে বালিকা বিদ্যালয় এবং একটি শিক্ষিকা ট্রেনিং স্কুল প্রতিষ্ঠার পূর্বোক্ত প্রস্তাবও ওই সার্কুলার পত্রে উল্লেখ করা হয়। এ পত্রের সাথে কিছু প্রশ্নমালা সংযোগ করা হয় যাতে সংশ্লিষ্টদের চাহিদা অনুযায়ী মতামত দেয়া সহজ হয়। নারীশিক্ষা সাব-কমিটির প্রস্তাবনাগুলো এদেশের মুসলিম সংগঠনসমূহ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে এবং দু'মাসের মধ্যেই তাদের অনেকের মতামত সেক্রেটারির কাছে প্রেরণ করা হয়। দু'একটি ব্যতিক্রম ছাড়া অধিকাংশ সংগঠনই নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা নির্দ্বিধায় স্বীকার করে নেয়।[১৩১] তবে লক্ষণীয় যে, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ব্যাপারে কিছু দ্বিমত থাকলেও জেনানা ও গৃহশিক্ষকের নিকট শিক্ষার বিষয়টিকে সকলেই স্বাগত জানায়।

বিভিন্ন প্রচেষ্টা ও অনুশীলনের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করে নওয়াব সলিমুল্লাহর সভাপতিত্বে গঠিত নারীশিক্ষা বিষয়ক সাব-কমিটি ১৯০৮ সালের ২০ ডিসেম্বর একটি প্রাথমিক 'সাজেশন' বা পরামর্শ রিপোর্ট পেশ করে। উক্ত রিপোর্টে বাংলা ও উর্দু পাঠ্যসূচি প্রবর্তনের মাধ্যমে প্রচলিত কোরান শিক্ষার নিম্ন প্রাইমারি স্কুলগুলোকে যুগোপযোগী ও লোকায়ত করা এবং এজন্য উদারভাবে সাহায্য প্রদান; পশ্চাদপদ মুসলিম নারীশিক্ষার অগ্রগতির জন্য বেশি পরিমানের সরকারি অনুদান বরাদ্দ; প্রতিটি জেলায় অন্তত দুটো করে উন্নত ধরনের মুসলিম বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং এ বিষয়ে মুসলিম সমাজে আগ্রহ সৃষ্টি করা; ঐ সব স্কুলে উপযুক্ত বেতন ভাতাদি দিয়ে মুসলিম শিক্ষক/ শিক্ষিকা নিযুক্ত করা এবং এ জন্য সরকারি অনুদান প্রদানের মাধ্য নারীশিক্ষার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধির চেষ্টা করা; মুসলিম শিক্ষিকা বা বয়স্ক মুসলিম পুরুষ শিক্ষক দ্বারা মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় মেয়েদের জন্য আরো বেশি করে মহল্লা ক্লাস নেয়ার ব্যবস্থা করা; নারীশিক্ষাকে উৎসাহিত করার জন্য বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত বালিকা এবং জেনানা শিক্ষা গ্রহণকারী নারীদের কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফলের জন্য পুরস্কারের সংখ্যা ও পরিমাণ বৃদ্ধি করার পরামর্শ দেয়া হয়।[১৩২]

---

১৩১. বিরোধিতাকারীদের মধ্যে অন্যতম ছিল ' কিশোরগঞ্জ মুসলিম এ্যাসোসিয়েট'। সংগঠনটি সাব কমিটির উদ্যোগের প্রশংসা করলেও মত দেয় যে, মুসলিম বালিকাদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণের সময় এখনো আসেনি, তাই আরো অপেক্ষা করা দরকার। দ্রষ্টব্য, মোঃ আলমগীর, 'নারীশিক্ষা ও নওয়াব সলিমুল্লাহ', *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৯৯

১৩২. *Report on the Sub-Committee for Female Education* among *Mohammedans,* Dacca, 20 December,1908; মোঃ আলমগীর, 'নারীশিক্ষা ও নওয়াব সলিমুল্লাহ', *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৯৯-১০০

মুসলিম সমাজের বাস্তব অবস্থা দৃষ্টে নবাব সলিমুল্লাহ জেনানা শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। ১৯১০ সালে জেনানা শিক্ষা কার্যক্রমকে ত্বরান্বিত করার বিষয়ে তিনি পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রাদেশিক মুসলিম শিক্ষা সমিতির প্রতিশ্রুতি লাভ করেন। জেনানা শিক্ষার এ সুফলও পাওয়া গিয়েছিল। ১৯১১-১৯১২ সালে মুসলিম নারীশিক্ষা বিষয়ক এক পরিসংখ্যানে এ বিষয়টি পরিদৃষ্ট হয়।[১৩৩]

১৯১১ সালে ১০ জুন নবাব সলিমুল্লাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মুসলিম নারীশিক্ষা বিষয়ক সাব-কমিটির সভায় বেশ কয়েকটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। এসব প্রস্তাবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল- জেলা সদরসহ মুসলিম নারীশিক্ষার চাহিদা রয়েছে এমন স্থানে পৌর স্কুল চালু করা; সরকারি অনুদানে মফস্বল এলাকায় মুসলিম বালিকাদের জন্য উন্নত ধরনের স্কুল চালু করা; মুসলিম বালিকাদের জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং জেনানা ক্লাসের পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন; পাঠ্যসূচি প্রণয়নকালে মুসলমান সম্প্রদায়ের মানসিকতা এবং ধর্মানুভূতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয় এমন রচনাবলী সতর্কভাবে পরিহার করা; প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রদেয় বৃত্তির যুক্তিসঙ্গত অংশ মুসলিম বালিকাদের জন্য সংরক্ষণ করা; জেনানা শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের প্রদেয় বার্ষিক বৃত্তি ষাণ্মাষিক করা; এবং মুসলিম বালিকাদের শিক্ষার জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বগুড়া শহরে অন্তত একটি মাধ্যমিক স্কুলকে সরকারিকরণ করা ইত্যাদি।[১৩৪]

মুসলিম নারীশিক্ষা বিষয়ক সাব-কমিটির কর্মতৎপরতা ও প্রচারণা সুপারিশ নারীশিক্ষা বিষয়ে কেবল সরকারি নীতি নির্ধারণকে প্রভাবিত করেছিল এমনটা নয়, এর দ্বারা নারীশিক্ষা বিষয়ে মুসলিম সমাজেও আগ্রহ ও সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। এমনকি এ সাব-কমিটির কর্ম প্রয়াসে উদ্বুদ্ধ হয়ে বাংলার সামর্থবান মুসলমানদের কেউ কেউ নিজ সম্প্রদায়ের নারীদের শিক্ষার জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠায়ও অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন বলে তথ্য সূত্রে জানা যায়।[১৩৫]

ধনবাড়ির জমিদার নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী ছিলেন বাংলার মুসলিম সমাজের একজন অগ্রণী নেতা। মুসলিম সমাজের শিক্ষার প্রসারে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অবদানের কথা সুবিদিত। Female Educational Committee এর সদস্য এবং Sub-Committee for Mohammedan Female Education-এর সেক্রেটারি হিসেবে নারীশিক্ষার প্রসারে তাঁর বিশেষ ভূমিকা প্রসঙ্গে ইতোমধ্যেই উল্লেখ করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, উপর্যুক্ত কমিটির সাথে সক্রিয়ভাবে যুক্ত থেকে মুসলিম নারীশিক্ষার প্রসারে কতগুলো প্রস্তাব উত্থাপনের মধ্যে তিনি তাঁর দায়িত্ব শেষ

১৩৩. দ্রষ্টব্য *Report on the progress of Education in Eastern Bengal and Assam, During the years 1907-1908 to 1911-1912,* vol. I, p. 101, Para 229; সুফিয়া আহমেদ, 'পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশে মুসলমানদের শিক্ষার অগ্রগতিতে নবাব সলিমুল্লাহর অবদান', *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৯৪

১৩৪. *Proceedings of a meeting of the Sub-Committee for Mohammedan Female Education,* 10 June, 1908; মোঃ আলমগীর, 'নারীশিক্ষা ও নওয়াব সলিমুল্লাহ', *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১০১

১৩৫. এ প্রসঙ্গে জনৈক মুন্সী গোলাম সোবহান কর্তৃক ময়মনসিংহের কাছিঝুলি নামক স্থানে তাঁর নিজ বাড়ীতে মুসলিম বালিকাদের শিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠিত একটি বালিকা বিদ্যালয়ের কথা উল্লেখ করা যায়। দ্রষ্টব্য, মোঃ আলমগীর, 'নারীশিক্ষা ও নওয়াব সলিমুল্লাহ', *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১০২

করেননি। পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রাদেশিক আইন সভার সদস্য হিসেবে প্রস্তাবগুলো বাস্তবায়নে সরকারের প্রতি জোরালোভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। দৃষ্টান্ত হিসেবে ১৯০৮-১৯০৯ সালের এবং ১৯০৯-১৯১০ সালের বাজেট আলোচনায় এ প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য স্মরণযোগ্য। শেষোক্ত বাজেট বক্তৃতায় Female Educational Committee এর গৃহীত প্রস্তাবাদি সম্পর্কে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এগুলো বাস্তবায়নে কর্তৃপক্ষ যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছিলেন।[১৩৬] ১৯১৪ সালে বঙ্গীয় সরকার প্রাদেশিক পরিষদের পরিচালক মি. হার্নেলকে প্রধান করে 'Mohammedan Educational Advisory Committee' নামে যে উচ্চপর্যায়ের একটি কমিটি গঠন করেছিল নওয়াব আলী চৌধুরী এর অন্যতম সদস্য ছিলেন।[১৩৭] কমিটির সদস্যরূপে তিনি কেবল মুসলমানদের সাধারণ শিক্ষার জন্যই কাজ করেননি, নিজ সম্প্রদায়ের নারীশিক্ষার জন্যেও তিনি কমিটির কাছে স্বতন্ত্রভাবে একটি সংক্ষিপ্ত নোট দাখিল করেছিলেন। ১৯১৪ সালের ১১ এপ্রিল ঢাকায় অনুষ্ঠিত 'বঙ্গ প্রেসিডেন্সী মুসলমান শিক্ষা সমিতি'র উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতির ভাষণে নওয়াব আলী চৌধুরী বলেন, "আমাদের বালিকাদের প্রশিক্ষণের উপরই আমাদের বালকদের শিক্ষা অনেকাংশে নির্ভর করে। শিক্ষার প্রাথমিক স্কুল হলো বাড়ী। মায়েরা শিক্ষিতা না হলে শিশুদের চরিত্র গঠনের আশা করা যায় না। এ বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।" তিনি পূর্ববাংলা ও আসামের নারীশিক্ষায় অর্জিত অগ্রগতির কথা উল্লেখ করে তা যেন কোনমতেই ব্যাহত না হয়, বরং আরো অগ্রগতি অর্জত হয় সে বিষয়ে মুসলিম সমাজের সাহায্য কামনা করেন। তিনি নারীশিক্ষার অগ্রগতির ধারা অব্যাহত রাখার জন্য জেনানা বা অন্তঃপুর শিক্ষাকে বিশেষভাবে উৎসাহ প্রদান করেন।[১৩৮]

বস্তুত, ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের পর থেকে গঠিত বিভিন্ন কমিটির সাথে সক্রিয়ভাবে যুক্ত থেকে নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী মুসলিম সমাজে নারীশিক্ষার প্রসারে বিভিন্ন স্কীম প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেন।

টাঙ্গাইলের স্যার আবদুল করিম গজনবী [(১৮৭২-১৯৩৯ খ্রি.), এ কে গজনবী নামে অধিক পরিচিত] ছিলেন অবিভক্ত বাংলার মন্ত্রী, বঙ্গীয় শাসন পরিষদের (Bengal Governor's Executive Council) সদস্য ও বঙ্গীয়

---

১৩৬. দ্রষ্টব্য *The Eastern Bengal Assam Gazette*, Part VI, May 13, 1908, 21 April, 1909, pp. 60; 65; মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, *নওয়াব আলী চৌধুরী: জীবন ও কর্ম*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮৭, পৃ. ১২৬

১৩৭. কমিটির অন্যান্য সদস্য ছিলেন: নবাব খাজা স্যার সলিমুল্লাহ, খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা , নবাব এ.এফ.এম আবদুর রহমান খান বাহাদুর, খান বাহাদুর মৌলবী মোহাম্মদ ইব্রাহিম, শামসুল উলামা আবু নসর মুহম্মদ ওয়াহীদ, এ. কে গজনবী, খান বাহাদুর মির্জা সুজাত আলী বেগ, এ.কে ফজলুল হক, মাজহারুল আনওয়ার চৌধুরী, খান বাহাদুর দেওয়ান ফযলে রাব্বী এবং খান বাহাদুর রহীম যাহিদ সোহরাওয়ার্দী প্রমুখ। মোহাম্মদ আবদুল মজিদ, *খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা: শিক্ষা ও সমাজচিন্তা*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ৪৮

১৩৮. Presidential Address by Nawab Ali Chowdhury delivered in the Inaugral session of the Bengal presidency Muhammedan Educational Conference, Dacca, the 11th April, 1914. pp. 17-18; মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, *নওয়াব আলী চৌধুরী: জীবন ও কর্ম*, পৃ. ১২৬-১২৭

প্রাদেশিক ও ভারতীয় কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য, মুসলিম শিক্ষার সংস্কারক এবং বঙ্গীয় মুসলিম রেনেসাঁর অন্যতম দিকপাল। তিনিও পূর্বোক্ত হার্নেল কমিটির অন্যতম সদস্য ছিলেন। নারীশিক্ষার একনিষ্ঠ সমর্থক এ কে গজনবী হার্নেল কমিটির সদস্য হিসেবে মুসলিম নারীশিক্ষাকে পুরুষদের শিক্ষার চেয়েও অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বলে মত দিয়েছিলেন। কারণ তিনি মনে করতেন, একটি শিশুর শিক্ষা এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের বিকাশ অনেকাংশেই তার মা এবং বোনের দ্বারা প্রভাবিত হয়।[১৩৯] মুসলিম নারীশিক্ষার প্রসারে এ কে গজনবী ঢাকা ও কলকাতায় কিছু সংখ্যক স্বতন্ত্র মডেল বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারের কাছে দাবি করেন, যেখানে ধর্মীয় মনোভাব বজায় রাখতে আরবি শিক্ষারও ব্যবস্থা থাকবে। হার্নেল কমিটির অন্যতম সদস্য বিশিষ্ট মুসলিম বুদ্ধিজীবী এ.এফ.এম আবদুর রহমান খান বাহাদুরও অনুরূপ মডেল বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবি জানিয়েছিলেন।[১৪০]

ড. আবদুল্লাহ সোহরাওয়ার্দী (১৮৭০-১৯৩৫ খ্রি.) ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ এবং মুসলিম সমাজের একজন নেতৃস্থানীয় বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিবিদ। তিনিও নারীশিক্ষার একজন জোরালো সমর্থক ছিলেন। তিনি মনে করতেন, নারীশিক্ষা ব্যতীত বুদ্ধিবৃত্তিক জাগরণ ও সংস্কার সাধন সম্ভব নয়। অজ্ঞতা, অদক্ষতার অন্ধকার থেকে নারীদের মুক্তি এবং তাদের প্রগতির পথে ধাবিত করার জন্য নারীশিক্ষার যথোপযুক্ত ও পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণের উপর তিনি বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করেছিলেন। তাই বঙ্গীয় আইন পরিষদের সদস্য হিসেবে ১৯১৭-১৮ সালের বাজেট বক্তৃতায় তিনি নারীশিক্ষা প্রসারে সরকারি উদ্যোগ ও সহায়তা বৃদ্ধির জোর দাবি জানান।[১৪১]

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, উনিশ শতকের শেষার্ধে বাঙালি মুসলিম সমাজে নারীশিক্ষার ব্যাপারে কিছুটা আগ্রহ তৈরি এবং নারীশিক্ষার প্রসারে কিছু ইতিবাচক অগ্রগতিও অর্জিত হয়েছিল। তবে প্রতিবেশী হিন্দু সমাজের এমনকি সমকালীন মুসলিম বিশ্বের কিছু দেশের তুলনায় বাংলার মুসলিম সমাজে নারীশিক্ষা এবং সামগ্রিক উন্নতির গতি ছিল অনেক মন্থর। তাই বিশ শতকে এসেও বাঙালি মুসলমানদের নারীশিক্ষার ব্যাপারে উৎসাহিত করতে হয়েছিল। এ ব্যাপারে আধুনিক মনন এবং প্রগতিশীল ভাবধারাপুষ্ঠ মুসলমান নারী-পুরুষ, সংবাদপত্র এবং সংগঠন বিশেষভাবে সচেষ্ট হয়েছিল। এক্ষেত্রে নারী জাগরণের অগ্রদূত রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের ভূমিকা সর্বাগ্রে গণ্য। রোকেয়া ছাড়াও তাঁর ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত আরো অনেক মহিয়সী নারীশিক্ষা প্রসারে বাঙালি মুসলিম সমাজকে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণীত করার চেষ্টা করেছেন। কেবল নারীরাই নয়, অনেক পুরুষ বুদ্ধিজীবী, এমনকি রাজনীতিবিদগণও এ সময় নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি

---

১৩৯. *A Note on Muhammadan Education by the Hon'ble Mr. A k Ghaznavi to be considered by Muhammadan Educational Advisory Committee*, Calcutta, 1915. p. 6

১৪০. মোঃ আবদুল্লাহ আল মাসুম, *ব্রিটিশ আমলে বাংলার মুসলিম শিক্ষা: সমস্যা ও প্রসার*, পৃ. ৫৫৪

১৪১. *Proceedings of the Bengal Legislative Council*, vol. XLIX, 1917, p. 456

করে এ বিষয়ে জনমত তৈরিতে নানাভাবে ভূমিকা পালন করেছেন। নারীশিক্ষার প্রতি জনমত তৈরিতে মুসলমানদের সম্পাদিত অনেক সংবাদপত্র ও সাময়িকী প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেছিল। এক্ষেত্রে *নবনূর, মাসিক মোহাম্মদী, আল এসলাম, দ্যা মুসলমান* ইত্যাদি পত্রিকার নাম উল্লেখযোগ্য। তবে যে পত্রিকাটি এ বিষয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে, সেটি হলো *সওগাত*। এ কথা সর্বজনবিদিত যে, বাঙালি মুসলমান সমাজের বিকাশ ও অগ্রগতিতে *সওগাত* পত্রিকা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন সম্পাদিত[১৪২] *সওগাত* পত্রিকাটি যে সব নীতি আদর্শ অনুসরণ করতো এর মধ্যে অন্যতম ছিল নারীশিক্ষা ও নারী স্বাধীনতার পূর্ণ সমর্থন। পত্রিকাটিকে নারীমুক্তি আন্দোলনের অগ্রদূত বলে গণ্য হয়। উপরের আলোচনায় এর প্রতিফলন দেখা যায়। অনেক চিন্তাশীল প্রগতিবাদী লেখক *সওগাত* পত্রিকায় তাদের লেখনীর মাধ্যমে নারীশিক্ষার সপক্ষে জনমত তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। তারা সওগাত ছাড়াও উপরে উল্লিখিত নারীশিক্ষার সমর্থক পত্রিকার মাধ্যমে নারীশিক্ষার বিরুদ্ধবাদীদের বক্তব্যেরও জবাব প্রদান করতেন। প্রসঙ্গত হাবিবুল্লাহ বাহার ও শামসুন নাহার মাহমুদ সম্পাদিত *বুলবুল* পত্রিকাটির নামও উল্লেখ করা যায়। এটিও বাঙালি মুসলিম নারীদের শিক্ষা বিস্তার ও জাগরণে প্রচেষ্টা চালিয়েছিল। ব্যক্তি উদ্যোগ, সংবাদ ও সাময়িকপত্র ছাড়াও বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত অনেক সভা-সমিতি গড়ে উঠেছিল, যে সব সংগঠন নারীশিক্ষার পক্ষে জনমত তৈরিসহ নারীশিক্ষার বিস্তারে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। তাদের এসব প্রচেষ্টা মুসলিম নারীশিক্ষার প্রসারে সরকারের নীতি নির্ধারণেও প্রভাব বিস্তার করেছিল।

৬. ৪: বিশ শতকের প্রথমার্ধে বাঙালি মুসলিম নারীশিক্ষার প্রসারে জেনানা শিক্ষা ব্যবস্থা

বাঙালি মুসলিম নারীদের শিক্ষার সপক্ষে জনমত তৈরির উপর্যুক্ত ব্যক্তিক প্রয়াস, সংবাদপত্র ও সাময়িকী এবং সাংগঠনিক তৎপরতা বিষয়ক আলোচনার পর এবার মুসলিম নারীশিক্ষার প্রসারে বেসরকারি উদ্যোগে বিভিন্ন প্রচেষ্টা সম্পর্কে আলোকপাত করা যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে নারীশিক্ষার ব্যাপারে বাঙালি মুসলিম সমাজে আগ্রহ দেখা গেলেও এ সময় নারীশিক্ষার জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ বলতে গেলে ছিলই না। এ সময় মুসলিম নারীদের শিক্ষার প্রধান অবলম্বলন ছিল জেনানা বা অন্তঃপুর শিক্ষা। মুসলিম পরিবারের পর্দানশীন মেয়েরা এবং বয়স্ক নারীদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ জেনানা শিক্ষার প্রতি আগ্রহী ছিলেন। বিশ শতকেও বাঙালি মুসলিম সমাজে নারীশিক্ষার এ জনপ্রিয় ধারাটি অব্যাহত ছিল। এ সময় বেসরকারি উদ্যোগে ব্যক্তিগত প্রয়াসে জেনানা শিক্ষা ব্যবস্থা অব্যাহত রাখার প্রয়াস যেমন দেখা যায়, তেমনি মুসলিম সমাজের বাস্তবতা উপলব্ধি করে সরকারিভাবেও জেনানা শিক্ষার পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করা হয়। সরকারিভাবে জেনানা শিক্ষাপদ্ধতি অব্যাহত রাখার ব্যাপারে শিক্ষা দপ্তরের কারো কারো ভিন্ন মত

১৪২. আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদও *সওগাত* পত্রিকাটির সম্পাদনার সাথে জড়িত ছিলেন।

থাকলেও সরকার এ ব্যবস্থা বন্ধ করেনি। ১৯০১ সালে অনুষ্ঠিত সিমলা শিক্ষা সম্মেলনের সুপারিশ অনুযায়ী বাংলা সরকার মুসলিম নারীশিক্ষা বিস্তারে জেনানা শিক্ষা পদ্ধতির উপর গুরুত্বারোপ করেছিল। হিন্দু-মুসলিম নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনাক্রমে ১৯০৩ সালে সরকার জেনানা শিক্ষার একটি পাঠ্যক্রম তৈরি করে। এ সময় সরকার নিযুক্ত শিক্ষিকাগণ আগ্রহী শিক্ষার্থীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে পাঠদান ছাড়াও কিছু কেন্দ্রে নারীদের একত্র করে পাঠদানের ব্যবস্থা করে।[১৪৩] জেনানা শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনায় সরকারকে সহযোগিতার জন্য স্থানীয় প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে কমিটিও গঠন করা হয়।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, জেনানা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে শিক্ষা দপ্তরের সরকারি কর্মকর্তাদের মধ্যে মতপার্থক্য ছিল। ১৯০৬ সালে একজন ব্রিটিশ নারী স্কুল পরিদর্শক জেনানা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করে এ খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ সাধারণ বালিকা বিদ্যালয়ে ব্যয়ের পরামর্শ দেন। এর বিপরীতে বর্ধমান ও প্রেসিডেন্সি বিভাগের মহিলা স্কুল পরিদর্শক মিস এইচ বোস গ্রামাঞ্চলে মুসলিম নারীদের জেনানা শিক্ষার প্রয়োজন আছে বলে অভিমত দেন। ফলে সরকার এ শিক্ষা পদ্ধতি বহাল রাখে। তদুপরি সরকার কর্তৃক গঠিত Female Educational Committee (১৯০৮) এর সদস্য এবং Sub-Committee for Mohammedan Female Education, Mohammedan Educational Advisory Committee (১৯১৪) এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের (১৯১৭) প্রস্তাবে জেনানা শিক্ষা ব্যবস্থা অব্যাহত রাখার বিষয়ে মত প্রকাশ করা হয়েছিল। এসব কমিটির মতামত জেনানা শিক্ষা বিষয়ে সরকারের নীতিকে প্রভাবিত করেছিল বলে মনে হয়।

সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়াও ব্যক্তিগত প্রয়াস এবং উদ্যোগে বিশ শতকের প্রথম দশকে বাংলায় জেনানা শিক্ষা কার্যক্রম জোরদার হয়। ফলে পর্দা প্রথা মেনে সাধারণ মুসলিম পরিবারের, এমনকি রক্ষণশীল পরিবারের নারীরাও শিক্ষা লাভে সুযোগ পায়। তথ্যসূত্র থেকে জানা যায় যে, ১৯০৬-৭ সালে যেখানে ঢাকা জেনানা শিক্ষা কেন্দ্রগুলোতে ২১ জন হিন্দু এবং ১৭ জন মুসলিম নারী শিক্ষার্থী ছিল, ১৯১১-১২ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় যথাক্রমে ১২৬ জন হিন্দু এবং ১৪৯ জন মুসলিম নারী শিক্ষার্থীতে।[১৪৪] লক্ষণীয় যে, এ সময়কালে ঢাকার জেনানা শিক্ষা কেন্দ্রগুলোতে হিন্দু অপেক্ষা মুসলিম শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এতে বুঝা যায় যে, জেনানা শিক্ষা মুসলিম সমাজে অধিক জনপ্রিয় ছিল। ঢাকা ছাড়াও পূর্ব বাংলার গোপালগঞ্জ, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, নোয়াখালী, রাজশাহী, বগুড়া, পাবনা, রংপুর প্রভৃতি অঞ্চলে জেনানা শিক্ষা কেন্দ্র পরিচালনা করা হয়। জেনানা শিক্ষার পাঠ্যক্রম সংশোধন করে উন্নত করা হয়। সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগ

১৪৩. তথ্যসূত্র থেকে জানা যায় যে, সরকার জেনানা শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য মাসিক ৩০ টাকা বেতন ধার্য করে ৩১ জন শিক্ষিকা নিয়োগ দিয়েছিলেন। এদের মধ্যে ৮ জন শিক্ষিকা কেবল মুসলিম নারীশিক্ষার্থীদের পাঠদানে নিয়োজিত ছিলেন। দ্রষ্টব্য, মো. আবদুল্লাহ আল মাসুম, *ব্রিটিশ আমলে বাংলার মুসলিম শিক্ষা: সমস্যা ও প্রসার*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫৪৪

১৪৪. *Report on the progress of Education in Eastern Bengal and Assam, During the years 1907-1908 to 1911-1912,* vol. I, p. 101; মো. আবদুল্লাহ আল মাসুম, *ব্রিটিশ আমলে বাংলার মুসলিম শিক্ষা: সমস্যা ও প্রসার*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫৪৭

ও তৎপরতায় বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে বাংলার মুসলিম সমাজে জেনানা নারীশিক্ষা পদ্ধতি আরো জনপ্রিয়তা লাভ করে। ঢাকা, রাজশাহী এবং চট্টগ্রামসহ মুসলিম জনসংখ্যা অধ্যুষিত অঞ্চলে নারীশিক্ষার অগ্রগতি সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য পরিসংখ্যানে এটি প্রমাণিত হয়।[১৪৫]

জেনানা শিক্ষায় মুসলিম নারীশিক্ষার ইতিবাচক অগ্রগতি সত্ত্বেও বিশ শতকের দ্বিতীয় শতকের শেষ দিকে এ পদ্ধতিতে নারীশিক্ষার প্রসার ও ও নিয়ন্ত্রণে নানা সমস্যা দেখা যায়। একদিকে যোগ্য শিক্ষিকার অভাব, পর্যাপ্ত আর্থিক অনুদান সমস্যা, অন্যদিকে জেনানা শিক্ষার পদ্ধতিগত নানা ত্রুটি ইত্যাদির ফলে এ শিক্ষা পদ্ধতির ভবিষ্যত নিয়ে পুনরায় বিতর্ক দেখা দেয়। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সরকারি ব্যবস্থাপনায় 'আতুস' বা মুসলিম শিক্ষিকাদের বাড়িতে যে জেনানা শিক্ষা পদ্ধতির প্রচলন ছিল, তা বঙ্গভঙ্গ রদের পর বন্ধ করে দেয়া হয়। প্রয়োজনীয় অর্থ ও শিক্ষকের অভাবে ১৯১২-১৩ সালে কিছু জেনানা শিক্ষা কেন্দ্র বন্ধ হয়ে যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, মাসিক বেতন কিংবা আনুষঙ্গিক খরচ না পাওয়ায় শিক্ষিকাগণ আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন এবং অনেকেই শিক্ষকতার পদ ত্যাগ করেন। অন্যদিকে শিক্ষিকাগণ বাড়ি বাড়ি গিয়ে ছাত্রীদের পড়ানোর ক্ষেত্রে নানা সমস্যা ও অনেক সময় বিব্রতকর পরিস্থিতির মুখোমুখি হতেন। সমকালীন নারীশিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রতিবেদনে এ সব সমস্যার প্রতিফলন দেখা যায়।[১৪৬] উপর্যুক্ত প্রতিবন্ধকতার কারণে জেনানা শিক্ষায় ছাত্রী ও শিক্ষিকার সংখ্যা হ্রাস পেতে শুরু করে। এ অবস্থায় জেনানা শিক্ষা পদ্ধতির সংস্কারের দাবি ওঠে এবং সরকারের একাংশ থেকে বিশেষত স্কুল পরিদর্শিকাগণ এই ব্যবস্থা বন্ধ করার সুপারিশ করেন। ফলে সরকার এই স্কিমের আর প্রসার না ঘটিয়ে ধীরে ধীরে এর সংকোচন শুরু করে। এ সময় জেনানা শিক্ষার বিকল্প হিসেবে নতুন চিন্তা শুরু হয়। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে শিক্ষা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের পক্ষ থেকে জেনানা শিক্ষা পদ্ধতিতে আগ্রহী শিক্ষার্থীদের জন্য এভাবে বাড়ি হতে বাড়ি শিক্ষাদান ও ব্যাপকভাবে কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা না করে নির্বাচিত কিছু সংখ্যক কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিক্ষা প্রদান করার প্রস্তাব করা হয়।[১৪৭] সার্বিক দিক বিবেচনা করে সরকার ঐ পরিকল্পনাটি অনুমোদন করে। অন্যদিকে, বিশ শতকের ত্রিশের দশকে বাংলার নারীশিক্ষায় তুলনামূলকভাবে অগ্রগতি অর্জিত হয়। এ সময় সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করায় মেয়েদের বিদ্যালয়ে গমনের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। এমনকি বিবাহিত নারীরাও

১৪৫. দ্রষ্টব্য *Supplement to the Progress of Education in Bengal 1912 -13 to 1916- 17 (Fifth Quinquennial Review),* Calcutta 1918, pp. 20, 21, 110-111

১৪৬. *Report on the Female Education in the Presidency and Burdwan Divisions, 1917,* p. 8: *Report on Public Instruction in Bengal 1920-22,* p.15; *Seventh Quinquennial Review on the Progress of Education in Bengal 1920-22, 1926-27,* p. 69; *Quinquennial Report on Female Education for the Dacca circle 1917-18, 1920 -22,* pp.1-9; মো. আবদুল্লাহ আল মাসুম, *ব্রিটিশ আমলে বাংলার মুসলিম শিক্ষা: সমস্যা ও প্রসার*, *পূর্বোক্ত*,পৃ. ৫৬০

১৪৭. ঢাকা প্রশিক্ষণ কলেজের প্রিন্সিপাল মি. ওয়েস্ট এ প্রস্তাবটি দিয়েছিলেন। তাঁর এ প্রস্তাবটি ইংল্যান্ডের National Parent's Union পরিকল্পনার ধারণা থেকে নেয়া হয়েছিল। প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় নারীদের পড়া, হাতের লেখা শেখানো ছাড়াও গণিত ও স্বাস্থ্যবিজ্ঞানসহ অন্যান্য আধুনিক শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা থাকবে। মি. ওয়েস্ট তাঁর প্রস্তাবিত পরিকল্পনা নিয়ে ইডেন কলেজ সংযুক্ত প্রশিক্ষণ স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা ও ঢাকার জেনানা শিক্ষিকাদের সঙ্গে আলোচনা করলে তাঁরা এ প্রস্তাবের সাথে সহমত পোষণ করেন। মো. আবদুল্লাহ আল মাসুম, *ব্রিটিশ আমলে বাংলার মুসলিম শিক্ষা: সমস্যা ও প্রসার*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫৬০

বিদ্যালয়ে যেয়ে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। তদুপরি ১৯৩০ সালে বাল্য বিবাহ আইনগতভাবে[১৪৮] নিষিদ্ধ করা হলে প্রাতিষ্ঠানিক নারীশিক্ষা এমনকি নারীদের জন্য উচ্চশিক্ষা অর্জনের সুযোগ বৃদ্ধি পায়। এ অবস্থায় জেনানা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা আরো হ্রাস পায়। জানা যায় যে, বর্ণিত সময়ে বাংলায় জেনানা শিক্ষা ব্যবস্থায় মাত্র ১৪ জন শিক্ষিকার অধীনে ৫৫১ জন শিক্ষার্থী পাঠ গ্রহণরত ছিলেন।[১৪৯] এ পরিসংখ্যান থেকে জেনানা শিক্ষার ব্যাপারে বাঙালি নারীদের অনাগ্রহের বিষয়টি বুঝা যায়। বিদ্যমান পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে এ সময় নারীশিক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত স্কুল পরিদর্শিকাগণ জেনানা শিক্ষা ব্যবস্থা বিলুপ্ত করার জন্য সুপারিশ করলে বাংলা সরকার ১৯৩৩ সালে ঐ শিক্ষা পদ্ধতি সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত করে। তবে সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, জেনানা শিক্ষায় যে অর্থ ব্যয় করা হতো এখন থেকে তা মুসলিম নারীশিক্ষার উন্নয়নের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ও অন্যান্য খাতে ব্যয় করা হবে।[১৫০] এভাবেই বাংলায় নারীশিক্ষা বিস্তারে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা একটি উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রমধর্মী শিক্ষা পদ্ধতির অবসান ঘটে। উল্লেখ্য যে, সরকারিভাবে জেনানা শিক্ষা পদ্ধতি বিলুপ্ত করা হলে ব্যক্তিগত ও বেসরকারিভাবে এ পদ্ধতিটি অব্যাহত রাখারও প্রয়োজনীয়তা কমে আসে। কেননা এ পর্যায়ে মুসলিম পরিবারের মেয়েরাও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণে ক্রমান্বয়ে আগ্রহী হয়ে ওঠে।

৬. ৫: বাঙালি মুসলিম নারীশিক্ষার প্রসারে বেসরকারি প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাঙালি মুসলিম সমাজে নারীশিক্ষা প্রতি আগ্রহ তৈরি হলেও এ শতাব্দীতে মুসলিম নারীশিক্ষার জন্য বিদ্যায়তনিক বা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ বলতে গেলে ছিলই না। বর্তমান অভিসন্দর্ভের পূর্ববর্তী একটি অধ্যায়ে এ বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। উনিশ শতকে নবাব ফয়জুন্নেছা চৌধুরাণী প্রতিষ্ঠিত একটি বালিকা বিদ্যালয় এবং এ শতকের একেবারে শেষলগ্নে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত মুসলিম বালিকা বিদ্যালয় ছাড়া মুসলমান নারীদের শিক্ষার জন্য স্বতন্ত্র কোনো বিদ্যালয়ই ছিল না। সরকারি এবং বেসরকারি উদ্যোগে আলোচ্য সময়ে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত বালিকা বিদ্যালয়গুলোতে তুলনামূলকভাবে মুসলিম ছাত্রী সংখ্যাও ছিল একেবারে হাতে গোনা। এ অবস্থায় বিশ শতকে মুসলিম নারীশিক্ষা প্রসারে নানামুখী তৎপরতা জোরদার করা হয়। এ সময় বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিবিদদের প্রচেষ্টায় সরকারও মুসলিম নারীশিক্ষা প্রসারে যত্নবান হয়। এর অংশ হিসেবে

---

১৪৮. ১৯২৯ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর ব্রিটিশ ভারতের ইম্পেরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে 'বাল্যবিবাহ নিরোধক আইন' (The Child Marriage Restraint Act, 1929) পাশ হয় এবং ১ এপ্রিল ১৯৩০ সালে সমগ্র ব্রিটিশ ভারতে এ আইনটি কার্যকর করা হয়। এ আইনটি প্রণয়নে রায় সাহেব হরবিলাস সারদা বিশেষ ভূমিকা পালন করেন এবং এ কারণে এ আইনটি 'সারদা আইন' নামেও বিশেষভাবে পরিচিত।

১৪৯. *Seventh Quinquennial Review on the Progress of Education in Bengal 1932-37,* Alipore, 1939, pp. 91-92

১৫০. *Report on Public Instruction in Bengal 1932-33,* p.31; *Seventh Quinquennial Review on the Progress of Education in Bengal 1932-37,* Alipore, 1939, pp. 91-92

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলায় বিভিন্ন ধরনের বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়।[১৫১] মুসলিম নারীদের জন্য মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যামিক, এমনকি উচ্চশিক্ষার দ্বারও উন্মুক্ত হয়।

বিশ শতকের শুরু থেকেই মুসলিম নারীশিক্ষার প্রসারে সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি ও ব্যক্তি উদ্যোগ জোরদার হয়। বিশ শতকের মধ্যভাগে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসান এবং ভারত বিভক্তির সময় পর্যন্ত বাংলায় মুসলিম নারীশিক্ষার প্রসারে অনুকূল জনমত তৈরিতে ব্যক্তিগত ও সাংগঠনিক তৎপরতা এবং জেনানা শিক্ষার প্রসারে প্রচেষ্টা ইত্যাদি বিষয়ে ইতোমধ্যে আলোচনা করা হয়েছে। এ পর্যায়ে আলোচ্য সময়ে বাঙালি মুসলিম নারীশিক্ষার প্রসারে ব্যক্তিগত ও বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত কিছু বালিকা বিদ্যালয় সম্পর্কে আলোকপাত করা হবে।

আলোচ্য সময়ে বেসরকারি ও ব্যক্তি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত সকল নারীশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তথ্য জানা যায় না। সোনিয়া নিশাত আমিন উল্লেখ করেছেন ১৯৩৮ সালে কলকাতাসহ বাংলা প্রদেশে বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠাত ও পরিচালিত ৩৬টি মুসলিম প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল। এসব বিদ্যালয় পরিচালনায় কিছু পরিমাণে সরকারি অনুদানও পাওয়া যেতো। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, সামসিয়া জেনানা মাদ্রাসাসহ কিছু বেসরকারি বালিকা বিদ্যালয়কে মাধ্যমিক স্তরের ক্লাসও চালু করার অনুমতি দেয়া হয়েছিল।[১৫২] তবে বেসরকারি পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত এসব বালিকা বিদ্যালয়ের পূর্ণাঙ্গ তালিকা বা বিবরণ পাওয়া যায় না। এ অবস্থায় আলোচ্য সময়ে বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত উল্লেখযোগ্য কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে নিম্নে আলোকপাত করা হলো।

সোহ্‌রাওয়ার্দীয়া বালিকা বিদ্যালয়

বিশ শতকে বেসরকারি উদ্যোগে মুসলমানদের প্রতিষ্ঠিত প্রথম বালিকা বিদ্যালয় ছিল 'সোহ্‌রাওয়ার্দীয়া বালিকা বিদ্যালয়'। বিদ্যালয়টির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন খুজিস্তা আখতার বানু জাহিদ (১৮৭৩-১৯১৯ খ্রি.), যিনি সোহ্‌রাওয়ার্দীয়া বেগম নামেও পরিচিত ছিলেন। এ মহিয়সী নারী ছিলেন ছিলেন একজন লেখক, শিক্ষাবিদ ও সমাজ সংস্কারক। প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ও লেখক ওবায়দুল্লাহ আল ওবায়দী সোহ্‌রাওয়ার্দী ও মাকবুলান নিসা বেগম দম্পতির জ্যেষ্ঠ কন্যা খুজিস্তা বানু প্রথম ভারতীয় মহিলা যিনি ১৮৮৭ সালে সিনিয়র ক্যামব্রিজ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এছাড়াও তিনি প্রথম ভারতীয় মহিলা যিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক উর্দু সাহিত্যের একজন

১৫১. প্রকৃতি ও ধরন অনুযায়ী সরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়গুলো ছিল: মডেল প্রাথমিক বিদ্যালয়, আরবান প্রাইমারী স্কুল, পঞ্চায়েত ইউনিয়ন বালিকা বিদ্যালয়, পশ্চাদপদ সম্প্রদায়ের জন্য বালিকা বিদ্যালয়, ঢাকা শহরভিত্তিক বালিকা বিদ্যালয়, কলকাতা শহরভিত্তিক বালিকা বিদ্যালয়, নির্বাচিত প্রাথমিক বিদ্যালয়, বিশেষ (পেশাগত) বিদ্যালয়। এ ছাড়াও ছিল বালিকা মক্তব ও মাদ্রাসা। মো. আবদুল্লাহ-আল মাসুম, *ব্রিটিশ আমলে বাংলার মুসলিম শিক্ষা:সমস্যা ও প্রসার*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫৬১-৬৩

১৫২. সেনিয়া নিশাত আমিন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৩১

পরীক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হন।[১৫৩] খুজিস্তা আখতার বানুর স্বামী স্যার জাহিদ সোহ্‌রাওয়ার্দী একজন আইনজ্ঞ ও বিচারক ছিলেন। এ দম্পতির এক পুত্র হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী (১৮৯২-১৯৬৩ খ্রি.) প্রথমে অবিভক্ত বাংলা এবং পরে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। অপর পুত্র হাসান শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী (১৮৯০-১৯৬৫ খ্রি.) একজন কূটনীতিবিদ, সাহিত্যিক এবং সাহিত্য সমালোচক হিসেবে সুপরিচিত।

খুজিস্তা আখতার বানু একজন নারী অধিকার কর্মী ছিলেন। সামাজিক কুসংস্কার এবং পারিবারিক নিগ্রহ থেকে মুক্ত করে সমকালীন নারী সমাজের জীবনমানের সার্বিক উন্নয়নের জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করেন। নারীশিক্ষার একজন দৃঢ় প্রবক্তা হিসেবে তিনি সমকালীন বাঙালি মুসলিম সমাজে প্রাতিষ্ঠানিক নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। তাই ১৯০৯ সালে তিনি কলকাতায় একটি মুসলিম বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। যে বালিকা বিদ্যালয়টি 'সোহ্‌রাওয়ার্দীয়া বালিকা বিদ্যালয়' নামে পরিচিতি লাভ করে।[১৫৪] বিদ্যালয়টি ভারতের ভাইসরয় (কার্যকাল ১৯০৫-১৯১০ খ্রি.) লর্ড মিন্টোর (প্রকৃত নাম গিলবার্ট ইলিয়ট-মারে-কাইনমাউন্ড মিন্টো) স্ত্রী আন্না মারিয়া অ্যামিয়াভ (লেডি মিন্টো নামে সমাধিক খ্যাত) উদ্বোধন করেন। এটি ছিল বাংলার মুসলিম বালিকাদের জন্য বিশ শতকে প্রতিষ্ঠিত প্রথম বালিকা বিদ্যালয়। খুজিস্তা আখতার বানু প্রতিষ্ঠিত এ বালিকা বিদ্যালয়টির কার্যক্রম সম্পর্কে বিস্তারিত কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। তবে সম্ভবত পরবর্তিতে এর নাম পরিবর্তন হয়ে খুজিস্তা আখতার বানু গার্লস স্কুল করা হয়েছিল। তথ্যসূত্র মতে, ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত এটি একটি বেসরকারি মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় হিসেবে পরিচালিত হয়।[১৫৫]

সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল

বাঙালি মুসলমান নারীর মুক্তি ও জাগরণের অগ্রদূত রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন। ইতোমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বাঙালি নারীর, বিশেষত বাঙালি মুসলিম নারীর মুক্তি সাধনই ছিল রোকেয়ার জীবনের আরাধ্য বাসনা। তিনি বেশ বুঝতে পেরেছিলেন বাঙালি নারীর আত্মা ও মনুষ্যত্ব বিকাশ এবং তাদের জাগরণের পূর্বশর্ত হচ্ছে নারীশিক্ষা। এ জন্যই তিনি বাঙালি মুসলিম সমাজে নারীশিক্ষা সম্পর্কে সচেতনতাবোধ তৈরি এবং নারীশিক্ষার পক্ষে জনমত তৈরিতে মেধা বিশেষ করে তাঁর ক্ষুরধার লেখনিকে ব্যবহার করেছেন। (বর্তমান অধ্যায়ে ইতোমধ্যে এতদবিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।) নারীশিক্ষা প্রসারে একজন নিরলস কর্মী হিসেবে রোকেয়া এখানেই তাঁর দায়িত্ব শেষ করেননি। বাঙালি নারীর শিক্ষার জন্য বিদ্যায়তনিক ব্যবস্থাও তিনি করেছিলেন। এ কথা বলা অসঙ্গত হবে না যে, বিশ শতকে বাঙালি মুসলিম মেয়েদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা

১৫৩. খুজিস্তা বানু রচিত *আয়না এ ইব্রাত* নামক একটি গ্রন্থ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজসমূহের পাঠ্যসূচিভূক্ত ছিল।
১৫৪. আবদুল হাকিম (সম্পা.), *বাংলা বিশ্বকোষ*, ৩য় খণ্ড, ঢাকা, ১৯৭৫, পৃ. ২৬০-৬১
১৫৫. আনোয়ার হোসেন, *স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার মুসলিম নারী (১৮৭৩-১৯৪৭)*, পৃ.৮৪

বিস্তারে সবচেয়ে জোরালো ভূমিকা পালন করেছিলেন তিনি। নারীশিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার তাগিদ থেকে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল।' উল্লেখ্য যে, রোকেয়ার ষোল বছর বয়সে উচ্চশিক্ষিত ও পদস্থ সরকারি কর্মকর্তা সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেন (১৮৫৮-১৯০৯ খ্রি.) এর সাথে বিয়ে হয়েছিল। তাঁদের দাম্পত্য জীবনের স্থায়ীত্বকাল ছিল মাত্র ১০ বছর। সাখাওয়াত হোসেন তাঁর মৃত্যুর পূর্বে নারীশিক্ষার জন্য একটি স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য স্ত্রী রোকেয়াকে দশ হাজার টাকা প্রদান করেছিলেন। সম্ভবত তিনি ভেবেছিলেন যে, "মেয়েদের একটি স্কুল চালাতে পারলে রোকেয়ার নিজের জীবনের আশাও পূর্ণ হবে, আর সেই সঙ্গে দেশের ও জাতির সর্বাপেক্ষা হিতকর কর্মকৃতি মেয়েদেরও লেখাপড়া শেখান হবে।"[১৫৬] স্বামীর জীবনাবসানের ৫ মাস পর রোকেয়া ১৯০৯ সালের ১ অক্টোবর মাত্র ৫ জন ছাত্রী নিয়ে ভাগলপুরের খলিফাবাগে 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল' নামে একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। তবে ভাগলপুরে রোকেয়ার বেশিদিন থাকা সম্ভব হয়নি। বিষয় সম্পত্তিগত বিরোধের কারণে সপত্নী-কন্যা ও তাঁর জামাতার দুর্ব্যবহার ও নানা ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে তিনি ১৯১০ সালের শেষভাগে ভাগলপুর ত্যাগ করে কলকাতায় চলে আসেন।

১৯১০ সালের ৩ ডিসেম্বর তিনি কলকাতার ১৩ নং ওয়ালিউল্লাহ লেনের একটি ছোট কক্ষে আটজন ছাত্রী নিয়ে পুনরায় 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল' নামে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। কলকাতার ন্যায় এতবড় শহরে একজন মুসলিম নারী অল্প সঞ্চয় এবং সামান্যতর অভিজ্ঞতা নিয়ে বালিকা বিদ্যালয় চালু করে প্রথমাবস্থায় অর্থ সংকটসহ নানা অসুবিধায় পড়েন। এ অবস্থায় কলকাতায় যাঁরা রোকেয়াকে সহযোগিতার জন্য এগিয়ে আসেন তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন সমসাময়িক মুসলিম সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব, হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের প্রবক্তা ও প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ ব্যারিস্টার আবদুর রসুল (১৮৭০-১৯৭১৭ খ্রি.)। তাঁর বাসভবনে ১৯১১ সালের ২ এপ্রিল রোকেয়ার স্কুল সংক্রান্ত প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং এ সভায় মৌলভী সৈয়দ আহমদ আলীকে সম্পাদক করে স্কুল পরিচালনা কমিটি গঠিত হয়। ১৯১২ সালে বালিকা বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে মাসিক ১০০ টাকা অনুদান বরাদ্দ করা হয়। এদ্বারা স্কুলটির পরিচালনা ব্যয়ের অতি সমান্য পরিমাণই মেটানো যেতো। বাকি টাকা সংগ্রহ করা রোকেয়ার জন্য অনেক কঠিন ছিল। এ কঠিন সময়ে রোকেয়ার পাশে দাঁড়িয়েছিলেন নওয়াব সৈয়দ সামসুল হুদা, কলকাতা জজ কোর্টের বিচারক আমিন আহমদ ও জি.এম কাসেমী প্রমুখ। তাঁরা, বিশেষ করে নওয়াব সৈয়দ সামসুল হুদা সাখাওয়াত মেমোরিয়াল বিদ্যালয়ে আর্থিক সহায়তা দান ও সরকারি অনুদান সংগ্রহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।[১৫৭] তদানীন্তন

১৫৬. মোশফেকা মাহমুদ, *পত্রে রোকেয়া পরিচিতি*, ঢাকা বাংলা একাডেমী, ১৯৮৯, পৃ. ৩; মাসুমা খানম, *নজরুল চেতনায় নারী ও নারীত্ব*, পৃ. ১২

১৫৭. শামসুল আলম, *রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন*, *পূর্বোক্ত* , পৃ. ৯৩-৯৪

ভারতের ভাইসরয় পত্নী লেডি চেমসফোর্ড ও লেডি কারমাইকেল রোকেয়ার স্কুল প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনায় পরামর্শক ও উৎসাহ দাতাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। ভূপালের বেগম সুলতান জাহান, মিসেস পি.কে. রায়, মিসেস হাকাম, মিসেস সাকিনা চৌধুরী এবং সরোজিনী নাইডু (১৮৭৯-১৯৪৯ খ্রি.) প্রমুখও রোকেয়াকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করেন। রোকেয়ার নিঃস্বার্থ সমাজসেবা, শিক্ষানুরাগ ও নারীশিক্ষা প্রসারে তাঁর অবদানের প্রশংসা করে ১৯১৬ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর সরোজিনী নাইডো তাঁকে একটি পত্র লিখেছিলেন।[১৫৮]

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের স্কুলে প্রথম দিকে ছাত্রীদের অনেকেই পড়ালেখা করতো বিনা বেতনে, কেউ কেউ পড়তো নামমাত্র বেতনে এবং ছাত্রীদের যাতায়াতের গাড়ী ভাড়া মওকুফ করা হতো অনেক সময়। এ সমস্ত সুযোগ দান করে এবং পর্দার নিশ্চয়তা দিয়ে ছাত্রী সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন মুসলিম পরিবারে গিয়ে তিনি অনুরোধ জানাতেন। প্রথম দিকে স্কুলটির শিক্ষার মাধ্যম ও প্রশাসনিক কাজের ভাষা ছিল উর্দু। সম্ভবত এ বিশেষ কারণেই তিনি প্রথমে বাঙালি এবং বাংলাভাষী অভিভাবক মহলে তেমন সাড়া ফেলতে পারেননি। তারপরও ১৯১৫ সালে পাঁচটি ক্লাস নিয়ে রোকেয়ার এ স্কুলটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের স্তরে পৌঁছে এবং দু'বছর পর মধ্য ইংরেজি বিদ্যালয়ে উন্নীত হয়। এ বছরই স্কুলটির ঠিকানাও পরিবর্তিত হয় এবং ৮৬/এ লোয়ার সার্কুলার রোডের একটি বাড়িতে এর পাঠদান কার্যক্রম চলে। রোকেয়ার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় স্কুলটিতে ছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং ১৯২৭ সালে স্কুলটিতে সপ্তম শ্রেণি চালু করা হয়। স্কুলের পরিধি সম্প্রসারণের ফলে রোকেয়ার একার পক্ষে আর এর ব্যয় নির্বাহ করা সম্ভব হচ্ছিল না। এ অবস্থায় বোম্বের প্রখ্যাত ব্যবসায়ী বি এম মালবভরি এবং কলকাতার নওয়াব বদরুদ্দীন হায়দার আর্থিক সহযোগিতা নিয়ে এগিয়ে আসেন। মহামান্য আগা খান স্কুলটির ফান্ডে এককালীন ৩০০ টাকা অনুদান প্রদান করেন।[১৫৯] এ ছাড়াও রেঙ্গুনের ব্যবসায়ী আবদুল করিম জামাল, খিলাফত আন্দোলনের পুরোধা প্রখ্যাত সাংবাদিক ও স্বাধীনতা সংগ্রামী মাওলানা মোহাম্মদ আলী জওহর, এ কে ফজলুল হক, বিচারপতি সৈয়দ শরফুদ্দিন, জনশিক্ষা বিভাগের সহকারী পরিচালক খান তাসাদ্দুক আহমদ, সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুলের পরিচালনা পরিষদের সম্পাদক সৈয়দ আহমদ আলী ও ওয়ালিউল ইসলাম, বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী শিক্ষা বিভাগের কর্মকতা মৌলভী আবদুল করিম, ডেভিড হেয়ার স্কুলের অধ্যক্ষ বিনয়ভূষণ সরকার, *দ্যা মুসলমান* পত্রিকার সম্পাদক প্রখ্যাত সাংবাদিক মৌলভী মুজিবুর রহমান, নওয়াব সিরাজুল ইসলাম, স্যার আবদুর রহিম, টাঙ্গাইলের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী এবং পাটনার সৈয়দ হাসান ইমাম প্রমুখ মহান মনীষী, বিদগ্ধ রাজনীতিবিদ ও সমাজ সংস্কারকগণ নারীশিক্ষা প্রসারে

---

১৫৮. দ্রষ্টব্য, মোশফেকা মাহমুদ, *পত্রে রোকেয়া পরিচিতি*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫-৬

১৫৯. শামসুল আলম, *রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন*, *পূর্বোক্ত* পৃ. ৯৭

রোকেয়ার মহতী উদ্যোগ ও একনিষ্ঠ সাধনাকে ফলপ্রসূ করার জন্য বিভিন্নভাবে সমর্থন, সহযোগিতা ও আনুকূল্য প্রদর্শন করেন।[১৬০]

আর্থিক সংকটতো ছিলই, এ ছাড়াও এ স্কুল এবং রোকেয়ার বিরুদ্ধে সে সময় কম চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র হয়নি। কিছু মহৎপ্রাণ ব্যক্তি তাঁর উদ্যোগে সাড়া দিয়ে এগিয়ে এসেছিলেন বটে, কিন্তু সমকালীন সমাজপতিদের অনেকই তাঁর বিরুদ্ধে এমনকি তাঁর স্কুলটির উচ্ছেদ সাধনে নানা অপপ্রয়াস চালিয়েছিলেন। ধর্মান্ধ মোল্লা মৌলভীগণ নারীশিক্ষা বিস্তারে রোকেয়ার বিদ্যালয় স্থাপনকে ধিক্কার জানিয়ে ছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে এমন অপপ্রচার চালানো হয়েছিল যে, "যুবতী বিধবা স্কুল স্থাপন করে নিজের রূপ যৌবনের বিজ্ঞাপন প্রচার করিতেছেন।"[১৬১]

সমাজের নিন্দা, গ্লানি এবং অন্যান্য প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও রোকেয়ার শ্রমনিষ্ঠার ফলে সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুলটি উচ্চ ইংরেজি স্কুলে উন্নীত হয়। ১৯২৯-৩০ সালে সরকার স্কুলটিকে ইংরেজি উচ্চ বিদ্যালয়ে পরিণত করে।[১৬২] ১৯৩১ সালে উচ্চতর শ্রেণিসমূহ থেকে জোবেদা খাতুন, রাবেয়া খাতুন, কায়সারী বেগম, খুরশিদী বেগম, হানিফা খাতুন ও আবেদা খাতুন প্রমুখ ছাত্রী বঙ্গীয় শিক্ষা পরিষদের (BSP) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। একই বছর সাখাওয়াত মেমোরিয়ালের ছাত্রীরা প্রথমবারের মতো কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন।[১৬৩] উল্লেখ্য যে, এ স্কুলে উচ্চতর শ্রেণি চালু করায় কয়েক বছরের মধ্যেই প্রতিষ্ঠা করতে হয়েছিল মুসলিম মহিলা শিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়।

সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুলটি প্রতিষ্ঠার পর এ স্কুলটিই যেন রোকেয়ার জীবন ইতিহাসে পরিণত হয়। 'ব্যক্তির ত্যাগে সমষ্টির কল্যাণ সাধন' এটিই ছিল রোকেয়ার জীবন ব্রত। তাই সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুলটিকে রক্ষা এবং এর উন্নয়নে তিনি নিজের ব্যক্তিগত সুখ ও আরাম-আয়েশ বিসর্জন দিতে দ্বিধা করেননি। রোকেয়ার এ ত্যাগের কথা বলতে গিয়ে সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুলের শিক্ষিকা ফাতেমা খানম লিখেন, "অলস অকর্মণ্য মুসলমান নারী জাতির জন্য এ প্রবীন বিধবা মহিলাটি যা করেছেন, সারা ভারতে তার তুলনা নেই।"[১৬৪] আমীন উদ্দীন আহমদ লিখেন, "শিক্ষাহীন বাঙালি মেয়ের জন্য নিজের জীবনকে তিলে তিলে ক্ষয় করিয়াছেন। মনে হয়,

---

১৬০. শামসুল আলম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১০৩

১৬১. উদ্ধৃতি, মোতাহার হোসেন সুফী, *বেগম রোকেয়া: জীবন ও সাহিত্য*, পৃ. ৪৮

১৬২. সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল ছাড়াও সরকার এই সময়ে ঢাকা, বহরমপুর, হাওড়া এবং বর্ধমানসহ বাংলার বিভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠিত অন্তত ৯টি মধ্যম বালিকা বিদ্যালয়কে উচ্চ ইংরেজি স্কুলে উন্নতি করেছিল। শুধু তাই নয়, নারীশিক্ষার প্রতি মুসলিম সমাজকে উৎসাহিত করার জন্য বরিশালে একটি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে সেখানে মুসলিম নারী শিক্ষক নিয়োগ দেয়। এমনকি চট্টগ্রামের ডা. খাস্তগীর বিদ্যালয়েও একজন মুসলিম নারী শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়েছিল। *Report on Public Instruction in Bengal , 1922-23*, p. 15*; Report of the Moslem Education Advisory Committee, 1934,* p. 109

১৬৩. শামসুল আলম, *রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৯৮

১৬৪. ফাতেমা খানম, *সপ্তর্ষি*, কলকাতা, ১৯৬৪, মুখবন্ধ।

সমাজের সহিত তিনি জোয়ান অব আর্কের ন্যায় যুঝিয়াছেন, গৃহশক্রুর সহিত যেন চাঁদ সুলতানার ন্যায় লড়িয়াছেন।”[১৬৫]

রোকেয়া ছিলেন একজন বাস্তববাদী মহিয়সী নারী। তাঁর লক্ষ্য ছিল সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুলকে একটি আদর্শ মুসলিম বালিকা বিদ্যালয় হিসেবে গড়ে তোলা, যেখানে শিক্ষার্থীরা আধুনিক জগতের সাথে তাল মিলিয়ে চলবার মতো প্রয়োজনীয় শিক্ষা অর্জন করতে পারে। রোকেয়া বিশ্বাস করতেন, মেয়েদের এমন শিক্ষায় শিক্ষিত করতে হবে, যাতে তারা ভবিষ্যৎ জীবনে আদর্শ গৃহিণী, আদর্শ জননী এবং সর্বোপরি একজন আদর্শ নারী হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। এ লক্ষ্য সামনে রেখে তিনি তাঁর স্কুলে যুগোপযুগী ও সুসমন্বিত শিক্ষাপদ্ধতি প্রবর্তন করেছিলেন। তাঁর স্কুলের পাঠ্যসূচিতে তফসিরসহ কোরআন পাঠ থেকে আরম্ভ করে ইংরেজি, বাংলা, উর্দু, ফারসি, হোম নার্সিং, ফার্স্ট এইড, রন্ধন এবং সেলাই ইত্যাদি অত্যাবশ্যকীয় বিষয় অন্তর্ভুক্ত ছিল।[১৬৬]

রোকেয়ার প্রতিষ্ঠিত সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুলটি কেবলই একটি বিদ্যালয় ছিল না, এটি ছিল বাঙালি মুসলিম নারী জাগরণের সূতিকাগার। রোকেয়ার স্কুল থেকে বহু মহীয়সী নারী জন্ম নিয়েছিলেন যারা পরবর্তী সময়ে বাংলায় মুসলিম নারী জাগরণে ও নারীমুক্তি আন্দোলনে বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছেন। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের স্বনামধন্য শিক্ষক, নারী অধিকার আন্দোলনের নেত্রী অধ্যাপক লতিফা আকন্দ (১৯২৫-২০১৬ খ্রি.) সাখাওয়াত মেমোরিয়াল বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী ছিলেন।

হেতালিয়া বালিকা বিদ্যালয়

হেতালিয়া বালিকা বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত একটি মুসলিম বালিকা বিদ্যালয়। ইতোমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আঞ্জুমানে ওলামায়ে বাঙ্গালা মুসলিম নারীশিক্ষার প্রসারে বাংলার বরিশাল ও কুষ্টিয়া অঞ্চলে কয়েকটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিল। কুষ্টিয়ায় প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়গুলোর মধ্যে একটি একটি ছিল হেতালিয়া বালিকা বিদ্যালয়। ১৯১৬ সালে প্রতিষ্ঠিত এ বালিকা বিদ্যালয়টি সম্পর্কে বিস্তারিত কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। তবে একটি তথ্য সূত্র মতে, সে সময় এ বিদ্যালয়টিতে ৩০ জন মুসলিম বালিকা অধ্যয়নরত ছিল।[১৬৭] বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এ বিদ্যালয়টিতে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল।

কামরুন্নেছা গার্লস হাইস্কুল

কামরুন্নেছা গার্লস হাইস্কুল ঢাকার টিকাটুলিতে অবস্থিত। উল্লেখ্য যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ছাত্রী বিপ্লবী লীলা নাগ (১৯০০-১৯৭০ খ্রি.) ‘দিপালী সংঘ’ নামে একটি সমাজসেবী সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এ

১৬৫. আমীন উদ্দীন আহমদ, ‘স্মৃতির অর্ঘ্য’ *মাসিক মোহাম্মদী*, মাঘ, ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২৭০

১৬৬. ফাতেমা খানম, *সপ্তর্ষি*, কলকাতা, ১৯৬৪, মুখবন্ধ।

১৬৭. আঞ্জুমানে ওলামায়ে বাঙ্গালার রিপোর্ট (১৯১৩-১৬) কলিকাতা, ১৯১৭, পৃ. ১৫, ১৯

সংগঠনের উদ্যোগে ঢাকায় চারটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। এর মধ্যে টিকাটুলিতে প্রতিষ্ঠিত দিপালী-১ নামক স্কুলটি মুসলিম বালিকাদের শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে স্থাপিত হয়েছিল। ১৯২৪ সালে ইডেন কলেজের স্কুল শাখা আলাদা হয় এবং এ স্কুলটির সাথে যুক্ত হয়। জানা যায় যে, এক সময় স্কুলটি অর্থ সংকটে পড়ে বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। এ সময় স্কুলটি রক্ষায় এগিয়ে আসেন ঢাকার নওয়াব পরিবারের বিদুষী নওয়াবজাদী আখতার বানু।[১৬৮] তিনি ও তাঁর দুই বোন মেহের বানু ও পরীবানু[১৬৯] স্কুলটি পরিচালনার জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদানসহ স্কুলের জন্য প্রয়োজনীয় জমি দান করেন। তখন স্কুলটির নামকরণ তাঁদের মা কামরুন্নেছার[১৭০] নামে 'কামরুন্নেছা গার্লস হাইস্কুল' করা হয়।[১৭১]

বাংলায় মুসলিম নারীশিক্ষার প্রসারে কামরুন্নেছা গার্লস হাইস্কুলের বিশেষ অবদান রয়েছে। রোকেয়ার সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুলের ১৩ বছর পর প্রতিষ্ঠিত কামরুন্নেছা স্কুলের অগ্রগতি সাধনে আরো অনেক মহিয়সী নারীর নাম যুক্ত আছে। ১৯১৬-১৯৪২ সাল পর্যন্ত স্কুলটি পরিচালনায় মিসেস সুজাতা রায় মূল ভূমিকা পালন করেন।[১৭২] ১৯৪৭ সালের ভারত বিভক্তির পর পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দীন (১৮৯৪-১৯৬৪ খ্রি.) কামরুন্নেছা গার্লস হাইস্কুলটি সরকারিকরণ করেন। স্কুলটি বর্তমানে কামরুন্নেছা সরকারি বালিকা বিদ্যালয় নামে নারীশিক্ষায় বিশেষ অবদান রেখে চলছে।

কলকাতা শিল্প স্কুল

বিশ শতকের শুরুর দিকে মহিলা শিল্প সমিতি কলকাতায় শিল্প স্কুল নামে একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে। মহিলা সমিতির এ স্কুলটি হিন্দু-মুসলিম সকল ধর্মের নারীদের শিক্ষার জন্য উন্মুক্ত ছিল। তথ্য সূত্র থেকে জানা যায় যে, এ স্কুলে কিছু মুসলিম ছাত্রী অধ্যয়ন করতেন। স্কুলটিতে সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের বয়ন, সেলাই ইত্যাদিসহ নানাধরণের শিল্প সংশ্লিষ্ট কাজ শিক্ষা দেয়া হতো।[১৭৩]

কাছিঝুলি মুসলিম বালিকা বিদ্যালয়

---

১৬৮. নওয়াবজাদী আখতার বানু আরো অনেক সমাজসেবামূলক কাজের সাথে যুক্ত ছিলেন। টিকাটুলির অভয় দাস লেনে কামরুন্নেছা স্কুলের পাশেই তিনি তাঁর পিতা নবাব খাজা আহসানুল্লাহর নামে একটি হাসপাতাল নির্মাণ করেছিলেন। ১৯৪০ সালে হাসপাতালটি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এর ভবনাদিসহ জমি কামরুন্নেছা হাইস্কুলকে দান করা হয়। ড. মো. আলমগীর, *মুসলিম বাংলার অপ্রকাশিত ইতিহাস: ঢাকার নওয়াব পরিবারের অবদান*, ঢাকা, খোশরোজ কিতাব মহল, ২০১৪, পৃ. ২২৯। আখতার বানু তাঁর নিজস্ব এস্টেট হতে রামকৃষ্ণ মিশনের জন্য জমিদান করেছিলেন। তাছাড়াও নারীশিক্ষা প্রসারের জন্য তিনি দিপালী সংঘকেও জমি দান করেছিলেন বলে জানা যায়। সোনিয়া নিশাত আমিন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১২৫

১৬৯. পরীবানু একজন বিদ্যানুরাগী নারী ছিলেন। তিনি কলকাতায় বসতি স্থাপন করেন। তিনি তাঁর পুত্রকেই কেবল উচ্চশিক্ষিত করেননি, মেয়ে জুলেখা বানুকেও (১৯০৪-১৯৭৪ খ্রি.) যথোপযুক্ত শিক্ষা দিয়েছিলেন। জুলেখা বানু ১৯২৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সংস্কৃত বিষয়ে প্রথম শ্রেণিতে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেছিলেন। জুলেখা বানুর স্বামী গোলাম মুর্শিদ ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের একজন কর্মকর্তা ছিলেন। সোনিয়া নিশাত আমিন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১২৫-১২৬

১৭০. কামরুন্নেছা ছিলেন ঢাকার নবাব খাজা আহসানুল্লাহর অন্যতম স্ত্রী। তিনি সুতিকা রোগে আক্রান্ত হয়ে ১৯০০ সালের ২২ জুন মৃত্যুবরণ করেন।

১৭১. ড. মো. আলমগীর, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২২৯

১৭২. সুজাতা রায় ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক ড. এস এন রায়ের স্ত্রী।

১৭৩. মো. আবদুল্লাহ আল মাসুম, *ব্রিটিশ আমলে বাংলা মুসলিম শিক্ষা*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫৪৪

বাংলা সরকার কর্তৃক গঠিত মুসলিম নারীশিক্ষা বিষয়ক সাব-কমিটির প্রচারণা ও উৎসাহে উদ্বুদ্ধ হয়ে এ সময় বাংলার আর্থিকভাবে সামর্থ্যবান কেউ কেউ নারীশিক্ষার জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠায় অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। এরূপ একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ময়মনসিংহের কাছিঝুলি নামক স্থানে। জনৈক মুন্সী গোলাম সোবহান ১৯০৭ সালে মিউনিসিপ্যাল এলাকার মধ্যেই তাঁর নিজ বাড়ীতে মুসলিম বালিকাদের শিক্ষার জন্য উক্ত স্কুলটি প্রতিষ্ঠা করেন। নারীশিক্ষা কমিটির সুপারিশমত স্কুলটিকে একটি মডেল গার্লস স্কুলে উন্নীত করার জন্য স্কুল ম্যানেজিং কমিটির সেক্রেটারি জনাব এম.এ. মোমেন সরকারি অনুদান আদায়ের ব্যাপারে ব্যবস্থা নিতে নারীশিক্ষা বিষয়ক কমিটির সেক্রেটারি সৈয়দ নওয়ার চৌধুরীকে ১৯০৮ সালের ১০ আগস্ট একটি পত্র দিয়েছিলেন। তবে এ বাবদ অনুদান পাওয়া গিয়েছিল কি-না, এ সম্পর্কে কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। মুসলিম নারীশিক্ষা প্রসারেও এ বিদ্যালয়টি কতটুকু অবদান রাখতে পেরেছিল, তথ্যসূত্রের অভাবে এতদবিষয়ে আলোকপাত করা সম্ভব নয়।

সৈয়দুন্নেছা হোম গার্লস

বাংলার মুসলিম সমাজের অবিসংবাদিত নেতা এ কে ফজলুল হক। বাংলা সরকারের শিক্ষামন্ত্রী এবং পরে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি নারী শিক্ষার প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। মন্ত্রী হিসেবে সরকারি ব্যবস্থাপনার বাইরে নিজস্ব উদ্যোগেও তিনি নারী শিক্ষার প্রসারে অবদান রাখেন। তিনি তাঁর মা সৈয়দুন্নেছার নামে বরিশালে তাঁর নিজ বাড়িতে সৈয়দুন্নেছা হোম গার্লস স্কুল নামেও একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।[১৭৪] শিক্ষার্থীদের সুবিধার্থে তিনি স্কুল সংলগ্ন একটি হোস্টেলও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। উল্লেখ্য যে, এর আগে বরিশালে মেয়েদের জন্য আর কোনো ছাত্রী নিবাস ছিল না। বলা বাহুল্য যে, এ কে ফজলুল হকের এ উদ্যোগ বরিশাল অঞ্চলে নারী শিক্ষার প্রসারে ইতিবাচিক ফল বয়ে এনেছিল।

মেহেরুন্নেসা মেমোরিয়াল উচ্চ বিদ্যালয়

বরিশাল অঞ্চলে নারীশিক্ষার জন্য বেসরকারি উদ্যোগে পরিচালিত আরেকটি বিদ্যালয়ের নাম ছিল মেহেরুন্নেসা মেমোরিয়াল উচ্চ বিদ্যালয়। ১৯৪১ সালে এ বিদ্যালয়টিও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এ কে ফজলুল হক। নারীশিক্ষা দরদী ফজলুল হক ১৯৪১ সালে তাঁর জন্মস্থান সাতুরিয়ায় গ্রামে এ বিদ্যালয়টির গোড়াপত্তন করেন।[১৭৫]

---

১৭৪. মো. আবদুল্লাহ আল মাসুম, *ব্রিটিশ আমলে বাংলা মুসলিম শিক্ষা*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫৭৯

১৭৫. সিরাজ উদ্দীন আহমেদ, *শেরে বাংলা এ কে ফজলূল হক*, দ্বিতীয় সংস্করণ, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ১০৬

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এ কে ফজলুল হক নিজস্ব উদ্যোগে কেবল বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা নয়, মুসলিম নারীশিক্ষার প্রসারে প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য নিজস্ব উদ্যোগে একটি তহবিলও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর নিজস্ব এ তহবিল থেকে তিনি নারী শিক্ষা প্রসারে নির্বাহের জন্য বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনুদান প্রদান করা হতো।[১৭৬]

সুলতানা গার্লস মাদ্রাসা

মুসলিম নারীশিক্ষার প্রসারের উদ্দেশ্যে খান সাহেব সুলতান আহমেদ মহিউদ্দিন আহমেদ, সরকার নকীবউদ্দিন ও সৈয়দ মোস্তাফা গাউসুল হক প্রমুখ গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের উদ্যোগে ১৯৪৩ সালে খুলনায় একটি বালিকা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ উদ্যোগে তাঁদের সহায়তা করেন খুলনার তদানিন্তন সাব- ডেপুটি কালেক্টর মঈনউদ্দিন আহমেদ ট্রেজারি অফিসার ও সাব-ডেপুটি কালেক্টর আবদুল আজিজ মির্জা এবং জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ হামিদ আলী প্রমুখ। জেলা ম্যাজিস্ট্রে হামিদ আলীর স্ত্রীর নামে এ মাদ্রাসাটির নামকরণ করা হয় 'সুলতানা গার্লস মাদ্রাসা'।[১৭৭] মাত্র ৬ জন ছাত্রী নিয়ে এ মাদ্রাসাটির শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়েছিল। স্থানীয় বিদুষী রহিমা খাতুন বিএ.বিএড মিস্ট্রেস ইন-চার্জ হিসেবে এ স্কুলটি পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন। স্কুলটিতে রহিমা খাতুন ছাড়াও পারুল মির্জা (সাব-ডেপুটি কালেক্টর আবদুল আজিজ মির্জার কন্যা) এবং মতিয়া খাতুন (রহিমা খাতুনের ছোট বোন এবং সাব- ডেপুটি কালেক্টর মঈনউদ্দিন আহমেদের স্ত্রী)। মিস্ট্রেস ইন-চার্জ রহিমা খাতুনের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠার তৃতীয় বছরই স্কুলটিতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ৬০ থেকে ৭০ জনে উন্নীত হয়। উল্লেখ্য যে, খুলনার আযম খান কলেজের বিপরীত দিকের একটি ভাড়া বাড়িতে সুলতান গার্লস মাদ্রাসার শিক্ষা কার্যক্রমের সুচনা হলেও ছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে এখানে স্থান সংকুলান না হওয়ায় খান জাহান আলী রোডে একটি স্থায়ী ভবনে এটি স্থানান্তর করা হয়।[১৭৮]

প্রতিষ্ঠার কয়েক বছরের মধ্যে উপযুক্ত মাদ্রাসাটি জুনিয়র মাদ্রাসায় রূপান্তরিত করা হয়।১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পর পাকিস্তান যুগেও এ মাদ্রাসাটি খূলনায় মুসলিম নারী শিক্ষার প্রসারে অবদান রাখে। ইতোমধ্যে স্কুল কর্তৃপক্ষ মাদ্রাসাটিকে স্কুলে রূপান্তরিত করার উদ্যোগ নেয়। তাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ১৯৬৬ সালে এটি একটি জুনিয়র স্কুলে উন্নীত হয় এবং এর নতুন নামকরণ হয় 'সুলাতানা হামিদ আলী জুনিয়র গার্লস স্কুল'।

---

১৭৬. ফজলূল হকের প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা তহবিল হতে ১৯৯৩ সালে ফরিদপুর জুনিয়র বালিকা মাদ্রাসাকে ৬০০ টাকা, মালদা আলীনগর বালিকা মক্তবে ৫০ টাকা এবং চব্বিশ পরগনার দুগদিয়া সুন্নাতুন্নেসা বালিকা মক্তবে ১৫০ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছিল। শুধু এসব প্রতিষ্ঠান নয়, সমকালীন বিভিন্ন সূত্রে ফজলুল হকের শিক্ষা তহবিল থেকে এরূপ অনুদান প্রদানের আরো বহু তথ্য পাওয়া যায়। মো. আবদুল্লাহ আল মাসুম, *ব্রিটিশ আমলে বাংলা মুসলিম শিক্ষা*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫৭৯

১৭৭. ১৯৪৪ সালে মাদ্রাসার নামের সাথে হামিদ আলীর নাম যুক্ত করে এর নামকরণ করা হয় 'সুলাতানা হামিদ আলী গার্লস মাদ্রাসা'। মোহাম্মদ রেজউয়ানুল হক, *আমার মা: বেগম রহিমা খাতুন*, ঢাকা, গতিধারা, ২০১৮, পৃ. ৯৬, ১০০

১৭৮. মাদ্রাসা পরিচালনা কমিটির সেক্রেটারি খান সাহেব সুলতান আহমেদ নিজ অর্থ ব্যয়ে এক খণ্ড জমি ক্রয় করে তা মাদ্রাসার নামে ওয়াকফ করে দেন। ওয়াকফকৃত এ জমিটিতেই সুলতানা গার্লস মাদ্রাসার স্থায়ী ভবন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল।

১৯৭০ সালে এটি হাইস্কুলে উন্নীত হয় এবং এর নতুন নামকরণ করা হয় 'সুলতানা হামিদ আলী মাধ্যমিক বিদ্যালয়'। এখনো এ স্কুলটি খুলনা অঞ্চলে নারী শিক্ষায় বিশেষ অবদান রেখে চলছে।[১৭৯]

৬.৭: মুসলিম **নারীশিক্ষার ধরন, বিষয়বস্তু ও পাঠ্যসূচি সম্পর্কিত বিতর্ক**

বিশ শতকে নারীশিক্ষার ব্যাপারে বাঙালি মুসলিম সমাজ তুলনামূলকভাবে সচেতন হলেও মুসলিম নারীশিক্ষার ধরন, পরিধি এবং পাঠ্যক্রম নিয়ে বিতর্ক অব্যাহত ছিল। নারীশিক্ষার ধারা এবং বিষয় কি হবে? তারা কতুদূর শিক্ষা লাভ করবে এবং কিভাবে শিক্ষা গ্রহণ করবে? এগুলোই ছিল বিতর্কের মুখ্য বিষয়। সমকালীন পত্র-পত্রিকায় এতদবিষয়ে নারীশিক্ষার সমর্থকদের বিতর্কের উল্লেখ পাওয়া যায়। বিশেষ করে নারীদের আধুনিক ও ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাদান করা সঙ্গত কিনা-এ বিষয়ে তৎকালীন পত্র-পত্রিকাগুলোতে বিস্তর লেখা-লেখি হয়েছে। এসব লেখায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নারীদের আধুনিক ও উচ্চশিক্ষা গ্রহণের বিরোধিতা করা হয়েছে। ১৩০৯ বঙ্গাব্দে *মিহির ও সুধাকর* পত্রিকা যুক্তি দেখায় যে, মুসলিম সমাজে নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা আছে ঠিকই, কিন্তু তার পরিসর বেঁধে দেওয়া উচিত। এ পত্রিকার মতে, কোরান শিক্ষা এবং উর্দু ও বাংলা ভাষা শিক্ষা মেয়েদের পক্ষে বর্তমানে অত্যন্ত জরুরি। মিহির ও সুধাকর এই অভিমত ব্যক্ত করে যে, মেয়েদের 'ললনা সুহৃদ' এর মতো বাংলা পাঠ্যপুস্তক পাঠ করতে পারার ক্ষমতা অবশ্যই থাকা উচিত, যাতে করে তারা গৃহস্থালির কাজ গোছানো, স্বাস্থ্যরক্ষা, সন্তানপালন এবং স্বামী ও পরিবারের অন্যান্য বয়োজ্যেষ্ঠদের সেবা-যত্ন করার মৌলিক জ্ঞান অর্জন করতে পারে। উচ্চশিক্ষার দ্বার মেয়েদের কাছে উন্মুক্ত করার বিরোধিতা করে পত্রিকাটি মেয়েদের মাদ্রাসায় ইংরেজি শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করার সুপারিশ করে।[১৮০] ১৩০৯ বঙ্গাব্দে 'মুসলমান সমাজে স্ত্রীশিক্ষা' শিরোনামে এক নিবন্ধে *মিহির ও সুধাকর*-এ লেখা হয়:

> যদি অন্তঃপুরে ইংরেজি শিক্ষার প্রচলন সম্ভব, তবে স্কুল স্থাপন করিয়া বালিকাগণকে শিক্ষা দিতে আপত্তি কি? যেসব স্কুলে মুসলমান বালিকার প্রবেশাধিকার আছে, তথায় তাহাদিগকে ইংরেজি শিক্ষা প্রদানে ক্ষতি কি?... বিশেষত আমাদের বালিকা মাদ্রাসাগুলোতে ইংরেজি শিক্ষার বন্দোবস্ত করিলে সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা অবলম্বন করা হয়।[১৮১]

১৩২৬ বঙ্গাব্দে আল-ইসলাম পত্রিকায় 'শিক্ষার ভিত্তি' নামক এক প্রবন্ধে আব্দুর রহমান বাংলার মুসলিম বালিকাদের প্রাথমিক শিক্ষাদান সম্পর্কে তার মত ব্যাখ্যা করেন। তিনি সুপারিশ করেন যে, প্রথম শ্রেণি থেকে ষষ্ঠ শ্রেণি পর্যন্ত বালিকারা কোরান, বাংলা, অঙ্ক, স্বাস্থ্য ও চরিত্রগঠন বিষয়ক মৌখিক শিক্ষা ও হস্তলিপি; উর্দু, সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও ভূগোল, সূচিশিল্প ও অন্যান্য হাতের কাজ, রন্ধনপ্রণালী: সন্তান ও পরিজন পালন, গৃহরক্ষা

---

১৭৯. মোহাম্মদ রেজউয়ানুল হক, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১০০

১৮০. *মিহির ও সুধাকর* ১৪ আশ্বিন, ১৩১১, বঙ্গাব্দ

১৮১. 'মুসলমানসমাজে স্ত্রীশিক্ষা', *মিহির ও সুধাকর*, মাঘ২৩, ১৩০৯

বিষয়ক শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে পাঠ লাভ করবে।[১৮২] আব্দুর রহমান নারীশিক্ষার একজন জোরালো সমর্থক হলেও মুসলিম মেয়েদের আধুনিক শিক্ষার ঘোর বিরোধী ছিলেন। পূর্বোক্ত নিবন্ধে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত নারীদের সম্পর্কে তাঁর বিরূপ মনোভাব প্রকাশ করে লিখেন:

> মোছলেম ললনাগণকে শিক্ষিত করিতে মোছলেম সমাজের উপযোগী শিক্ষাদান করিতে হইবে। পাশ্চাত্য সমাজের আদর্শে তাহাদিগকে শিক্ষিতা করিতে চেষ্টা করিলে তাহা সুফল প্রসব করিবে না। স্যামিজ, কামিজ আঁটিয়া গাড়ী চড়িয়া বুড়া বয়স পর্যন্ত বিদ্যালয় গমন করা মোছলেম মহিলাগণের পক্ষে সম্ভবপর নহে।.... ইদানীং বটতলার বা অশ্বত্থ তলার নভেল নাটক পাঠ, সচিত্র প্রেমপত্র লিখন, রঙ্গালয়ে গমন, বিচিত্র বসন ভূষণে অঙ্গরাগ বৃদ্ধিকরণ প্রভৃতি বিষয় যেমন শিক্ষার অঙ্গ হইয়াছে, যে শিক্ষায় রুচি বিকৃত হয়, অনাচার এবং ধর্ম-কর্মে অনাস্থার ভাব পরিস্ফুট হয়, তাহা কদাচ বাঞ্ছনীয় নয়।[১৮৩]

মুসলিম নারীশিক্ষার ধরন ও পাঠ্যসূচি সম্পর্কে কেবল আব্দুর রহমান নয় অনেক নারীশিক্ষা সমর্থকদের মনোভাব এমনই রক্ষণশীল ছিল। ১৯১৯ সালে সওগাত পত্রিকায় নুরুন্নেসা খাতুন 'নারীজাতির শিক্ষা' শীর্ষক প্রবন্ধে স্পষ্ট ভাষায় বলেন যে ,ইসলামি জ্ঞান বর্জন করে ব্রাহ্ম সমাজের মেয়েদের মতো মুসলমান মেয়েদের মিশনারি স্কুলে গমন করা অনভিপ্রেত, যতদিন না পর্যন্ত মুসলমান মেয়েদের জন্য পৃথক স্কুল স্থাপন করা যাচ্ছে ততদিন গৃহের মধ্যেই তাদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে হবে।[১৮৪] রহিমা খাতুন মিলকী *সওগাত* পত্রিকায় লেখেন, পাশ্চাত্য ধারায় বালক-বালিকাগণ একই সাথে যেভাবে গৃহের বাইরে গিয়ে স্কুলে লেখাপড়া শেখে, ঠিক সেভাবে মুসলমান মেয়েদের শিক্ষাদান সমাজের পক্ষে কল্যাণকর হবে না, ইসলামি ধ্যানধারণা বর্জিত শিক্ষা সমাজের পক্ষে ক্ষতিকারক হবে।[১৮৫]

বেগম ফতেমা লোহানী নামক একজন নারী লিখেন, ব্রাহ্ম, ইংরেজ এবং পার্সী নারীদের অনুকরণে মুসলিম নারীরা যদি রান্নাবান্না ও গৃহের অন্যান্য কাজে সম্পূর্ণভাবে অবহেলা করে পড়াশুনা ও খেলাধুলা নিয়ে ব্যস্ত থাকলে গৃহস্বামীরা মেয়েদের বাড়ির বাইরে গিয়ে স্কুলে যোগদান করাকে ভালোভাবে মেনে নেবে না। মেয়েদের উচিত বাড়িতে বসে সেলাইফোড়, এমব্রয়ডারি, সূচিশিল্পের কাজ করা এবং সামান্য অর্থ উপার্জন করা।[১৮৬] *সওগাত* পত্রিকায় 'স্ত্রীশিক্ষা' শিরোনামে এক প্রবন্ধে জনৈক তাহেরউদ্দিন আহমেদ লিখেছিলেন, মুসলমান মেয়েদের শিক্ষার বিষয় ও শিক্ষাপদ্ধতি ছেলেদের থেকে পৃথক হওয়া বাঞ্ছনীয়। তাঁর মতে, মুসলিম মেয়েদের সাহিত্য, স্বাস্থ্যবিধি, বিজ্ঞান, গৃহসজ্জা, শিশুপালন, সঙ্গীত, সূচিশিল্পের কাজ, এমব্রয়ডারি প্রভৃতিতে

১৮২. আব্দুর রহমান, 'শিক্ষার ভিত্তি', *আল-ইসলাম*, কার্তিক, ১৩২৬, পৃ.৩৯০
১৮৩. ঐ
১৮৪. নুরুন্নেসা খাতুন, 'নারীজাতির শিক্ষা', *সওগাত*, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৬, প. ৫২১-২২
১৮৫. রহিমা খাতুন মিলকী, 'মুসলিম নারীশিক্ষা পদ্ধতি', *সওগাত*, মাঘ, ১৩৩৪, প. ৬৮১
১৮৬. ফাতেমা লোহানী, 'নারীসমাজের কর্তব্য', *সওগাত*, ভাদ্র, ১৩৩৪, প. ২৭৪-৭৬

বিশেষভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া উচিত। কারণ তাঁরমতে, সন্তান জন্মদান, শিশুপালন এবং ঘরদোর পরিপাটি রাখাই হলো মেয়েদের প্রধান কাজ।[১৮৭]

শেখ আব্দুল গফুর জালালী ও ইসমাইল হোসেন সিরাজী প্রমুখ বাঙালি মুসলিম বুদ্ধিজীবীগণ মেয়েদের ঐতিহ্যিক ধর্মীয় শিক্ষাদানের পক্ষে ছিলেন। তাঁদের মতে, মেয়েদের লেখাপড়া শেখার আবশ্যিকতা আছে, কিন্তু সেই বিদ্যাশিক্ষার উদ্দেশ্য হবে মাতা, স্ত্রী ও ভগিনীর ভূমিকা পালনের উপযোগী করে মেয়েদের গড়ে তোলা। ১৩৩৩ বঙ্গাব্দে *সওগাত* পত্রিকায় 'নারীর কথা' শীর্ষক এক প্রবন্ধে কাশেমা খাতুন ইসলামি ধ্যানধারণার পরিসরের মধ্যে রেখে মেয়েদের শিক্ষাদানের পক্ষে মত দেন। তিনি মেয়েদের পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত করার বিরোধিতা করেন। কারণ তাঁর মতে, এতে মযেদের মধ্যে বস্তুবাদী ও নাস্তিকবাদী ধ্যানধারণা ছড়িয়ে পড়বে।[১৮৮]

সাহিত্যিক মীর মশাররফ হোসেন নারীদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল হওয়া সত্ত্বেও এবং তাদের নিয়ন্ত্রিত ব্যক্তি স্বাধীনতার পক্ষে মত পোষণ করলেও নারীশিক্ষার প্রতি তাঁর মনোভাব ছিল অনেকাংশেই রক্ষণশীল। প্রথাবদ্ধ পর্দানশীন শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি তাঁর সমর্থন এবং আগ্রহ ছিল। আধুনিক প্রগতিশীল নারীশিক্ষার ব্যাপারে তিনি ছিলেন অনুদার মনের মানুষ।[১৮৯]

তবে সংখ্যায় অল্প হলেও বাঙালি মুসলমানদের কেউ কেউ মুসলিম মেয়েদের আধুনিক শিক্ষার পক্ষে মত দিয়েছিলেন। এদের মধ্যে সৈয়দ আমীর আলী ছিলেন অন্যতম। তিনি মুসলিম ছেলে-মেয়েদের একই ধরনের শিক্ষাদানের পক্ষে ছিলেন।[১৯০] উদার যুক্তিবাদী কাজী ইমদাদুল হক নারীদের উচ্চ ও আধুনিক শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি মুসলিম নারীদের বাইরের জগতে পদচারণা করার অনুমতি দাবি করেন। তিনি ইংরেজি শিক্ষার বিস্তার ও নারীশিক্ষার ব্যাপারে খোলাখুলি মত ব্যক্ত করে মুসলিম মেয়েদের উচ্চশিক্ষার বিরুদ্ধবাদীদের তীব্র সমালোচনা করেন।[১৯১] সাহিত্যিক এস. ওয়াজেদ আলী ও আব্দুর রসিদ প্রমুখও মুসলমানদের ঐতিহ্যিক আরবি-ফারসি ও উর্দু শিক্ষার সাথে আধুনিক শিক্ষায় মেয়েদের শিক্ষিত করার পক্ষপাতী ছিলেন।[১৯২] ঢাকায় বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের অন্যতম নেতা কাজী মোতাহার হেসেন মনে করতেন, মেয়েদের এমব্রয়ডারি, রন্ধন প্রণালী, পত্রলিখন প্রণালী শিক্ষা দেয়ার জন্য গৃহে আবদ্ধ রাখার চিন্তা অবাস্তব ও আপত্তিজনক। তাঁর মতে, মেয়েদের শিক্ষার জগৎ দর্শন, সাহিত্য, ইতিহাস ইত্যাদি থেকে শুরু করে ডাক্তার বা

১৮৭. তাহেরউদ্দিন আহমেদ, 'আমাদের স্ত্রী শিক্ষ'া, *সওগাত*, কার্ত্তিক, ১৩৩৪, প. ৪৫১-৪৫৩

১৮৮. কাশেমা খাতুন, নারীর কথা, *সওগাত*, আষাঢ়, ১৩৩৩, পৃ. ৪৮

১৮৯. ওয়াকিল আহমদ *উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানের চিন্তা ও চেতনারধারা*, প্রথম খণ্ড, পৃ. ২৭৩

১৯০. Syed Ameedr Ali, Influence of Women in Islam, *The Nineteenth Century,* London, May 1899)

১৯১. ইমদাদুল হক, 'আমাদের শিক্ষা', *নবনূর*, আষাঢ়, ১৩১০ বঙ্গাব্দ, পৃ, ৯৩

১৯২. আবুদর রসিদ, 'আমাদের নবজাগরণ ও শরীয়ৎ', *শিক্ষা*, চৈত্র, ১৩৩৩, পৃ. ৯৩

আমলা হওয়ার জ্ঞান অর্জন পর্যন্ত বিস্তৃত হওয়া উচিত।[১৯৩] আবুল ফজল, ডা. লুৎফর রহমান প্রমুখও নারীশিক্ষার পূর্বোক্ত দর্শনে বিশ্বাসী ছিলেন।

নারীশিক্ষার প্রকৃতি ও পাঠ্যক্রম কি হবে এ নিয়ে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের নিজস্ব চিন্তন ছিল। এক্ষেত্রে তাঁর চিন্তনের মধ্যে যেমন সমকালীন মুসলিম সমাজের গরিষ্ঠ অংশের মনোভাবের প্রতিফলন দেখা যায়, তেমনি উদারনৈতিক চিন্তাধারারও সমর্থন পাওয়া যায়। তিনি তৎকালীন মুসলিম সমাজে বিদ্যমান গার্হস্থ্য মূল্যবোধের গুরুত্ব বিবেচনায় নিয়ে নারীদের জন্য এমন শিক্ষার কথা বলেছেন, যাথে একজন নারী ভালো স্ত্রী, যথার্থ গৃহিণী এবং ভালো মা হতো পারেন। আবার একজন উদারমনা মানুষ হিসেবে তিনি শিক্ষাকে শুধু নারীর নারীসুলভ ভূমিকা বৃদ্ধির উপায় হিসেবে দেখেননি, বরং তিনি শিক্ষাকে নারীর অর্থনৈতিক মুক্তি ও স্বাধীনতার নিমিত্ত হিসেবেও বিবেচনা করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি মেয়েদের পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, কৃষি ইত্যাদি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথাও উল্লেখ করেছেন। রোকেয়া মেয়েদের জন্য এমন একটি একটি আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা কথা বলেন, যেখানে ভিন্ন পরিবেশে নিজেকে খাপ খাওয়ানোর মতো সক্ষমতা তারা অর্জন করতে পারবে। তিনি মনে করতেন যে, অন্য সমাজের নারীরা যদি ডাক্তার, আইনজীবী ও রাজনীতিবিদ হতে পারেন তবে মুসলিম মেয়েরা কেন পিছিয়ে থাকবে।[১৯৪]

নারীশিক্ষার ব্যাপারে রোকেয়া ছিলেন বাস্তববাদী এবং রক্ষণশীল ও বিপ্লবীসত্তার এক দ্বৈত সমন্বয়। রোকেয়ার এই দৃষ্টিভঙ্গি বিশেষ করে নারীদের জন্য কর্মমুখী ও অর্থকরী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা আয়শা আহমেদ এবং মিসেস এম রহমান প্রমুখও বলেছেন। আয়শা আহমেদ মেয়েদের সৎ বা অসৎ পাত্রের হাতে তুলে দেয়ার চাইতে তাদেরকে উপার্জনাক্ষম করে তোলার ব্যাপারে অধিক গুরুত্বারোপ করেন।[১৯৫]

উপর্যুক্ত আলোচনায় দেখা যায় যে, নারী বিশ শতকের বাঙালি মুসলিম সমাজ নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করলেও এর ধরন, পাঠ্যক্রম এবং শিক্ষা পদ্ধতি নিয়ে তাদের মধ্যে মতপার্থক্য ছিল। প্রথম পর্যায়ে রক্ষণশীল মতের প্রাধান্য থাকলেও আস্তে আস্তে উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রসার ঘটে। শুরুতে যারা প্রাতিষ্ঠানিক নারীশিক্ষার বিরোধী ছিলেন, তারাও তাদের যুক্তি ও অবস্থান পরিবর্তন করে প্রাতিষ্ঠানিক নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন। এক সময় যারা মনে করতেন প্রাকৃতিক স্বভাবের কারণেই নারীরা উদার মানববিদ্যা ও গার্হস্থ্য অর্থনীতির মতো কিছু বিশেষ শিক্ষার জন্য উপযুক্ত, সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে তাদের অনেকেই নারীদের জন্য কর্মমুখী শিক্ষার স্বপক্ষে অবস্থান নেন। ফলশ্রুতিতে বিশ শতকের ত্রিশের দশক হতে বাঙালি মুসলিম মেয়েরা কেবল প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নয়, উচ্চশিক্ষার চত্বরেও পদার্পণ করতে সক্ষম হয়।

---

১৯৩. কাজী মোতাহার হোসেন, 'বাঙালী মুসলমানের দৈন্য', *সওগাত*, মাঘ, ১৩৩৭, পৃ. ২০১

১৯৪. সোনিয়া নিশাত আমিন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৫১-১৫২

১৯৫. আয়শা আহমেদ, 'মুসলিম সমাজে উন্নতির অন্তরায়', *সওগাত*, পৃ. ৪৭; সোনিয়া নিশাত আমিন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৫২-১৫৩

৬.৮: বিশ শতকে বাঙালি মুসলিম নারীশিক্ষার অগ্রগতি: একটি পর্যালোচনা

ইতোমধ্যেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, উনিশ শতকের শেষ দিকে নারীশিক্ষা বিষয়ে মুসলিম সমাজের আধুনিক ও প্রগতিমনস্ক অংশের পরিবর্তিত মনোভাব ও কার্যক্রম ইত্যাদির ফলে বাংলার মুসলিম সমাজে নারীশিক্ষার যে শুভ সূচনা হয়েছিল, বিশ শতকে এর গতি প্রবাহ আরো বৃদ্ধি পায়। এ সময় সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি ও ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় বাংলার মুসলিম সমাজে নারীশিক্ষার আরো প্রসার ঘটে। বিভিন্ন তথ্য-পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, বিশ শতকের প্রথমার্ধে শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে মুসলিম নারী শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। নিচের সারণিতে এর প্রমাণ পাওয়া যায়।

বাংলার মুসলিম সমাজে নারী শিক্ষার প্রসার ১৯১২-১৯৪১[১৯৬]

বছর	শিক্ষার স্তর	মোট ছাত্রী	মুসলিম ছাত্রী	হিন্দু ছাত্রী	মুসলিম ছাত্রীর হার	হিন্দু ছাত্রীর হার
১৯১২	উচ্চশিক্ষা (কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়	৪০ জন	০১ জন	৩১	২.৫%	৭৭.৫%
১৯২১	ঐ	২১৬ জন	০৩ জন	১৪৬	১.৩৮%	৬৭.৫৯%
১৯৩০-৩১	ঐ	৩৭৫ জন	০৩ জন	৩৬৬	০.৮%	৯৭.৬%
১৯৪১	ঐ	২৭৬৫ জন	১৬০জন	৩৬২	৫.৭৮%	৮৫.৩৬%
১৯১২	মাধ্যমিক শিক্ষা (মাধ্যম ও উচ্চ বিদ্যালয়	৫৯৬৬	১৩৩	৪১৮২	২.২২	৭০০৯%
১৯২১	ঐ	১৩২৩১	৫২১	৬৭৫৪	৩.৯৩%	৫১.০৪%
১৯৩০-৩১	ঐ	৮৭৭১	২৩৩	৫১১৬	২.৬৫%	৫৮.৩২%
১৯৪১	ঐ	২৩৮২২	১৮৯৯	১৯৮০২	৭.৯৭%	৮৩.১২%
১৯১২	প্রাথমিক	২০৭২৬১	৭৬৩৫৩	১২৪৯১৭	৩৬.৮৩%	৬০.২৭%
১৯২১	ঐ	৩২৯৭৫৪	১৭৮৩৭১	১৪৫১৮৮	৫৪.০৯%	৪৪.০২%
১৯৩০-৩১	ঐ	৫১১০৭৫	২৮০৯০৩	২১৯২১৯	৫৪.৯৬%	৪২.৮৯%
১৯৪১	ঐ	৭৭৯১৯২	৪২৫১০৩	৩৩৯৬০৫	৫৪.৫৫%	৪৩.৫৮%

উপরের সারণিতে আলোচ্য সময়ে বাংলায় প্রাথমিক হতে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত মুসলিম নারীশিক্ষার দৃশ্যমান অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়। পরিসংখ্যানে প্রাথমিক স্তরে মুসলিম নারী শিক্ষার বিশেষ অগ্রগতি লক্ষণীয়। পর্যালোচনাধীন সময়ে এ স্তরে তারা হিন্দু সম্প্রদায়ের চেয়েও অগ্রগতি অর্জনে সক্ষম হয়। তবে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা স্তরে মুসলিম নারীদের অবস্থান তখনো সন্তোষজনক ছিল না। ১৯১৬ সালে *আল ইসলাম* পত্রিকায় কবি ইসমাইল হোসেন সিরাজী তাঁর 'স্ত্রীজাতির স্বাধীনতা' নামক নিবন্ধে সে সময় পর্যন্ত মুসলমান একজন

১৯৬. বিভিন্ন সরকারি তথ্যসূত্র অনুসরণে প্রণীত। দ্রষ্টব্য, মো. আবদুল্লাহ আল মাসুম, ব্রিটিশ আমলে বাংলা মুসলিম শিক্ষা, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫৮০-৫৮১

মেয়েও মাধ্যমিক পাস না করার বিষয়টি আক্ষেপ করে উল্লেখ করেন। অবশ্য একই পত্রিকার একটি সম্পাদকীয় পাদটীকা থেকে জানা যায় যে, ১৯১৬ সালে প্রখ্যাত মুসলিম আইনজীবী ব্যারিস্টার আবদুর রসুলের কন্যা মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে উচ্চমাধ্যমিক এ ভর্তির সিদ্ধান্ত নেন।[১৯৭] গত শতাব্দীর বিশের দশকে মাধ্যমিক শিক্ষায় মুসলিম ছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। অবশ্য উপরের সারণিতে দেখা যায় যে, ১৯৩১ সালে এসে তা পুনরায় হ্রাস পায়। অবশ্য পরবর্তী এক দশকে মাধ্যমিক শিক্ষায় মুসলিম ছাত্রী সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পায়। এ পরিবৃদ্ধির পেছনে এ কে ফজলুল হক এবং তাঁর সরকারের বিশেষ অবদান ছিল। তদুপরি এ সময়ে বেসরকারি এবং ব্যক্তি উদ্যোগের ফলে মুসলিম সমাজের নারীশিক্ষার ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা দেখা দেয়। যার প্রতিফলন ঘটে মাধ্যমিক শিক্ষায় নারীশিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধিতে।

সারণিতে লক্ষণীয় যে, ১৯৩১ সাল পর্যন্ত উচ্চশিক্ষায় মুসলমান নারীদের কার্যত তেমন কোনো অগ্রগতি হয়নি। এ সময়ে বাংলার মুসলিম সমাজে উচ্চশিক্ষা গ্রহণকারী নারীর সংখ্যা ছিল হাতে গোনা। তথ্য সূত্র থেকে জানা যায় যে, ১৯২০-এর দশকের আগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কোনো মুসলিম নারী স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেননি।[১৯৮] ১৯২২ সালে সুলতানা বেগম মুইদজাদা[১৯৯] কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানসহ বিএ ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি ছিলেন বাংলার প্রথম মুসলিম নারী, যিনি এ গৌরবের অধিকারী হন। শিক্ষায় অনন্য কৃতিত্বের স্বীকৃতি হিসেবে সুলতানা বেগম মুইদজাদা 'শান্তিমণি' এবং 'উমেশচন্দ্র মুখার্জী' স্বর্ণপদক লাভ করেন।[২০০] ১৯২১ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠার ছয় বছর পর ১৯২৭ সালে ফজিলাতুন্নেসা (১৯০৫-১৯৭৬) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফলিত গণিতশাস্ত্রে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনিই ছিলেন বাঙালি প্রথম মুসলিম নারী যিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএ ডিগ্রি লাভ করেন। এরপর তিনি সরকারি বৃত্তি নিয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য ইংল্যান্ডে গিয়েছিলেন। অবিভক্ত বাংলায় তিনিই প্রথম মুসলিম নারী, যিনি এ কৃতিত্বের অধিকারী হয়েছিলেন।[২০১] এর আগে ফজিলাতুন্নেসা ঢাকার ইডেন স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে বেথুন কলেজে ভর্তি হন

১৯৭. সোনিয়া নিশাত আমিন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৩০

১৯৮. ১৯১০ সালে প্রকাশিত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পঞ্জিকায় স্নাতক ডিগ্রি অর্জনকারীদের তালিকায় একজন মুসলিম নারীর কথা উল্লেখ রয়েছে। তবে তাঁর সম্পর্কে কোনো তথ্য কোনো গবেষকের রচনায় স্থান পয়নি। সোনিয়া নিশাত আমিন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৩০

১৯৯. সুলতানা বেগম মুইদজাদা ছিলেন প্রখ্যাত সাংবাদিক আগা মইদুল ইসলামের কন্যা। বিদগ্ধ পণ্ডিত আগা মইদুল ইসলামের পূর্বপুরুষের বাসস্থান ছিল পারস্য। তাঁকে পারস্যের জাগরণের অন্যতম পথিকৃৎ বলে গণ্য করা হয়। তিনি কলকাতায় এসে বিখ্যাত দ্বি-ভাষিক পত্রিকা (বাংলা ও উর্দু ভাষার) *হাবলুল মতিন*-এর সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেন।

২০০. সোনিয়া নিশাত আমিন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৩১

২০১. ফজিলাতুন্নেছা ছিলেন পূর্ব বাংলার টাঙ্গাইলের এক মধ্যবিত্ত মুসলিম পরিবারের সন্তান। তাঁর আগে এবং সমসাময়িককালে সুলতানা বেগম মুইদজাদা এবং তাঁর বোন সাকিনা ফারুক মুইদজাদা উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করেন। তবে মুইদজাদা ভগ্নিদ্বয় ছিলেন অভিজাত পরিবারের এবং কলকাতাবাসী। তাদের পারিবারিক পরিমণ্ডলে উচ্চশিক্ষার একটি আবহ ছিল। অন্যদিকে ফজিলাতুন্নেছা একজন সাধারণ গ্রামীণ পরিবারের সদস্য হয়েও নিজের মেধা ও পরিশ্রম বলে উচ্চশিক্ষা অর্জন করেন।

এবং সেখান থেকেই উচ্চমাধ্যমিক ও স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। উল্লেখ্য যে, ১৯২৬ সালে ইডেন স্কুলে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির ক্লাস চালু করা হয়। এর ফলে পূর্ব বাংলায় মুসলিম নারীদের উচ্চশিক্ষার সুযোগ ত্বরান্বিত হয়।

উচ্চশিক্ষা গ্রহণকারী মুসলিম নারীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন সাকিনা ফারুক মুইদজাদা। তিনি ছিলেন ইতোপূর্বে উল্লেখিত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক সুলতানা বেগম মুইদজাদার ছোট বোন। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনশাস্ত্রে এম ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি ছিলেন আইন বিষয়ে এমএ ডিগ্রি ধারী প্রথম মুসলিম নারী। ১৯৩৫ সালে তিনি ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টে কর্মরত একমাত্র মুসলিম নারী আইনজীবী।[২০২]

উপরে সংযুক্ত সারণিতে দেখা যায় ১৯৩০ এর দশকে বাঙালি মুসলিম নারীদের উচ্চশিক্ষা গ্রহণের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়। এসব অগ্রগতি অর্জনে পূর্ববাংলায় ইডেন স্কুলের কলেজে রূপান্তর এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রভাব ছিল। এছাড়াও মুসলিম নারীর উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে 'সারদা অ্যাক্ট' এর অবদানও স্বীকার কতে হবে।[২০৩] তবে বাংলার মুসলিম নারীদের উচ্চশিক্ষায় লেডি ব্রাবোর্ন কলেজ প্রতিষ্ঠা ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইল ফলক। ১৯৩৯ সালে অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী এ কে ফজলুল হকের বিশেষ উদ্যোগে কলকাতায় লেডি ব্রার্বোর্ন কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়। বাংলার গর্ভনরের স্ত্রীর নামাঙ্কিত এ কলেজটি মূলত মুসলিম নারীদের উচ্চশিক্ষার উদ্দেশেই প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। অবশ্য পরে অন্য ধর্মীয় সম্প্রদায়ের নারী ক্ষার্থীদের জন্যও এর দ্বার উন্মুক্ত করা হয়। অবশ্য কলেজ সংলগ্ন ছাত্রী নিবাসটি মুসলিম শিক্ষার্থীদের জন্যই বরাদ্দ রাখা হয়। বলা হয় যে, লেডি ব্রাবোর্ন কলেজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে উচ্চশিক্ষা সম্পর্কিত বাঙালি মুসলিমদের বহুকালের পুরনো ধ্যান-ধারণার অবসান ঘটে। মুসলিম সমাজে নারীর উচ্চশিক্ষার হার প্রসারিত হয়। ১৯৪০ সালে লেডি ব্যাবোর্ন ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পূর্বে প্রাপ্ত একটি পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় যে, সে সময় কলেজটিতে মোট অধ্যয়নরত শিক্ষাথীর সংখ্যা ছিল ১৫২ জন এবং এর মধ্যে মুসলিম শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ১২০ জন।[২০৪] এ সময় কলেজটি পরিচালনার জন্য যে কমিটি গঠন করা হয়েছিল এতে তিন জন উচ্চশিক্ষিত মুসলিম নারী ছিলেন। এছাড়াও ৯ জন শিক্ষকের মধ্যে ২ জন ছিলেন মুসলিম।[২০৫]

---

২০২. সোনিয়া নিশাত আমিন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৩১

২০৩. বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ আইন। বাল্য বিবাহ প্রতিরোধে ভারতের হিন্দু-মুসলিম সমাজ সংস্কারকগণ ১৯২৯ সালে ভারতীয় ব্যবস্থাপক পরিষদে একটি বিল উত্থাপন করেন। দীর্ঘ বিতর্কের পর ১৯৩০ সালের এপ্রিল মাসে সারদা অ্যাক্ট নামে একটি আইন পাশ হয়। এতে নারী-পুরুষের বিবাহের বয়স নির্ধারণ করা হয় যথাক্রমে ১৮ ও ১৪ বছর। বলা হয় যে, নারীদের উচ্চশিক্ষা এবং সামাজিক অগ্রগতিতে সারদা অ্যাক্ট নবযুগের সূচনা করেছিল। মো. আবদুল্লাহ আল মাসুম, ব্রিটিশ আমলে বাংলা মুসলিম শিক্ষা, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫৭১

২০৪. আনোয়ার হোসেন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৮১

২০৫. কলেজ পরিচালনা পরিষদের সদস্য ৩ জন মুসলিম নারী ছিলেন মিসেস হামিদা মোমিন (এমএলসি), মিসেস ফারা বানু খানম (এমএলএ) এবং মিসেস হাসিনা মোর্শেদ (এমবিএ, এমএলএ)। অন্যদিকে ২ জন মুসলিম শিক্ষক ছিলেন মিসেস শামসুন্নাহার মাহমুদ (বাংলা) এবং ফাতেমা বেগম (উর্দু)। আনোয়ার হোসেন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৮১

বিশ শতকে প্রথমার্ধে বাংলার মুসলিম নারীসমাজে সাধারণ শিক্ষার অগ্রগতির পাশাপাশি তারা বিভিন্ন পেশাগত শিক্ষায়ও অংশগ্রহণ শুরু করে। ১৯৪১ সালের সরকারি শিক্ষা প্রতিবেদন অনুযায়ী বাংলার শিল্প ও প্রযুক্তিগত বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষারত মোট ২৩৬১ জন ছাত্রীর মধ্যে ৩৮৫ জন ছিল মুসলিম। এ সময়ে মেডিকেল স্কুলগুলোতে অধ্যয়নরত মোট ৯৪ জন ছাত্রীর মধ্যে মাত্র ৯ জন মুসলিম শিক্ষার্থী ছিল।[২০৬] সংখ্যার দিক থেকে উল্লিখিত বিশেষায়িত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মুসলিম ছাত্রী সংখ্যা অনেক কম হলেও পেশাগত শিক্ষায় বাংলার মুসলিম নারীদের অংশগ্রহণের তথ্যকে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি হিসেবেই বিবেচনা করতে হবে।

যে কোনো সমাজ বা জাতির উন্নয়নে নারীরশিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। কেননা নারী ও পুরুষ নিয়েই সমাজ গঠিত। নারীদেরকে পৃথক রেখে পুরুষদের শিক্ষার শতভাগ অগ্রগতি হলেও সেই জাতিকে প্রকৃত শিক্ষিত বলা যায় না। বাংলার হিন্দু সমাজ এ সত্যটি দ্রুত উপলব্ধি করলেও মুসলিম সমাজ এটি বুঝতে অনেক বেশি সময় নেয়। ফলে বাংলার মুসলিম সমাজে নারীশিক্ষার প্রসার বিলম্বিত হয়। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে নারী শিক্ষা প্রসঙ্গে মুসলিম সমাজের প্রাগসর অংশ চিন্তা-ভাবনা শুরু করলেও বাস্তবে নারীশিক্ষার কোনো কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি বললেই চলে। উনিশ শতকের শেষপাদে বাংলার মুসলিম সমাজে সীমিত পরিসরে নারী শিক্ষার উদ্যোগ গৃহীত হয় বটে, তবে প্রতিবেশি হিন্দু সমাজের সাথে তুলনা করলে উল্লেখ করা মতো ছিল না। অভিসন্দর্ভের পূর্ববর্তী অধ্যায়ে এতদবিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

উপরের আলোচনায় দেখা যায় যে, বিশ শতকের প্রথমার্ধে ব্রিটিশ শাসিত ঔপনিবেশিক বাংলায় মুসলিম নারীশিক্ষা নতুন গতিবেগ লাভ করে। এ সময় নারীশিক্ষা বিশেষ করে মুসলিম নারীশিক্ষার প্রসারে একদিকে যেমন সরকারি উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা বৃদ্ধি পায়, তেমনি এতদবিষয়ে বেসরকারি ও ব্যক্তি উদ্যোগও জোরদার হয়। পর্যালোচনাধীন সময়ে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনসহ মুসলিম নারী-পুরুষ বুদ্ধিজীবী ও সমাজ সংস্কারকগণ নিজ সম্প্রদায়ে নারীশিক্ষার ব্যাপরে সচেতনতা ও আগ্রহ বৃদ্ধির চেষ্টা করেন। মুসলিম মনীষী, সমাজকর্মী, লেখক ও বুদ্ধিজীবী, এমনকি রাজনীতিবিদগণও তাদের লেখনী, আলোচনা এবং সংঘ-সমিতির মাধ্যমে নিজেদের সম্প্রদায়ের কাছে নারীশিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার কথা দ্ব্যর্থহীনভাবে তুলে ধরেন। তাদের অব্যাহত প্রচেষ্টায় নারীশিক্ষার প্রতি মুসলিম সমাজে আগ্রহ ও সচেতনতা বৃদ্ধি পায়। উল্লেখ্য যে, এ সময়ও বাঙালি মুসলিম সমাজে নারীশিক্ষার প্রসারে নানা প্রতিবন্ধকতা ছিল।[২০৭] এসব অন্তরায়সমূহ দূরীভূত

---

২০৬. *Repot on Public Instruction in Bengal 1940-41*; p. 58; মো. আবদুল্লাহ আল মাসুম, ব্রিটিশ আমলে বাংলা মুসলিম শিক্ষা, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫৭১

২০৭. উল্লেখযোগ্য এসব প্রতিবন্ধকতা ও অন্তরায়ের মধ্যে ছিল নারীশিক্ষা সম্পর্কে রক্ষণশীল মনোভাব ও কুসংস্কার, পর্দা ও অবরোধ প্রথার কঠোরতা, বাল্য বিবাহ, উপযুক্ত নারী শিক্ষকের অভাব, জেনানা বা অন্তঃপুর শিক্ষার সীমিত সুযোগ, নারীদের জন্য উপযোগী শিক্ষা পদ্ধতির অভাব, আবাসিক সুবিধার স্বল্পতা, যাতায়ত সমস্যা এবং দারিদ্রজনিত অর্থনৈতিক সংকট ইত্যাদি। বিভিন্ন ত্যসূত্রে

করে নারীশিক্ষার প্রসারে যেমন সরকার নানামুখী ব্যবস্থা গ্রহণ করে, তেমনি বেসরকারি ও ব্যক্তি উদ্যোগেও তা নিরসন করার চেষ্টা করা হয়। নারীশিক্ষার প্রসারে বিশ শতকের ত্রিশের দশক পর্যন্ত মুসলিম সমাজের ঐতিহ্যবাহী জেনানা বা অন্তঃপুর শিক্ষার ধারা বজায় রাখা হয়। একই সাথে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগ ও ব্যবস্থাপনায় নারীশিক্ষার বিদ্যায়তনিক কার্যক্রম জোরদার করা হয়। ফলশ্রুতিতে মুসলিম সমাজে নারীশিক্ষার বিশেষ অগ্রগতি সাধিত হয়। উপরে সংযুক্ত একটি সারণিতে এ অগ্রগতির চিত্র স্পষ্টভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। তবে এ অগ্রগতিতে বেসরকারি ও ব্যক্তি উদ্যোগের অবদান কতটুকু, প্রয়োজনীয় তথ্য প্রমাণের অপর্যাপ্ততার কারণে এ বিষয়ে পৃথক পরিসংখ্যান প্রদান করা সম্ভব নয়। অবশ্য এ কথা বলা অযৌক্তিক হবে না যে, মুসলিম নারীশিক্ষার এ অগ্রগতিতে বেসরকারি ও ব্যক্তি উদ্যোগ ও প্রচেষ্টার যথেষ্ট অবদান ছিল। উপরের আলোচনায় এটি প্রমাণিত হয়েছে।

এসব অন্তরায়ের কথা স্থান পেয়েছে। দ্রষ্টব্য *Repot of the Muslim Education Advisory Committee, 1934, pp.113-114*

সপ্তম অধ্যায়

বাংলায় নারীশিক্ষা প্রসারে অমুসলিম ব্যক্তি ও সাংগঠনিক প্রয়াস (১৯০৫-১৯৪৭ খ্রি.)

উনিশ শতকে বাংলায় নবজাগরণের যুগে বাংলার সমাজ সংস্কারকগণ নারীমুক্তির অংশ হিসেবে নারীশিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন। ফলে বঙ্গীয় নারীসমাজ বিশেষ করে হিন্দু সমাজস্থ নারীদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটে। সরকারি উদ্যোগের বাইরে এ সময় ব্যক্তি ও বেসরকারি সাংগঠনিক তৎপরতায় বাঙালি হিন্দু নারীরা জেনানা শিক্ষার পাশাপাশি বিদ্যায়তনিক শিক্ষাগ্রহণে আগ্রহী হয়। এমনকি উনিশ শতকের শেষ দিকে সংখ্যায় কম হলেও বাঙালি হিন্দু নারীরা উচ্চশিক্ষার দ্বারেও পৌঁছাতে সক্ষম হয়। বিশ শতকের শুরুতে নারীশিক্ষার প্রসার জোরদার হয়। নারীশিক্ষার ব্যাপারে সরকারি উদ্যোগ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। সরকারি উদ্যোগে পরিচালিত শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করে তুলনামূলক বিচারে বাঙালি হিন্দু পরিবারের মেয়েরা মুসলিম মেয়েদের তুলনায় সমাজ জীবনে আরো এগিয়ে যায়। বাঙালি হিন্দু সমাজে নারীশিক্ষার প্রসারের ফলে বিশ শতকের প্রারম্ভে তাদের মধ্যে বৈচিত্র্যপূর্ণ ও ভিন্নতর আত্মপ্রকাশ ঘটে। সারদা ঘোষের মতে, বিশ শতকের প্রারম্ভে বঙ্গ মহিলাদের এ বৈচিত্র্যপূর্ণ ও ভিন্নতর আত্মপ্রকাশ ছিল গভীর তাৎপর্যবাহী। তাঁর ভাষায়:

> প্রথমত, চিন্তা ও মননের গণ্ডি অতিক্রম করে বঙ্গ মহিলাদের স্বজাত্যবোধ ও বৃহত্তর সমাজ ও জনগণের সঙ্গে নিজেদের একাত্ম করে দেখার আগ্রহ ক্রমশ বাস্তব রূপ নিতে শুরু করেছিল। উনিশ শতকে শিক্ষার সুযোগ পাওয়া কতিপয় বঙ্গনারীকে যে সামাজিক সমালোচনা ও নিয়ন্ত্রণের বেড়াজালের মধ্যে নিজেদের আত্মপ্রকাশকে তুলে ধরতে হয়েছিল, বিশ শতকে এসে রাজনৈতিক উত্তেজনার সময়কালে সেই আত্মপ্রকাশ অনেক সহজ ও ব্যাপক হয়ে পড়েছিল।[১]

বিশ শতকে পরিবর্তিত বাস্তবতায় বাংলার হিন্দু সমাজে নারী-চেতনায় এক ধরণের পরিবর্তন এসেছিল এবং এর ফলে বাঙালি নারীরা নিজেদের পারিবারিক ও সামাজিক অবস্থানকে বৃহত্তর পরিবেশে তুলে ধরতে প্রয়াসী হন। পুরুষের উপর নির্ভরতা ত্যাগ করে কতিপয় বিশিষ্ট নারী ব্যক্তিগতভাবে এবং সাংগঠনিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নারীশিক্ষা ও নারীর কার্যকরী ক্ষমতাকে উৎসাহিত করার উদ্যোগ ও দায়িত্ব গ্রহণ করেন। আলোচ্য অধ্যায়ে নারীশিক্ষার প্রসারে কতিপয় বিশিষ্ট হিন্দু বাঙালি মহিয়ষী নারীর ব্যক্তিগত ও সাংগঠনিক প্রচেষ্টা সম্পর্কে আলোকপাতের প্রয়াস নেয়া হলো।

৭.১: নারীশিক্ষার প্রসারে ব্যক্তিগত প্রয়াস

---

১. সারদা ঘোষ, *নারীচেতনা ও সংগঠন: ঔপনিবেশিক বাংলা ১৮২৯-১৯২৫*, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১৩, পৃ. ২১৮

বিশ শতকের সূচনা থেকে নারীশিক্ষার ব্যাপারে সরকারি উদ্যোগ প্রসারিত হলেও বাঙালি হিন্দু সমাজে ব্যক্তিগত ও বেসরকারি প্রচেষ্টার আবেদন ও গুরুত্ব নিঃশেষ হয়ে যায়নি। তাই বাংলায় নারীশিক্ষা প্রসারে অনেকে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা ও উদ্যোগ নিয়েছিলেন। সীমিত পরিসরে সকলের অবদান পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন সম্ভব নয় বিধায় এ পর্যায়ে ভারত বিভক্তিকাল পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য কতিপয় ব্যক্তির প্রচেষ্টা সম্পর্কে আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখা হলো। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, উনিশ শতকে নারীশিক্ষা প্রসারে পুরুষ সমাজ সংস্কারকদের বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। বর্তমান গবেষণা অভিসন্দর্ভের চতুর্থ অধ্যায়ে এতদবিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। উনিশ শতকের শেষদিকে নারীশিক্ষার প্রভাবে হিন্দু সমাজের কতিপয় বিশিষ্ট নারী নিজেরাই স্বজাতীয়দের মুক্তি ও জাগরণের ব্যাপারে উদ্যোগী হন। এর ধারাবাহিকতায় বিশ শতকে নারীশিক্ষা ও নারীমুক্তির প্রসঙ্গে নারীরাই অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তাই বর্তমান অধ্যায়ের আলোচনায় নারীশিক্ষার প্রসার বিষয়ে ব্যক্তিগত উদ্যোগ প্রসঙ্গে নারীদের প্রয়াসই স্থান পেয়েছে। পূর্ববর্তী অধ্যায়ের আলোচনায় দেখা যায় যে, বিশ শতকেও নারীশিক্ষা প্রসঙ্গে বাঙালি মুসলিম সমাজ ছিল অনগ্রসর। তাই এ পর্যায়ে মুসলিম মননে নারী শিক্ষা সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করা ছিল উদ্যোক্তাদের প্রথম কর্তব্য। তবে হিন্দু মনন নারীশিক্ষার ব্যাপারে প্রস্তুত ও আগ্রহী হওয়ায় নারীশিক্ষা প্রসারে তারা সরাসরি নানা উদ্যোগ ও প্রয়াস গ্রহণ করেন। এ পর্যায়ে বিশিষ্ট কয়েকজন নারীর ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো:

সরলা রায় ও নারীশিক্ষা: সরলা রায় (১৮৫৯-১৯৪৬ খ্রি.) ছিলেন একজন শিক্ষাবিদ।[২] সরলা রায় কলকাতা শহরে অবস্থিত বঙ্গমহিলা বিদ্যালয় এবং বেথুন স্কুলের প্রথম ছাত্রীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। সরলা রায় ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয়ের প্রথম নারী সেক্রেটারী হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। কলকাতায় সরলা রায় স্বর্ণকুমারী দেবীর 'সখি সমিতি'র সঙ্গে যুক্ত হন এবং নারীমুক্তি, জাগরণ ও তাদের উন্নয়নে কাজ করেন। তিনি মার্গারেট কুজিনস প্রতিষ্ঠিত 'অল ইন্ডিয়া উইমেনস কনফারেন্স'র একজন নেতৃস্থানীয়া সদস্য ছিলেন। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটেরও সদস্য ছিলেন। সরলা রায় ১৯২৭ সালে প্রতিষ্ঠিত 'নিখিল ভারত মহিলা সম্মিলন' (All India Women's Conference)-এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন। উল্লেখ্য যে, সরোজিনী নাইডু, কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায়, মুথুলক্ষী রেড্ডি এবং রাজকুমারী অমৃত কৌরসহ ঔপনিবেশিক ভারতের অনেক খ্যাতিমান নারী এ উল্লেখযোগ্য এবং শক্তিশালী নারী অধিকার সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন।[৩] ১৯৩২ সালে সরলা রায় সংগঠনটির সভানেত্রী হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। তিনি এমন এক সময়ে সভাপতি হন যখন ভারতীয় নারীদের ভোটাধিকার সম্প্রসারণের আন্দোলন প্রবাহমান ছিল। উল্লেখ্য যে, নারীদের ভোটাধিকার

২. সরলা রায় ছিলেন কলকাতার বিখ্যাত ব্রাহ্মসমাজ সংস্কারক দুর্গামোহন দাশের কন্যা। তাঁর বোন অবলা বসু এবং ভাই প্রখ্যাত আইনজীবী সতীশরঞ্জন দাশ । সরলা রায়ের স্বামী ছিলেন প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রথম ভারতীয় অধ্যক্ষ প্রসন্নকুমার রায় (পি কে রায় নামে সমধিক পরিচিত)। সমাজকর্মী চারুলতা মুখোপাধ্যায় তাঁর একমাত্র কন্যা ছিলেন।

৩. Marie Sandell, *The Rise of Women's Transnational Activism: Identity and Sisterhood Between the World Wars*, Bloomsbury Publishing, London, 2015, https://en.wikipedia.org/wiki/Sarala_Roy, Retrived, 20.10.2023)

অর্জনের প্রচেষ্টার বিকাশের বিষয়ে বাঙালি সমাজে মতামতের ব্যাপক পার্থক্য ছিল। এ অবস্থায় ডরোথি জিনারাজাদাসা, রাধাবাই সুব্বারায়ণ এবং বেগম শাহ নওয়াজের সাথে সরলা রায় এ বিষয়ে নারীদের কাছ থেকে বিবৃতি এবং মতামত সংগ্রহে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিলেন। শেষোক্ত সংগঠনটির সভাপতি হিসাবে তিনি নারীদের ভোটাধিকারের বিষয়টি ছাড়াও বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে জনমত সংগঠিত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। নিখিল ভারত মহিলা সম্মিলনের সভাপতি হিসেবে প্রদত্ত এক ভাষণে সরলা রায় যুক্তি দিয়েছিলেন যে সংস্কারের মূল চাবিকাঠি হবে নারীশিক্ষার প্রসার ও একে শক্তিশালী করা। তাঁর মতে, এটি বাল্যবিবাহের প্রচলিত প্রথা বন্ধ করার প্রচেষ্টায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।[৪]

একজন প্রাগসর সংস্কৃতিবান নারী হিসেবে সরলা রায় উনিশ শতকের শেষ দিকে কলকাতার বাঙালি অভিজাত পরিবারের নারীদের নৃত্যনাট্যে অংশগ্রহণ করার জন্য অনুপ্রেরণা যোগান। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর অনুরোধে 'মায়ার খেলা' নামক নৃত্যনাট্য রচনা করেন এবং বেথুন স্কুলে এ নাটক প্রথম মঞ্চস্থ করা হয়।

সরলা রায় বেঙ্গল উইমেনস এডুকেশন লীগের (Bengal Women's Education League) সাথেও কাজ করেছেন। এক্ষেত্রে তাঁর উল্লেখ্যযোগ্য সারথি ছিলেন নারী জাগরণের অগ্রণী পথিকৃৎ রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন এবং বোন লেডি অবলা বসু। এ সংগঠনটি নারী ও শিশুদের জন্য শিক্ষার সুযোগ ও উন্নত পরিবেশ তৈরি করার জন্য নানাভাবে কাজ করেছে। সরলা রায়, রোকেয়া ও অবলা বসু ১৯২৭ সালের ১৬-১৮ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় বেঙ্গল এডুকেশন কনফারেন্সের আয়োজন করেন। এ সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে সরলা রায় 'The Scope of the Curriculum of the Secondary School' শিরোনামে এক বক্তৃতায় নারীদের ব্যক্তিগত অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির উপর বিশেষ মনোযোগ দিয়ে স্কুল পাঠ্যক্রম পরিবর্তনের সুপারিশ করেন।[৫]

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, সরলা রায় নারীশিক্ষা ও তাদের অধিকারের একজন শক্তিশালী সমর্থক কর্মী-সংগঠক ছিলেন। পারিবারিক ঐতিহ্য অনুসারে তিনি নারীশিক্ষা ও নারীর আত্মোন্নয়নে সারা জীবন কাজ করে গেছেন। তিনি স্বামীর কর্মক্ষেত্র ঢাকায় থাকাকালে সেখানে একটি মহিলা সমিতি (১৮৮০ খ্রি.) ও একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। নারীদের উন্নতির জন্য ১৯০৫ সালে তিনি কলকাতায় 'মহিলা সমিতি' নামে একটি স্থানীয় সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ১৯১৪ সালে সরলা রায় 'ইন্ডিয়ান উইমেনস এডুকেশন সোসাইটি' (Indian Women's Education Society) নামে আরেকটি সংস্থা তৈরি করেন। এ সংগঠনটির মূল

৪. Samita Sen & Anindita Ghosh, , *Love, Labour and Law: Early and Child Marriage in India*, SAGE Publishing India, 2020, https://en.wikipedia.org/wiki/Sarala_Roy, Retrived, 20.10.2023

৫. Lotika Ghose, 'Social and Educational Movements for Women and by Women, 1820-1950', in *Bethune School & College, Centenary Volume, 1849-1949,*), Ed. by Kalidas Nag, Reprint, Clacutta, 2004, p. 157

উদ্দেশ্য ছিল যুক্তরাজ্যে অধ্যয়নের জন্য নারীদের বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা করা।[৬] তবে তাঁর অন্যতম উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব হলো 'গোখলে মেমোরিয়াল গালর্স স্কুল' প্রতিষ্ঠা। তিনি ১৯২০ সালে কলকাতায় একটি গার্লস স্কুল প্রতিষ্ঠা করে এর নামকরণ করেন গোখেল মেমোরিয়াল গালর্স স্কুল। উল্লেখ্য যে, গোপালকৃষ্ণ গোখলে (১৮৬৬-১৯১৫ খ্রি.) ছিলেন ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথমযুগের একজন স্বনামধন্য রাজনৈতিক নেতা এবং বিশিষ্ট সমাজ সংস্কারক। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রবীণ নেতা এবং 'সার্ভেন্টস অফ ইন্ডিয়া সোসাইটি'র প্রতিষ্ঠাতা গোখলে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতিও ছিলেন। তবে এর থেকেও তাঁর বড় পরিচয়, তিনি প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার দাবি নিয়ে যারা ১৯১০ সালে সরব হয়েছিলেন তিনি ছিলেন তাদের মধ্যে প্রথম। নারীসমাজকে তখন ১০ বছর বয়সে প্রাপ্ত বয়স্ক হিসেবে গণ্য করা হতো। গোখলেই প্রথম- নারীদের এ প্রাপ্ত বয়স্কতা নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হন এবং তাঁর দাবির মুখেই সে বয়স ১০ থেকে বাড়িয়ে ১২ করা হয়। সম্ভবত সে কারণেই সরলা রায় তাঁর প্রতিষ্ঠিত নারীশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে নারী এবং শিক্ষা বান্ধব গোখলের নাম জড়িয়ে নেন। গোখলের সাথে সরলা রায়ের ব্যক্তিগত বন্ধুত্বের কথাটিও এক্ষেত্রে স্মরণযোগ্য। উল্লেখ্য যে, এ স্কুল গড়ে তোলার সঙ্গে সরলা রায়ের বোন লেডি অবলা বসুরও অক্লান্ত পরিশ্রম এবং নিষ্ঠা মিশে আছে।

সরলা রায় মনে করতেন যে, শিক্ষা মানে চিন্তা ও সংস্কৃতির বিকাশ এবং এমন শিক্ষাই মানুষের জীবনে একটি বিস্তৃত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আসে। তাঁর লক্ষ্য ছিল শিক্ষা ও জ্ঞানের মাধ্যমে নারীদের পৃথিবীর উপযোগী জীবন্ত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা। নারীদের সে জ্ঞানের আলো দ্বারা আলোকিত করা, যা তাদের কাজ করার শক্তি যোগাবে এবং মানুষের প্রতি ভালোবাসায় অনুপ্রাণিত করবে এবং তাদের কর্মশক্তিতে উজ্জীবিত করবে।[৭] তিনি এ লক্ষ্যকে সমানে রেখে নিজে গোখলে মেমোরিয়াল গার্লস স্কুলের শিক্ষাসূচি প্রণয়ন করেছিলেন। তিনি নিজে স্কুলে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন। গোখলে মেমোরিয়াল স্কুলের পাঠ্যক্রম প্রণয়নে তাঁর অনেক উদ্ভাবনী প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি স্কুলের ছাত্রীদের বাংলা, হিন্দি এবং ইংরেজি- এ তিনটি ভাষায় শিক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা করেন। সরলা রায় বিদ্যালয়ে পাঠ্যক্রম বহির্ভূত শিক্ষামূলক কার্যক্রমের একটি পরিসরও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যেটিতে খেলাধুলা, সঙ্গীত এবং থিয়েটার অন্তর্ভুক্ত ছিল। শিক্ষার্থীদের নোবেল বিজয়ী সাহিত্যিক কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত সঙ্গীত পরিবেশন ও চর্চা করা একটি সাধারণ নিয়ম ছিল। উল্লেখ্য যে, ঠাকুর পরিবার বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাথে তাঁর ব্যক্তিগত বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল। এ জন্যই

---

৬. Shukla, *Women Chief Ministers in Contemporary India*, APH Publishing, Delhi, 2007, p. 16

৭. দ্রষ্টব্য, https://gokhalememorialgirlsschool.org/ Retrived 20.10.2023

রবিঠাকুর সরলা রায়ের অনুরোধে কেবল তাঁর নৃত্যনাট্য ‘মায়ার খেলা’ রচনা করেননি, বরং এটি রায়কে উৎসর্গও করেছিলেন।[৮]

উল্লেখ্য যে, গোখলে মেমোরিয়াল গার্লস স্কুলটি (বর্তমান ঠিকানা ১/১ হরশিচন্দ্র রোড, কলকাতা) এখনো কলকাতার একটি উল্লেখযোগ্য নারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে সুপরিচিত। এ স্কুলটির বিকাশ ও উন্নয়নে সরলা রায়ের সত্যিকারের উত্তরসূরি ড. রাণী ঘোষের বিশেষ অবদান রয়েছে। তিনি সরলা রায়ের নীতি ও পরিকল্পনা অনুসরণ করে স্কুলটিকে একটি শক্ত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠাকরণে বিশেষ অবদান রাখেন। এ কারণে গোখলে মেমোরিয়াল গার্লস স্কুলের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা সরলা রায়ের পাশাপাশি ড. রীণা ঘোষের নামটিও শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে।

সরোজনলিনী দত্ত ও নারী শিক্ষা: সরোজনলিনী দত্ত (১৮৮৭-১৯২৪ খ্রি.) একজন ভারতীয় নারীবাদী এবং সমাজ সংস্কারক। তিনি ছিলেন বাংলার নারীদের উন্নয়ন আন্দোলনের একজন পথিকৃৎ নারী। হুগলির এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণকারী সরোজনলিনী দত্তের পিতা ছিলেন সিভিলিয়ান ব্রজেন্দ্রনাথ দে ও মাতা নগেন্দ্রনন্দিনী দেবী। সরোজনলিনী দেবী পাশ্চাত্যপন্থী ভাবধারা ও আদব-কায়দায় অভ্যস্থ এক পারিবারিক আবহের মধ্যে বেড়ে ওঠেছিলেন। তিনি কোনো বিদ্যালয়ে প্রথাগত শিক্ষা গ্রহণ করেননি, তবে নিজ বাড়িতেই ইউরোপীয় শিক্ষিকার কাছে তিনি প্রয়োজনীয় শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। এমনকি মাত্র ছয় বছর বয়সে তাঁর ইংল্যান্ড যাওয়ারও সুযোগ হয়েছিল। দাম্পাত্য জীবনে স্বামীর সাথে তিনি বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চল ছাড়াও জাপান পরিভ্রমণেরও সুযোগ পেয়েছিলেন। উল্লেখ্য যে, ১৯০৬ সালে সরোজনলিনীর বিয়ে হয়। তাঁর স্বামী গুরুসদয় দত্ত (১৮৮২-১৯৪১ খ্রি.) ছিলেন একজন উচ্চপদস্থ আইসিএস সরকারি কর্মকর্তা, প্রখ্যাত লেখক এবং লোক সাহিত্য গবেষক। গুরুসদয় দত্ত ব্রতচারী ‘আন্দোলন’র[৯] প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন এবং ব্রতচারীদের মধ্যে তিনি ‘প্রবর্তক জী’ নামে খ্যাত ছিলেন।

পারিবারিক প্রেক্ষাপট ও শিক্ষাদীক্ষার বিচারে সরোজনলিনী দত্ত তাঁর পূর্ববর্তী অধিকাংশ বাঙালি নারীদের থেকে একটু স্বতন্ত্র ছিলেন এবং পশ্চিমা সভ্যতা এবং তাদের জীবনচর্চা সম্পর্কে তাঁর স্বচ্ছ ধারণা ছিল। পুঁথিগত শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তিনি খেলাধুলা, অশ্বারোহণ ও সঙ্গীতেও পারদর্শিনী ছিলেন। বস্তুত বহুমুখী শিক্ষা ও বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সরোজনলিনী দত্তের মধ্যে গড়ে ওঠেছিল এক উদার জীবনচর্চা ও সাংস্কৃতিক

---

৮. Chakravarty, Chandrava; Chaudhuri, Sneha Kar, *Tagore's Ideas of the New Woman: The Making and Unmaking of Female Subjectivity*. SAGE Publishing India, 2017, https://en.wikipedia.org/wiki/Sarala_Roy, Retrived, 20.10.2023

৯. ‘ব্রতচারী আন্দোলন’ হচ্ছে গুরুসদয় দত্ত কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটি আধ্যাত্মিক ও সামাজিক উন্নয়নের আন্দোলন। ১৯৩২ সালে ব্রতচারী সমিতির মাধ্যমে এ আন্দোলনের সূচনা হয়। ব্রিটিশ ভারতের নাগরিকদের মধ্যে দেশপ্রেম, জাতীয় চেতনা ও নাগরিকত্ববোধ তৈরী করা ছিল এ আন্দোলনের মূল লক্ষ্য।

চিন্তা। ফলে তাঁর পক্ষে নারী উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ ও সাংগঠনিক উদ্যোগ বাস্তাবয়ন করা সম্ভব হয়েছিল। স্বামীর কর্মসূত্রে দেশের প্রত্যন্তাঞ্চলে তৃণমূল স্তরের জীবনযাত্রা, অন্যদিকে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের প্রগতিশীল দেশগুলোর সংস্কৃতির সঙ্গে তাঁর পরিচয় পরবর্তীকালে তাঁকে নারীশিক্ষাসহ নারী উন্নয়নের জন্য বিস্তৃত কর্মসূচি গ্রহণে উৎসাহিত করেছিল। উপরন্তু বিশ শতকের প্রথমার্ধের জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক আন্দোলনের সুবাদে ব্যক্তিজীবন ও বৃহত্তর জীবনে একইসঙ্গে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বৈশিষ্ট্যগুলোকে উপলব্ধি করা তাঁর পক্ষে সহজ হয়েছিল। তাই যুগ বাস্তবতার নিরিখে সরোজনলিনী দত্ত স্বাদেশিকতার ঐতিহ্যকেই নিজের মধ্যে ধারণ করেছিলেন।[১০] স্বামীর সাথে মফস্বলের কৃষি, শিল্প ও সমবায় বিষয়ক সভা সমিতিসমূহে যোগদান করার মধ্যে দিয়ে অর্জিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা পরবর্তীতে তাঁর নারী স্বার্থানুসারী সংগঠন প্রতিষ্ঠা ও এর জন্য বাস্তবানুগ কর্মসূচি গড়ে তোলায় অনেক সহজ হয়েছিল। ব্রিটেন ও জাপান থেকে তিনি পাশ্চাত্য ঘরণার সাংগঠনিক প্রক্রিয়া, বিজ্ঞানশাস্ত্র এবং নারীদের জীবনচর্চা সম্পর্কে যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করেছিলেন তাও তাঁর সাংগঠনিক কার্যক্রমে সহায়ক হয়েছিল। তবে লক্ষণীয় যে, তিনি বিদেশি বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী শিক্ষার প্রসার, অর্থকরী স্বনির্ভরতা, জাতিভেদ দূরীকরণ, নারীদের প্রত্যক্ষভাবে সামাজিক ও পারিবারিক ক্রিয়াকলাপে যোগদান করার মতো বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দিলেও নিজের পরিকল্পিত সংগঠনের মূল অনুপ্রেরণা হিসাবে তিনি প্রথাগত হিন্দু নারীর আদর্শকেই তুলে ধরার চেষ্টা করেছিলেন। নিজে ব্রাহ্ম পরিবারভুক্ত হলেও সনাতন বাঙালি হিন্দু নারী জীবনের প্রতি তাঁর দুর্বলতা ছিল এবং হিন্দু নারীর আদর্শকে উপজীব্য করেই বাঙালি নারীদের জীবনের বিকাশসাধনের জন্য উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।

তৎকালীন বাঙালি সমাজে নারীশিক্ষা একটি সাধারণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সুতরাং সরোজনলিনী দত্ত নারীদের জন্য সার্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা, উচ্চশিক্ষা, বিজ্ঞানমূলক শিক্ষাব্যবস্থা- সমস্ত কিছুরই প্রসার ঘটাতে আগ্রহী ছিলেন। এজন্য স্বামীর সঙ্গে তিনি বাংলার যে সমস্ত মফস্বল অঞ্চলে গিয়েছিলেন, সেখানে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করতে উদ্যোগ নিয়েছেন এবং নিজেই ছাত্রী সংগ্রহের চেষ্টা করেছেন। জানা যায় যে, তিনি মফস্সল নারীদের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করে তাদের নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অবহিত ও উৎসাহিত করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর প্রচেষ্টায় অনেক পরিবারের দুই প্রজন্মের নারীরা পর্যন্ত এক সাথে লেখা পড়া করতে আগ্রহী হয়ে ওঠেছিল।[১১]

বাঙালি সমাজে নারীশিক্ষার একটি প্রধান অন্তরায় ছিল বাল্যবিবাহ। সরোজনলিনী তাই এ বাল্যবিবাহকে কখনো সমর্থন করেননি। তিনি বাল্য বিবাহকে এদেশীয় নারীদের পূর্ণ শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে

১০. গুরুসদয় দত্ত, সরোজনলিনী দত্ত, *সরোজনলিনী দত্ত*, সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতি, কলিকাতা, ১৯২৬, পৃ. ৬৬-৬৭; সারদা ঘোষ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৬৮

১১. গুরুসদয় দত্ত, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১২০

এমনকি তাদের শারীরিক বিকাশও ব্যাহত করে বলে মনে করতেন। তিনি একে বালবিধবা এবং তাদের সামাজিক ও ব্যক্তি জীবনেরও দুর্দশার কারণ বলে উল্লেখ করেছেন। নারীদের স্বনির্ভরতাকে তিনি গুরুত্ব দিতেন। এ কারণে বিবাহের আগে মেয়েদের উপার্জন করার উপযোগী শিক্ষাদান করার ব্যাপারেও সরোজনলিনী দত্ত আগ্রহী ছিলেন। তাঁর ভাষায় বলা যায়, 'বাঙালী মেয়েদের জীবনে নিরানন্দতার একটা প্রধান কারণ এই যে, তাহারা বালিকা জীবন যে কি জিনিস তা জানিবার সুযোগ পায় না... ।'[১২] নারীশিক্ষার আরেকটি প্রতিবন্ধক কঠোর অবরোধ প্রথার প্রাবল্যের তিনি বিরোধী ছিলেন। তিনি অন্তঃপুরের নারীদের সঙ্গে আহার ও দিনযাপনের মধ্যে দিয়ে তাদের সঙ্গে এক সহজ সম্পর্ক গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন, যাতে তাদের মধ্যে ধর্ম ও সামাজিক সংকোচের নিয়ন্ত্রণ হ্রাস পায়। এমনকি মুসলিম অন্তঃপুরচারিণীরাও তাঁর সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করতেন।[১৩]

নারীদের স্বাভাবিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সরোজনলিনী দত্ত একক প্রচেষ্টা অপেক্ষা সাংগঠনিক উদ্যোগকে অধিক ফলপ্রসূ বলে মনে করতেন। এজন্য তিনি নারী উন্নয়নের কর্মসূচির সক্রিয় উদ্যোগ হিসেবে নারী উন্নয়নমূলক সংগঠন প্রতিষ্ঠাকে অন্যতম উপায় হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। সরোজনলিনী তাঁর প্রস্তাবিত নারী সংগঠনের অন্যতম অঙ্গ হিসাবে কলকাতায় একটি কেন্দ্রীয় মহিলা সমিতি গড়ে তোলার পরিকল্পনা করেছিলেন। তবে তার আগে আঞ্চলিকভাবে নারী উন্নয়ন পরিকল্পনার অংশ হিসেবে তিনি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে শাখা সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন। নারী উন্নয়নের জন্য তাঁর পরিকল্পনাগুলো কেবল মহিলা সংগঠনের মধ্যে দিয়েই যথাযথভাবে সফল হতে পারে বলে তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন। তাই তিনি সংগঠন প্রতিষ্ঠায় মনোযুগী হন এবং অন্যদরও এ বিষয়ে উৎসাহিত করেন। তিনি নারীদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন:

> আমি তাই আমাদের দেশের মা বোনেদের অনুরোধ করছি, জেগে উঠুন– প্রতি জেলায়, প্রতি সহরে, প্রতি গ্রামে মহিলা সমিতি স্থাপন করুন। স্ত্রী শিক্ষার প্রভাবে দেশ ছেয়ে ফেলুন, তাছাড়া দেশের প্রকৃত উন্নতির আশা নাই। দেশের মহিলারা জাগ্রত হোন, নতুবা যতই স্বাধীনতার আশা করি না কেন, সবই বিফল হবে।[১৪]

সরোজনলিনী দত্ত বাংলার বিভিন্ন স্থানে বেশ কয়েকটি নারী সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এদের মধ্যে **১৯১৩** সালে পাবনায়, **১৯১৬** সালে বীরভূমে, **১৯১৭** সালে সুলতানপুরে, **১৯১৮** সালে রামপুরহাটে, **১৯২১** সালে বাঁকুড়ায় এবং **১৯২৪** সালে দার্জিলিং নারী সমিতি উল্লেখযোগ্য। তিনি আঞ্চলিক স্তরে নারী সমিতি গঠনের মাধ্যমে তাঁর উদ্দেশ্য রূপায়ণে ব্রতী হয়েছিলেন।

১২. ঐ

১৩. সারদা ঘোষ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬৯

১৪. সরোজনলিনী দত্ত, 'নারীশিক্ষা ও সংগঠন, *কমলা*, অগ্রহায়ণ ১৩৩১ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৪

জানা যায় যে, সরোজনলিনী দত্তের প্রচেষ্টায় পাবনায় একদল উৎসাহী নারী একত্র হয়ে ১৯১৩ সালে একটি মহিলা সমিতি গঠন করেন। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল অন্তঃপুরচারিণী নারীদের মধ্যে সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে তোলা; নিজস্ব পারিবারিক গণ্ডির বাইরে সমাজসেবামূলক কাজে যোগ দেয়া, জীবনের বাস্তব প্রয়োজনীয় বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা ও আলোচনা সভার আয়োজন করা। এ সব বিষয়ের মধ্যে ছিল গৃহগত স্বাস্থ্য, গৃহস্থালী অর্থনীতি, বিধবা নারীদের কুটিরশিল্পের প্রশিক্ষণ দেয়া- যাতে তারা নিজেদের জীবিকার ব্যবস্থা নিজেরাই করতে পারেন।[১৫]

১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে সরোজনলিনীর উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় বীরভূম মহিলা সমিতি। এ সময়টি ছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের তীব্রতার পর্ব। এ সমিতি নারী উন্নয়নমূলক কর্মসূচি পালন করার পাশাপাশি বিশ্বযুদ্ধে যোগদানকারী সৈন্যদের সাহায্যের ব্যাপারেও উদ্যোগ নিয়েছিল। সেইসঙ্গে সরোজনলিনী দত্ত বীরভূম মহিলা সমিতির উদ্যোগে বালিকা বিদ্যালয়ও স্থাপন করেন– যেখানে গৃহস্থালীর জন্য প্রয়োজনীয় বিজ্ঞানচর্চার উপর গুরুত্ব দেয়া হতো। এতে কৃতকার্য ও সফল ছাত্রীদের পুরস্কার দানের ব্যবস্থা ছিল এবং তাদের পঠন-পাঠনের জন্য প্রয়োজনীয় পাঠ সামগ্রীসহ পত্র-পত্রিকাও সরবরাহ করা হতো। বয়স্কা, অন্তঃপুরচারিণী, অশিক্ষিতা নারীদের শিক্ষাদানের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা ছিল এ সমিতিতে। এ সমিতি মানব কল্যাণমূলক কাজও পরিচালনা করতো। এর প্রমাণ সমিতির পক্ষ থেকে স্থানীয় হাসপাতালে অর্থ সাহায্য এবং প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহের ব্যবস্থা করা। বীরভূমে সরোজনলিনীর এ মহিলা সমিতির কর্মতৎপরতার আভাস পাওয়া যায় বীরভূম থেকে চলে আসার সময় তাঁর বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে। তিনি বলেছিলেন যে, যে সমাজে নারীরা রাষ্ট্রীয় প্রগতি ও বিকাশের ধারা থেকে বঞ্চিত সে রাষ্ট্র কখনোই উন্নতি লাভ করতে পারে না। তিনি প্রাচীন ভারতীয় নারীদের শিক্ষা ও প্রগতিশীলতার বিচারে অনেক বেশি প্রগতিশীল মনে করতেন এবং মহিলাদের পশ্চাৎপদতাকে দূর করার ক্ষেত্রে বীরভূমের মহিলা সমিতির উদ্যোগের বিশেষ প্রশংসা করেছিলেন।[১৬] সরোজনলিনী দত্তের মৃত্যুর পর বীরভূমের মহিলা সমিতির সদস্যরা তাঁর স্মৃতিরক্ষার্থে একটি সভাগৃহ নির্মাণ করেন, যা পরিচিতি পেয়েছিল 'সরোজনলিনী মিলন মন্দির' নামে।

সরোজনলিনী দত্ত ১৯১৭ সালে সুলতানপুরে এবং ১৯১৮ সালে রামপুরহাটেও মহিলা সমিতি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এ সমিতি গুলোর মাধ্যমেও তিনি তাঁর পরিকল্পিত নারীশিক্ষা এবং নারী উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে নানা পদক্ষেপ নিয়েছিলেন।

---

১৫. সারদা ঘোষ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৩

১৬. G S Dutta, *A Woman of India: Being the lif of Saroj Nalini*, Oxford University Press, 1941, pp. 94-95

সরোজনলিনী দত্তের প্রত্যক্ষ উদ্যোগে ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে বাঁকুড়ায় যে মহিলা সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা তার সামাজিক উন্নয়নমূলক এবং শিক্ষামূলক কর্মসূচি রূপায়ণে যথেষ্ট সফল হয়েছিল। এ সংগঠনের পক্ষ থেকে স্থানীয় হাসপাতালে সাহায্য দান, নারীশিক্ষার প্রসারে স্থানীয় পর্যায়ে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন, মহিলা সদস্যদের জন্য অর্থকরী শিল্পপ্রশিক্ষণ দান এবং ধাত্রীবিদ্যার প্রশিক্ষণ দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এখান থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ধাত্রীরা বিভিন্ন প্রসূতি সদনে জীবিকা নির্বাহ করতে পারতেন বা নিজেরাই স্বাধীন যাত্রীবৃত্তি গ্রহণের মাধ্যমে জীবিকার ব্যবস্থা করতেন। বাঁকুড়া মহিলা সমিতির সম্পাদিকা রাজরাজেশ্বরী দেবীকে লেখা এক পত্রে সরোজনলিনী এ বিষয়ে তাঁর আনন্দের কথা প্রকাশ করেছিলেন। একই সাথে তিনি অনুরোধ করেছিলেন মাতৃ ও শিশুস্বাস্থ্য রক্ষায় যেন পাশ করা ধাত্রী ছাড়া অন্য ধাত্রী লোকে না ডাকে সে বিষয়ে সকলকে লক্ষ রাখতে।[১৭] বাঁকুড়ায় থাকাকালীন তিনি উচ্চবিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের সাফল্যের পর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে মহিলাদের অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করেছিলেন। এমনকি 'শিক্ষায় মাতার প্রভাব' শীর্ষক প্রবন্ধ রচনার জন্য তিনি উপস্থিত মহিলাদের আহ্বানও জানান। সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাবন্ধিকাদের তিনি মহিলা সমিতির তরফ থেকে পুরস্কার দানেরও ব্যবস্থা করেছিলেন। বাঁকুড়ায় সরোজনলিনী দত্ত অনেক বালবিধবা নারীর শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন এবং ইচ্ছুক মহিলাদের পরবর্তীকালে শিল্প-শিক্ষার জন্য কলকাতায় প্রেরণের ব্যবস্থাও করে দিয়েছিলেন। বিধবা নারীরা যাতে ভদ্র উপায়ে রন্ধনবৃত্তি, শিল্পবৃত্তি গ্রহণের সুযোগ পায়, সেজন্য তিনি বারবার সমিতিগুলোকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। রক্ষণশীল বাঙালি পরিবারের নারীরা যেন স্বাচ্ছন্দে অন্তঃপুর শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেন, সে জন্য সরোজনলিনীর প্রতিষ্ঠিত সমিতিগুলোতে নারী শিক্ষিকা নিয়োগের ব্যবস্থাও করা হয়েছিল।

বাংলার অন্যান্য জেলার মতো সুদূর দার্জিলিংয়েও সরোজনলিনী দত্ত মহিলা সমিতি গঠনের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে দার্জিলিং-এ থাকাকালীন তিনি স্থানীয় মহিলা ও বালিকাদের মধ্যে স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বাংলার স্বাস্থ্যবিভাগের ড. মুরারিমোহন বসু এবং বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলীর নিশিকান্ত বসুর সাহায্যে এক বক্তৃতা সভার আয়োজন করেন। দার্জিলিং- এর বাঙালি, ভুটিয়া, নেপালি ও ইংরেজ নারীরা এ সভায় যোগদান করেন। এ সমিতিতে সন্তান প্রতিপালন, শিশুমঙ্গল, নারীর স্বাস্থ্যসংক্রান্ত আলোচনা হতো। মহিলা সমিতির উদ্যোগে আয়োজিত এক সভার ব্যাপারে নারীদের সচেতন করার জন্য তিনি বাড়ি বাড়ি ঘুরে তাদের উদ্বুদ্ধ করেছেন।[১৮]

১৭. গুরুসদয় দত্ত, *সরোজনলিনী দত্ত*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৮০

১৮. সারদা ঘোষ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৭৫

জানা যায় যে, দার্জিলিং-এ মহিলা সমিতি গঠনের সময়ই তিনি বাংলায় আরো বৃহত্তরভাবে নারী সংগঠন গড়ে তোলার পরিকল্পনা করতে শুরু করেছিলেন। বস্তুত তিনি চেয়েছিলেন কলকাতায় একটি কেন্দ্রীয় নারীমঙ্গল সমিতি গড়ে তুলে বিভিন্ন জেলার নারী সংগঠনসমূহের সাথে এর সংযোগ ঘটাতে। এ কেন্দ্রীয় সমিতিতে নারীদের সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থার পাশাপাশি অর্থকরী শিল্প-শিক্ষা, বিধবা ও অনাথা নারীদের পুনর্বাসন ও নারীদের আর্থিক উপার্জনের ব্যবস্থা করার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হবে বলেও তিনি পরিকল্পনা করেছিলেন। ১৯২৪ সালের শেষ দিকে কলকাতায় এসে তিনি তাঁর পরিকল্পনা বাস্তবায়নে তৎপর হয়েছিলেন।[১৯] তাঁর এ উদ্যোগের প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে সরোজনলিনী দত্ত কলকাতার ইডেন গার্ডেনে এক মহাপ্রদর্শনীতে কলকাতা মহিলা সমিতির তরফ থেকে স্টল দেয়ার সিদ্ধান্ত নেন। তাঁর এ উদ্যোগ সফল হয়েছিল বলে সরলা রায় উল্লেখ করেছেন।

সরোজনলিনী দত্ত নারীস্বার্থ সম্বলিত বহুমুখী কর্মসূচিতে নিজেকে ব্যস্ত রেখেছিলেন। তিনি কলকাতায় যে কেন্দ্রীয় নারী সংগঠনটি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছিলেন তিনি তার নাম স্থির করেছিলেন 'বঙ্গীয় মহিলা কেন্দ্র সমিতি'। সরোজনলিনী প্রস্তাবিত নারী সমিতিতে একটি কার্যকরী সভার কথাও ভাবা হয়েছিল। সংগঠনের সমস্ত কর্মসূচি, তথ্য, পরিকাঠামো, সংগঠন আয়োজিত বিভিন্ন বক্তৃতা ও নিয়মাবলিকে পুস্তকাকারে প্রকাশ করার পরিকল্পনাও তাঁর ছিল। এ মহিলা কেন্দ্র সমিতিতে যে নারীদের মধ্যে বিজ্ঞান সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হবে একথাও তিনি বিশেষভাবে বলেছিলেন। বিভিন্ন জেলা এবং আঞ্চলিক স্তরে কেউ অনুরূপ মহিলা সমিতি গড়ে তুলতে আগ্রহী হলে তাদের বঙ্গীয় মহিলা সমিতির সাধারণ সম্পাদিকার কাছে লিখিতভাবে জানালে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে তিনি আশ্বস্ত করেছিলেন। তবে ১৯২৫ সালে সরোজনলিনী দত্তের আকস্মিক মৃত্যু হলে তাঁর পরিকল্পিত 'বঙ্গীয় মহিলা কেন্দ্র সমিতি' গঠন করা সম্ভব হয়নি।

সরোজনলিনী দত্তের কর্মকাণ্ড এবং তাঁর সাংগঠনিক তৎপরতা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, তাঁর জীবনের অন্যতম ব্রত ছিল বাঙালি সমাজের অবিবাহিতা ও বিবাহিতা নারীদের প্রাতিষ্ঠানিক ও অন্তঃপুর শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষিত করে তোলা ও আগ্রহী শিক্ষিতা নারীদের ঐক্যবদ্ধ করে সংগঠনের ছত্রছায়ায় নিয়ে আসা। সরোজনলিনী দত্ত বাঙালি মেয়েদের শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রে পশ্চাৎপদতা দর্শনে মর্মাহত হতেন। শুধু পুরুষদের শিক্ষা ও কর্মের মধ্যে দিয়েই যে, দেশ এগুবে না, এটি তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। বাঙালি পুরুষদের এতদবিষয়ে উদাসীনতা তাঁকে হতাশ করেছিল। এক বক্তৃতায় তিনি তাঁর এ হতাশার কথা ব্যক্ত করেছিলেন।[২০] তিনি একথা দৃঢ়ভাবেই বিশ্বাস করতেন যে, জেলা ও গ্রামীণ স্তরে নারীদের শিক্ষার প্রসার না

১৯. গুরুসদয় দত্ত, *সরোজনলিনী দত্ত*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৮৯-৯০

২০. গুরুসদয় দত্ত, *সরোজনলিনী দত্ত*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭২

ঘটলে কেন্দ্রীয় উদ্যোগে নারীশিক্ষা বিস্তারের প্রক্রিয়া কখনোই সফল হতে পারে না। এ জন্য তিনি মফস্বলে নারীশিক্ষা প্রসারের চেষ্টা করেন।

সরোজনলিনী দত্ত তাঁর সাংগঠনিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে নারীদের উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন সেবামূলক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছিলেন। নারীদের জন্য নার্সিং ও ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন তিনি। সরোজনলিনীর নারী উন্নয়নের জন্য গঠিত মহিলা সংগঠনসমূহের সম্ভাব্য কর্মসূচিতে ছিল বিধবাদের জন্য শিল্পাশ্রম স্থাপন, জেনানা শিক্ষার প্রসারের জন্য শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন, বালিকাদের বিদ্যালয়ের যাতায়াতে উৎসাহিত করার জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা করা, শিশুমঙ্গল কেন্দ্র স্থাপন করা ইত্যাদি। সেই সঙ্গে নারী এবং শিশুদের স্বাস্থ্য সচেতন করে তোলার জন্য তিনি নারী সমিতিসমূহকে বিভিন্ন সময়ে স্বাস্থ্য বিষয়ে আলোকচিত্র ও বক্তৃতাদানের আয়োজনেরও পরামর্শ দিয়েছিলেন।

এ সময়ে বাংলায় নারী সংগঠনের প্রক্রিয়া যথেষ্ট ত্বরান্বিত হয়েছিল এবং একাধিক নারী সংগঠন গড়ে উঠেছিল। নিজের সংগঠনসমূহ ছাড়াও সে সময়ের অন্যান্য নারী সংগঠনগুলির সঙ্গেও তিনি যুক্ত ছিলেন। নারীদের নিরাপত্তার অন্যতম অনুষঙ্গ হিসাবে যে বাঙালি 'সহায়িকা বালিকা' বা *Girl Guides* গড়ে উঠেছিল, সরোজনলিনী দত্ত এর কমিটির সদস্যা ও কোষাধ্যক্ষাও নির্বাচিত হয়েছিলেন। বাঙালি এবং বিদেশি নারীদের নিয়ে যে 'কলিকাতা নারী কর্মীসংঘ' বা Calcutta League of Woman Workers প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তিনি তার ভারতীয় মহিলা বিভাগের সম্পাদিকা ছিলেন এবং তাঁর উদ্যোগে এই সংগঠনের সদস্য সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছিল বলে জানা যায়। তাঁর এ সাংগঠনিক কর্মতৎপরতা সম্পর্কে লেডি অবলা বসু যথেষ্ট আগ্রহী ছিলেন। তিনি ১৯১৯ সালে নারী শিক্ষাপ্রসার, শিশু ও মাতৃকল্যাণ, নারীদের সেবামূলক ও শিল্প-শিক্ষামূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্বনির্ভর করে তোলার লক্ষ্যে 'নারী শিক্ষা সমিতি' নামে এটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। উদ্দেশ্যগত দিক থেকে অবলা বসু ও সরোজনলিনী দত্তের কর্মপদ্ধতিতে খুব একটা পার্থক্য ছিল না। এজন্যই অবলা বসু সরোজনলিনীকেই নারীশিক্ষা সমিতির কাউন্সিলে শামিল করে নিয়েছিলেন। এমনকি নারীশিক্ষা সমিতির তরফ থেকে যে বিদ্যাসাগর বাণীভবন গড়ে তোলা হয়েছিল, তার সমস্ত দায়িত্বভার সরোজনলিনী দত্তকে প্রদান করা হয়েছিল। সরোজনলিনী দত্ত এই বাণীভবনের মধ্যে বিধবাদের শিক্ষা ও শিল্পমূলক প্রশিক্ষণ দানের ব্যবস্থা করেছিলেন। তিনি নারীদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের উপরও বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। এমনকি এই সমিতির বিশেষ কমিটিতে কিছু ভারতীয় সদস্যদের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীমতি স্ট্যালি ও শ্রীমতি বেন্টলি নামক দুইজন ইউরোপীয় মহিলাকেও তিনি যুক্ত করেছিলেন।[২১]

---

২১. গুরুসদয় দত্ত, *সরোজনলিনী দত্ত*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১১০

মহিলা সংগঠনের পাশাপাশি এ সময় সরোজনলিনী ভারতীয় নারীদের অধিকার সংরক্ষণের জন্য রাজনৈতিক কর্মতৎপরতাতেও কমবেশি অংশ নিতেন। ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটিতে মহিলাদের প্রথম ভোটদানের অধিকার স্বীকৃত হলে মহিলাদের ভোট লিপিবদ্ধ করার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়েছিল। সরোজনলিনী দত্ত সেই কমিটির সদস্য নিযুক্ত হয়েছিলেন। এমনকি পার্কস্ট্রিটে গেলস্ট্যান ম্যানশন-এ নারীদের ভোটদানের জন্য যে ভোটকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছিল তার দায়িত্বও তাঁর উপরে ন্যস্ত হয়েছিল।

এভাবে সরোজনলিনী দত্ত তাঁর জীবদ্দশায় একাধিক নারী সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত থেকে তাঁর সমাজসেবামূলক কাজ যেমন অব্যাহত রেখেছিলেন, তেমনই তাঁর নিজস্ব আদর্শ ও পরিকল্পনার উপর ভিত্তি করে একটি সুপরিকল্পিত ও সুগঠিত নারী সংগঠন গড়ে তোলার স্বপ্নও তাঁর মধ্যে সর্বদাই জাগরুক ছিল। ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দের ১৯ জানুয়ারি সরোজনলিনী দত্তের অকাল মৃত্যু না ঘটালে তিনি স্বয়ং তাঁর এই পরিকল্পনা হয়তো রূপায়িত হতো। কিন্তু তাঁর পক্ষে তাঁর পরিকল্পিত নারী সংগঠনকে বাস্তব রূপদান করা সম্ভব হয়নি।

সরোজনলিনী দত্ত তাঁর কর্মের মাধ্যমে ভারতীয় নারী তথা জনসমাজের কাছ থেকে কেবল শ্রদ্ধা ও সম্মান লাভ করেননি, এজন্য তিনি ইংরেজ সম্রাট কর্তৃক ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে MBE (ব্রিটিশ সাম্রাজ্যমণ্ডলীর সদস্য) উপাধিতেও ভূষিত হন। কোচবিহারের মহারাণী সুনীতি দেবীর পর তিনিই ছিলেন দ্বিতীয় ভারতীয় মহিলা, যিনি এই সম্মানের অধিকারিণী হয়েছিলেন। এমনকি প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশ সেনাদলের ভারতীয় সেনাদের সাহায্যের জন্য তিনি যে উদ্যোগ নিয়েছিলেন, তার স্বীকৃতি হিসাবে ইংল্যান্ডের রেডক্রশ সোসাইটি থেকে প্রশংসাপত্র ও উপহারও লাভ করেছিলেন।[২২]

৭.২: নারীশিক্ষার প্রসারে বেসরকারি সাংগঠনিক প্রয়াস

বিশ শতকে ব্যক্তিগত প্রয়াসের বাইরে কতিপয় সংগঠনের কর্মতৎপরতা দেখা যায়, যেগুলো নারীশিক্ষা ও নারী জাগরণ বিষয়ে নানামুখী অবদান রেখে ছিল। এ সংগঠনগুলো রাজনৈতিক আন্দোলন বা বিপ্লবী কর্মতৎপরতার পরিবর্তে নারীদের সামাজিক ও পারিবারিক অবস্থানকে রূপান্তরিত করতে অধিক আগ্রহী ছিল। এদিক থেকে এ সংগঠনগুলো ছিল উনিশ শতকের সমাজসংস্কার ও নারী উন্নয়নমূলক নারী সংগঠনসমূহের উত্তরসূরি। ভগিনি সমাজ, হিরন্ময়ী বিধান আশ্রম, ভারত স্ত্রী মহামণ্ডল, নারী মঙ্গল সমিতি ও নারী শিক্ষা সমিতি ইত্যাদি ছিল এ ধারার অনুসারী সংগঠন। দিপালী সংঘ ছিল এক্ষেত্রে কিছুটা ব্যতিক্রম। এটি একটি এর কর্মধারায় বিপ্লবী রাজনৈতিক আদর্শ থাকলেও এটিও নারীশিক্ষা এবং নারী জাগরণে বিশেষ অবদান রেখেছিল। এ পর্যায়ে বাঙালি সমাজে প্রতিষ্ঠিত এসব সংগঠনের শিক্ষাসহ নারী উন্নয়নমূলক কার্যক্রম সম্পর্কে আলোপাত করা হলো।

---

২২. সারদা ঘোষ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৭৮

জাতীয় শিক্ষা পরিষদ: ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন প্রশমনের অংশ হিসেবে সরকার 'কার্লাইল সার্কুলার' জারি করে। এ কালা কানুনের আওতায় বহু ছাত্রকে জরিমানা, বিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার ও গ্রেপ্তার করা হয়। ছাত্রদের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ সরকারের এ দমনমূলক নীতির প্রতিক্রিয়ায় জাতীয় নেতৃবৃন্দ জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন এবং ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দের ১১ই মার্চ ৯২ জন সদস্যবিশিষ্ট 'জাতীয় শিক্ষাপরিষদ' (National Council of Education) গঠন করে। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অরবিন্দ ঘোষ প্রমুখ এর মূল কর্ণধার ছিলেন। এ সময় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বীরভূমের ভুবনডাঙ্গা-র জমিদারীতে 'শান্তিনিকেতন আশ্রম' গঠন করেন। কোনো প্রকার সরকারি সাহায্য ছাড়াই এ শিক্ষা পরিষদের অধীনে ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে জাতীয় শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠিত হয়। কয়েকটি কলেজ, ৫০০টি মাধ্যমিক স্কুল ও ৩০০টির বেশি প্রাইমারি স্কুল তৈরি হয়েছিল। এসব শিক্ষায়তনগুলিতে বহিষ্কৃত ছাত্রদের ভর্তি ও শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়। জাতীয় শিক্ষা পরিষদ নারী শিক্ষার ব্যাপারেও মনোযোগ দিয়েছিল। জানা যায় যে, ১৯০৫-১৯২০ জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ নারীশিক্ষা প্রসারের নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করায় মেয়েদের মধ্যে শিক্ষিতের হার বৃদ্ধি পায়।

ভগিনি সমাজ: উনিশ শতকের শেষ দিকে কলকাতার বাইরে বাংলার বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন নারী সংগঠন গড়ে ওঠতে দেখা যায়। এ সব সংগঠনের মধ্যে এটি ছিল ভগিনী সমাজ। বগুড়ার অন্নপূর্ণা চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা ছিলেন সুশীলা দেবী। বিয়ের পর তিনি ময়মনসিংহে এসে গড়ে তুলেছিলেন 'ভগিনি সমাজ' নামক সংগঠনটি। নারীশিক্ষার প্রসার ছিল এ সংগঠনটির মূল উদ্দেশ্য।[২৩] তবে এ সংগঠনটি নারীশিক্ষা প্রসারে কীভাবে কাজ করতো এবং এর পরিসর কতটুকু বিস্তৃত ছিল, এ সম্পর্কে বিস্তারিত কোনো তথ্য পাওয়া যায় না।

হিরণ্ময়ী বিধবা আশ্রম: বঙ্গীয় নারীসমাজের উন্নয়ন ও শিক্ষাক্ষেত্রে হিরন্ময়ী বিধান আশ্রমের ভূমিকা স্মরণযোগ্য। স্বর্ণকুমারী দেবীর প্রতিষ্ঠিতি সখি সমিতির (১৮৯৬ খ্রি.) অঙ্গ প্রতিষ্ঠান শিল্প সমিতির উদ্যোগে ১৯০৬ সালে কলকাতায় 'মহিলা বিধান আশ্রম' নামে একটি সেবাসঙ্গ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। হিরণ্ময়ী দেবী ছিলেন এর মূল উদ্যোক্তা। জানা যায় যে, সখি সমিতির পক্ষ থেকে কয়েকজন বিধবাকে প্রতিপালন করা হতো। বিশ শতকের শুরুর দিকে সখি সমিতির উদ্দীপনা ও কার্যক্রম যখন স্তিমিত হয়ে আসে তখন এ নারীদের ভার নিতে হয়েছিল স্বর্ণকুমারী দেবীর কন্যা হিরণ্ময়ী দেবী ও সরলা দেবীকে। হিরন্ময়ী দেবী এ অসহায় বিধবাদের নিজের বাড়িতে রেখেছিলেন। বরানাগরের শশীভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ইতোমধ্যে একটি

---

২৩. শ্রীনাথ চন্দ্র, *ব্রাহ্ম সমাজের চল্লিশ বছর*, ঢাকা, ১৩২০ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২৫৭

'বিধবা আশ্রম' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। একে বাংলায় প্রতিষ্ঠিত প্রথম বিধবা আশ্রম হিসেবে গণ্য করা হয়।[২৪] ধারণা করা হয় যে, শশীভূষণ বন্দোপাধ্যায় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিধবা আশ্রম হিরণ্ময়ী দেবীকে কলকাতায় একটি বিধবা হোম চালু করতে অনুপ্রাণিত করেছিল। তিনি ১৯০৬ সালে ৯ নং শিব নারায়ণ দাস লেনে মহিলা বিধবা আশ্রম শুরু হয়েছিল। মহিলা বিধবা আশ্রম প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ছিল প্রথমত: গৃহহীন বিধবাদের গৃহাশ্রয় প্রদান; দ্বিতীয়ত: আশ্রিত বিধবাদের প্রাথমিক সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি এমন কারুশিল্পে প্রশিক্ষণ দেয়া যা তাদের স্বাবলম্বী করে তুলতে পারে।

বিধবা আশ্রমে প্রশিক্ষার্থীদের জন্য দুপুর ১২টা থেকে ৩টা পর্যন্ত ক্লাস অনুষ্ঠিত হতো। যেখানে স্পিনিং এবং বুনন, হ্যান্ড মেশিনে স্টকিংস এবং ভেস্ট তৈরি, লেইস তৈরি, সেলাই এবং কাটিং, অঙ্কন এবং পেইন্টিং, মাটির মডেলিং এবং খোদাই, সঙ্গীত এবং গান, প্রাথমিক নার্সিং, স্বাস্থ্য এবং স্বাস্থ্যবিধি, এবং হোম-ডক্টরিং ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হতো। লতিকা ঘোষ উল্লেখ করেছেন যে,

> Many poor day-scholars as well as women in affluent circumstances attended the classes and learned such subjects as drawing and painting, music and singing as well as sewing, cutting, embroidery, clay-modelling and carving.[২৫]

বিধবা আশ্রমে পঠিত বিষয়গুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এখানে হস্তশিল্পগুলোকে একটি নান্দনিক ভিত্তি দেয়া হয়েছিল। পরবর্তীকালে নারীদের জন্য গঠিত ভারত স্ত্রী মহামণ্ডলের অঙ্গ প্রতিষ্ঠান বিদ্যাসাগর বাণী ভবন, সরোজ নলিনী দত্ত মেমোরিয়াল ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্কুল এবং অল-ইন্ডিয়া উইমেনস কনফারেন্স দ্বারা পরিচালিত শিল্প বিদ্যালয়গুলো এ বিধবা আশ্রম থেকে অনুপ্রেরণা ও করণীয় বিষয়ে দিক-নির্দেনা পেয়েছিল। *ভারতী* পত্রিকায় প্রকাশিত সমিতির একটি প্রতিবেদন (আশ্বিন ,১৩১৫ বঙ্গাব্দ) থেকে জানা যায় যে, সেখানে ৩০ জন আবাসিক এবং ৫০ জন অনাবাসিক শিক্ষার্থী প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা লাভ করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, প্রথম দিকে কিছু ইংরেজ নারী মহিলা দৈনিক কিছু ক্লাস পরিচালনায় সাহায্য করেছিলেন। বিধবা আশ্রমটি পরিচালনা করা হতো একটি ম্যানেজিং কমিটির মাধ্যমে। সূচনাতে এ কমিটির সদস্যদের মধ্যে ছিলেন কোচবিহারের মহারাণী সুনীতি দেবী, ময়ূরভঞ্জের মহারাণী সুচারু দেবী (এরা দুজনই ছিলেন বিখ্যাত ব্রাহ্মসমাজ সংস্কারক ও নেতা কেশব চন্দ্র সেনের কন্যা), স্বর্ণকুমারী দেবী, লেডি হ্যামিল্টন, প্রিয়ম্বদা দেবী, মিসেস চ্যাপম্যান, মিসেস এস পি সিনহা প্রমুখ। হিরণ্ময়ী দেবী বিধবা আশ্রমের সেক্রেটারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।[২৬]

---

২৪. Lotika Ghose, 'Social and Educational Movements for Women and by Women, 1820-1950', *op.cit,* p. 148
২৫. *Ibid*
২৬. Lotika Ghose, 'Social and Educational Movements for Women and by Women, 1820-1950', *op.cit,* p. 149

হিরণ্ময়ী দেবী মহিলা বিধবা আশ্রমটি সুচারুরূপে পরিচালনা করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর স্মৃতিকে জাগরুক করে রাখা এবং তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থে মহিলা বিধবা আশ্রমের নাম পরিবর্তন করে 'হিরণ্ময়ী বিধবা আশ্রম' করা হয়। হিরণ্ময়ী দেবীর মৃত্যুর পর তাঁর কন্যা কল্যাণী মল্লিক বিধবা আশ্রমটি বেশ দক্ষতার সাথে পরিচালনা করেন।

উইমেন্স ইন্ডিয়া এসোসিয়েশন

১৯১৭ সালের ৮ মে প্রতিষ্ঠিত একটি সর্বভারতীয় নারী সংগঠন হলো 'উইমেন্স ইন্ডিয়া এসোসিয়শন' (Women's Indian Association-WIA)। এর প্রতিষ্ঠাতা ও উদ্যোক্তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন অ্যানি বেসান্ত, ডরোথি গ্রাহাম জিনরাজদাসা, মার্গারেট কাজিনস্ প্রমুখ। মাদ্রাজের আধিয়ারে এ সংগঠনটির যাত্রা শুরু হয়েছিল। সংগঠনটির প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে আরো অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এস. অম্বুজাম্মল, ড. মুথুলক্ষ্মী রেড্ডি, মঙ্গলাম্মল সাদাসিভিয়ার, সরলাবাই নায়েক, হেরাবাই টাটা, ডক্টর পুনেন লুখোসে, কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায়, বেগম হাসরাত মোহানি, এবং ধনবন্তী রামা রাও।[২৭] অ্যানি বোসান্ত সংগঠনটির প্রথম প্রেসিডেন্ট এবং মার্গারেট কাজিনস্ অনারারি সেক্রেটারি ছিলেন। এ সংগঠনটির মূল উদ্দেশ্য ছিল নারীজাতির মুক্তি ও আত্মোন্নয়নে কাজ করা। এ লক্ষ্যে ভারতীয় নারীদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটানো, বাল্যবিবাহ রোধ, নারীদের সম্পত্তির অধিকার ও ভোটাধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য স্থানীয় স্তরে শিক্ষামূলক উদ্যোগ ও আলোচনাচক্রের আয়োজন করতো। *স্ত্রী ধর্ম* নামে এর একটি পত্রিকাও প্রকাশ করা হয়। পত্রিকাটি উইমেন্স ইন্ডিয়া এসোসিয়েশনের এজেন্ডা হিসেবে নারীশিক্ষার পক্ষে এবং বাল্যবিবাহ ও অবরোধ প্রথার বিরুদ্ধে প্রচারণা ও জনমত তৈরিতে ভূমিকা রাখে। WIA বিনামূল্যে মেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষার পাশাপাশি স্বাস্থ্যবিধি, শিশুকল্যাণ, এবং বৃত্তিমূলক দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করে। দরিদ্র নারীদের জন্য চিকিৎসা সেবা প্রদানের দায়িত্বও এ সংগঠনটি পালন করে।

উইমেন্স ইন্ডিয়া এসোসিয়েশন ছিল একটি সর্বভারতীয় সংগঠন। ১৯২৬ সাল নাগাদ ভারতের বিভিন্ন স্থানে এর ৮০টি শাখা সংগঠন গড়ে ওঠে। বাংলায়ও এর কার্যক্রম বিস্তৃত হয়েছিল। বঙ্গীয় নারীসমাজের অগ্রণী প্রতিনিধি লেডি অবলা বসু, কবি কামিনী রায়, মৃনালিনী সেন এবং কুমুদিনী বসু প্রমুখ এর সাথে যুক্ত ছিলেন। তাঁরা বাঙালি নারীদের মধ্যে শিক্ষার প্রসারসহ সংগঠনটির অন্যান্য লক্ষ্য বাস্তবায়নে কাজ করেছেন।

ভারত স্ত্রী মহামণ্ডল, সরলা দেবী চৌধুরাণী ও অন্যান্য: ভারত স্ত্রী মহামণ্ডলের প্রতিষ্ঠাতা সরলাদেবী চৌধুরাণী (১৮৭২-১৯৪৫ খ্রি.)। তিনি ছিলেন জন্মসূত্রে কলকাতার প্রসিদ্ধ ও সংস্কারবাদী জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারের

২৭. https://www.encyclopedia.com/international/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/womens-indian-association, **Retrived 10.5.2023**

সদস্য এবং জানকীনাথ ঘোষাল ও স্বর্ণকুমারী দেবীর কন্যা (১৮২৫-১৯৩২ খ্রি.)। উল্লেখ্য যে, স্বর্ণকুমারী দেবী ছিলেন একজন বাঙালি কবি, ঔপন্যাসিক, সংগীতকার ও সমাজ সংস্কারক। তিনি ছিলেন আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রথম উল্লেখযোগ্য নারী সাহিত্যিক। তাঁর কন্যা সরলাদেবীর নিজস্ব আত্মজীবনী *জীবনের ঝরা পাতা* থেকে তাঁর পারিবারিক জীবন সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা পাওয়া যায়।[২৮] ঠাকুর পরিবারের প্রগতিশীল ভাবধারার প্রভাব সরলাদেবীর মধ্যে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান থাকলেও তাঁর জীবনচর্চা ও দৃষ্টিভঙ্গি ছিল পরিবারের অন্য সদস্যদের তুলনায় স্বতন্ত্র ও উনিশ শতকের সামাজিক পরিবেশের প্রেক্ষিতে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। তিনি ঠাকুর পরিবারের রীতি অনুযায়ী ইংরেজী আদব-কায়দায় নিজেকে অভ্যস্ত করে তোলার পরিবর্তে বেথুন স্কুলের দেশীয় পরিবেশে নিজেকে শিক্ষিত করা শ্রেয় মনে করেছিলেন। বেথুন স্কুল ও কলেজের ছাত্রী হিসেবে তিনি যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন এবং এ কলেজ থেকে স্নাতক ডিগ্রিও লাভ করেছিলেন। ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে বিএ সাম্মানিক পাশ করে তিনি পদ্মাবতী মেডেলের অধিকারিণী হন। এর পরবর্তী পর্যায়ে তিনি একইসঙ্গে সঙ্গীত ও সাহিত্যচর্চায় মনোনিবেশ করেছিলেন। নিজেদের পারিবারিক পত্রিকা *ভারতী* এবং *ভারতী ও বালক* ছাড়াও তিনি মাসিক *বসুমতী*, *প্রবাসী*, *ভারতবর্ষ*, *মডার্ন রিভিউ*-এর মতো পত্রিকাগুলোতে নিয়মিত লিখতেন।[২৯] তিনি উনিশ শতকের রক্ষণশীল সামাজিক পরিবেশের চাপ উপেক্ষা করে কলকাতা থেকে সুদূর মহীশূরে মহারাণী গার্লস স্কুলে শিক্ষকতার বৃত্তি গ্রহণ করে সেখানে একাকী বসবাস শুরু করেন। ব্যক্তিজীবনে দুঃসাহসিক পদক্ষেপ গ্রহণের মধ্যে দিয়ে তিনি একইসঙ্গে তাঁর ব্যক্তি স্বাধীনতার দাবি এবং নারীদের আর্থিক স্বনির্ভরতার প্রয়োজনকে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন বলে মনে করা হয়। সরলাদেবীর চিন্তা ও চেতনার বৈচিত্র্য ও ব্যতিক্রমী ভাবনার দৃষ্টান্ত হলো ত্রিশ বছরের অধিক সময় পর্যন্ত অবিবাহিত থাকা। অবশেষে পারিবারিক চাপে তিনি বিয়ে করেন।[৩০]

ঔপনিবেশিক বাংলায় নারীমুক্তি ও নারী চেতনা বিকাশে সরলাদেবীর অসামান্য অবদান রয়েছে। রাজনৈতিক ও সামাজিক বিষয়গুলোকে কেন্দ্র করে সরলাদেবীর ব্যক্তিগত চিন্তা-ভাবনা ও পদক্ষেপ তাঁর নারীসংক্রান্ত চিন্তা-ভাবনার মধ্যেও প্রতিফলিত হয়েছিল। সাধারণভাবে বলা যায় সরলাদেবীর ব্যক্তি জীবনই নারী উন্নয়নের এক প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত ছিল। কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি ভারতীয় নারীদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান, নারীর জীবনের রূপান্তর ও তার জীবনের উদ্দেশ্য নির্ণয় করার ব্যাপারেও যথেষ্ট তৎপর ছিলেন। তবে

২৮. ১৯৪৪-৪৫ খ্রিস্টাব্দে আত্মজীবনীটি *সাপ্তাহিক দেশ* পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় এবং পরে এটি ১৯৭৫ সালে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

২৯. সরলা দেবী চৌধুরাণীর তাঁর সাহিত্যচর্চার মধ্যে রোমান্টিক বক্তব্য, শিক্ষামূলক প্রবন্ধ, জাতিগত চিন্তা চেতনামূলক প্রবন্ধ, ধর্মীয় প্রবন্ধ, রাজনৈতিক বক্তব্য সম্বলিত প্রবন্ধ ও সর্বোপরি নারী সমস্যা ও উন্নয়নমূলক চিন্তাধারা সম্বলিত রচনা সমস্তই শামিল ছিল।

৩০. বিয়ের ক্ষেত্রেও সরলা দেবী ব্যতিক্রমী ও ব্যক্তিস্বাধীনতার পরিচয় অক্ষুণ্ণ রাখেন। তাঁর স্বামী পাঞ্জাবের বিখ্যাত আর্য সমাজী নেতা রামভজ দত্ত চৌধুরী ছিলেন একজন বিপত্নীক অবাঙালি। পারিবারিক ঐতিহ্য ভঙ্গ করে তিনি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকেই নারী উন্নয়নের যে ধারা শুরু হয়েছিল তা তাঁর নারীচেতনার বিকাশে অনেকটাই সাহায্য করেছিল। উনিশ শতকের সমাজসংস্কার আন্দোলন বাঙালি নারীর উন্নয়নের জন্য শিক্ষা, সামাজিক জীবনে কিছু কিছু স্বাধীনতা ও পেশাগত ক্ষেত্রে সীমিত আত্মপ্রকাশের মতো মূলত পারিবারিক, ব্যক্তিগত ও সামাজিক বিষয়গুলোকে নিয়েই সরব ছিল। কিন্তু বিংশ শতকীয় ভারতীয় রাজনীতির পালাবদলের পরিপ্রেক্ষিতে সরলাদেবী নারী উন্নয়নের জন্য নিছক তাঁর পারিবারিক বা সামাজিক দাবিগুলোকেই নয়, বরং তিনি নারীর রাজনৈতিক অধিকার ও দায়িত্ব পালনকেও গুরুত্ব দিয়েছিলেন। উনিশ শতকের শেষপর্ব পর্যন্ত যখন বাঙালি নারীরা তাদের আত্মপ্রকাশের ব্যাপারে ছিলেন যথেষ্ট সাবধানি ও সতর্ক, তখন সরলাদেবীর ব্যক্তিজীবন তথা রাজনৈতিক ভাবাদর্শের বহিঃপ্রকাশ নিঃসন্দেহে বঙ্গনারীর সামাজিক অবস্থিতিকে দ্রুত উন্নততর করে তুলেছিল। উনিশ শতকের শেষভাগ থেকে সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবনবাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে তিনি সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। তাঁর রাজনৈতিক চিন্তা ও চেতনার ও কর্মতৎপরতার মূলে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর সঙ্গে তাঁর পরিচয়, পরিবারের বাইরে কাজ করার অভিজ্ঞতা, বিবেকানন্দের জাতীয়তাবাদী চিন্তাভাবনার ধারা বিশেষভাবে কার্যকর ছিল। তিনি রাজনীতিতে বাঙালি নারীদের অংশগ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধি করার জন্য তিনি জোরালো প্রচার চালান। একই সঙ্গে কংগ্রেস সংগঠন তথা বাংলার কাউন্সিল ও বিধানসভায় নারীদের যোগদানের সুযোগ দেয়ার ক্ষেত্রে পুরুষদের অনীহারও সমালোচনা করেন। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, এই ধরনের বক্তব্য সরলাদেবীর সাংবিধানিক রাজনীতির প্রতি সচেতনতার প্রমাণ বহন করে। ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে All India Women's Conference গড়ে ওঠার পর থেকেই ভারতীয় নারীদের রাজনৈতিক অধিকারের দাবি, ভোটদানের অধিকারের দাবি গুরুত্ব পেতে থাকে এবং এই ধরনের নারী আন্দোলনে সরলাদেবীও শামিল ছিলেন।

উল্লেখ্য যে, নারীদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার বিকাশের ফলে বিশ শতকের প্রথম ভাগে সরলাদেবীর মতো বাঙালি নারীরা নিজেদের অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে এক গভীরতর কর্তব্যবোধের ধারণাতেও উজ্জীবিত হয়েছিল। জাতীয় আন্দোলনে বাঙালি নারীদের এ অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা ও দায়বদ্ধতা তাদের সামাজিক অস্তিত্ব ও গুরুত্বকেই ভিন্ন মাত্রা দিয়েছিল। এভাবে বঙ্গনারীর আত্মপ্রকাশের বিষয়টিকে শুধুমাত্র নারীকেন্দ্রিক ভাবনা-চিন্তার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে আরো প্রসারিত করার ক্ষেত্রে সরলাদেবীর ভূমিকাকে স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করতেই হয়। যদি তাঁর চিন্তা-চেতনার ক্ষেত্রটিকেই ধরা যায় তবে দেখা যাবে যে তিনি পরিবারে নারীর ভূমিকাকে যথার্থ সহধর্মিণী, মাতা ও কন্যার আদর্শে সঞ্জীবিত করার প্রয়াস পেয়েছিলেন। এজন্যই তাঁর প্রবন্ধগুলিতে যথার্থ হিন্দুধর্মীয় আদর্শের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা নারী জীবন বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। তিনি 'একালে ও সেকাল' প্রবন্ধে আধুনিক বঙ্গনারীর জীবনচর্চা, শিক্ষা ও পারিবারিক ভূমিকাকে গুরুত্ব দিয়েও একথা বার বার ঘোষণা করেছিলেন যে, আধুনিক শিক্ষার প্রভাব নারী জীবনের আত্মিক ও জাগতিক উন্নতির পরিবর্তে

তাকে আরও বেশি পরাধীন ও সামাজিক শৃঙ্খলাবদ্ধ করে তুলেছে। আধুনিক শিক্ষার প্রভাব তাদের কেবলমাত্র আচার-ব্যবহার ও পোশাকের ক্ষেত্রেই রূপান্তর এনেছে। ফলে পারিবারিক জীবনে তাদের এ রূপান্তর উন্মার্গগামিতা বলে সমালোচিত হয়েছে। অথচ মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে তারা এখনও পণপ্রথা, বাল্যবিবাহ, বৈধব্যজীবনের কঠোর অনুশাসন, পারিবারিক অবরোধের কঠোরতার মধ্যেই আবদ্ধ থেকে গেছেন। বাঙালি নারীদের আত্মশক্তির বিকাশের জন্য তিনি শিক্ষা, রাজনীতি, অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা, স্বাধীন সিদ্ধান্ত গ্রহণের মতো বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দিতেন ঠিকই, কিন্তু একইসঙ্গে বাংলার রঙ্গমঞ্চে বারবনিতাদের অভিনেত্রী হিসাবে অংশগ্রহণ তাঁর কাছে 'অনৈতিক' বলে সাব্যস্ত হয়েছিল। সার্বিক বিবেচনায় সরলাদেবীর নারীবাদী মানসিকতা প্রচলিত সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক স্তরভেদকে অতিক্রম করে উঠতে পারেনি বলে অনেকেই মনে করেন।[৩১] বস্তুত নারীর আত্মবিকাশ অথচ চিরাচরিত মানসিক ধ্যান-ধারণার সংরক্ষণ এ দ্বিবিধ বৈশিষ্ট্যই সরলাদেবীর নারীসংক্রান্ত চিন্তাধারার মধ্যে সর্বদাই বিদ্যমান ছিল। গবেষকগণ মনে করেন যে, সরলাদেবীর চিন্তাভাবনার সঙ্গে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবান্দোলন এবং সারদাদেবী, গৌরীমাতার আদর্শ ও সাংগঠনিক উদ্যোগের পার্থক্য আবার সামঞ্জস্যও লক্ষ করা যায়। অনুমান করা যায় যে শতাব্দীর পরিবর্তনের সাথে সাথে বঙ্গনারীর চিন্তাধারায় যে রূপান্তর এসেছিল তাকে গুরুত্ব দিয়েও সরলা দেবী ঊনবিংশ শতকীয় নারী চেতনার বৈশিষ্ট্যগুলোকে একেবারে অস্বীকার করতে পারেননি।

সরলাদেবী তাঁর ব্যক্তিজীবনে সুদূর মহীশূর থেকে শুরু করে পাঞ্জাব, লাহোর, পারস্য, হিমালয়ের প্রত্যন্ত অঞ্চল, বাংলার বিভিন্ন জেলাগুলোতে সরাসরি বসবাস, কাজকর্ম ও যোগাযোগের সুযোগ পেয়েছিলেন এবং এই সমস্ত অঞ্চল থেকে নারী জীবনের যে বাস্তবচিত্র তিনি পেয়েছিলেন তা তাঁর নারীবাদী চিন্তা-চেতনার মধ্যে সম্মিলিত হয়ে পড়েছিল। বাস্তবজীবনের এ বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে সরলাদেবী তাঁর নারী চেতনাকে স্পষ্টরূপ দিতে চেয়েছিলেন। শিক্ষাকে তিনি ভারতীয় নারীর জন্য সর্বাধিক আবশ্যিক বিষয় বলে মনে করতেন। এ শিক্ষার মধ্যে ছিল প্রথাগত শিক্ষা, নিজস্ব ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্পর্কে জ্ঞান, অন্তঃপুর শিক্ষা, পাশ্চাত্যপন্থী বিজ্ঞান শিক্ষা। এ শিক্ষাকে কাজে লাগিয়েই পরবর্তীকালে নারীরা নিজেদের রুজি-রোজগারের পথের অনুসন্ধান করতে পারে বলে সরলাদেবী বিশ্বাস করতেন। দ্বিতীয়ত, তিনি নারীদের আত্মবিকাশের ক্ষেত্রে বাল্যবিবাহকে অন্যতম বাধা বলে মনে করতেন। বিবাহ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা গড়ে ওঠার আগেই বাঙালি মেয়েদের বিবাহের ব্যবস্থা তাদের আজীবনের জন্য পরাধীন ও পরাশ্রয়ী করে তোলে বলে তিনি মনে করতেন। এজন্য মেয়েদের উপযুক্ত শিক্ষা গ্রহণের পর বিবাহের আবশ্যকতাকে তিনি গুরুত্ব দিয়েছিলেন।

৩১. সারদা ঘোষ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৩৪

সরলাদেবী তাই নারী উন্নয়নের জন্য যে বাস্তব উদ্যোগ নিয়েছিলেন তাতে সর্বভারতীয় স্তরে কাজ করার ধারণাকে রূপায়িত করতে সর্বাগ্রে তৎপর হয়েছিলেন। স্বদেশি ও বয়কট আন্দোলনের পূর্বেই তিনি গড়ে তুলেছিলেন 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' যেখানে নারীদের হস্তশিল্পজাত দ্রব্যাদির বিক্রয়ের ব্যবস্থা করে তিনি এক ধরনের স্বদেশি উদ্যোগের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। ব্যক্তিজীবনে তিনিই প্রথম ভারতীয় নারী যিনি জাতীয় কংগ্রেসের সচিব পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে গান্ধিজির অসহযোগ আন্দোলনেও তিনি প্রত্যক্ষভাবে যোগদান করেছিলেন। ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি ভারতীয় সংবাদপত্র সেবী সংঘের সভাপতিত্ব করেছিলেন। সেইসঙ্গে লক্ষ্ণৌ-এর প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে সভানেত্রী এবং এলাহাবাদে বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে সঙ্গীত শাখার নেত্রীও তিনি হয়েছিলেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে সাংগঠনিক উদ্যোগ, প্রাতিষ্ঠানিক কার্যকলাপ, সর্বভারতীয় স্তরে সমাজসেবামূলক, রাজনৈতিক, জনস্বার্থবিষয়ক অনুষ্ঠান, কর্মসূচি প্রতিটিতেই সরলাদেবী ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত ছিলেন বা নেতৃত্বকারী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। জনজীবনের সঙ্গে তাঁর এই ওতপ্রোত যোগ ও কর্মতৎপরতা তাঁর ভারতীয় নারী সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনাকে শুধুমাত্র তাত্ত্বিক আলোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে প্রাতিষ্ঠানিকভাবেও নারী উন্নয়নের উদ্যোগ নিতে উৎসাহিত করে এবং এরই অন্যতম দিক হিসেবে তিনি গড়ে তোলেন 'ভারত স্ত্রী মহামণ্ডল'। সর্বভারতীয় স্তরে নারী সংগঠন প্রতিষ্ঠা সরলাদেবী চৌধুরাণীর কোনো তাৎক্ষণিক ইচ্ছার প্রতিফলন ছিল না। এজন্য তিনি দীর্ঘ দিনের প্রস্তুতি নিয়ে এগিয়েছিলেন। তিনি মনে করতেন যে, আধ্যাত্মিক, রাজনৈতিক, সামাজিক বা সাংস্কৃতিক যে-কোনো ভাবেই হোক না কেন, শুধু কিছু সংখ্যক পুরুষ বা নারীর পারস্পরিক সম্মিলন দ্বারা কখনোই বৃহত্তর মানবিক যোগাযোগ বা সামাজিক, রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়।[৩২] এজন্য প্রয়োজন বৃহত্তর জনসমাজের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করার ব্যবস্থা করা। অর্থাৎ শুধু কোনো পল্লী, নগর বা জেলাভিত্তিক সংগঠন গঠনের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সামাজিক বা রাজনৈতিক সংস্কারের দাবি তুললে কখনোই তা জোরদার হয়ে উঠতে পারে না। এর জন্য প্রয়োজন সর্ব ভারতীয় সংগঠন যার মাধ্যমে ভারতের সকল প্রদেশ ও অঞ্চলের মানুষের একে অপরের সঙ্গে মতবিনিময় করতে বা সমস্যার সমাধানের পথ অনুসন্ধান করতে পারবে। বস্তুত সর্বভারতীয় স্তরে নারী সংগঠনের নজির স্থাপন করে সরলাদেবী নারীকেন্দ্রিক বিষয়গুলো ও তাদের অধিকারের দাবিগুলোকে আরও বেশি স্পষ্ট রূপদান করতে চেয়েছিলেন। পূর্ববর্তী সময়ের বিভিন্ন সাংগঠনিক ধ্যান-ধারণা থেকে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেই সরলাদেবীর মতো সর্বভারতীয় রাজনৈতিক নেত্রী ও সমাজসেবিকা নারীর সাংগঠনিক উদ্যোগকে বৃহত্তর জাতীয় রূপ দিতে প্রয়াসী হয়েছিলেন।

৩২. সারদা ঘোষ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৪১

১৯১০ সালে সরলাদেবী চৌধুরাণী এলাহাবাদে প্রতিষ্ঠা করেন ভারত স্ত্রী মহামণ্ডল (All Indian Women's Organization)। ভারত স্ত্রী মহামণ্ডলের উন্মেষের উদ্দেশ্য আলোচনা করে সরলাদেবী চৌধুরাণী *ভারতী* তথা অন্যান্য পত্রপত্রিকায় একাধিক বক্তব্য পেশ করেছিলেন। 'যোগাযোগ' নামক প্রবন্ধে তিনি বলেছিলেন "ভারত স্ত্রী মহামণ্ডল নামে যে মহাসমিতি স্থাপিত হইয়াছে, তাহার একটি প্রধান উদ্দেশ্য, তাহাই, আপনাদের পরস্পরের কাজের সম্বাদ পরস্পরের কাছে পৌছাইয়া দিবে।" এ সংগঠনের মাধ্যমে ভারতীয় নারীরা তাদের অধিকার এবং অবস্থিতি সম্পর্কে আরও বেশি সচেতন হবে এবং দাবি-দাওয়া পূরণে উদ্যোগী হবে-এ আশা তিনি পোষণ করতেন। ভারত স্ত্রী মহামণ্ডলের মতো সংগঠনের মধ্যে দিয়ে নারীরশিক্ষা ও আত্মসচেতনতাবোধ অরো বৃহত্তর পরিশীলিত রূপ ধারণ করতে পারে বলে তিনি মনে করতেন। তিনি বলেছিলেন যে-

> চিন্তাশীলা এবং কার্যকুশলা ভারতরমণীগণের নিমিত্ত এই স্ত্রী মহামণ্ডলই একটি সাধারণ কেন্দ্রস্থল, ইহার অবলম্বনে প্রথমত আপন জীবনে উন্নতি স্থাপন করিয়া ক্রমে সমাজের, দেশের এবং বিশ্বসংসারের উন্নতি সাধন করিতে আমরা সক্ষম হইব। একই মহৎ আদর্শ আমাদের প্রত্যেক ভারতবর্ষীয় রমণীর জীবনের লক্ষ্য হইলে আমরা একতার যে সুদৃঢ় সূত্রে গ্রথিত হইব তাহা কিছুতেই ছিন্ন হইবার নয়।[৩৩]

আলোচনা প্রসঙ্গে সরলাদেবী বলেছিলেন নারীশিক্ষার বিস্তার ঘটানো ভারত স্ত্রী মহামণ্ডলের প্রাথমিক উদ্দেশ্য। তিনি মনে করতেন, নারী চেতনার সর্বাঙ্গীণ বিকাশ ও নারীর আত্মসম্মান ও স্বনির্ভরতা গড়ে তোলার জন্য শিক্ষাই প্রধান হাতিয়ার।[৩৪] সরলাদেবী বলেছিলেন বাল্যবিবাহ ও অবরোধ প্রথার দরুন হিন্দু ও মুসলিম মহিলারা কখনোই পরিপূর্ণ শিক্ষালাভের সুযোগ পায় না। এ ব্যাপারে ইংরেজ শিক্ষিকারা গৃহ শিক্ষিকার ভূমিকা কিছুটা পালন করলেও তাদের খ্রিস্টধর্মসুলভ আচরণ ও ধর্মপ্রচারের প্রবণতা এ উদ্দেশ্যকে ব্যাপক রূপদান করতে পারেনি। সেজন্যই ভারত স্ত্রী মহামণ্ডলের লক্ষ্য হবে অন্তঃপুর শিক্ষার মাধ্যমে নারী শিক্ষার বিস্তার ঘটানো। এজন্য প্রতিটি প্রদেশ থেকে অর্থ এবং স্বেচ্ছাশিক্ষিকা সংগ্রহ ও বেতনভুক শিক্ষিকা নিয়োগের ব্যবস্থার কথাও বলা হয়। এ জন্য সংগঠনে একটি পৃথক অর্থভাণ্ডারও প্রতিষ্ঠা করা হয়।

সংগঠনের দ্বিতীয় লক্ষ্য ছিল ভারতীয় নারীর পঠনযোগ্য পাঠ্যপুস্তক রচনা ও তাদের সাহিত্য প্রতিভার পৃষ্ঠপোষকতা করা। এ পরিকল্পনাকে কার্যকর করার জন্য সরলাদেবী ইংরেজি পুস্তকগুলোর ভাষান্তর করার পরিকল্পনা করেন। মহামণ্ডলের প্রতিটি শাখা সভায় এজন্য লেখিকাও নিযুক্ত করা হয়। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল এ অনূদিত পুস্তকগুলো মুদ্রিত করে অন্তঃপুর শিক্ষায় ব্যবহার করা হবে এবং যতদিন না নারী শিক্ষার উপযোগী পাঠ্যপুস্তক রচিত হয়, ততদিন পর্যন্ত এই পুস্তকগুলোই নারী শিক্ষার কাজে ব্যবহৃত হবে।

---

৩৩. সরলাদেবীর বক্তৃতা ৩০ ডিসেম্বর ,১৯১০- উক্ত বক্তৃতাটি প্রিয়ম্বদা দেবী কর্তৃক 'ভারত স্ত্রী মহাণ্ডল' শিরোনামে বঙ্গানুবাদ করা হয় এবং *ভারতী* পত্রিকায় চৈত্র, ১৩১৭ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়।

৩৪. ঐ

উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সরলাদেবীও মনে করতেন যে নারীর উপযোগী পাঠ্যপুস্তক পুরুষদের পাঠ্যপুস্তকের তুলনায় স্বতন্ত্র হওয়া প্রয়োজন। উনিশ শতকের নারী শিক্ষার প্রসারের প্রাথমিক পর্বে নারী শিক্ষাসংক্রান্ত বিতর্কের একটি প্রধান দিক ছিল নারীর পঠন-পাঠনযোগ্য পুস্তক বা পাঠ্যসূচি নির্ণয়। নারীদের পুরুষদের অনুরূপ পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যপুস্তক পাঠ ও ব্যবহার বা শিক্ষা ব্যবস্থা নারী সুলভ 'সুকুমার প্রবৃত্তি'গুলোর হানি ঘটাবে এবং তাদের উন্মার্গগামিনী করে তুলবে। বর্তমান অভিসন্দর্ভের অন্য একটি অধ্যায়ের আলোচনায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, এরূপ মনোভাব বা আশঙ্কা কেশবচন্দ্রের মতো সমাজ সংস্কারকগণও পোষণ করতেন। অবশ্য বিশ শতকে এসে নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে এতখানি রক্ষণশীলতা আর হয়তো ছিল না এবং নারীরা বিজ্ঞানবিষয়ক পঠন-পাঠনের সুযোগ পাচ্ছিল। তা সত্ত্বেও সর্বতোভাবে নারীশিক্ষাকে পুরুষদের শিক্ষার তুল্য করে দেখার মতো দুঃসাহসিক পদক্ষেপ নিতে কেউই সেভাবে সোচ্চার হননি। ভারত স্ত্রী মহামণ্ডলও এ ব্যাপারে প্রচলিত ধারারই অনুসারী ছিল।

তবে অন্তঃপুর শিক্ষা বিস্তারের পাশাপাশি এ সংগঠনটি নারীর স্বার্থানুকূল আরও কতকগুলো উদ্দেশ্য ও নিয়মাবলী স্থির করেছিল। সেগুলো ছিল এ মহামণ্ডলের মধ্যে দিয়ে ভারতে সকল বর্ণ ও ধর্মসম্প্রদায়ের নারীদের ঐক্যবদ্ধ করে তাদের নৈতিক ও বাস্তব অবস্থার রূপান্তর ঘটাতে হবে। এজন্য ভারতের সকল প্রদেশের নারীদের সাময়িক সম্মেলনের মাধ্যমে সংগঠনের সদস্যা করা হবে। বয়স্কা নারীদের পারিবারিক অবস্থা পর্যালোচনা করে অন্তঃপুর শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে। ভারতীয় ভাষার বিকাশ সাধনের জন্য অনূদিত পুস্তকের প্রসার বৃদ্ধি করা হবে এবং স্বল্পমূল্যে নারীদের মধ্যে পুস্তক বিক্রয়ের ব্যবস্থা করে তাদের জ্ঞানের বিকাশ ঘটানো হবে।

নারীদের আর্থিক স্বনির্ভরতা গড়ে তোলার জন্য সেবাব্রতী বা নার্সিং-এর প্রশিক্ষণ দেয়া এবং প্রয়োজন হলে এ জাতীয় প্রতিষ্ঠানও গড়ে তোলা সংগঠনটির কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত ছিল। নারীদের হস্তজাত শিল্পদ্রব্য বিক্রয়ের জন্য প্রতিটি এলাকায় ভাণ্ডার খোলা হয়। মূলত দরিদ্র পরিবারের হস্তশিল্প এগুলোতে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা-যাতে তাদের দারিদ্র্যের কিছু সুরাহা হয়।[৩৫]

উপর্যুক্ত পরিকল্পনাগুলো রূপায়ণের জন্য ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ ও নগরে মহামণ্ডলের শাখা স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়। সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, যদি অন্য কোনো মহিলা সমিতি বা নারী সংগঠন অনুরূপ কাজে ইতোমধ্যেই যুক্ত থাকে, তবে ইচ্ছা করলে তারাও এ স্ত্রী মহামণ্ডলের সঙ্গে যুগ্মভাবে কাজ করতে পারবে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল নারীরাই এ সংগঠনের সদস্য হতে পারতেন। প্রথম অবস্থায় অন্তঃপুর শিক্ষার জন্য ছাত্রীদের

৩৫. সরলা দেবী চৌধুরাণী, 'ভারত স্ত্রী মহামণ্ডল'; 'অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা', *ভারতী*, বৈশাখ, জৈষ্ঠ্য, আষাঢ়, ১৩৩২ বঙ্গাব্দ

কাছ থেকে শিক্ষিকাদের বেতন সংগ্রহের ব্যবস্থা করা হতো। পরে সংগঠনের অর্থভাণ্ডার স্থিতিশীল হলে দরিদ্র পরিবারগুলোতে বিনামূল্যে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়। উক্ত উদ্দেশ্যগুলো সম্পাদনের জন্য সদস্যাদের নিয়মিত চাঁদা ছাড়াও যে-কোনো সহানুভূতিশীল ব্যক্তিকেই আর্থিক অনুদান প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হয়।[৩৬]

এলাহাবাদ, লাহোর, বোম্বাই, মাদ্রাজ, দিল্লি, প্রয়াগ, লক্ষ্মৌ কাশী অঞ্চল ছাড়াও বাংলাতেও ভারত স্ত্রী মহামণ্ডলের শাখাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। বাংলায় এ সংগঠনের কর্মসূচির সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা নারী চেতনার বিকাশে বিশেষভাবে সাহায্য করেছিলেন। সরলাদেবী আহ্বান জানিয়েছিলেন যে ,ভারত স্ত্রী মহামণ্ডলের জন্য অন্তত দশ হাজার সভ্য যেন বাংলায় সংগ্রহ করা হয়। এ উদ্দেশ্যপূরণের জন্য তিনি কতকগুলো পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। এ জন্য তিনি বাঙালি নারীদের ভারত স্ত্রী মহামণ্ডলের সদস্যপদ গ্রহণের জন্য আহ্বান জানান। তিনি ভারত স্ত্রী মহামণ্ডলের উদ্দেশ্য সফল করার জন্য প্রতিটি শহরের পাড়ায় পাড়ায় এ সংগঠনের শাখাকেন্দ্র গড়ে তুলে অন্তঃপুর নারীশিক্ষা ও দরিদ্র নারীদের অর্থোপার্জনের জন্য শিল্পভাণ্ডার স্থাপন করার পরামর্শ দেন। এজন্য তিনি প্রস্তাব দিয়েছিলেন যে প্রতিটি নারী নিজের নিজের অবসর ও ক্ষমতানুযায়ী প্রতিদিন বা প্রতি সপ্তাহে এক ঘণ্টা করে অন্য কোনো নারীকে কিছু শেখাবার দায়িত্ব নেবে। এর মধ্যে বাংলা, ইংরেজির মত ভাষাশিক্ষা, সঙ্গীতচর্চা, সেলাই, আলপনা সবই শামিল ছিল।[৩৭] বিভিন্ন ধর্মীয় ব্রত অনুষ্ঠানের মতো এ বাঙালি নারীদের তিনি সমাজসেবাকেও এক ব্রত হিসাবে গ্রহণ করার আহ্বান জানিয়েছিলেন। এজন্যই তাঁর মূল দাবিই ছিল বাংলায় সর্বাধিক সংখ্যক নারীকে ভারত স্ত্রী মহামণ্ডলের সদস্য পদে নিয়োগ করা। শুধুমাত্র নারী সদস্য সংগ্রহই নয়, ভারত স্ত্রী মহামণ্ডলকে একটি সফল নারী সংগঠনের রূপ দিতে তিনি ভারতীয় তথা বাঙালি পুরুষদেরও স্ত্রী মহামণ্ডলের সদস্য হিসাবে যুক্ত হতে উৎসাহ দেন। সরলাদেবী আশা করেছিলেন যে, এ সংগঠনের মাধ্যমে ভারতীয় অন্যান্য নারীদের মতো বাঙালি অন্তঃপুরচারিণী নারীরাও অন্তঃপুরের গণ্ডি অতিক্রম করে বৃহত্তর জগতে অনেক সহজভাবে আত্মপ্রকাশ করতে সক্ষম হবে।

সরলাদেবী ভারত স্ত্রী মহামণ্ডলের শাখাকেন্দ্র বাংলাতে গড়ে তুললেও বৈবাহিক সূত্রে তিনি লাহোরে অবস্থান করায় এর বাংলার শাখা-সংগঠনের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন কৃষ্ণভাবিনী দাস (১৮৬২-১৯১৯ খ্রি.)। তিনি ছিলেন উনিশ শতকের ব্যতিক্রমী বাঙালি নারীদের মধ্যে অন্যতম, যিনি স্বামী দেবেন্দ্রনাথ দাসের সঙ্গে বিদেশ যাত্রা ও সেখানে দীর্ঘদিন বসবাসের সুযোগ পেয়েছিলেন। (তাঁর ইংল্যান্ড বাসের অভিজ্ঞতা থেকে তিনি

৩৬. সরলা দেবী চৌধুরাণী, 'ভারত স্ত্রী মহামণ্ডল' *ভারতী*, বৈশাখ, ১৩৩২ বঙ্গাব্দ

৩৭. সরলা দেবী চৌধুরাণী, 'যোগাযোগ', ভারতী, বৈশাখ ১৩১৮ বঙ্গাব্দ

লিখেছিলেন *ইংল্যান্ডে বঙ্গমহিলা* (১৮৮৫) গ্রন্থটি।[৩৮] তিনি বলেছিলেন যে নারী-পুরুষের যথার্থ সহযোগিতার ভাবনা ও ভূমিকা ইংল্যান্ডেই বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। ইংরেজ মহিলারা নারীর পারিবারিক দায়িত্ব পালন করার সাথে সাথে সৃজনশীল ও অর্থকরী কাজেও অংশ নেয়, যার ফলেই ইংরেজ জাতির এই শ্রীবৃদ্ধি সম্ভব হয়েছে। যেহেতু মহিলারাই জাতির অর্ধেক অংশ, তাই তাদের অলস, নিরর্থক জীবনযাত্রা বস্তুতপক্ষে জাতি ও সমাজের পক্ষেই ক্ষতিকর।[৩৯] তিনি ব্যক্তিজীবনে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষালাভ করতে পারেননি। কিন্তু নিজস্ব জ্ঞান ও বিদ্যাচর্চার কারণেই তিনি শেষ জীবনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষকও নিযুক্ত হয়েছিলেন। স্বামী দেবেন্দ্রনাথ দাসের সাহচর্যও তাঁকে এক সাধারণ নারী থেকে এক ব্যতিক্রমী নারীতে পরিণত করেছিল বলে অনেকে মনে করেন। এ কৃষ্ণভাবিনী দেবীর উদ্যোগেই বাংলায় ভারত স্ত্রী মহামণ্ডলের বিকাশ ও বিস্তৃতি সম্ভব হয়েছিল। তিনি ভারত স্ত্রী মহামণ্ডলের সভানেত্রী রূপে নারী উন্নয়নের কর্মসূচি রূপায়ণে উদ্যোগী হন। তাঁরই চেষ্টায় ভারত স্ত্রী মহামণ্ডল বাংলার অন্যতম একটি প্রথম সারির নারী সংগঠনের রূপ পরিগ্রহ করেছিল- এমন তথ্য পাওয়া যায় তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর সম্পর্কে একাধিক রচনায়। *মডার্ন রিভিউ* পত্রিকা লিখেছিল-

> After the death of the husband and of her only daughter, she threw herself heart and soul into the movement for the education and uplift of her sisters. With the help of teachers maintained by the Stree-mahamandal, of which she was secretary and chief workers, she carried on the work of zenana tuition for years in a thoroughly unsectarian manner. She did not accept state help for this or any other of her activities, as she did not like any interference with her liberty in the choice of means and methods.[40]

আবার সরোজকুমারী দেবী তাঁর স্মৃতিচারণা করে বলেন, ‘ভারত স্ত্রী মহামণ্ডলের জন্য তিনি কি অশ্রান্ত পরিশ্রম করেছিলেন, কত দীনদুঃখী বিধবার অন্ন সংস্থানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সকল বাটীতেই তাঁর অবারিত দ্বার। সকলেই তাঁহাকে ভালোবাসিত।”[৪১]

কৃষ্ণভাবিনী দাস ভারত স্ত্রী মহামণ্ডল' শীর্ষক এক প্রবন্ধে বাংলায় তাঁর নেতৃত্বে পরিচালিত এ সংগঠনের কার্যাবলীর কিছু বিবরণ দিয়েছেন। এ সংগঠনের কর্মসূচি ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন, কলকাতাতে এ সংগঠনের কার্যালয়ে সমস্ত ভারতীয় নারীদের একত্র করার জন্য মাঝেমাঝেই সদস্যদের সাময়িক সমাবেশ আয়োজন করা হতো। ভারতীয় নারীদের অবস্থার উন্নতির জন্য তাদের অন্তঃপুর শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরো জোরদার করা হয়।

---

৩৮. এই গ্রন্থের মধ্যে দিয়ে তাঁর বিলেত যাত্রার অভিজ্ঞতা, ইংল্যান্ডের সমাজ, সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক চিন্তাধারার রূপরেখা, শিক্ষাব্যবস্থা, গার্হস্থ্য জীবন, গণতান্ত্রিক রাজনীতি, মহারানি ভিক্টোরিয়া সমস্ত কিছুরই পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ পাওয়া যায়। ইংল্যান্ডে বঙ্গমহিলা' গ্রন্থে কৃষ্ণভাবিনী দেবী পাশ্চাত্য মহিলাদের তুলনায় বারংবার ভারতীয় মহিলাদের অবস্থার বর্ণনা করেছেন।

৩৯. কৃষ্ণভাবিনী দাস, *ইংল্যান্ডে বঙ্গমহিলা, দ্রষ্টব্য* অরুণা দাশগুপ্ত,(সম্পা.) , *কৃষ্ণভাবিনী দাসের প্রবন্ধাবলী*, কলিকাতা, ২০০৪, পৃ. ৯

৪০. Srimati Krishnabhabini Das, *The Modern Review,* April, 1919 p. 413)

৪১. সরোজকুমারী দেবী, কৃষ্ণভাবিনী দাস, ভারতী, অগ্রহায়ণ, ১৩২৯ বঙ্গাব্দ)

ভারতীয় ভাষাগুলোর বিকাশের জন্য এবং নারীদের জ্ঞানবৃদ্ধির জন্য স্বল্পমূল্যের পুস্তক প্রকাশ ও বিক্রয়ের ব্যবস্থাও এর কর্মসূচির অন্তর্গত ছিল। এমনকি সংগঠনের আদর্শ অনুযায়ী নারীদের আর্থিক স্বনির্ভরতা দানের জন্য তাদের হস্তশিল্পের কাজে উৎসাহ দেয়া হতো এবং তাদের শিল্পদ্রব্যগুলো বিক্রয়ের জন্য কলকাতা শহরের একাধিক 'পুরনারী নির্ব্বাহ ভাণ্ডার' নামক ডিপো খোলা হয়েছিল।[৪২] এসময় কলকাতা ছাড়াও মেদিনীপুরেও ভারত স্ত্রী মহামণ্ডলের শাখাকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছিল।

১৯১১ খ্রিস্টাব্দে সরলাদেবীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে কলকাতায় এ সংগঠনের সূত্রপাত হয় এবং দু বছরের মধ্যে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের কর্মসূচি দিয়ে এই সংগঠনের কাজও শুরু হয়। কৃষ্ণভাবিনী দাসের লেখা থেকে জানা যায় যে, অন্তঃপুর শিক্ষার জন্য প্রথমে ছ'জন শিক্ষিকাকে নিয়োগ করা হয়েছিল, যাদের উপর ষোলোজন বয়স্কা বালিকার শিক্ষাদানের দায়িত্ব ছিল। ১৩১৯ বঙ্গাব্দ নাগাদ ভারত স্ত্রী মহামণ্ডলের অন্তঃপুর শিক্ষিকার সংখ্যা ২০ জনে এবং ছাত্রীর সংখ্যা ১২০ জনে উন্নীত হয়েছিল। এরা প্রত্যেকেই ছিলেন বিবাহিত নারী।[৪৩] কৃষ্ণভাবিনী দাসের নেতৃত্বে ভারত স্ত্রী মহামণ্ডলের জনপ্রিয়তা যে বৃদ্ধি পেয়েছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কেবল কলকাতায়ই এ সমিতির তিনটি শাখাকেন্দ্র গড়ে ওঠে। এ সময়ে কলকাতার স্ত্রী মহামণ্ডলের শাখা সমিতিগুলোতে মোট সদস্য সংখ্যা ছিল ছয় শত এবং সদস্য পদ গ্রহণের জন্য তারা জাতি, বর্ণ বা ধর্ম কোনোকিছুর ভেদই মানতেন না।

জানা যায় যে, কৃষ্ণভাবিনী দাস হিন্দু বিধবাদের মতো খদ্দরের পোশাক পরে নগ্নপদে এবং হেঁটে হেঁটে বিভিন্ন পল্লীতে ঘুরে ঘুরে নারীদের কাছে শিক্ষার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতেন এবং তাদের সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করতেন। তিনি ব্যক্তিজীবনে যথেষ্ট ধনী থাকলেও জনসমক্ষে কখনো তার বহিঃপ্রকাশ ঘটাননি। এ প্রসঙ্গে একটি ধারণা করা যেতে পারে যে, প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন পাশ্চাত্য ভাবাদর্শে যথেষ্ট প্রভাবিত এবং তাঁর উপস্থিতি সাধারণ কলকাতাবাসী বাঙালিদের কাছে খুব গ্রহণযোগ্য ছিল না। কিন্তু ভারত স্ত্রী মহামণ্ডলের সাংগঠনিক কার্যাবলীকে সফল করার জন্য তিনি জনজীবনের সঙ্গে সহজতর ঘনিষ্ঠ সংযোগ গড়ে তোলার প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন। এক্ষেত্রে তাঁর ব্যক্তিজীবনের কৃচ্ছ্রতা বিশেষভাবে সাহায্য করেছিল। জানা যায় ভারত স্ত্রী মহামণ্ডলের কর্মসূচি রূপায়ণ করতে গিয়ে উদ্যোক্তাদের প্রায়ই সামাজিক সমালোচনার শিকার হতে হতো এবং অনেক ক্ষেত্রে বিরূপ প্রতিক্রিয়াও গড়ে ওঠত। কিন্তু এ ব্যাপারে তাঁর কর্মোদ্যোগ ছিল প্রশংসনীয়। ভারত স্ত্রী মহামণ্ডলে নির্যাতিতা নারীদের জন্য সহায়তা দানের ব্যবস্থা ছিল এবং এ সহায়তা শুধু আর্থিক বা মানবিক ছিল না। প্রয়োজনে কৃষ্ণভাবিনী দাস এজন্য পুলিশ কোর্টেও যাতায়াত করতেন। নিগৃহীতা মহিলাদের পুনর্বাসনের জন্য তিনি ভবানীপুরে বাড়িরও ব্যবস্থা করেছিলেন।

---

৪২. কৃষ্ণভাবিনী দাস 'ভারত স্ত্রী মহামণ্ডল', *মহিলা*, কার্ত্তিক, ১৩১৯ বঙ্গাব্দ

৪৩. *ঐ*

অন্তঃপুর নারীশিক্ষা ছাড়াও ভারত স্ত্রী মহামণ্ডল প্রাতিষ্ঠানিক নারীশিক্ষারও উদ্যোগ নিয়েছিল। জানা যায় যে, কৃষ্ণভাবিনী দাস কলকাতার বৌবাজার অঞ্চলে বালিকাদের শিক্ষার জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন, যার ছাত্রীসংখ্যা ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ ছিল প্রায় ৫০ জন। শিক্ষিকা সংখ্যা ছিল ৩ জন। অন্তঃপুর শিক্ষার জন্য ধনী পরিবারগুলোর কাছ থেকে শিক্ষকদের বেতন বাবদ অর্থ আদায় করা হতো। তবে কৃষ্ণভাবিনী দেবীর বক্তব্য থেকে জানা যায় যে, সংগঠনের আর্থিক সংগতি দুর্বল থাকার দরুনই প্রাথমিক পর্বে এ বেতনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তাঁর পরিকল্পনা ছিল সংগঠনের অর্থভাণ্ডার দৃঢ় হলে সাধারণ গৃহস্থ ও দরিদ্র পরিবারগুলোতে বিনামূল্যে নারীদের অন্তঃপুর শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে।

১৯১৬ সালে কৃষ্ণভাবিনী দাস ভারত স্ত্রী মহামণ্ডলের অধীনে একটি বিধবা আশ্রমও স্থাপন করেছিলেন। তাঁর নেতৃত্বে ভারত স্ত্রী মহামণ্ডলের কার্যাবলী আলোচনা করে সরলাদেবী বলেছিলেন "কলিকাতার ভারত স্ত্রী মহামণ্ডলের শাখার কার্যকলাপ সম্বন্ধে এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করি। কৃষ্ণভাবিনী দাসের চেষ্টা যত্নে ইহা একটি প্রকৃত সমাজহিতৈষী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। অন্তঃপুরে বিধবা, কুমারী ও অনাথা নারীগণকে সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে শিল্প-শিক্ষা দানেরও ব্যবস্থা হয়।"[৪৪]

কলকাতায় ভারত স্ত্রী মহামণ্ডলের প্রতিষ্ঠা এবং বিকাশের সঙ্গে প্রিয়ম্বদা দেবীর (১৮৭১-১৯৩৫ খ্রি.) নামও বিশেষভাবে জড়িত। তিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও সমাজসেবক। প্রিয়ম্বদা কলকাতার বিখ্যাত ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন। নারীমুক্তি ও জাগরণের অন্যতম অগ্রণী নারী প্রিয়ম্বদা নারীশিক্ষার প্রসারে বহু মহিলা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন।[৪৫] তিনি ভারত স্ত্রী-মহামণ্ডলের বাংলা শাখার প্রধান হিসেবেও তিনি দায়িত্বপালন করেন। অকাল বৈধব্য এবং একমাত্র পুত্রের বিয়োগ ব্যথা তাঁকে যে জীবনযন্ত্রণার মধ্যে ফেলেছিল তা ভোলার জন্য সাহিত্যচর্চা ও সমাজসেবার পথ বেছে নিয়েছিলেন প্রিয়ম্বদা দেবী। ভারত স্ত্রী মহামণ্ডল ছাড়াও স্বর্ণকুমারী দেবী প্রতিষ্ঠিত 'সখি সমিতি' (১৮৮৬ খ্রি.) এবং ১৯০৬ সালে হিরন্ময়ী দেবী (স্বর্ণকুমারী দেবীর কন্যা) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'বিধবা শিল্পাশ্রম' (পরে মহিলা শিল্পাশ্রম নামে পরিচিত) প্রভৃতি সংগঠনের সাথেও প্রিয়ম্বদা দেবী সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন। জানা যায় যে, পূর্বসূরী ও সমকালীন নারীদের মতো প্রিয়ম্বদা দেবীও নারীমুক্তি ও জাগরণ সম্পর্কে তাঁর চিন্তাভাবনাকে বাস্তবায়নের জন্য সাংগঠনিক তৎপরতার সাথে নিজেকে যুক্ত করেছিলেন। ভারত স্ত্রী মহামণ্ডল গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ১৯১০ সালে এলাহাবাদে জাতীয় কংগ্রেসের নিখিল ভারতীয় নারী সম্মেলনে ইংরেজি ভাষায় প্রদত্ত সরলা দেবী চৌধুরাণীর

৪৪. সরলাদেবী চৌধুরাণী, *জীবনের ঝারা পাতা*, কলিকাতা, ১৩৮২ বঙ্গাব্দ, উদ্ধৃতি, সারদা ঘোষ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৫৬

৪৫. তাঁর পিতা কৃষ্ণকুমার বাগচী এবং মাতা প্রসন্নময়ী দেবী। প্রিয়ম্বদা কলকাতার বেথুন স্কুল থেকে এন্ট্রান্স (১৮৮৮) এবং বেথুন কলেজ থেকে এফ.এ (১৮৯০ খ্রি.) ও বি.এ (১৮৯২ খ্রি.) পাস করেন। ১৮৯২ সালে মধ্যপ্রদেশ নিবাসী আইনজীবী তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। বিয়ের মাত্র তিন বছর পরে (১৮৯৫ খ্রি.) তিনি বিধবা হন।

ভাষণটি তিনি বাংলায় অনুবাদ করে *ভারতী* পত্রিকায় (চৈত্র, ১৩১৭ বঙ্গাব্দ) প্রকাশ করেন। এর মধ্য দিয়ে ভারত স্ত্রী মহামণ্ডলের সাথে তাঁর যোগসূত্র তৈরি হয় এবং একপর্যায়ে তিনি এর সম্পাদিকা পদে অভিষিক্ত হন। প্রিয়ম্বদা দেবী নিজে একজন স্কুল শিক্ষক ছিলেন এবং অনেক বালিকা বিদ্যালয়ের সাথে তাঁর সংশ্লিষ্টতা থাকলেও তিনি ভারত স্ত্রী মহামণ্ডলের পরিচালিত অন্তঃপুর নারীশিক্ষার উপরই অধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন। প্রিয়ম্বদা দেবীও মনে করতেন যে, নারীদের জন্য গৃহকোণই আদর্শ ক্ষেত্র। তার মধ্যেই তাদের বুদ্ধি, মানসিকতা ও কর্তব্যের যথাযথ বিকাশ সম্ভব হয়। সুতরাং নারীদের এমন শিক্ষা দেয়া প্রয়োজন যাতে তাদের নারীসুলভ কোমল বৃত্তিগুলি অক্ষুণ্ন থাকে ও পারিবারিক দায়িত্ব পূরণ সম্ভব হয়, অথচ চিন্তা ও বুদ্ধিরও যাতে বিকাশ ঘটে, তার প্রতিও গুরুত্ব দেয়া হয়। বস্তুত এটি ছিল একটি উনিশ শতকীয় ধারণা। তবে বিশ শতকে এসেও বাঙালি নারীরা যে সেই মানসিকতার ঘেরাটোপ থেকে নিজেদের সম্পূর্ণ মুক্ত করতে পারেনি প্রিয়ম্বদা দেবী এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। প্রিয়ম্বদা দেবী নারীদের গৃহ এবং শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য তাদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থারও মৃদু সমালোচক ছিলেন। তিনি নারীদের উচ্চশিক্ষা গ্রহণের বিশেষ আবশ্যকতা নেই বলে মনে করতেন। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রণীত নারীশিক্ষার পাঠ্যসূচিকে পুরুষোচিত বলে আখ্যা দিয়েছিলেন। কারণ এতে নারীদের জন্য উপযোগী ললিতকলা ও অর্থকরী শিক্ষাদানের কোনো ব্যবস্থা ছিল না। এ জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থাকে তিনি গ্রহণযোগ্য বলে মনে করতেন না এবং নারীদের জন্য স্বতন্ত্র শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রস্তাব দিয়ে নারীদের মাধ্যমেই নারীশিক্ষার ব্যবস্থা করার পরামর্শ দিয়েছিলেন।[৪৬] তিনি নারীদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা ও অন্তঃপুর শিক্ষা দানের উপযোগী প্রশিক্ষণ গ্রহণেরই পরামর্শ দিয়েছিলেন। ভারত স্ত্রী মহামণ্ডলের সম্পাদিকা হিসাবে তিনি এ সংগঠনের কর্মসূচিকেই নারীশিক্ষা বিস্তারের সর্বাপেক্ষা সক্রিয় ও ইতিবাচক পদক্ষেপ বলে মনে করতেন। তাঁর মতে, এ সংগঠনটি হলো সম্পূর্ণভাবে নারীদের দ্বারা পরিচালিত। সুতরাং এখানে নারী স্বার্থকেই সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হয়ে থাকে। এ সংগঠনে যোগদানের জন্য তিনি সমস্ত বাঙালি নারীদের আহ্বান জানিয়েছিলেন।[৪৭]

অন্তঃপুর নারীশিক্ষার একজন ঘোর সমর্থক হলেও প্রিয়ম্বদা দেবী সময়ের দাবিকে উপেক্ষা করতে পারেননি। তাই তাঁর উদ্যোগে ১৯২১-২২ সালের মধ্যে ভারত স্ত্রী মহামণ্ডলের অধীনে তিনটি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সর্বশেষ বিদ্যালয়টি গড়ে উঠেছিল মির্জাপুর স্ট্রিটে, চৈত্র, ১৩২৮ বঙ্গাব্দে। প্রথমে এ বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ছিল ৫ জন। কিন্তু এক বছর পর এ সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় পঞ্চাশ জনে। ১৩২৮ বঙ্গাব্দ নাগাদ শিয়ালদহ কৃষ্ণভাবিনী বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল প্রায় ৭০ জন এবং বৌবাজার কৃষ্ণভাবিনী

৪৬. প্রিয়ম্বদা দেবী, 'স্ত্রীশিক্ষা', *অন্তঃপুর*, জৈষ্ঠ্য, ১৩০৮ বঙ্গাব্দ
৪৭. সারদা ঘোষ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৬২

বিদ্যালয়ে ছাত্রীসংখ্যা ছিল ৬৫ জন। এ তিনটি বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের জন্য শিক্ষয়িত্রীও নিযুক্ত করা হয়েছিল। এদের মধ্যে মির্জাপুর বিদ্যালয়ে ২ জন, শিয়ালদহ বিদ্যালয়ে ৩ জন ও বৌবাজার বিদ্যালয়ে ৩ জন শিক্ষিকা শিক্ষাদান করতেন। ভারত স্ত্রী মহামণ্ডল পরিচালিত ভবানীপুর নারী পুনর্বাসন কেন্দ্রে অন্তঃপুর শিক্ষা বিভাগে ৪ জন ও কলকাতার অন্তঃপুর শিক্ষা বিভাগে ৫ জন শিক্ষিকা নিযুক্ত ছিলেন। ভবানীপুরে অন্তঃপুর শিক্ষা গ্রহণ করতেন প্রায় ৪০ জন শিক্ষার্থী এবং কলকাতায় এ সংখ্যা ছিল প্রায় ৪৫ জন। প্রাতিষ্ঠানিক এবং অন্তঃপুর উভয়ক্ষেত্রেই নারীশিক্ষার মান নির্ণয়ের জন্য পরীক্ষার ব্যবস্থা ছিল। যোগ্য শিক্ষার্থীকে পদক ও পুরস্কার দেয়া হতো এবং প্রতি শ্রেণির জন্য পৃথক পৃথক পাঠ্যসূচিরও ব্যবস্থা ছিল। এভাবে ১৯২২ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ বাংলায় ভারত স্ত্রী মহামণ্ডলের প্রধান কেন্দ্রস্থল কলকাতার সংগঠনের মধ্যে ৩টি বিদ্যালয় ও ২টি অন্তঃপুর শিক্ষাকেন্দ্র বিদ্যমান ছিল। সেই সঙ্গে ভারত স্ত্রী মহামণ্ডলের নিজস্ব একটি শিক্ষয়িত্রীভবনও ছিল। এ সমস্ত শিক্ষাকেন্দ্র পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের যোগান আসত মূলত ব্যাংকে রাখা টাকার সুদ এবং ভারত স্ত্রী মহামণ্ডলের চাঁদা এবং গুণগ্রাহী ব্যক্তিদের প্রদত্ত সাহায্যের মাধ্যমে। এছাড়া শিক্ষাকেন্দ্রগুলোর ছাত্রীদের ও শিক্ষিকাদের যাতায়াতের জন্য যানবাহনেরও ব্যবস্থা করতো এ সংগঠন।[৪৮]

ভারত স্ত্রী মহামণ্ডল যে সময় গড়ে উঠেছিল, সেই সময়টি ছিল ভারতে জাতীয়তাবাদী রাজনীতির উত্তেজনাপূর্ণ সময়। ইউরোপীয় মহিলাদের নিয়োগের ব্যবস্থা থাকলেও কৃষ্ণভাবিনী দাসের সময় থেকে ভারত স্ত্রী মহামণ্ডল অন্তঃপুর শিক্ষার জন্য সর্বতোভাবে দেশীয় শিক্ষয়িত্রীদের নিয়োগের চেষ্টা চালায়। প্রথমদিকে এতে খুব সাড়া না পাওয়া গেলেও কৃষ্ণভাবিনী দেবীর ব্যক্তিগত অনুরোধ ও চেষ্টার মাধ্যমে কেউ কেউ রাজি হন। প্রিয়ম্বদা দেবীর সময় দেশীয় শিক্ষিকা নিয়োগ আরো বৃদ্ধি পায়।

বিশ শতকের প্রারম্ভে গড়ে ওঠা ভারত স্ত্রী মহামণ্ডলের মতো নারী সংগঠনগুলো বাংলায় নারী চেতনার বিকাশের জন্য অন্তঃপুর শিক্ষা, শিল্পচর্চার পাশাপাশি অর্থ উপার্জনের বিষয়টির উপর খুবই গুরুত্ব দিতে থাকে। ভারত স্ত্রী মহামণ্ডলও এ কাজ করে। ভারত স্ত্রী মহামণ্ডল অন্তঃপুর শিক্ষা ও নারী শিক্ষার বিষয়টিকে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য প্রতি তিন মাস অন্তর বক্তৃতা সভার আয়োজন করতো। ভারত স্ত্রী মহামণ্ডল নিজেদের কর্মসূচিকে প্রচার করার জন্য সংবাদপত্র ও পত্র-পত্রিকায় বিজ্ঞাপনেরও সাহায্য নিয়েছিল। এর একটি ইতিবাচক প্রভাব যে সমাজে পড়েছিল প্রিয়ম্বদা দেবীসহ মহাগুলের সাথে জড়িতদের বক্তব্য ও লেখনি থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। সংগঠনটির উদ্যোগে অন্তঃপুর নারীশিক্ষা ছাড়াও প্রাতিষ্ঠানিক নারীশিক্ষার উদ্যোগ সম্পর্কে ইতোমধ্যেই আলোকপাত করা হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায় যে, সংগঠনটি তার ছাত্রীদের জন্য

৪৮. সারদা ঘোষ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৬২

যে পাঠ্যসূচি নির্ণয় করেছিল তার মধ্যে ছিল শিল্প, সঙ্গীত, বাংলা, ইংরেজি, প্রাথমিক সংস্কৃতপাঠ, গণিত, ভূগোল, ইতিহাস ও পুরাণ ইত্যাদি বিষয়। সে সঙ্গে বাংলায় সাহিত্য চর্চার উপর এবং নৈতিক মূল্যবোধ গড়ে তোলার উপরও বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছিল। তবে যে বিষয়টি বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় তা হলো সরলা দেবীর ভাবনা ও আদর্শকে পাথেয় করে গড়ে ওঠা এ সংগঠনটিও নারীদের আত্মোন্নতির অন্যতম উদ্দেশ্য হিসাবে শ্বশুরকুলের অনুকূল স্ত্রী হয়ে ওঠার যোগ্যতাকেই গুরুত্ব দিতো এবং এ ব্যাপারে এর সঙ্গে উনিশ শতকের বাংলায় গড়ে ওঠা নারী সংগঠনগুলোর একটি বিশেষ সামঞ্জস্য বা মিল রয়েছে। এর মধ্যে দিয়ে আরেকটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, বিশ শতকের প্রথম ভাগেও নারী চেতনার বিকাশের জন্য যে আত্মোন্নতির কথা বলা হয় ও সংগঠন গড়ে ওঠে তাতেও নারীদের স্বাধীন মানসিকতার প্রকাশ এবং স্বাধীনভাবে জীবনযাপনের অধিকারকে বিশেষ প্রাধান্য দেয়া হতো না। নারী চেতনার বিকাশের ক্ষেত্রে এ দ্বিধাগ্রস্ততা বাংলার নারী সংগঠনগুলো অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। এ কারণেই পারিবারিক এ ধরনের নারী সংগঠনগুলো আপামর নারীদের সামাজিক ও ব্যক্তিগত অবস্থানকে কোনো বৈপ্লবিক রূপান্তরের দিকে নিয়ে যেতে পারেনি বলে অনেকের মত।[৪৯] কিন্তু তা সত্ত্বেও নারীদের স্বার্থে এ সংগঠনগুলোর কার্যক্রম অর্থহীন ছিল, এমনটা ভাবার কোনো কারণ নেই। বস্তত এসব সংগঠনের তৎপরতা ও কার্যক্রমের প্রভাবে প্রচলিত নারী জীবনে অবশ্যই কিছু আলোড়ন সৃষ্টি হচ্ছিল এবং রূপান্তরের এ প্রক্রিয়া যতই সীমিত হোক না কেন, পরবর্তীকালে গড়ে ওঠা নারী আন্দোলনে তা অবশ্যই অনুপ্রেরণা সঞ্চার করেছিল।

আর্থিক সংকট ও অন্যান্য কিছু কারণে ১৯২৩ সালের পর থেকে ভারত স্ত্রী মহামণ্ডলের কার্যক্রম পরিচালনা ক্রমশ কঠিন হতে থাকে। উদ্যোক্তাদের ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আর্থিক সংকটের কারণে সংগঠনের শিক্ষাচার কর্মসূচিকে কলকাতার বাইরে প্রসারিত করা যায়নি। এমনকি প্রবাসী শিক্ষয়িত্রীদের বসবাসের জন্য ১৯২০ সাল থেকে থেকে সংগঠন যে শিক্ষয়িত্রী ভবনটি পরিচালনা করে আসছিল, ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ সেটিও ছেড়ে দিতে হয়। আর্থিক সংকট মোকাবিলায় সংগঠনটির সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। অর্থনৈতিক দুর্বলতার পাশাপাশি সংগঠনটির দুর্বলতার আরো দুটি কারণ অনুমান করা যায়। ১৯২০-৩০-এর দশকে গান্ধিবাদী রাজনীতির প্রভাবে সরকারি উদ্যোগের বাইরে ভারতীয় সমাজের নারীদের শিক্ষা ও অর্থকরী শিল্পচর্চার মতো অন্যান্য ক্ষুদ্র, বৃহৎ গোষ্ঠীগত বিষয়গুলো ক্রমশ গুরুত্ব হারাতে থাকে। ভারত স্ত্রী মহামণ্ডল তাই তার সর্বভারতীয় উদ্যোগ সত্ত্বেও কর্মসূচির গুরুত্বের দিক থেকে দ্বিতীয় সারিতে চলে আসে। তদুপরি এ সময় নারীশিক্ষার মতো বিষয়গুলো ছাপিয়ে নারী সংগঠনগুলোর দাবি দাওয়ার মধ্যে নারীদের ভোটাধিকার ও কর্মের অধিকারের মতো বিষয়গুলো প্রাধান্য পেতে শুরু করেছিল। এই অবস্থায় শুধু অন্তঃপুর শিক্ষা, শিল্পদ্রব্য বিক্রয়

৪৯. সারদা ঘোষ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৬৩-২৬৪

এবং ব্যক্তি উদ্যোগে নারীশিক্ষার প্রসার বিষয়ক দাবিকে কেন্দ্র করে টিকে থাকা নারী সংগঠনগুলো গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে। তবে বিষয়টিকে সম্পূর্ণ নেতিবাচকভাবে না দেখে বাঙালি নারীদের চিন্তা ও চেতনার ধারাবাহিক বিকাশের এক স্বাভাবিক পরিণতি বলে ভাবা যেতে পারে।

তবে ভারত স্ত্রী মহামণ্ডলের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সরলা দেবী সর্বাত্মক চেষ্টা করেছিলেন। বৈশাখ, ১৩৩২ বঙ্গাশের *ভারতী* পত্রিকায় সর্বসাধারণের অবগতির জন্য সরলাদেবী আবার ভারত স্ত্রী মহামণ্ডলের উদ্দেশ্য ও নিয়মাবলী প্রকাশ করেন। সে সঙ্গে ভারত স্ত্রী মহামণ্ডলের কার্যপ্রণালীকে আর শুধু অন্তঃপুর স্ত্রী শিক্ষার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে সার্বজনীন স্ত্রীশিক্ষা ও শিল্পশিক্ষাদানের জন্য একটি প্রাতিষ্ঠানিক পদক্ষেপ নেয়ার সিদ্ধান্তও তিনি নেন। এজন্য ১৯৩০ সালের ১ জুন ভবানীপুরে 'ভারত স্ত্রী শিক্ষাসদন' প্রতিষ্ঠা করা হয়। এখানে স্বয়ং সরলাদেবী ছাত্রীদের গীতাপাঠ করাতেন। এ শিক্ষাসদনে একটি শিশু সংরক্ষণকেন্দ্রও ছিল। মহামণ্ডলের তরফ থেকে শিশুদের আসা ও যাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এ শিক্ষাসদনে আবার প্রাতিষ্ঠানিকভাবে প্রবেশিকা পর্যন্ত পড়ানোর ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৩০ সালের ৭ আগস্ট শিক্ষাসদনের কার্যালয় স্থানান্তরিত হয় কলেজ স্কোয়ারের এলবার্ট হলে। শিক্ষাসদনের ছাত্রীসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় সরলা দেবী একটি ছাত্রী নিবাসেরও ব্যবস্থা করেন। এ দুটি প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য গঠিত হয় এক অধ্যক্ষ সভাও। এই সভার নেতৃত্বে ছিলেন স্বয়ং সরলাদেবী চৌধুরাণী। ইতোমধ্যে ভারত স্ত্রী মহামণ্ডল তার স্বতন্ত্র গুরুত্ব হারিয়ে ফেলায় তাকে ভারত স্ত্রী শিক্ষাসদনের অন্তর্ভুক্ত করে দেয়া হয় এবং সরলাদেবীও তাঁর আধ্যাত্মিক অনুরাগের কারণে সংগঠনটির প্রত্যক্ষ ও সক্রিয় কার্যপরিচালনা থেকে ক্রমশ সরে আসতে থাকেন। এভাবে ভারত স্ত্রী মহামণ্ডলের কার্যধারা ক্রমশ নারীশিক্ষার পরিমণ্ডলেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে।[৫০]

লেডি অবলা বসু ও নারী শিক্ষা সমিতি: নারী শিক্ষা সমিতি (স্থাপিত ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দ) তার উদ্দেশ্য, পরিকল্পনা ও কর্মপদ্ধতির বিচারে নারীর আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়নের উপযোগী সংগঠন ছিল। এ সংগঠনটির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন লেডি অবলা বসু। অবলা বসু কলকাতা শহরে অবস্থিত বঙ্গমহিলা বিদ্যালয় এবং বেথুন স্কুলের প্রথম ছাত্রীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। ব্রাহ্মসমাজ সংস্কারক দূর্গামোহন দাশের কন্যা অবলা বসু উনিশ শতকের ব্যতিক্রমী বঙ্গ মহিলাদের মধ্যে ছিলেন প্রথম সারিতে। শিক্ষাপ্রসার, সমাজসেবা, রাজনৈতিক কর্মপ্রক্রিয়া ও সাংগঠনিক উদ্যোগের প্রতিটি ক্ষেত্রেই তিনি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাচেতনার বহিঃপ্রকাশ যেমন ছিল বঙ্গীয় নারীসমাজ, তেমনই তাঁর নারী উন্নয়নমূলক সমাজসেবার অভিব্যক্তি ঘটেছিল নারীশিক্ষা সমিতির মাধ্যমে। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে এই সংগঠনটি প্রতিষ্ঠা করে তিনি নারী উন্নয়নের উপযোগী

---

৫০. সরলা দেবী চৌধুরাণী, *জীবনের ঝরা পাতা*, পৃ. ২০৩-২০৪

কতকগুলো লক্ষ্যপূরণে প্রয়াসী হন। এর মধ্যে ছিল বাংলার গ্রামাঞ্চলে নারীশিক্ষা বিস্তারের জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, মাতৃ ও শিশুকল্যাণ কেন্দ্র স্থাপন করে সন্তানসম্ভবা মায়েদের স্বাস্থ্যসংক্রান্ত প্রশিক্ষণ, ধাত্রীবিদ্যা, শিশুপালন, শিশুশিক্ষা, প্রাথমিক চিকিৎসা ও গৃহস্থ সেবার তালিম দেয়া, নারীদের কুটিরশিল্পে উৎসাহিত করতে গ্রামে শিল্প প্রশিক্ষণকেন্দ্র গড়ে তুলে মেয়েদের অর্থকরী শিল্পের প্রশিক্ষণ দেয়া, সমিতির তরফ থেকে মেয়েদের শিক্ষয়িত্রীর প্রশিক্ষণ দিয়ে গ্রামীণ বিদ্যালয়গুলিতে প্রেরণ করা ও সমিতির তরফ থেকে নারী শিক্ষার উপযোগী পাঠ্যপুস্তক প্রস্তুত করা।[৫১] অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে নারী শিক্ষা সমিতি মূলত নারীশিক্ষা বিস্তারকেই তাদের সংগঠনের লক্ষ্যবস্তু নির্ধারণ করেছিল এবং নারী শিক্ষা সমিতির উদ্যোগে কলকাতায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। এগুলোর মধ্যে দুটি পরবর্তীকালে প্রসারিত হয়ে মহাবিদ্যালয়ের মর্যাদা লাভ করেছিল এবং একটি এখনও বিদ্যমান আছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দুটি হলো ‘মুরলিধর মহিলা কলেজ’ এবং ‘বেলতলা মহিলা কলেজ’। ১৯২১ সাল নাগাদ সমিতির তরফে হুগলি ও হাওড়ার বিভিন্ন গ্রামে নারীশিক্ষার লক্ষ্যে আটটি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। নারী শিক্ষা সমিতির উদ্যোগে ১৯২৪ সালের মধ্যে পূর্ব বাংলার ঢাকা, ফরিদপুর ও পাবনায় প্রায় চৌদ্দটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয় বলে জানা যায়।[৫২]

নারী শিক্ষা সমিতির কর্মধারার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল বাংলার প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা এবং সেগুলো যথাযথভাবে কাজ করতে শুরু করলে স্থানীয় কমিটির হাতে এর কার্যভার তুলে দেয়া। এভাবে ১৯৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতার সময় পর্যন্ত প্রায় ৫৯টি (কোনো কোনো সূত্র মতে ‘নারী শিক্ষা সমিতি’র মাধ্যমে অবলা বসু- গ্রাম বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে ৮৮ টি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।) প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল।। ১৯২৭-২৮ খ্রিস্টাব্দ, ১৯৩২-৩৩ খ্রিস্টাব্দ, ১৯৩৪-৩৫ খ্রিস্টাব্দে পাওয়া সরকারি প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, বাংলার পশ্চাৎপদ গ্রামসমূহে নারী শিক্ষা সমিতি প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারে যথেষ্ট সদর্থক ভূমিকা পালন করেছে। গ্রামাঞ্চলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য সমিতির তরফে একজন গ্রামীণ বিদ্যালয় সংগঠক এবং একজন নারী সুপারিনটেন্ডেন্টও নিযুক্ত ছিলেন। এ সমিতির পক্ষ থেকে প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য ১৪ টি শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছিল।[৫৩]

অবলা বসু তাঁর নারী শিক্ষা সমিতির আদর্শকে রূপায়ণের জন্য এর দ্বিতীয় আরেকটি যে শাখা সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তা হলো ‘বিদ্যাসাগর বাণী ভবন’। জানা যায় যে, বাঙালি সমাজের অল্পবয়সী বিধবাদের দুর্বিষহ

৫১. Lotika Ghose, ‘Social and Educational Movements for Women and by Women, 1820-1950’, *op.cit*, p. 152

৫২. *Ibid*

৫৩. *Ibid*

জীবন ভাবিয়ে তুলেছিল মহীয়সী বঙ্গকন্যা অবলা বসুকে। এমতাবস্থায় অপরের গলগ্রহ হয়ে থাকা যুবতী বিধবাদের স্বনির্ভর করে গড়ে তুলবার লক্ষ্যে নারী শিক্ষা সমিতির উদ্যোগে ১৯২৫ সালে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন বিদ্যাসাগর বাণী ভবন। পরের বছর ১৯২৬ সালে গড়ে তোলেন 'মহিলা শিল্পভবন'। পরবর্তী সময়ে অবলা বসু 'বাণী ভবন ট্রেনিং স্কুল' নামে আরেকটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেন। জানা যায় যে, বিদ্যাসাগর বাণী ভবন থেকে বালবিধবা বা বিধবাদের প্রয়োজনীয় শিক্ষামূলক প্রশিক্ষণ দিয়ে সমিতির পরিচালিত গ্রামীণ বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষিকা হিসাবে নিয়োগ করা হতো। এছাড়াও এখান থেকে নারীদের অর্থকরী শিল্পশিক্ষারও প্রশিক্ষণ দেয়া হতো। এখানে নারীদের সেলাই, কাটাই, তাঁত বোনা, পোশাক প্রস্তুত, মাটির দ্রব্য নির্মাণ, চর্মশিল্প ও সুতোর কাজ শেখানো হতো। এছাড়া ছাত্রীরা ষষ্ঠ শ্রেণি পর্যন্ত বিদ্যাসাগর বাণী ভবনে সাধারণ শিক্ষালাভ করতে পারতো। এরপর স্থানীয়দের প্রেরণ করা হতো বিদ্যালয়ের (এটিও লেডি অবলা বসুর কর্মোদ্যোগের অন্যতম নিদর্শন) শিক্ষিকা শিক্ষণ কেন্দ্রে প্রশিক্ষণের জন্য। বিদ্যাসাগর বাণীভবনে উদ্যোগে প্রাথমিক মাতৃভাষা শিক্ষা দানের জন্য ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে আরেকটি শিক্ষিকা শিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। প্রশিক্ষণের পর এখানকার শিক্ষার্থীরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়েও শিক্ষকতার সুযোগ পেতেন।[৫৪]

১৯২২ সালে ঝাড়গ্রামে বিদ্যাসাগর বাণী ভবন প্রতিষ্ঠার পর নারীশিক্ষা ও নারীর অর্থকরী ভূমিকার আত্মপ্রকাশের ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গৃহীত হয়। সেই সঙ্গে সরকারি আনুকূল্য লাভ করার ফলে এ জাতীয় শিক্ষা প্রসারের উদ্যোগ আরো পরিপুষ্ট হয়। এ সংগঠনের উদ্যোগে উৎসাহিত হয়ে ঝাড়গ্রামের মহারাজা নারী শিক্ষা সমিতিকে ২৫ বিঘা জমি ও ১০০০ টাকা অনুদান দেন, যার সাহায্যে ঝাড়গ্রামে বিধবা নারীদের বসবাসের জন্য একটি আশ্রম গড়ে তোলার ব্যবস্থা করা হয়। এই আবাসনে বিধবা নারীদের উদ্যানবিদ্যা, দুগ্ধ উৎপাদন ও চিনামাটির কাজের প্রশিক্ষণ দেয়া হতো। এভাবে এই নারী সংগঠনগুলো নারী উন্নয়নমূলক আলাপ-আলোচনা এবং বক্তৃতামালার সাথে সাথে প্রত্যক্ষ প্রশিক্ষণ ও ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে নারীর বাস্তব উন্নয়নের উদ্যোগ নিয়েছিল।[৫৫]

নারী শিক্ষা সমিতির মাধ্যমে লেডি অবলা বসু পাঠ্যপুস্তক রচনার কাজেও হাত দিয়েছিলেন। তাঁর সকল কর্ম পরিকল্পনা এগিয়ে নেয়ার পাশাপাশি -মা ও শিশুর স্বাস্থ্য সুরক্ষার কাজও তিনি পরিচালনা করতেন। বলার অপেক্ষা রাখে না, এতোগুলো প্রকল্পের-সমস্ত কাজই চলছিল প্রধানত তাঁরই উদ্যোগে। বস্তুত বিদুষী অবলা বসু দেহে মনেই ছিলেন একজন সংগ্রামী মানুষ। বসু বিজ্ঞান মন্দিরের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য অবলা বসু বিজ্ঞানী স্বামী জগদীশচন্দ্র বসুর মৃত্যুর পর তাঁর সঞ্চিত এক লক্ষ টাকা দিয়ে 'সিস্টার নিবেদিতা উইমেন্স

---

৫৪. সারদা ঘোষ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৩৪

৫৫. ঐ, পৃ. ২৩০-২৩২

এডুকেশন ফান্ড' প্রতিষ্ঠা করেন। এই ফান্ডের মাধ্যমে 'অ্যাডাল্টস প্রাইমারি এডুকেশন' নামে একটি প্রতিষ্ঠান তিনি গড়ে তুলেছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, সিস্টার নিবেদিতার সঙ্গে বসু পরিবারের সম্পর্ক ছিল খুবই ঘনিষ্ঠ। ১৯১১ সালে বসু পরিবারের দার্জিলিংয়ের বাড়িতেই সিস্টার নিবেদিতা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

সরোজনলিনী দত্ত নারী মঙ্গল সমিতিঃ সরোজনলিনী দত্ত নারী মঙ্গল সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ব্রিটিশ সরকারের উচ্চপদাধিকারী এবং বাংলার ব্রতচারী আন্দোলনের প্রাণপুরুষ গুরুসদয় দত্ত। স্ত্রী সরোজনলিনী দত্তের আকস্মিক মৃত্যুর পর ১৯২৫ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি তাঁর শ্রাদ্ধবাসরে কলকাতার প্রথিতযশা বুদ্ধিজীবীরা অংশ নিয়েছিলেন এবং সেখানে সরোজনলিনীর চিন্তা ও সাংগঠনিক পরিকল্পনা সম্পর্কে বিশদ আলোচনাও হয়েছিল। এদিনই তাঁর স্বামী গুরুসদয় দত্ত তাঁর স্মৃতিরক্ষার্থে ৫ হাজার টাকা অনুদান ঘোষণা করেন। তিনি তাঁর স্ত্রীর আদর্শের উপর ভিত্তি করে কলকাতায় একটি কেন্দ্রীয় মহিলা সমিতি এবং তার শাখা হিসাবে বাংলার জেলাসমূহেও অনুরূপ সংগঠন গড়ে তুলে নারী উন্নয়নমূলক এবং শিল্প প্রশিক্ষণের পরিকল্পনা রূপায়ণে উদ্যোগী হন। তাঁর এ প্রক্রিয়ায় সমর্থন জানিয়েছিলেন সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক সিআইই, রায় বাহাদুর এ সি বন্দ্যোপাধ্যায়, আর এন দে, ডা. এ এন মিত্র প্রমুখ। তাঁদের মধ্যকার আলাপ আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯২৫ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি সরোজনলিনী দত্ত নারী মঙ্গল সমিতি প্রতিষ্ঠা করা হয়।[৫৬] (G S Dutta, A Woman of India: Being the lif of Saroj Nalini, Oxford University Press, 1941, p. 122) সরোজনলিনী দত্ত নারী মঙ্গল সমিতির কেন্দ্রীয় দপ্তরের ঠিকানা ছিল ৪৫ নং বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা। এ সংগঠন গড়ে তোলার ব্যাপারে তৎকালীন বাংলার আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব সক্রিয় উদ্যোগ ও সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন বর্ধমানের মহারাণী, লেডি অবলা বসু, লেডি সিন্‌হা, কুমুদিনী বসু, শ্রীযুক্ত এস. আর. দাস, স্যার এ. কে. গজনবি, জাস্টিস স্যার এন. আর চট্টোপাধ্যায় এবং নবাব বাহাদুর সৈয়দ নবাব আলি চৌধুরী প্রমুখ। সরোজনলিনী দত্ত নারী মঙ্গল সমিতি এভাবে প্রথম থেকেই হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়েরই বুদ্ধিজীবী মহলের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন লাভ করতে পেরেছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে , আধুনিক দৃষ্টিকোণ থেকে একটি নারী সংগঠন বলতে যে ধরনের বৈশিষ্ট্য, কার্যাবলী, পরিকাঠামোকে বোঝায়, সেসমস্ত কিছুই ছিল সরোজনলিনী দত্ত নারী মঙ্গল সমিতিতে।

বিশ শতকের তৃতীয় দশকে বাংলার অন্যতম সুপরিকল্পিত ও সুগঠিত নারী সংগঠন হিসাবে সরোজনলিনী দত্ত নারী মঙ্গল সমিতি তার কার্যক্রম শুরু করে। গুরুসদয় দত্ত প্রথমে কলকাতা শহরে নারী মঙ্গল সমিতির অন্যতম অঙ্গ হিসাবে ১৯২৫ সালে এক শিল্প-শিক্ষা কেন্দ্র গড়ে তুলেন। জানা যায় যে, অন্তঃপুরচারিণী নারীদের এ প্রশিক্ষণমূলক কর্মসূচির সঙ্গে যুক্ত রাখার জন্য গুরুসদয় দত্ত স্বয়ং গাড়ি করে তাদের শিক্ষাকেন্দ্রে

৫৬. G S Dutta, *A Woman of India: Being the lif of Saroj Nalini*, Oxford University Press, 1941, p. 122

নিয়ে আসতেন। ১৯২৬ সালে এখানে সঙ্গীত শিক্ষার ক্লাসও শুরু হয়। সংগঠনটি পরিচালনায় প্রথম দিকে গুরুসদয় দত্তের সঙ্গে রায় বাহাদুর এ. সি. বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীমতি কুমুদিনী বসু যথেষ্ট সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন। ১৯২৫ সালের নভেম্বর মাসে সরোজনলিনী নারী মঙ্গল সমিতির মুখপত্র হিসাবে 'বঙ্গলক্ষ্মী' নামক মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। কুমুদিনী বসু, লতিকা বসু (ঘোষ), হেমলতা ঠাকুর, শান্তা দেবী প্রমুখ সংগঠন পরিচালনার পাশাপাশি এবং *বঙ্গলক্ষ্মী* পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেন।

গ্রাম বাংলায় নারীশিক্ষা ও নারীর আর্থিক স্বনির্ভরতার ভূমিকাকে গুরুত্ব দেয়ার জন্য সরোজনলিনী দত্ত নারী মঙ্গল সমিতির কেন্দ্রীয় সংগঠনের অধীনে সারা দেশে বেশ কিছু শাখা সংগঠন গড়ে ওঠেছিল। ১৯২৫ সালে যেখানে মাত্র সাতটি বা আটটি আঞ্চলিক মহিলা সমিতিসহ কেন্দ্রীয় সমিতি তার কর্মকাণ্ড শুরু করেছিল, মাত্র চার বছরে এ সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ২৫০ এ। ১৯৪০ সাল নাগাদ সরোজনলিনী দত্ত নারী মঙ্গল সমিতির অধীনে প্রায় ৪০০টি শাখা সমিতি ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে তাদের উন্নয়নমূলক কর্মসূচির সঙ্গে যুক্ত ছিল।[৫৭] সরোজনলিনী দত্ত নারী মঙ্গল সমিতির কেন্দ্রীয় ও শাখা সংগঠনগুলোর মূল উদ্দেশ্য ছিল নারীশিক্ষার প্রসার, নারীদের মধ্যে গার্হস্থ্যবিজ্ঞান এবং স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি, মাতৃ ও শিশু মঙ্গলের কর্মসূচি গ্রহণ এবং হস্তচালিত শিল্প প্রসারের উদ্যোগ গ্রহণ। নারীদের জীবনমুখী শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে আর্থিকভাবে স্বনির্ভর করার লক্ষ্যে সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি সরোজনলিনী দত্ত নারী মঙ্গল সমিতির উদ্যোগে নারীদের সেলাই এবং কাপড় কাটা, বয়ন, কার্পেট-বয়ন, সূচিকর্ম, উল বুনন, খেলনা তৈরি, স্পিনিং, অঙ্কন এবং পেইন্টিং, খোদাই এবং এনামেলিং, চামড়াজাত পণ্য তৈরি এবং বর্জ্য দ্রব্য থেকে শিল্পসামগ্রী প্রস্তুত ইত্যাদি বিষয়ে শিল্প প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য বয়স্ক শিক্ষার ক্লাস এবং বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয়ের উপর আলোচনা ও বক্তৃতা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হতো। গ্রামীণ স্তরে স্বাস্থ্যবিধি, পরিচ্ছন্নতা, খাদ্যদ্রব্যের গুরুত্ব, দুরারোগ্য ব্যাধির মোকাবিলা পদ্ধতি সম্বলিত মাতৃভাষায় লিখিত পুস্তিকা বিতরণ ও বক্তৃতা সভার আয়োজন করা হতো সমিতির পক্ষ থেকে। অন্যদিকে জেলা ও গ্রামসমূহে প্রসূতি সদন, শিশুমঙ্গল কেন্দ্র, ধাত্রীবিদ্যা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং নারী ও শিশুদের স্বাস্থ্যবিধি সংক্রান্ত ব্যবস্থা নানা কার্যক্রম পরিচালনা করা হতো। তদুপরি প্রতিটি গৃহে সবজি ও ফল উৎপাদনের ব্যবস্থা করা ও সদস্যদের এ কৃষিজাত ও শিল্পজাত দ্রব্যগুলোকে বাজারজাত করার ব্যবস্থা করাও সমিতির অন্যতম কর্মসূচি ছিল।[৫৮]

সরোজনলিনী দত্ত নারী মঙ্গল সমিতির কার্যাবলী যে সমকালীন বাংলায় নারীশিক্ষার প্রসার ও নারীর আত্মোন্নয়নে যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায় বিখ্যাত সব ব্যক্তিদের আলোচনায়।

---

৫৭. G S Dutta, *A Woman of India*, *op.cit*, p. 124

৫৮. Lotika Ghose, 'Social and Educational Movements for Women and by Women, 1820-1950', *op.cit*, p. 155

১৯২৮ সালের ২৪ আগস্ট বাংলার গভর্নরের পত্নী মিসেস জ্যাকসন সরোজনলিনী কেন্দ্রীয় সমিতিতে শ্রীমতী দত্তের চিত্রের আবরণ উন্মোচনের সময় সমিতির কার্যাবলীর প্রশংসা করে বলেছিলেন, " ... during our late tour through Eastern Bengal I had the opportunity of visiting several Mahila Samitis and know how much these Institutes are appreciated."[৫৯] শুধু মিসেস জ্যাকসন নয়, নারীশিক্ষা এবং নারীজাতির সার্বিক উন্নতি বিধানে সমিতির কার্যক্রমের প্রশংসা করেছিলেন কলকাতার বিশপ ফিসার, লেডি জে ডব্লিউ রাবার্টসন (*The Story of the Women's Institute Movement in England* গ্রন্থের প্রণেতা), ইংল্যান্ডের National Federation of Women's Institute এর মুখ্যসচিব নিউজেন্ট হ্যারিস এবং মিসেস ডেনম্যান প্রমুখ।[৬০] *লন্ডন টাইমস*- এ ১৯২৯ সালেল ২৬ জানুয়ারি ও ২ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত দুটি বিশেষ প্রবন্ধে সরোজনলিনী দত্ত নারী মঙ্গল সমিতির সামাজিক ও শিক্ষামূলক কার্যাবলীর বিশেষ প্রশংসা করা হয়। এ প্রসঙ্গে ১৯২৯ সালের ১ জানুয়ারি *Agricultural Journal of India*, Volume 24. Part I -এ Marie E. H. Makie এর লেখা একটি প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃত করা যেতে পারে। তিনি লিখেছেন:

> The Samitis have made the lives of the women of Bengal happier, more hopeful and more useful than it was three years ago. A new social life has made its appearance and meetings, lectures, classes, study-groups, domestic and cottage industries have come to form so important a part of every Mahila Samiti that a Mahila Samiti can be truly described as a real educational centre for the rebuilding of national life.[৬১]

সরোজনলিনী দত্ত নারী মঙ্গল সমিতির কেন্দ্রীয় সংগঠনের মূল দায়িত্ব ছিল বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে এবং ভারতের অন্যান্য প্রদেশে অনুরূপ মতাদর্শে বিশ্বাসী নারী সংগঠন গঠনের জন্য প্রচার চালানো, বিভিন্ন মহিলা সমিতির কার্যাবলী পর্যবেক্ষণ করা ও তাদের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করা, বিভিন্ন শাখা সমিতিতে প্রশিক্ষিত মহিলা কারিগরী শিক্ষিকা প্রেরণের ব্যবস্থা করা, *বঙ্গলক্ষ্মী* পত্রিকার প্রকাশনার নিয়মিত ব্যবস্থা করা, কলকাতার মহিলা শিল্প-শিক্ষা কেন্দ্রের বিকাশের ব্যবস্থা করা এবং নারীশিক্ষার উপযোগী বক্তৃতার আয়োজন করা।

সরোজনলিনী দত্ত নারী মঙ্গল সমিতির একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিল সরোজনলিনী শিল্পশিক্ষা বিদ্যালয়। এটি স্থাপিত হয়েছিল ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে এবং এর প্রাথমিক ছাত্রীসংখ্যা ছিল মাত্র ৭ জন। তবে পরবর্তীতে এর ছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। সমিতির অন্যতম কর্মী লতিকা ঘোষ ১৯২৫ থেকে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত সময়কালে বিভিন্ন বছরে এর ছাত্রী সংখ্যা কত ছিল তার বিবরণ দিয়েছে।[৬২] এতে মূলত বয়স্কা নারীদের কারিগরি শিক্ষাদানের

---

৫৯. G S Dutta, A Woman of India, *op.cit,* p.136

৬০. *Ibid*

৬১. Marie E. H. Makie, *Agricultural Journal of India*, Volume 24. Part I, January, 1929

৬২. দ্রষ্টব্য Lotika Ghose, 'Social and Educational Movements for Women and by Women, 1820-1950', *op.cit,* p. 156

ব্যবস্থা করা হতো। এ শিল্প বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য ছিল কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত নারী শিক্ষিকা গড়ে তুলে তাদের প্রাদেশিক সমিতিমূহে প্রেরণ করা, গ্রামাঞ্চল এবং কলকাতায় বিধবা এবং অসহায় নারীদের শিল্প-শিক্ষার প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের অর্থ উপার্জনের উপযোগী করে তোলা। সমিতির এ শিল্প শিক্ষা কেন্দ্রটি যে, যথেষ্ট সক্রিয়ভাবে কাজ করতো লতিকা ঘোষের বর্ণনা থেকে তা জানা যায়।[৬৩]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের চরম সংকটময় সময় এবং স্বাধীনতা লাভের প্রাক্-মুহূর্তের বিশৃঙ্খলার সময়কে বাদ দিলে এই শিল্প-শিক্ষা কেন্দ্র থেকে নারীদের নিয়মিত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ ও উত্তীর্ণ হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। এখানে মূলত সেলাই, কাটাই, সূচিশিল্প, লেশ তৈরি, সুতো কাটা, দড়ি প্রস্তুত, ঝুড়ি বানানো, চিত্রণ, অঙ্কন ও সাধারণ শিক্ষার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হতো। এছাড়া ধর্মীয় ও নৈতিক মূল্যবোধ ও সঙ্গীতচর্চার প্রশিক্ষণও ছিল এর অন্যতম কর্মসূচি। কেন্দ্রীয় শিল্প-শিক্ষা বিদ্যালয়টি Director of Public Instruction, Director of Industries এবং তৎকালীন বড়লাটের পত্নীর সমর্থন লাভ করেছিল। ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে হিসাব অনুযায়ী এ শিল্প-শিক্ষাকেন্দ্রের সঙ্গে প্রায় ৪০০ জন মহিলা যুক্ত ছিলেন।[৬৪] আঞ্চলিক মহিলা সমিতিগুলো এই শিল্প-শিক্ষার প্রশিক্ষণ লাভ করার সাথে সাথে জনস্বাস্থ্য বিস্তার, প্রাথমিক চিকিৎসা ও সেবার আদর্শকে প্রচার করার ব্যাপারেও দায়বদ্ধ ছিল। বাঁকুড়ায় নারী মঙ্গল সমিতির উদ্যোগে একটি প্রসূতি কেন্দ্রও প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। শাখা-সমিতিগুলো নারীদের কুটির শিল্প ও হস্তনির্মিত দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য প্রদর্শনী ও মেলার আয়োজন করতো। এছাড়া শিক্ষয়িত্রীরা বা শিক্ষিত নারীরা বয়স্কা নারীদের নিয়মিত শিক্ষাদান এবং তাদের জ্ঞান বিস্তারের জন্য সাংস্কৃতিক বিষয় ও স্বাস্থ্যমূলক বিষয় নিয়ে বক্তৃতারও আয়োজন করা হতো। নারীদের আত্মচেতনা বৃদ্ধি ও আত্মবিশ্বাস সৃষ্টির জন্য শাখা- সমিতিগুলো প্রয়োজনে নাট্যাভিনয়েরও ব্যবস্থা করতো।

পুনশ্চ উল্লেখ্য যে, সরোজনলিনী দত্ত নারী মঙ্গল সমিতির অন্যতম লক্ষ্য ছিল নারীশিক্ষার বিস্তার ঘটানো এবং বালিকাদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে অনেক বেশি পরিমাণে যুক্ত রাখা। এজন্য শাখা-সমিতিসমূহে বালিকা বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল, যেখানে বিনামূল্যে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিল। স্বাধীনতার পূর্ব পর্যন্ত সরোজনলিনী দত্ত নারী মঙ্গল সমিতি বারাসত, যশোর, হুগলি, বাঁকুরা, মাড়গ্রাম, বালী, দাসোরা, টালা, নিমতা, জালালপুর ও ব্রহ্মরন্ধ্রয়া অঞ্চলে তাদের শাখা সংগঠন গড়ে তুলেছিল। বারাসত মহিলা সমিতিতে সদস্য সংখ্যা ছিল ৪০ জন। এখানকার শিল্প-শিক্ষা কেন্দ্রে সেলাই-কাটাই, সুতো কাটা, পৈতে প্রস্তুত, আসন প্রস্তুত, মাটির মূর্তি গঠন, চাটনি ও প্রচলিত খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করা হতো। এর ফলে প্রায় ১৫টি পরিবারের অন্ন সংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছিল। দরিদ্র নারীদের পোশাক প্রস্তুতের প্রশিক্ষণ দেয়া হতো। জনৈকা শ্রীমতী হরিদাসী দেবীর নেতৃত্বে ১২ জন নারীকে নিয়ে গড়ে উঠেছিল বয়স্কা শিক্ষাকেন্দ্র। এখানে সঙ্গীত শিক্ষাও দেয়া হতো। এ

৬৩. Lotika Ghose, ‘Social and Educational Movements for Women and by Women, 1820-1950’, *op.cit,* p. 156

৬৪. G S Dutta, *A Woman of India, op.cit,* p. 127

সমিতির অন্তর্গত বালিকা বিদ্যালয়ে ৭০ জন বালিকা পাঠ গ্রহণ করতেন। শিবগঞ্জ মহিলা সমিতির উদ্যোগে পরিচালিত সরোজনলিনী বালিকা বিদ্যালয়ে গড়ে ৭০ জন বালিকার শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।[৬৫]

যশোরে সরোজনলিনী নারী মঙ্গল সমিতির শাখার ব্যবস্থাপনায় একটি বয়স্কা শিক্ষা কেন্দ্র পরিচালনা করা হতো। সমিতির উদ্যোগে যশোরের শহর ও মফস্বল এলাকায় তিনটি শিল্প-শিক্ষা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। প্রতি মাসে সমিতির সদস্যরা মিলিত হতেন এবং সেখানে স্বাস্থ্য, নারী ও শিশু মঙ্গল, নারীশিক্ষা, পারিবারিক অর্থনীতির প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতেন। এ সংগঠনে লতিকা মুখোপাধ্যায় নারীশিক্ষার উপর একাধিক বক্তৃতা দিয়েছিলেন। সংগঠনের আওতায় একটি ধাত্রীবিদ্যা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রও পরিচালিত হতো। হুগলির মহিলা সমিতিতে জেলা প্রশাসক, জেলা জজ ও সিভিল সার্জেনের মতো সরকারি উচ্চপদস্থ আমলাদের স্ত্রী এবং পরিবারের মহিলারা যুক্ত ছিলেন। এ শাখা সমিতিটির উদ্যোগেও নারীশিক্ষা ও নারীদের জন্য বিভিন্ন ধরনের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

বাংলার বিভিন্ন জেলাভিত্তিক সমিতির সাথে সরোজনলিনী দত্ত নারী মঙ্গল সমিতির কেন্দ্রীয় সংগঠন নিরন্তর সংযোগ বজায় রাখতো। এ সংগঠনটি হিন্দু সমাজের রক্ষণশীলতার ভিত্তিমূলে নাড়া দিতে পেরেছিল। মালদা মহিলা সমিতির সম্পাদিকা শ্রীমতী ইন্দিরা ঘোষের একটি বক্তব্য এ প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য। ইন্দিরা দেবীর ভাষ্য মতে, প্রাথমিক পর্বে সমিতি সম্পর্কে পুরুষ সমাজের মধ্যে যথেষ্ট সন্দেহ ও দ্বিধাগ্রস্ততা ছিল। তারা আশঙ্কা করেছিলেন যে, পরিবারের নারীরা সংগঠনে যুক্ত হলে গৃহস্থলীর দায়দায়িত্বে অবহেলা করবেন। কিন্তু সমিতির সদস্যরা তাঁদের কর্মদক্ষতা, ধৈর্য, আত্মবিশ্বাস ও সেবামূলক মনোভাব দিয়ে এ সন্দেহ দূর করতে সক্ষম হয়েছেন যে সমিতি নারীদের আত্মপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে গড়ে ওঠা কোনো বৈপ্লবিক উদ্যোগ নয়। এমনকি ধর্মীয় বা সামাজিক রীতিনীতির বেড়াজালকে অতিক্রম করাও তাঁদের লক্ষ্য নয়। বরং এ সংগঠন হলো একটি শিক্ষামূলক সংগঠন যেখানে শিক্ষা, বিজ্ঞানসম্মত পরিবেশ ও স্বাস্থ্য সচেতনতা, শিল্পভিত্তিক প্রশিক্ষণের পাশাপাশি নারীদের মধ্যে সাধারণ সামাজিক মেলামেশা ও সামাজিক উন্নয়নের আদর্শকে বাস্তবায়িত করার চেষ্টা চলেছে।[৬৬] এজন্যই এ সংগঠনটি রক্ষণশীল গ্রামীণ পুরুষ সমাজের কাছ থেকেও বড় প্রতিরোধের মুখে কখনও পড়েনি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, গ্রামীণ নারীদের মধ্যে এর পূর্বে কোনো শহুরে নারী সংগঠনই এত সুসংহতভাবে অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা বা শিক্ষা বিস্তারের ব্যাপারে কাজ করেনি। এক্ষেত্রে সরোজনলিনী নারী মঙ্গল সমিতির উদ্যোগ অবশ্যই বিশেষভাবে প্রশংসার দাবিদার। এ সংগঠন নারীদের জন্য যৌথ উদ্যোগে উপার্জনের ও শিক্ষার প্রসার ঘটাবার যে উদ্যোগ নিয়েছিল, তার মধ্যে দিয়ে অন্যতরভাবে নারীচেতনার বিকাশ সম্ভব হয়েছিল। গুরুসদয় দত্তের উদ্যোগে কেন্দ্রীয় মহিলা সংগঠনের অন্তর্গত শিক্ষিকা শিক্ষণ কেন্দ্রটি

---

৬৫. সারদা ঘোষ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৮২

৬৬. G S Dutta, *A Woman of India, op.ci* , p. 135

সরকারের অনুমোদন লাভের পর সিনিয়র টিচার্স ট্রেনিং কলেজে পরিণত হয়েছিল। ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে গুরুসদয় দত্তের অনুদানের ভিত্তিতেই সংগঠনের একটি কেন্দ্রীয় ভবন নির্মিত হয়। পরবর্তীতে কেন্দ্রীয় ভবনে শিল্প-শিক্ষা বিদ্যালয়, শিক্ষিকা শিক্ষণ কেন্দ্র ছাড়াও বিনামূল্যে দরিদ্র মানুষদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা কেন্দ্র, মেয়েদের জন্য condenesed course, বিমুক্ত শিক্ষাকেন্দ্র, বয়স্কা শিক্ষাকেন্দ্র, দৃষ্টিহীন ছেলেমেয়েদের জন্য শিক্ষাকেন্দ্র পরিচালিত হয়।[৬৭] সরোজনলিনী দত্ত নারী মঙ্গল সমিতিটি পরিচালিত হতো মূলত সাধারণ মানুষদের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত অর্থ, সদস্যদের চাঁদা এবং সামান্য সরকারি অনুদানে। সরোজনলিনী দত্ত নারী মঙ্গল সমিতি বাংলা ছাড়াও আসাম, বিহার, উড়িষ্যা ও যুক্তপ্রদেশেও বিস্তৃত হয়েছিল।

নারী রক্ষা সমিতি: 'নারী রক্ষা সমিতি' ছিল ১৯২৪ সালে প্রতিষ্ঠিত একটি নারী সংগঠন। বলপূর্বক বেশ্যাবৃত্তিতে যেসব নারীদের নিযুক্ত করা হতো, তাদের অনেককেই ব্রাহ্ম নেতারা সুস্থ সামাজিক জীবনে পরিচিতি দানের জন্য নিজেদের গৃহে আশ্রয় দিতেন। তাঁদের এ চিন্তা- চেতনার বিষয়টিকে বাস্তব ও সাংগঠনিক রূপ দেয়ার জন্য ১৯২৪ সালে কৃষ্ণকুমার মিত্রের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠা করা হয় 'নারী রক্ষা সমিতি'। সামাজিক অপরাধ, বলপূর্বক বেশ্যাবৃত্তি ও ধর্ষণের শিকার হয়ে যেসব নারী সমাজে অবহেলা ও সমালোচনার শিকার হয় এবং যাদের পক্ষে অন্যায়ের প্রতিকার ও প্রতিবিধান করার কোনো সুযোগ ছিল না, মূলত তাদের সাহায্যার্থেই এই সংগঠনটি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। সংগঠনটি নারীদের উপর সংঘটিত উপরের তিনটি অপরাধের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের উপযুক্ত আইনি শাস্তিদান করার চেষ্টা করতো। তাছাড়া নারীদের প্রতি অপরাধ প্রবণতাকে প্রশমিত করতে সংগঠনটির পক্ষ থেকে নিরন্তর প্রচার কার্য পরিচালনা করা হতো। সর্বোপরি নির্যাতিতা নারীও তার পরিবারের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করার পাশাপাশি এ সংগঠনের উদ্যোগে নারীদের সাধারণ শিক্ষা ও অর্থকরী শিল্পশিক্ষার প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের উপার্জনাক্ষম করার ব্যবস্থা নেয়া হতো।[৬৮]

যদিও নারী রক্ষা সমিতি গড়ে ওঠেছিল পুরুষ সমাজ সংস্কারকদের উদ্যোগে, কিন্তু নারী স্বার্থসংরক্ষণের ব্যাপারে এ সংগঠনটি যে উদ্যোগ নিয়েছিল, বাঙালি নারীদের মুক্তি এবং তাদের চিন্তা ও চেতনার বিকাশের ইতিহাসে তার ভূমিকা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ।

বেঙ্গল উইমেন্স এডুকেশনাল লীগ: বেঙ্গল উইমেন্স এডুকেশনাল লীগ (Bengal Women's Educational League) নামক সংগঠনটি ছিল ১৯২৭ সালের ১৬ থেকে ১৯ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় অনুষ্ঠিত বেঙ্গল উইমেনস এডুকেশনাল কনফারেন্সের ফল। এসোসিয়েশন অফ ব্রিটিশ ইউনিভার্সিটি উইমেন ইন ইন্ডিয়া এর উদ্যোগে গঠিত একটি উপকমিটির সুপারিশ অনুযায়ী নারীশিক্ষা বিষয়ে গঠনমূলক কর্মসূচি প্রণয়নসহ বিদ্যমান ব্যবস্থার

---

৬৭. সারদা ঘোষ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৮৯

৬৮. Lotika Ghose, 'Social and Educational Movements for Women and by Women, 1820-1950', *op.cit*, p. 139

পর্যালোচনা করার উদ্দেশ্যে কলকাতায় একটি সম্মেলন আহ্বানের উদ্যোগ নেয়। এ ব্যাপারে তৎকালীন বাংলা সরকারের শিক্ষা সচিবের স্ত্রী মিসেস লিন্ডসে তাদেরকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করেন। সম্মেলনের আহ্বায়ক কমিটির সদস্যরা ছিলেন বেথুন কলেজের অধ্যক্ষ মিস জি.এন. রাইট, লেডি জে.সি. বোস, মিসেস পি.কে. রায়, মিসেস রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন, মিসেস পি. চৌধুরী, মিস সি. সোরাবজি, মিসেস বিএল মিটার, মিসেস ব্যানার্জি, মিস হৃদয়বালা বোস, স্কুলের পরিদর্শক, প্রেসিডেন্সি বিভাগ এবং বর্ধমান, মিস এন. ঘোষ, বেগম সাকিনা মুওয়াইয়িদজাদা, সরোজ নলিনী দত্ত মেমোরিয়াল এসোসিয়েশনের তৎকালীন সেক্রেটারি, মিসেস মেহতা, ডায়োসেসান কলেজের অধ্যক্ষ সিস্টার ক্যারোলিন এলিজাবেথ, মিস থিওডোরা রাইট, মিস হগ, মিস রিভেট, মিস টেলর, মিস প্লাম্ব, এবং মিসেস লিন্ডসে। শেষোক্ত মিসেস লিন্ডসে সম্মেলন আয়োজক কমিটির সচিব ছিলেন। ১৯২৭ সালের ১৬-১৯ ফেব্রুয়ারি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে নারীশিক্ষার বিভিন্ন প্রসঙ্গ ছাড়াও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সহায়ক কর্যক্রমের উপর ১০টি প্রবন্ধ উপস্থাপিত হয়। এ সম্মেলনে বক্তা এবং সভাপতি হিসেবে নারীশিক্ষার প্রবক্তা ও অগ্রণী হিসেবে পরিচিত সরলা রায়, রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন, বেগম সাকিনা মুওয়াইয়িদজাদা, সরলাদেবী চৌধুরাণী এবং রেনুকা রায় প্রমুখ বাঙালি নারীদের সাথে বেশ কয়েকজন ব্রিটিশ নারীও উপস্থিত ছিলেন।

উপর্যুক্ত সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসারে 'বেঙ্গল উইমেন্স এডুকেশনাল লীগ' প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং ১৯২৭ সাল থেকে প্রতিবছর এর বার্ষিক সম্মেলন আয়োজন করা হয়। মফস্বল এবং কলকাতা শহরের নারীশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণ যেন লীগের অধিবেশনে যোগদান করতে পারে সে জন্য সরকারের কাছ থেকে স্থায়ী অনুমতি নেয়া হয়। বেঙ্গল উইমেন্স এডুকেশনাল লীগের বার্ষিক সম্মেলনসমূহে নারীশিক্ষা বিষয়ে কেবল গবেষণাপত্রই পড়া হতো না, বরং বিভিন্ন শিক্ষাগত সমস্যা নিয়ে প্রাণবন্ত আলোচনা করা হতো। শুধু বার্ষিক সম্মেলন নয়, বরং বছরব্যাপী বিভিন্ন লীগের উদ্যোগে শিক্ষামূলক বক্তৃতাও আয়োজন করা হতো।

নারীশিক্ষা প্রসঙ্গে লীগের কার্যক্রম মূলত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার সাথে সম্পর্কিত ছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বেঙ্গল উইমেনস এডুকেশন লীগই একমাত্র নারী সংগঠন ছিল, যেটি সরকারের স্বীকৃতি অর্জন করেছিল। এ সংগঠনটি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের নারীশিক্ষা বিষয়ে সরকারকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ এবং মতামত দিতে পারতো। লতিকা ঘোষ মন্তব্য করেছেন যে,

> By restricting itself to education and not allowing itself to be deviated from it, it has been able to do solid work in its own line, quietly and steadily. On all questions relating to girls' education the League is consulted by Government.[৬৯]

---

৬৯. Lotika Ghose, 'Social and Educational Movements for Women and by Women, 1820-1950', *op.cit*, p. 158

অল বেঙ্গল উইমেন্স ইউনিয়নঃ বাঙালি নারীদের কল্যাণে নিয়োজিত আরেকটি নারী সংগঠন ছিল 'অল বেঙ্গল উইমেন্স ইউনিয়ন' (All Bengal Women's Union)। সংগঠনটি নারী কল্যাণে নানামুখী কর্ম তৎপরতার সাথে নারীশিক্ষার প্রসারেও ভূমিকা রাখে। বিশেষ করে অসহায় দরিদ্র নারীদের বৃত্তিমূলক শিক্ষার মাধ্যমে স্বাবলম্বী করার কর্মসূচি নিয়েছিল সংগঠনটি। সংগঠনটির ১৯৩৩-৩৪ সালের রিপোর্ট দেখায় যে, এটি ১৯৩৩ সালে 'অল-বেঙ্গল উইমেনস ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইনস্টিটিউট' নামে দমদমে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছিল। একজন নারী সুপারিনটেনডেন্টের তত্ত্বাবধানে এখানে মেয়েদের সাধারণ শিক্ষা প্রদানের পাশাপাশি সূচিকর্ম, মিষ্টি ও আচার তৈরি, বাগান করা এবং বুনন ইত্যাদি প্রশিক্ষণ দেয়া হতো। প্রশিক্ষকগণ মেয়েদের ঝুড়ি তৈরি, মৃৎশিল্পের কাজ, বই বাঁধাই এবং স্ট্যাম্পযুক্ত চামড়ার কাজও শেখাতেন।[৭০]

অল বেঙ্গল উইমেন্স ইউনিয়ন সমমনা অন্যান্য নারী সংগঠনের সাথে যৌথভাবেও কাজ করতো। ইউনিয়ন পরিচালিত পূর্বোক্ত প্রতিষ্ঠানের কয়েকজন শিক্ষার্থী চিত্তরঞ্জন সেবা সদন থেকে নার্সিং প্রশিক্ষণ, সরোজনলিনী দত্ত মেমোরিয়াল স্কুলে শিক্ষক প্রশিক্ষণ এবং নারীশিক্ষা সমিতির বিদ্যাসাগর বাণী ভবনে শিল্প প্রশিক্ষণ নিয়েছিল। ইউনিয়নের অর্থে শিশু বিদ্যাপীঠে একজন ছাত্রীর পড়াশুনা করারও তথ্য পাওয়া যায়।[৭১] অল বেঙ্গল উইমেন্স ইউনিয়ন তাদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত প্রতিষ্ঠানের মেয়েদের চিত্তবিনোদনের জন্য ভ্রমণের ব্যবস্থা করাসহ ধর্মীয় উৎসবাদিতে অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করতো। এখান থেকে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত নারীদের ইউনিয়নের উদ্যোগে বিভিন্ন সম্মানজনক পেশায় পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হতো।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় অল বেঙ্গল উইমেন্স ইউনিয়ন কিছুটা ব্যাহত হয়। তাদের পরিচালিত অল-বেঙ্গল উইমেনস ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইনস্টিটিউটটি বন্ধ হয়ে যায়। অনেক প্রচেষ্টার পর ১৯৪৪ সালে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইনস্টিটিউটটি পুনরায় চালু করা সম্ভব হয়। এতে মেয়েদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা এবং বৃত্তিমূলক কাজের প্রশিক্ষণ আবার শুরু হয়। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পূর্বে ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গ ইত্যাদি কারণে বিপন্ন দশায় পতিত নারীদের কল্যাণে উইমেন্স ইউনিয়ন তার কার্যক্রম জোরদার করে। এ সময় ইউনিয়নের তত্ত্বাবধানে পিরচালি একটি হোমে শতাধিক নারী ও শিশু আশ্রয় লাভ করে। এখানকার প্রশিক্ষণ বিভাগ থেকে নারীদের সেলাই ও সূচিকর্ম, তাঁত, চরকা, হোম-নার্সিং, রান্না, গৃহস্থালির কাজ, বাগান পরিচর্যা, শিশুদের পরিচর্যা, এবং টিকাদান ইত্যাদি প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। ইউনিয়ন একাজ পরিচালনার জন্য সরকারের শিল্প মন্ত্রণালয় থেকে কিছু আর্থিক অনুদানও পেতো

৭০. Lotika Ghose, 'Social and Educational Movements for Women and by Women, 1820-1950', *op.cit*, p. 165
৭১. Lotika Ghose, 'Social and Educational Movements for Women and by Women, 1820-1950', *op.cit*, p. 165

দীপালি সংঘ, লীলা নাগ ও নারীশিক্ষা: বাংলায় নারী শিক্ষার ইতিহাসে লীলা নাগ (১৯০০-১৯৭০ খ্রি.) -এর নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। তিনি ছিলেন একজন সাংবাদিক, জনহিতৈষী এবং রাজনৈতিক আন্দোলনে সক্রিয় বিপ্লবী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ছাত্রী, পূর্ব বাংলার নারীশিক্ষা ও নারী আন্দোলনের পথিকৃৎ।[৭২] লীলা নাগের প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয়েছিল বিহারের দেওঘরে। পরে তিনি কলকাতার একটি ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করেন। ১৯১১-১৭ সাল পর্যন্ত তিনি ঢাকার ইডেন স্কুলে পড়াশুনা করেন এবং এখান থেকেই প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি কলকাতার বেথুন কলেজ থেকে ১৯১৯ সালে আইএ এবং ১৯২১ সালে বিএ পাশ করেন। বিএ পরীক্ষায় তিনি মেয়েদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে 'পদ্মাবতী স্বর্ণপদক' লাভ করেন। ১৯২১ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি বিষয়ে এমএ শ্রেণি ভর্তি হন এবং ১৯২৩ সালে তিনি দ্বিতীয় বিভাগে এমএ ডিগ্রি লাভ করেন। লীলা নাগই ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম এমএ ডিগ্রিধারী নারী শিক্ষার্থী।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে এমএ পাস করার পর লীলা নাগ উচ্চ বেতনে চাকুরি লাভের মাধ্যমে নিশ্চিত ভবিষ্যতের পানে না গিয়ে দেশ ও মানব কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত করেন। তাঁর জীবনের অন্যতম লক্ষ্য ছিল 'নারীজাগরণ ও মাতৃভূমির স্বাধীনতা' অর্জন। তিনি সুখি সুন্দর ব্যক্তিগত জীবনযাপনের চেয়ে নারীমুক্তি ও স্বদেশের স্বাধীনতা অর্জন করে সবাইকে নিয়ে শান্তিতে ও সম্মানে বাস করাকে মুখ্য হিসেবে বিবেচনা করেন। এক্ষেত্রে ব্যক্তি প্রচেষ্টায় লক্ষ্যপূরণ কঠিন হবে বিধায় তিনি সাংগঠনিক উদ্যোগ গ্রহণ করেন। লীলা নাগ পশ্চাদপদ বাঙালি নারী সমাজকে সচেতন ও জাগরণের মন্ত্রে উদ্দীপ্ত করার লক্ষ্য নিয়ে মাত্র ১২ জন সমমনা সঙ্গীকে সাথে করে ১৯২৩ সালের ডিসেম্বর মাসে গঠন করেন 'দীপালি সংঘ' নামক একটি সংগঠন। লীলা নাগ ও সুষমা সেনগুপ্ত যুগ্মভাবে এ সংগঠনের সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন।[৭৩] বকশীবাজারস্থ লীলা নাগের পৈত্রিক বাড়িতেই দীপালি সংঘের কার্যক্রম শুরু হয়। দীপালি সংঘ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য সম্পর্কে ১৯২৬ সালে লীলা নাগ লেখেন, "জ্ঞান, ধর্ম ও আনন্দহীন নারী সমাজকে জ্ঞানে ও কর্মে প্রতিষ্ঠা করিয়া, সজীব-সতেজ ও আনন্দময় জীবন গঠন করিতে সহায়তা করিবে–এই রূপ মহৎ উদ্দেশ্য লইয়া ৩ বৎসর পূর্বে

৭২. লীলা নাগ আসামের গোয়ালপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা গিরীশচন্দ্র নাগ ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। তাঁর মায়ের নাম কুঞ্জলতা দেবী চৌধুরী। লীলা নাগের পিতৃ-পরিবার ছিল তৎকালীন সিলেটের অন্যতম সংস্কৃতমনা ও শিক্ষিত একটি পরিবার। লীলা নাগ ১৯৩৯ সালের ১৩ মে বিপ্লবী অনিল রায়ের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। বিবাহের পরে তিনি লীলা রায় নামে সমধিক পরিচিতি লাভ করেন। লীলা নাগ সম্পর্কে বিস্তারিত দ্রষ্টব্য, দীপংকর মোহান্ত, *লীলা নাগ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৯; অজয় রায়, সম্পা. লীলা নাগ, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৭১।

৭৩. দীপালি সংঘের প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের অন্যরা ছিলেন: কলকাতার ঠাকুর পরিবারের এলা রায়, ঢাকার ব্যারিস্টার পি. কে. বসুর দুই কন্যা কমলা বসু ও মনোরমা বসু, ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম আচার্য ডা. নেপাল রায়ের দুই কন্যা লতিকা রায় ও লীলা রায়, সিলেটের মুরারীচাঁদ কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ অপূর্বচন্দ্র দত্তের কন্যা বীণা দত্ত এবং লীলা নাগের আজীবন শুভাকাঙ্ক্ষী ও সুহৃদ অমলচন্দ্র বসুর সহধর্মিনী শ্রীমতী সরোজ বসু প্রমুখ। প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের বাইরেও আরো অনেকেই এর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। এদের মধ্যে ডা. সুরেশচন্দ্রের কন্যা গিরিবালা গুপ্ত, বিভামতী সেন এবং ঊষা রাণীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সাগরিকা ঘোষ, 'দিপালী সংঘ- নারী সংগঠন থেকে বিপ্লবী সংগঠন', অজয় রায়, (সম্পা.), *লীলা নাগ*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ১৯১৭, পৃ. ৫১-৫৪)

১২জন বন্ধু মিলিত হইয়া" 'দীপালি সংঘে'র সৃষ্টি হয়।[৭৪] সংঘটি প্রতিষ্ঠার মূলে লীলা নাগের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য থাকলেও প্রথম দিকে নারী সমাজের সচেতনতা ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি ও প্রয়োজনীয় মানসিকতা গঠনে নানাবিদ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। নারীদের বিকাশশীল জীবনের পক্ষে সহায়ক ও অগ্রযাত্রার কর্মীরূপে গড়ে তুলতে দিপালী সংঘের পরিকল্পিত কার্যাবলী ছিল নিম্নরূপঃ ১. কুটির শিল্পশিক্ষা, ২. স্বাস্থ্য শিক্ষা, ৩. শিশু পালন ও পরিচর্যা, ৪. বই/পত্রিকা দলগত পাঠ, ৫. বয়স্ক শিক্ষা, ৬. শিশু শিক্ষা, ৭. আমোদ-প্রমোদ-চিত্তবিনোদন, ৮. খেলাধুলা, ৯. মহিলা পাঠাগার স্থাপন, ১০. ব্যায়াম শিক্ষা, ১১. সঙ্গীত শিক্ষা, ১২. অভিনয় শিক্ষা, ১৩. সমস্যামূলক রাজনৈতিক বিষয়ে ক্লাস। এছাড়াও নানা সেবামূলক কাজও এর অন্তর্ভুক্ত ছিল।

লীলা নাগ 'দীপালি সংঘের' শিক্ষিত মেয়েদের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ করেন। সংঘের মহিলাদের আরও কাজ ছিল বৃক্ষরোপণ, সবজি চাষ, তুলা উৎপাদন এবং প্রতিদিন কোনো না কোনো কল্যাণমুখী কাজ সম্পন্ন করা- যেমন, বয়স্ক নারীদের সাক্ষরতায় উদ্বুদ্ধকরণ, মেয়েদের স্কুলে পাঠানো, বাল্যবিবাহ রোধ, অস্পৃশ্যতা দূর ইত্যাদি। পারস্পরিক বন্ধনে নিবিড় ঐক্যের লক্ষ্যে সদস্যদের সাপ্তাহিক ও মাসিক সভায় উপস্থিতি ছিল আবশ্যক। প্রতিবছর বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ দ্বারা নানা বিষয়ে বক্তৃতা-সভা আহ্বান করা হতো। দীপালি সংঘের আহুত সভায় বক্তাগণের মধ্যে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত সরোজিনী নাইডু প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নাম রয়েছে।[৭৫]

দীপালি সংঘের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম ছিল নারীশিক্ষার প্রসার। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বিশ শতকে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ক্রমধারায় পূর্ব বাংলার ঢাকাতেও নারীশিক্ষার প্রসারে বিদ্যায়তনিক গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগেও নারীশিক্ষা প্রসারের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে। স্বদেশি যুগে বিপ্লবী রাজনৈতিক দল 'অনুশীলন' ও 'যুগান্তর' নারীশিক্ষার প্রসারে আগ্রহ দেখায়। তবে সে সময় বাস্তবে ইডেন স্কুল ছাড়া ঢাকায় মেয়েদের শিক্ষার জন্য উল্লেখযোগ্য কোনো স্কুল ছিল না। সোনিয়া নিশাত আমিন লিখেছেন, ইডেন স্কুলকে "তারা ব্রিটিশ স্বার্থান্বেষী স্কুল বলেই বিবেচনা কররতন। জাতীয়তাবাদী হিন্দু ব্রাহ্ম মধ্যবিত্ত পরিবার তাদের মেয়েদের ইডেনে দিতে কুণ্ঠাবোধ করত।"[৭৬] এ অবস্থায় লীলা নাগ তাঁর দীপালি সংঘের মাধ্যমে নারীশিক্ষা প্রসারে ব্রতী হন। ১৯২৮ সালের মধ্যে তিনি সংঘের উদ্যোগে ঢাকায় চারটি উচ্চবালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। প্রবাসী পত্রিকার একটি প্রতিবেদন মতে,

> দীপালি স্থাপনের সময় লীলাবতী দেখেন, উচ্চশিক্ষা লাভার্থিনী মেয়েদের মধ্যে একটি মাত্র উচ্চবিদ্যালয় ইডেন স্কুল যথেষ্ট নয়। সেই জন্য তিনি বিনা বেতনে কাজ করিয়া আর একটি উচ্চবালিকা বিদ্যালয় স্থাপন

---

৭৪. দীপংকর মোহন্ত, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৯

৭৫. লীলাবতী নাগ, দিপালী সংঘ- ঢাকা, *মাতৃমন্দির*, কলকাতা, ৪র্থ বর্ষ, ১১ সংখ্যা, ফাল্গুন, ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৩৪৩

৭৬. সোনিয়া নিশাত অমিন, *বাঙালি মুসলিম নারীর আধুনিকায়ন*, (অনু: পাপড়ীন নাহার), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০২, পৃ. ১২৩-১২৪

> করেন। প্রথমে ইহার নাম ছিল 'দীপালি হাইস্কুল'। তিনি সেখানে তিন বৎসর বিনা বেতনে কাজ করিয়া ইহার স্থায়িত্ব বিধান করেন। এখন ইহা কামরুননেসা হাইস্কুল নামে পরিচিত।[৭৭]

অভয় দাস লেনে প্রতিষ্ঠিত উপর্যুক্ত বালিকা বিদ্যালয়টি কীভাবে দীপালি হাইস্কুল থেকে কামরুন্নেসা হাইস্কুলে রূপান্তরিত হয়ে এখনো নারীশিক্ষা প্রসারে ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে, বর্তমান অভিসন্দর্ভের ষষ্ঠ অধ্যায়ে এ বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

১৯২৪ সালে লীলা নাগ বাংলাবাজারে আরো একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এ স্কুলটি সম্পর্কে লীলা নাগ নিজেই বলেছেন:

> বর্তমান যুগে নারী শিক্ষার প্রয়োজন আছে; কিন্তু সুযোগ ও ব্যবস্থার অভাব যথেষ্ট রহিয়াছে। বিদ্যালয়ে স্থানাভাব হেতু বহু বালিকাকে শিক্ষা লাভে বঞ্চিত থাকিতে হইতেছে। এই অভাব দূর করিবার আকাঙ্ক্ষায় ১৯২৪ সনে আর একটি উচ্চবালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়। এই কার্য্যে বহু অর্থ ও অবৈতনিক সাহায্য দানে দীপালি সঙ্ঘ বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন।[৭৮]

১৯২৮ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি লীলা নাগ স্থাপন করেন 'নারীশিক্ষা মন্দির'। স্কুলটি ঢাকার তৎকালীন অভিজাত এলাকা র‌্যাংকিন স্ট্রীটে অবস্থিত ছিল। মাত্র তিনজন ছাত্রীকে নিয়ে গাছের নিচে এ স্কুলটির ক্লাস শুরু হয়। তবে স্কুলটি অচিরেই প্রসার লাভ করে এবং সুসং-এর মহারাজা কুমুদ চন্দ্র সিং-এর অনুদানে নির্মিত বিশাল ভবনে স্থানান্তরিত হয়। ১৯৩২ থেকে ১৯৪১ পর্যন্ত স্কুলের প্রশাসন ছিল দক্ষ শিক্ষক উষা রাণীর উপর। অবশ্য এর আগে লীলা নাগ নিজেই নারীশিক্ষা মন্দিরের প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন। এ কারণেই সম্ভবত স্কুলটির কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ছিল। এটি ছিল অনেকটা আশ্রমের মতো। বিধবা হিন্দুদের এখানে বিশেষ সুযোগ দেয়া হতো।[৭৯] পরবর্তীতে এ স্কুলটির নাম শেরে বাংলা বালিকা বিদ্যালয় করা হয়। ১৯৬৬ সালে এ স্কুলটি কলেজে উন্নীত হয় এবং বর্তমানে 'শেরে বাংলা বালিকা মহাবিদ্যালয়' নামে রাজধানী ঢাকার টিকাটুলিতে এটি নারীশিক্ষা বিস্তার করে যাচ্ছে।

ঢাকা শহরে লীলা নাগের উদ্যোগে আরো কয়েকটি উচ্চবালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। এর মধ্যে পুরানা পল্টন গার্লস স্কুল, বকশী বাজার শিক্ষাভবন, কায়েতটুলী শিক্ষায়তন এবং হেয়ারস্ট্রীট শিক্ষালয়। শেষোক্ত বিদ্যালয়টি ছিল চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত।[৮০] নারীশিক্ষাকে ব্যাপকতর করার জন্য লীলা নাগ ঢাকা শহরে ১২টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ও স্থাপন করেছিলেন। বিশের দশকে ঢাকা শহরের আয়তনের তুলনায় বিদ্যালয়ের এ সংখ্যাকে নেহায়েত কম বলা যাবে না। নারীশিক্ষার প্রসারের জন্য লীলা নাগ ঢাকায় একটি গার্লস কলেজ

---

৭৭. *প্রবাসী*, বিবিধ প্রসঙ্গ, ৩১শ ভাগ, , ২য়খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা, ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ, পৃ, ৫৯২, উদ্ধৃতি, দীপংকর মোহান্ত, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩০

৭৮. *মাতৃমন্দির*, ৪র্থবর্ষ, ১১ সংখ্যা, ফাল্গুন, ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৩৪৪, উদ্ধৃতি, দীপংকর মোহান্ত, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩১

৭৯. সেনিয়া নিশাত আমিন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১২৬

৮০. দীপংকর মোহান্ত, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১; সেনিয়া নিশাত আমিন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১২৫

প্রতিষ্ঠারও পরিকল্পনা করেছিলেন। অবশ্য পরে তিনি দীর্ঘদিন কারান্তরীণ থাকায় পরিকল্পনা মতো কলেজটি স্থাপন করতে পারেননি।

ঢাকার বাইরেও বিভিন্ন স্থানে লীলা নাগ নারীশিক্ষা প্রসারে স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তবে এ সবের প্রকৃত তথ্য জানা যায় না। ১৯৩৮ সালে তিনি তাঁর নিজ গ্রাম পাঁচগায়ে একটি প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। বিদ্যালয়টি এখনো 'কুঞ্জলতা বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়' নামে টিকে আছে।[৮১] স্কুলটি জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকল শ্রেণির বালিকাদের শিক্ষা লাভের জন্য নির্মিত হয়েছিল। লীলা নাগ কলকাতাতেও নারীশিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন। ঢাকা জেলার মানিকগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত বায়রা গ্রামের দরিদ্র মুসলিম কৃষকদের জন্য ১৯৩৮ সালে স্বামী অনিল রায়ের সহযোগে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, একটি হাই স্কুল ও মেয়েদের জন্য ক্লাব প্রতিষ্ঠা করেন।[৮২] স্থানীয় উৎসাহী দরিদ্র জনসাধারণ এ কাজে লীলা নাগকে 'ঘরের লক্ষ্মী মেয়ে' হিসেবে সহযোগিতা করেছেন।

সেকালে নারীশিক্ষার পর্যাপ্ত ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা তথা স্কুল না থাকায় নিরক্ষর নারীদের সংখ্যা ছিল ব্যাপক। লীলা নাগ তাদের আত্মসচেতন ও শিক্ষার আলোকে আলোকিত করার উদ্যোগ হিসেবে 'গণশিক্ষা পরিষদ 'নামে একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। গণশিক্ষা পরিষদকে সহায়তা করার জন্য কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এবং জে এম সেনগুপ্ত প্রমুখ মনীষীদের স্বাক্ষর সম্বলিত একটি আবেদন পত্রও জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করা হয়েছিল। গণশিক্ষা পরিষদের তত্ত্বাবধানে লীলা নাগ টিকাটুলী, ওয়ারী, বকশী বাজার, ঠাঠারীবাজার, শাঁখারী পট্টি কায়েতটুলী ও ফরাশগঞ্জে বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছিল। এসব এলাকায় দীপালি সংঘের অফিস ও স্কুল ছাড়াও বিভিন্ন শিক্ষানুরাগীর বাড়িতে বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র পরিচালিত হতো। দীপালী সংঘের মেয়েরা বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রে পাঠদান করতেন।[৮৩]

নারীদের আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করাকে লীলা নাগ নারীমুক্তি ও প্রগতির অন্যতম শর্ত বলে মনে করতেন। তাছাড়া বিশ শতকের স্বদেশী ভাবনার প্রথম ও প্রধান শর্ত ছিল বিদেশী পণ্য বর্জন এবং দেশীয় শিল্প বিশেষ করে কুটির শিল্পের বিকাশ। এ লক্ষ্যে লীলা নাগের উদ্যোগে মেয়েদের জন্য আলাদাভাবে দীপালির শিল্প শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বকশী বাজার, ওয়ারী প্রভৃতি জায়গায় ছিল উৎপাদন কেন্দ্র। তুলা থেকে সুতা উৎপন্ন, পোশাক তৈরি ছাড়াও সূচি-শিল্প, বেত-কাঠের খেলনা ও আসবাবপত্র মেয়েরা নিজ হাতে তৈরি করে বিক্রি করতো। বছরে একবার উন্মুক্ত শিল্প প্রদর্শনীর আয়োজন করতেন লীলা নাগ।

---

৮১. বিদ্যালয়টি পুরাতন ঘরের নাম ফলকে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, শুরুতে এ বিদ্যালয়টি লীলা নাগের মা কুঞ্জলতা দেবী তাঁর পিতা রায়সাহেব প্রকাশচন্দ্র দেব চৌধুরী মহাশয়ের নামে উৎসর্গ করেছিলেন।

৮২. দীপংকর মোহান্ত, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩১

৮৩. দীপংকর মোহান্ত, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩১

লীলা নাগ ও তাঁর দীপালি সংঘের অন্যতম উদ্যোগ ছিল পাঠাগার স্থাপন। নারীদের ভারতবর্ষের পরাধীনতার গ্লানি সম্পর্কে সচেতন করার উদ্দেশ্যে তিনি দীপালি সংঘের পাঠাগার স্থাপন করেছিলেন। মেয়েদের আধুনিক মানসিকতা গঠন, জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা, স্বদেশপ্রেম জাগ্রত করতে সাহায্য করে এমন সব বই ও পত্রিকার সংগ্রহ ছিল দীপালি পাঠাগারে। তাছাড়া ছাত্রীদের 'স্টাডি সার্কেল' গঠন করে তিনি সাদারল্যাণ্ডের তাদের জন্য *ইণ্ডিয়া ইন বণ্ডেজ* গ্রন্থটি পাঠের বিশেষ ব্যবস্থা করেছিলেন।

ছাত্রীনিবাস না থাকায় মেয়েদের যেমন উচ্চশিক্ষা ব্যাহত হতো, তেমনি সার্বক্ষণিক সামাজিক রাজনৈতিক কাজে অংশগ্রহণ করাও ছিল দুরূহ। এ অসুবিধা দূর করার লক্ষ্যে দীপালির উদ্যোগে তিনি ছাত্রীনিবাস প্রতিষ্ঠা করেন। হেয়ার স্ট্রিটের একটি বাড়িতে লীলা নাগ নিজের তত্ত্বাবধানে এটি পরিচালনা করতেন। তিনি নারীদের আত্মরক্ষা ও শারীরিক ও মানসিকভাবে উপযুক্ত করে তৈরির জন্য ব্যায়ামাগারও প্রতিষ্ঠা করেন। ছুরি চালনা ও লাঠি খেলা ছিল ব্যায়ামের অংশ। বিপ্লবী পুলিন দাস কুস্তি, ব্যায়াম ও খেলা শেখানোর দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। বাসস্থানের অভাবে শিক্ষিত মেয়েদের পক্ষে নিরাপদে চাকুরি করা অসম্ভব থাকায় লীলা নাগ একটি 'কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল' চালু করেন। ৫, হেয়ার স্ট্রিটে ছিল ঐ 'কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল'। অবশ্য শেষ পর্যন্ত এ হোস্টেল লীলা নাগের অনুসারী বিপ্লবী নারীদের আশ্রয়স্থলে পরিণত হয়েছিল।[৮৪] অসহায় নারীদের পুনর্বাসন, বিভিন্ন কাজে অর্থব্যয়ের উদ্দেশ্যে লীলা নাগ 'দীপালি ভাণ্ডার' গড়ে তোলেন। বিধবা, সমাজকর্তৃক বহিষ্কৃতা, স্বজনহীন অসহায় বৃদ্ধা, ধর্ষিতাসহ নানাভাবে নিরব যন্ত্রণায় পিষ্ট নারীদের রক্ষার জন্য লীলা নাগ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 'নারী রক্ষা ফান্ড'। নারীদের চিত্ত-বিনোদনের লক্ষ্যে দীপালি সংঘ প্রয়োজনীয় কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল। এ প্রসঙ্গে লীলা নাগ লিখেন:

> আমাদের দেশের মহিলাগণ গৃহ-কোণ হইতে বহির্গত হইয়া কোনও আমোদ-প্রমোদ বা দশজনের সহিত মিলিত হইতে পারেন না। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য তাহাদের ভ্রমণের নির্দোষ আমোদ-প্রমোদের, সঙ্গীত সম্মিলনীর ও অভিনয় প্রভৃতির ব্যবস্থা করিয়া থাকেন।[৮৫]

দিপালী সংঘের অধীনেই প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল 'দিপালী ছাত্রী সংঘ'। যেখানে মেয়েদের শিক্ষা প্রদানের সাথে সাথে জাতীয়তাবাদী ও দেশ হিতৈষণামূলক রাজনৈতিক প্রশিক্ষণও প্রদান করা হতো। এ ছাত্রী সংঘের অন্যতম সদস্য ছিলেন রেনুকা সেন ও প্রীতিলতা ওয়াদ্দোরের মতো সশস্ত্র নারী বিপ্লবীরা।

পূর্ব বাংলা ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে বিশেষত কলকাতায় (আসাম ও ত্রিপুরাতেও সংগঠনের কার্যক্রম বিস্তৃত ছিল) লীলা নাগের উদ্যোগে দীপালি সংঘ গড়ে ওঠে। রেণুকা সেন, গীতি বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তি দাস

৮৪. দীপংকর মোহান্ত, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩১-৩২
৮৫. লীলা নাগ, দীপালী সংঘ, পূর্বোক্ত,

(হুমায়ুন কবিরের স্ত্রী) প্রীতি দাস ছিলেন লীলা নাগের সহযোগী। প্রীতি বন্দ্যোপাধ্যায় ও শান্তি দাস নিজ নিজ বাড়িতে 'দীপালি শিক্ষা মন্দির' প্রতিষ্ঠা করে নারীসমাজে শিক্ষার বিস্তার ঘটান। প্রীতি দাস কলকাতা দীপালি সংঘের সম্পাদিকা ছিলেন। ঢাকা শহরের মতো কলকাতায়ও দীপালি সংঘের সবগুলো কার্যধারা সম্পাদিত হতো। লীলা নাগ ১৯৩০ সালে কলকাতার গোয়াবাগানে রেণুকা বসুর সহায়তায় 'ছাত্রী ভবন' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন- যা পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক স্বীকৃতি পেয়েছিল।

বাংলার নারীশিক্ষা ও নারী অধিকার আন্দোলনে লীলা নাগের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের সময়ই তিনি নারীশিক্ষা ও নারী অধিকার আন্দোলনে নিজেকে যুক্ত করেছিলেন। এ সময় তিনি নিখিল বঙ্গীয় নারী ভোটাধিকার কমিটির সহ-সম্পাদিকা নিযুক্ত হন। দুঃস্থ নারীদের সেবার জন্য তিনি নিজে প্রতিষ্ঠা করেন 'ঢাকা মহিলা কমিটি'। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র বিপ্লবী অনিল রায় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শ্রীসংঘের তিনি ছিলেন প্রথম নারী সদস্য। তবে লীলা নাগের সকল কর্মকাণ্ডের একটি বড় উৎস ছিল দিপালী সংঘ। বলা হয় যে, দীপালি সংঘ ও লীলা নাগ ছিলেন অভিন্ন সত্তা। এ সংগঠনটি নারীসমাজের যাত্রাপথের সারথি হিসেবে কাজ করে। এ সংঘের মাধ্যমেই লীলা নাগ বাঙালি নারীসমাজের বন্ধন মুক্তির জন্য বহুমুখী সহায়ক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন। প্রথমে তিনি দিপালী সংঘের মাধ্যমে নারীশিক্ষার প্রসারে ব্রতী হন। কালক্রমে এটি একটি নারী সংগঠন থেকে ব্রিটিশ বিরোধী বিপ্লবী সংগঠনে রূপান্তরিত হয়। এ আলোচনা বর্তমান গবেষণায় প্রাসঙ্গিক নয় বিধায় দিপালী সংঘের নারীশিক্ষা কার্যক্রমের মধ্যে এ পর্যায়ে আলোচনা সীমিত রাখা হলো।

ঢাকায় বেসরকারি উদ্যোগে পরিচালিত কয়েকটি বালিকা বিদ্যালয়: সে সময় ঢাকায় আরো কয়েকটি বালিকা বিদ্যালয় ছিল যেগুলো পরিচালিত হতো স্থানীয় উদ্যোগে এবং কিছু সরকারি বা মিউনিসিপ্যালিটির অনুদানে। এসব স্কুলের মধ্যে ঢাকার পার্শ্ববর্তী নারায়ণগঞ্জের 'মর্গ্যান গার্লস হাই ইংলিশ স্কুল' অন্যতম। জানা যায় যে, নারায়ণগঞ্জের তদানীন্তন পৌর প্রশাসক মাইকেল মর্গ্যানের নিরলস প্রচেষ্টা ও তার সহধর্মিণী লেডি মর্গ্যানের ঐকান্তিক আগ্রহে অত্র এলাকার আর্থ-সামাজিকভাবে অনগ্রসর নারীসমাজের মধ্যে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যে ১৯১০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 'মর্গ্যান গার্লস হাই ইংলিশ স্কুল'। পরবর্তীতে 'ইংলিশ' শব্দটি বাদ দিয়ে শুধু 'মর্গ্যান গার্লস হাই স্কুল' নামকরণ করা হয়। এটি ছিল এতদঞ্চলের নারীশিক্ষার প্রথম উল্লেখযোগ্য বিদ্যাপীঠ। শতাব্দীকাল পরে বিগত ২০১৫ সালে এর সাথে উচ্চমাধ্যমিক শাখাযুক্ত হওয়ায় বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি 'মর্গ্যান গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ' নামে পরিচিত লাভ করেছে।[৮৬]

৮৬. http://mgscn.edu.bd/View/14, Retrived 10.2.2023

এছাড়াও ঢাকায় নারীশিক্ষার জন্য বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত স্কুলগুলোর মধ্যে ছিল 'পোস্তা বালিকা বিদ্যালয়'। বিশ শতকের গোড়ার দিকেই এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এক সময় স্কুলটি প্রায় বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হলে তৎকালীন স্কুল ইন্সপেক্টর মৃণলিনী সেন এবং ফাতেমা খানম স্কুলটিকে পুনরুজ্জীবিত করেন। ফাতেমা খানমের বাড়ি ছিল স্কুলটির পাশেই, উর্দু রোডে। ফাতেমা খানম ১৯২৬ সাল পর্যন্ত সেখানে কাজ করেন এবং ১৯৪৭ পর্যন্ত স্কুলটি টিকে ছিল বলে জানা যায়।[৮৭]

ঢাকার নিকটস্থ বালিয়াদির জমিদার ফারিদুদ্দিন সিদ্দিকী ১৯৩২ সালে সালে ঢাকার বেচারাম দেউড়িতে মেয়েদের জন্য একটি স্কুল খোলেন। বাংলার তৎকালীন শিক্ষা বিভাগের উপপরিচালক মোল্লা বক্স এ ব্যাপারে তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। স্কুলটির উন্নয়নে নারীশিক্ষার ব্যাপারে আগ্রহী স্থানীয় আবদুল খালেক, আবদুল লতিফ এবং ডা. বুলবুল বিশেষভাবে সহায়তা করেন বলে জানা যায়। তবে এ স্কুলটির সাথে একজন মহিয়সী নারীর নাম যুক্ত আছে, তিনি হলেন 'ওস্তাদ আম্মা' নামে পরিচিত সুফিয়া খাতুন। তিনি বাড়ি বাড়ি ঘুরে স্কুলটির জন্য ছাত্রী সংগ্রহ করতেন। বর্তমানে এ স্কুলটি 'আনোয়ারা বেগম বালিকা বিদ্যালয়' নামে নারীশিক্ষার প্রসারে কাজ করে যাচ্ছে।[৮৮]

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে নারীশিক্ষার প্রসারে বাংলায় সরকারি উদ্যোগের সূচনা হয়। অবশ্য সে সময় এর পরিসর ছিল সীমিত। বিশ শতকে বাংলায় নারীশিক্ষার প্রসারে সরকারি উদ্যোগ জোরদার হয়। সরকারি ব্যবস্থাপনায় প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কেবল নয়, জেনানা বা অন্তঃপুর শিক্ষার সুযোগ অনেক বৃদ্ধি পায়। বাঙালি হিন্দুসমাজে উনিশ শতকেই নারীশিক্ষার প্রসার শুরু হয়েছিল। বিশ শতকে এসে তাদের মধ্যে নারীশিক্ষা আরো জোরদার হয়। এ সময় মুসলিমদের তুলনায় হিন্দু মেয়েরা সরকারি স্কুল ও কলেজে অধিক সংখ্যায় শিক্ষা লাভ করে। এমনকি বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়েও হিন্দু নারীরা উচ্চশিক্ষা গ্রহণে ব্রতী হয়। সরকারি উদ্যোগে নারীশিক্ষার দিগন্ত প্রসারিত হলেও বিশ শতকের প্রথমার্ধে বেসরকারি ব্যক্তি ও সাংগঠনিক উদ্যোগে নারীশিক্ষার প্রসারের প্রচেষ্টা থেমে যায়নি। উপরের আলোচনায় এর প্রমাণ পাওয়া যায়। লক্ষনীয় বিষয় হলো এ পর্যায়ে বেসরকারি প্রয়াসে পরিচালিত নারীশিক্ষা উদ্যোগে নারীদের সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি কর্মোপযোগী বৃত্তিমূলক শিক্ষার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। এ পর্বের নারীশিক্ষা প্রসার আন্দোলনের সাথে যুক্ত সমাজ সংস্কারকগণ উপলব্ধি করেছিলেন যে, নারীসমাজের আত্মোন্নয়ন ও তাদের সামাজিক মুক্তির জন্য আর্থিক স্বনির্ভরতা বিশেষভাবে প্রয়োজন। তাই বিশ শতকে

৮৭. সোনিয়া নিশাত আমিন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১২৬

৮৮. সোনিয়া নিশাত আমিন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১২৬

বেসরকারি ব্যক্তি ও সাংগঠনিক উদ্যোগে পরিচালিত নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে এ বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছিল।

উপসংহার

মানব সভ্যতা বির্নিমান ও অগ্রগতিতে পুরুষের পাশাপাশি নারী জাতির ঐতিহাসিক ভূমিকা সুবিদিত। তাই পৃথিবীর প্রতিটি দেশের সমাজ অগ্রগতি নির্ণয়ে একটি বড় মাপকাঠি হলো সে সমাজে নারীর অবস্থান। নারী-পুরুষ সমাজ দেহের দুটি চক্ষুস্বরূপ। মানুষের সব রকমের কাজকর্মের প্রয়োজনেই দুটি চক্ষুর গুরুত্ব সমান। কবি কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে "বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি, চির কল্যাণকর অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।" কবির এ উক্তিতে নারী জাতির ঐতিহাসিক ও বাস্তব ভূমিকার স্বীকৃতি থাকলেও বাস্তবে পুরুষশাসিত সমাজে নারীর কৃতি-কর্মের স্বীকৃতি মেলেনি। বরং নানামুখী সামাজিক বিরূপ পরিস্থিতি, যেমন সম্পদ ও সম্পত্তিতে ব্যক্তি মালিকানার চিন্তা, পতিত্ব ও পিতৃপরিচয় নির্ভর পারিবারিক ধারার বিকাশের প্রেক্ষাপটে নারীকে ক্রমশ পুরুষের আজ্ঞাবহ, ভোগ্য ও সন্তান উৎপাদক যন্ত্রে পরিণত করা হয়। রাষ্ট্রশক্তি নারীপুরুষের এ সম্পর্ককে শুধু লালন করেনি, বরং নারীর উপর পুরুষের শাসন ও শ্রেষ্ঠত্বকে স্বীকৃতি দিয়েছে। পুরুষজাতি কখনো সামাজিক নিয়মবিধি এবং কখনো ধর্মকে নারী শোষণের হাতিয়াররূপে ব্যবহার করেছে। ধর্মের নামে পুরুষসমাজ নারীকে তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত রেখে নারীর উপর প্রভুত্ব করেছে। পৃথিবীর অনেক দেশে, এমনকি ভারতবর্ষেও দীর্ঘদিন এ ধারণা প্রতিষ্ঠিত ছিল যে, সর্বগুণে গুণান্বিত নারীও একজন অধম পুরুষের চাইতে হীন। কিছু ব্যতিক্রম হয়তো ছিল, তবে উনিশ শতকে এসেও দেখা যায় যে, সাধারণভাবে ভারতীয় তথা বাঙালি সমাজে পুরুষদের চোখে নারীরা ছিল গৃহকর্মে উপযুক্ত ক্রীতদাসী তুল্য। এরূপ বাস্তবতায় এদেশে নারীশিক্ষার যে বিশেষ প্রচলন ছিল না এ কথা বলা বাহুল্য।

শিক্ষা মানুষের অন্যতম মৌলিক অধিকার। শিক্ষা মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিকে বিকশিত করে, নিজের অস্তিত্বকে উপলব্ধি করতে শেখায়। পুনশ্চ উল্লেখ্য যে, নারী পুরুষ মিলেই মানব সমাজ। অন্যান্য মৌলিক অধিকারের ন্যায় শিক্ষা অর্জনের ব্যাপারেও নারী-পুরুষের অধিকার সমান। কিন্তু যুগযুগ ধরে পৃথিবীর সর্বত্রই নারীরা সকল বিষয়েই বৈষম্যের শিকার হয়েছে। পুরুষ প্রধান সমাজে নারীর শিক্ষা লাভের অধিকার চরমভাবে উপেক্ষিত হয়েছে। কখনো ধর্মের দোহাই দিয়ে, আবার কখনো বা সমাজপতিদের সৃষ্ট মনগড়া মতবাদ দিয়ে নারীকে বঞ্চিত করা হয়েছে শিক্ষার মৌলিক অধিকার থেকে। বাংলায়ও এর কোন ব্যতিক্রম ঘটেনি। প্রাচীনকাল থেকে বাংলার নারী সমাজে প্রাতিষ্ঠানিক পুঁথিগত শিক্ষা অত্যন্ত মন্থর গতিতে নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হয়েছে। আঠোরো শতকের শেষার্ধেও দেখা যায় যে, বাংলায় উচ্চবর্গের কতিপয় নারী প্রথাগত শিক্ষা লাভ করলেও সামগ্রিক সমাজব্যবস্থার উপর তার কোনো প্রভাব পড়েনি। অশিক্ষা এবং কুশিক্ষাই ছিল

সাধারণভাবে বাঙালি নারীজাতির বিধিলিপি। ১৮৩৫ ও ১৮৩৮ সালে প্রকাশিত উইলিয়াম এডামসের (William Adams) প্রণীত বাংলার শিক্ষা সংক্রান্ত প্রতিবেদনেও এ সত্য প্রতিভাত হয়েছে।

উনিশ শতকের প্রথমার্ধেও হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে পুরুষ প্রধান বাঙালি রক্ষণশীল সমাজ নারীশিক্ষাকে অপ্রয়োজনীয় বলে মনে করতো। নারীশিক্ষার প্রতি বাঙালি রক্ষণশীল সমাজের এরূপ মনোভাবের পেছনে বহুদিনের কুসংস্কারই অন্যতম কারণ ছিল। লেখাপড়া শিখলে মেয়েরা বিধবা, অসতী এবং অহংকার বশে স্বামী ও গুরুজনদের অবাধ্য হয়, মেয়েরা কালির আঁচড় দিলে গৃহে অলক্ষ্মী প্রবেশ করে এবং ইংরেজি শিখলে উচ্ছৃংখল হয় ইত্যাদি বিশ্বাস ও আশঙ্কা বাংলায় নারীশিক্ষার অন্তরায় হিসেবে কাজ করে। এমনকি নারীশিক্ষাকে শাস্ত্রবিরোধী বলেও প্রচার করা হয়। এসব কারণে অশিক্ষিত সাধারণ লোকের কথা দূরে থাক, সেকালের সমাজের শিক্ষিত ও নেতৃস্থানীয় লোকেরা পর্যন্ত নারীশিক্ষাকে স্বাগত জানাতে পারেননি। কুসংস্কার ও রক্ষণশীল মনোভাব শুধু নয়, বাঙালি সমাজে প্রচলিত বাল্যবিবাহ এবং বিবাহ পরবর্তী জীবনে নারীদের সাংসারিক কাজকর্ম ও নানা দায়দায়িত্বের বন্ধনে বন্দী করে তাদের লেখাপড়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হতো। যে বয়স মানুষের লেখাপড়া শেখার আদর্শ সময় সেই সময়ে এদেশের নারীরা সংসারের জাতাকলে পড়ে লেখাপড়া শেখার অবকাশ পেতো না। কেবল পুরুষতান্ত্রিক রক্ষণশীল সমাজের চাপে নয়, কখনো কখনো নারীদের চাপেও নারীরা লেখাপড়া শিখতে পারেনি। এক্ষেত্রে নারীরাও নারীদের জন্য প্রতিবন্ধক ছিলেন। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, সে সময় বাল্যবিবাহের ফলে নারীদের অল্পবয়সেই বিয়ে হয়ে যেতো এবং তারা অল্পবয়সেই শ্বশুরবাড়ির অন্দরমহলের সাংসারিক কাজকর্মের মধ্যে বন্দী হয়ে যেতো। তখনকার দিনে পরিবারের বয়স্কা নারীরা কমবয়সী বালিকা বধুদের লেখাপড়া শেখার বাসনাকে খুবই খারাপ চোখে দেখতেন। এটি ছিল এক ধরনের অদ্ভুত মনস্তত্ত্ব। কেননা রক্ষণশীল সমাজের চাপে পড়ে বয়স্কা নারীরা লেখাপড়া শিখতে পারেনি বলে তারা তাদের পরবর্তী প্রজন্মের নারীদেরও লেখাপড়া শিখতে দিতে চাইতেন না। এই অদ্ভুত মনস্তত্ত্বের প্রসঙ্গ উঠে এসেছে রাসসুন্দরী দাসীর স্মৃতিকথায়। তিনি লিখেছেন, "---বাস্তবিক মেয়েছেলের হাতে কাগজ দেখিলে সেটি ভারী বিরুদ্ধ কর্ম জ্ঞান করিয়া, বৃদ্ধা ঠাকুরানিরা অতিশয় অসন্তোষ প্রকাশ করিতেন।"[১] এভাবে নারীরা যাতে লেখাপড়া শিখতে না পারে– পুরুষতান্ত্রিক রক্ষণশীল সমাজের এ অভিপ্রায়কে বয়স্কা সনাতন চিন্তার নারীরাও পরোক্ষভাবে পরিপুষ্টি দান করেছিলেন।

উনিশ শতকের প্রথমদিকেও বাঙালি সমাজে শিক্ষাকে অর্থ উপার্জনের মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করা হতো। সংসার জীবনের ঘুর্নিবর্তে আবদ্ধ নারীদের যেহেতু অর্থ উপার্জনের জন্য বিশেষ দায় ছিল না, সে জন্য তাদের লেখাপড়া শেখার প্রয়োজন আছে বলে মনে করেনি বাংলার রক্ষণশীল সমাজ। তাছাড়া নারীকে পুরুষের চেয়ে

---

১. দ্রষ্টব্য বিজিত ঘোষ (সংকলন ও সম্পাদনা) *প্রমীলা স্মৃতিকথা সংগ্রহ*, প্রথম খণ্ড, পুনশ্চ, কলকাতা, ২০১৪, পৃ. ৯৬

সব দিক থেকে দুর্বল এবং অল্পবুদ্ধি বলেও বিবেচনা করা হতো। তাই এরূপ নারীদের বিদ্যাশিক্ষার আবশ্যকতা নেই বলে পুরুষরা মনে করতেন। বাংলায় এক সময় নারীশিক্ষা কমবেশি ঐতিহ্য থাকলেও পূর্বোক্ত পরিস্থিতিতে উনিশ শতকের সূচনায় এদেশে নারীশিক্ষার প্রচলন ছিল না বললেই চলে।

এরূপ বাস্তবতায় উনিশ শতকে বাংলায় রাজনীতি, সমাজ, ধর্ম ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে ক্ষয়িষ্ণু ও রক্ষণশীল মনোভাবের বিরুদ্ধে এক নবজাগরণ দেখা দেয়। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনাধীনে পাশ্চাত্য সভ্যতা, শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভাবে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনে পরিবর্তনের পাশাপাশি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনাচারণেও পরিবর্তন ঘটে। জীবনদৃষ্টিতে পরিবর্তন ও আত্মসচেতনতা বৃদ্ধির ফলে এদেশের পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত একটি নব্য শ্রেণির মধ্যে নতুন জীবন জিজ্ঞাসার সূত্রপাত হয়। খানিকটা নতুন সেক্যুলার মূল্যবোধের উন্মেষ ও বিকাশ, খানিকটা পাশ্চাত্যের জীবনধারার অনুকরণবশত এবং খানিকটা নগরায়ণজাত সচলতার ফলে উনিশ শতকের বাংলায় নানা ধরনের সামাজিক পরিবর্তন ও সমাজ-সংস্কারের প্রয়োজন অনিবার্য হয়ে দেখা দেয়। বাংলার এ নবজাগরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল নারীমুক্তি ও নারী জাগরণের প্রসঙ্গ। এ সময় ইউরোপীয় ভাবাদর্শে উজ্জীবীত শিক্ষিত বাঙালিগণ সমকালীন ইউরোপে বিশেষ করে ইংল্যান্ডের নারীমুক্তি আন্দোলন দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়ে স্বদেশী নারীসমাজের করুণ অবস্থা প্রেক্ষাপটে তাদের মানবিক অধিকার সম্পর্কে সচেতন হতে শুরু করেন। এ পর্যায়ে নারীদের জন্য শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত করা হয়। বাংলায় সৃষ্ট নবতর পরিস্থিতিতে নারীশিক্ষার বিস্তারে পরিকল্পিত প্রচেষ্টা শুরু হয়। উল্লেখ্য যে, উনিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত এ বিষয়ে সরকারের পক্ষ থেকে কোনো উদ্যোগ বা পৃষ্ঠপোষকতা পাওয়া যায়নি। ফলে এদেশে নারীশিক্ষার প্রচেষ্টা শুরু হয় ব্যক্তি ও বেসরকারি মাধ্যম থেকে। উনিশ শতকের সূচনাতেই ব্যক্তি ও বেসরকারি প্রয়াসে বাংলায় নারীশিক্ষার প্রসারের নানা উদ্যোগ ও পদক্ষেপ শুরু হয়। তবে এ প্রচেষ্টা জোরালো ও জোরদার হয় উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এসে। এ সময় স্বল্প পরিসরে নারীশিক্ষা প্রসারে সরকারি উদ্যোগও শুরু হয়। তবে সরকারি প্রচেষ্টা অপেক্ষা বেসরকারি পর্যায়ে ব্যক্তিগত ও সাংগঠনিক প্রয়াস ও তৎপরতা অনেক বেশি ছিল। বিশ শতকের শুরু থেকে নারীশিক্ষার বিকাশে সরকারি উদ্যোগ বৃদ্ধি পায়। তবে এতদসত্ত্বেও বেসরকারি প্রয়াসের গুরুত্ব ও তাৎপর্য হ্রাস পায়নি। ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান পর্যন্ত সরকারি উদ্যোগ ও প্রচেষ্টার পাশাপাশি বাংলায় নারীশিক্ষা প্রসারে বেসরকারি পর্যায়ে ব্যক্তিগত ও সাংগঠনিক প্রয়াস অব্যাহত থাকে। বর্তমান গবেষণা অভিসন্দর্ভে সাতটি অধ্যায়ের মধ্যে দিয়ে ১৮৪৯-১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলায় নারীশিক্ষা প্রসারে ব্যক্তি ও বেসরকারি উদ্যোগের স্বরূপ ও গতি-প্রকৃতি নির্ণয়, ঐতিহাসিক পর্যালোচনা এবং বিচার বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়েছে।

প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা যায় যে, ইংরেজ ঔপনিবেশিক রাজশক্তির সাথে আগত ইউরোপীয় খ্রিস্টান মিশনারিরা বাঙালি সমাজে নারীশিক্ষার প্রসারের কাজটির শুভ সূচনা করেন। সরকারি এবং এ এদেশীয় সমাজপতিদের

উদ্যোগে বাংলায় নারীশিক্ষা কার্যক্রম বিলম্বিত হলেও এ ব্যাপারে খ্রিস্টান মিশনারিদের তৎপরতা শুরু হয়েছিল আঠারো শতকের শেষপাদেই। Calcutta Church Mission, Ladies Society, The Ladies Association, এবং Srirampur Mission এর উদ্যোগে বাংলার বিভিন্ন স্থানে বেশ কিছু সংখ্যক মেয়েদের স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। তবে এসব স্কুল বাংলায় নারীশিক্ষা বিস্তারে বিশেষ তাৎপর্য ভূমিকা রাখতে পারেনি। কারণ তাঁদের নারীশিক্ষা বিস্তার পরিকল্পনায় বাঙালি নারীদের আত্মসত্তা বিকাশের কোনো তাগিদ ছিল না, ছিল এদেশে খ্রিস্টীয় ধর্মীয় আদর্শ ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির গৌরব ও মহিমা প্রচার। ফলে কোনো মুসলমান ঘরের মেয়েতো নয়ই, উচ্চবর্ণের হিন্দু পরিবারের মেয়েরাও এসব স্কুলে যেতো না। শুধু তাই নয়, নারীশিক্ষার ব্যাপারে বাঙালিদের অনুদার মনোভাব এ সময় মিশনারিদের প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে কঠোর প্রতিরোধে পরিণত হয়। এ অবস্থায় সাধারণত নিম্ন ও নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের হিন্দু এবং স্থানীয় ধর্মান্তরিত খ্রিস্টান পরিবারের মেয়েরাই এসব স্কুলে পড়াশুনা করতো। তদুপরি ১৮৩৮ সালের পর অর্থ সংকটের কারণে অধিকাংশ মিশনারি স্কুলের শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়।

নারীশিক্ষা বিষয়ে মিশনারিদের তৎপরতা সবর্জন স্বীকৃত হয়নি, তবে নারীশিক্ষা ব্যাপারে তাদের তৎপরতা বাঙালি মানসপটে একটি নাড়া দিয়েছিল। এ সময় নব্য ইংরেজি শিক্ষিত ও পাশ্চাত্য ভাবধারায় অনুপ্রাণিত কতিপয় মহৎপ্রাণ ব্যক্তি দুদর্শার কঠিন নিগড়ে নিস্পেষিত বাংলার নারীসমাজের পরিত্রাণ প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেন। নারীমুক্তির অন্যতম উপায় শিক্ষা বিস্তারের প্রয়োজনীয়তাও তারা গভীরভাবে উপলদ্ধি করেন। ফলে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় নারীশিক্ষা বিষয়ে বাদানুবাদ এবং সম্ভ্রান্ত ও নেতৃস্থানীয় অনেকের নারীশিক্ষার পক্ষে মত প্রকাশ ইত্যাদি মধ্যবিত্ত বাঙালির মন নারীশিক্ষার জন্য অনেকটা প্রস্তুত করে। উনিশ শতকে চতুর্থ দশকেই নারীশিক্ষা আন্দোলন মিশনারিদের প্রচেষ্টার বাইরে ক্রমেই বৃহত্তর বাঙালি সমাজে বিস্তার লাভ করে।

উনিশ শতকের প্রথমার্ধেই নারীশিক্ষা প্রসারে বাঙালিদের নিজস্ব উদ্যোগ শুরু হয়। রাজা রামমোহন রায় ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ দেশীয় সমাজ সংস্কারকগণ নারীশিক্ষা প্রসারে নানাভাবে কাজ করেন। ব্যক্তি প্রচেষ্টার বাইরে নারীশিক্ষা প্রসারে সাংগঠনিক তৎপরতা বৃদ্ধি পায়। ইয়ং বেঙ্গল, তত্ত্ববোধিনী সভা, সর্ব্বশুভকরী সভা থেকে শুরু করে ব্রাহ্মসমাজ এবং এর সাথে সম্পর্কযুক্ত বিভিন্ন সংগঠন রক্ষণশীল বাঙালি সমাজে নারীশিক্ষার প্রতি আগ্রহ ও সচেতনতা সৃষ্টিসহ নারীশিক্ষার প্রসারে নানা ভূমিকা ও কার্যক্রম পরিচালনা করে। উল্লেখ্য যে, উনিশ শতকে বাংলায় বিদ্যমান নারীশিক্ষা বিরোধী সমাজ বাস্তবতায় প্রথমেই প্রয়োজন ছিল নারীশিক্ষার পক্ষে সচেতনতা বৃদ্ধি ও একটি অনুকূল জনমত তৈরি করা। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য নারীশিক্ষার সমর্থক ব্যক্তিবর্গ ও সংগঠনসমূহ সংবাদপত্র ও সাহিত্যকে প্রধান অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করে।

উনিশ শতকে বাংলায় বেশ কিছু মাসিক, পাক্ষিক ও সাপ্তাহিক সংবাদ ও সাময়িকপত্র প্রকাশিত হয়েছিল। নারীশিক্ষার সমর্থকগণ জনমত সংগঠন ও নারীশিক্ষা প্রসারে এসব সংবাদ-সমায়িকপত্রে লেখালেখি করেছেন।

প্রতিক্রিয়া হিসেবে নারীশিক্ষা বিরোধী রক্ষণশীল সমাজও নারীশিক্ষার বিপক্ষে জনমত সংগঠিত করার জন্য সংবাদপত্রকে অবলম্বন করেছেন। ফলে নারীশিক্ষার পক্ষে-বিপক্ষে সংবাদপত্রে তর্ক-বিতর্ক হয়েছে। গোটা উনিশ শতক ধরেই কমবেশি তর্ক-বিতর্ক চলেছে। এসব তর্ক-বিতর্কের মধ্য দিয়ে সমাজে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। নারীশিক্ষা বিরোধীদের রক্ষণশীল মনোভাবের বিপক্ষে প্রগতিবাদীদের নারীশিক্ষার পক্ষে যৌক্তিক অবস্থান ও ব্যাখ্যা বাঙালি সমাজকে ক্রমশ প্রভাবিত করতে সক্ষম হয়েছে। ফলে বাঙালি সমাজের রক্ষণশীলতা ক্রমশ দূরীভূত হয়ে প্রগতিশীল উদার ও মুক্ত চিন্তার প্রসার ঘটেছে। নারীকে কেবল পুরুষের অধীন সত্ত্বা হিসেবে বিবেচনা না করে তাদের মানুষ হিসেবে বিবেচনা করার মনোবৃত্তি বাঙালি সমাজে ধীর গতিতে হলেও সঞ্চারিত হয়েছে। এরূপ মনোভাব বাঙালি সমাজে নারীশিক্ষার সপক্ষে অনুকূল জনমত ও একটি বৌদ্ধিক পটভূমি বিনির্মাণে ভূমিকা রেখেছিলো।

সাহিত্যকে বলা হয় সমাজের দর্পণ। উনিশ শতকে বাঙালির মনোজগতের ভাঙ্গাগড়ার পর্বে নারীশিক্ষাকে কেন্দ্র করে বাঙালি সমাজ রীতিমতো উত্তাল হয়েছিলো। নারীশিক্ষা প্রয়োজন কী-না, নারীশিক্ষার প্রকৃতি কী হবে, পাঠ্যসূচিতে কী থাকবে ইত্যাদি নানা বিষয় নিয়ে বাঙালি সমাজ মুখরিত হয়ে ওঠেছিল। এরই প্রতিফলন দেখা যায় সমকালীন বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায়। নারীশিক্ষাকে কেন্দ্র করে প্রবন্ধসাহিত্য থেকে শুরু করে, উপন্যাস বা কথাসাহিত্য, নাটক-প্রহসন ও কাব্য সবকিছুই রচিত হয়েছে আলোচ্য সময়ে। প্রভাবশালী ও প্রতিষ্ঠিত লেখক-সাহিত্যিক থেকে শুরু করে সাধারণ নারী পর্যন্ত নারীশিক্ষার পক্ষে-বিপক্ষে লিখেছেন। সাহিত্যিক মানদন্ড বিচারে এসব লেখনীর সবগুলো উচ্চস্তরের ছিল এমনটা বলার কোনো অবকাশ নেই। তবে এসব লেখায় নারীশিক্ষার মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে লেখকদের উদ্বেগ, সচেতনতা ও সম্পৃক্ততার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। এক কথায় বলতে গেলে গোটা উনিশ শতক জুড়ে নারীশিক্ষাকে কেন্দ্র করে বাঙালি সমাজের চিন্তাভাবনার একটি পূর্ণ প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠেছে উপরে বর্ণিত সাহিত্যকর্মে। নারীশিক্ষার পক্ষে বাঙালি জাতির মনোজগতে এর প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী।

নারীরাও যে মানুষ, তারাও যে মানবীয় অধিকার লাভের অধিকারী এবং এ অধিকার পূরণের মাধ্যমে তাদের অবস্থার উন্নতি না ঘটালে যে সমগ্র সমাজের কল্যাণ সম্ভব নয়–তা উনিশ শতকে বাঙালি ভদ্রলোকেরা উপলব্ধি করেছিলেন। এ উপলব্ধি থেকেই উনিশ শতকের প্রথমার্ধে রাজা রামমোহন রায় ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ নারীশিক্ষার উপর গুরুত্বারোপ করে তাদের কর্ম তৎপরতা শুরু করেন। তবে লক্ষণীয় যে, এদের প্রচেষ্টা নারীশিক্ষার প্রতি বাঙালির মনন জগত প্রস্তুতেই সীমিত ছিল। ইয়ং বেঙ্গল, তত্ত্ববোধিনী সভা, সর্ব্বশুভকরী সভাও মুখ্যত নারীশিক্ষার প্রতি জনমত তৈরিতেই ভূমিকা রাখে। বাংলায় নারীশিক্ষার বিদ্যায়তনিক প্রচেষ্টা শুরু হয় মূলত ১৮৪৯ সালে মনীষী বেথুনের স্কুল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। বেথুনের হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়ের (পরবর্তীতে বেথুন স্কুল নামে পরিচিত) দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে ব্রাহ্মসমাজ এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরসহ এর

সাথে সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তিবর্গ ও বিভিন্ন সংগঠন বাঙালি সমাজে নারীশিক্ষার প্রতি আগ্রহ ও সচেতনতা সৃষ্টি এবং নারীশিক্ষার প্রসারে নানা ভূমিকা ও কার্যক্রম পরিচালনা করে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নারীশিক্ষার প্রসারের জন্য বিদ্যায়তনিক উদ্যোগ জোরদার করেন। তাঁর অনুসরণে বাংলার নানা স্থানে অনেকেই বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগ নিয়েছিলেন।

বাংলায় নারীশিক্ষার একটি অন্যতম প্রধান অন্তরায় ছিল বাল্য বিবাহসহ নানা সামাজিক কুসংস্কার। নারীশিক্ষা প্রসারে ব্রতী প্রগতিশীল ব্যক্তি এবং ব্রাহ্মসমাজসহ অন্যান্য সংগঠন এসব কুসংস্কার দূরীকরণে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে। তবে সমকালীন সমাজ বাস্তবতাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা তাদের মত প্রগতিমনস্কদের পক্ষেও সম্ভব ছিল না। এরূপ করতে গেলে যে তীব্র সামাজিক প্রতিরোধ তাঁদের মহতী প্রয়াসকে ব্যর্থ করে দিতে পারে তারা সেটি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। উল্লেখ্য যে, তৎকালীন বাঙালি সমাজের নারীশিক্ষার সমর্থকদেরও বেশিরভাগ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পরিবর্তে পরিবার ও সমাজে নারীদের চিরাচরিত সামাজিক শৃঙ্খলার মধ্যে রেখেই শিক্ষাদানের পক্ষপাতী ছিলেন। তাই তারা প্রথমে মেয়েদের বিদ্যালয়ে নয়, বরং নিজ গৃহেই শিক্ষা দান সঙ্গত বলে মনে করতেন। এরূপ শিক্ষাকে বলা হতো 'অন্তঃপুর বা জেনানা শিক্ষা' ব্যবস্থা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, পাশ্চাত্য জীবনবোধ দ্বারা বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত ব্রাহ্মসমাজের সভ্যসহ প্রগতিবাদীরা তাদের নিজেদের পরিবারের নারীদের শিক্ষিত করাকে সভ্য হওয়ার মাপকাঠি বলে মনে করতেন। এভাবেই তৈরি হয়েছিল পরিবারে শিক্ষিত স্ত্রী, শিক্ষিত কন্যা ও শিক্ষিত পুত্রবধূর ধারণা। কিন্তু তখন পর্যন্ত বাঙালি মনন প্রাতিষ্ঠানিক নারীশিক্ষার জন্য তৈরি না হওয়ায় নারীশিক্ষার সমর্থক ব্যক্তি ও সংগঠনসমূহ তাদের নিজেদের পরিবারের এবং সাধারণ বাঙালি সমাজের অবিবাহিত ও বিবাহিত নারীদের জন্য অন্তঃপুর বা জেনানা শিক্ষা ব্যবস্থাকে উপযোগী মনে করে এর বিস্তার সাধনে উদ্যোগ নেয়। তবে জেনানা শিক্ষা ব্যবস্থার পাঠ্যসূচি পর্যালোচনা করলে বুঝা যায় যে, এ শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল যুগ বাস্তবতা অনুযায়ী পারিবারিক প্রয়োজন মেটানোতে নারীকে উপযোগী করে তোলা। নারীদের মধ্যে আধুনিক চেতনার বিকাশের জন্য তাদের উপযোগী করে তোলার তাগিদ তাদের মধ্যে ছিল বলে মনে হয় না।

সময়ের অগ্রগতির সাথে সাথে বাঙালি সমাজের মনোজগতে রূপান্তর দৃশ্যমান হয়। তাই উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাঙালি সমাজের একদল মানুষ নারীদের আজন্মলালিত কুসংস্কারের গণ্ডি থেকে মুক্ত করে সভ্যতার আলোকে সুশিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান করে তোলায় আগ্রহী হন। তাঁরা মনে করতেন যে, নারীদের কুসংস্কারের আচ্ছন্নতা থেকে মুক্তিদানের একমাত্র উপায় হলো তাদের যথোপযুক্ত শিক্ষা দান।[২] কিন্তু জেনানা বা অন্তঃপুর শিক্ষা এ চাহিদা পুরণে সক্ষম নয়। এ অবস্থায় প্রাতিষ্ঠানিক নারীশিক্ষার প্রয়োজনীতার কথা জোরালোভাবে উচ্চারিত হতে থাকে। ১৮৪৯ সালে বেথুন স্কুল প্রতিষ্ঠার পর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরসহ এদেশীয় সমাজ ও নারী

২. *বামাবোধিনী পত্রিকা*, চৈত্র, ১২৭৭

হিতৈষীদের কেউ কেউ নারীশিক্ষা প্রসারে নারীশিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ার কাজে মনোযোগী হয়েছিলেন। এ পর্যায়ে ব্রাহ্মসমাজসহ অন্যান্য নারীশিক্ষাব্রতী সংগঠনসমূহও প্রাতিষ্ঠানিক নারীশিক্ষা প্রসারে মনোযোগী হয় এবং তাদের উদ্যোগে অবিভক্ত বাংলার বিভিন্ন স্থানে নারীশিক্ষা প্রসারে অনেক বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়।

নারীদের প্রকৃত কর্মক্ষেত্র গৃহকোণকে ধরে নিয়েই তদুপযোগী শিক্ষা প্রদানকেই উনিশ শতকের নারীশিক্ষা প্রয়াসীদের শিক্ষা নীতিতে প্রাধান্য পেয়েছিল– এ অভিযোগ পুরোপুরি অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। ব্রাহ্ম নেতা কেশবচন্দ্রের মতো নারী হিতৈষীও নারীদের জন্য পুরুষদের ন্যায় উচ্চশিক্ষা প্রদানে পক্ষপাতী ছিলেন না। তাই দুর্গামোহন দাস, আনন্দমোহন বসু এবং দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী প্রমুখের উদ্যোগ ও অর্থানুকূল্যে ১৮৭৬ সালে বঙ্গমহিলা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি একে সমর্থন করেননি। এমনকি কেশবচন্দ্র সেন এবং তাঁর অনুসারীরা এ স্কুলের ছাত্রীদের বিরুদ্ধে অপপ্রচারে নেমেছিলেন। অবশ্য এতদসত্ত্বেও একদল প্রগতিবাদী বাঙালি ভদ্রলোক নারীদের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক, এমনকি উচ্চশিক্ষার সপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেন। তারা কেশবচদ্র সেন এবং তার অনুসারীদের রক্ষণশীল মতকে অপছন্দ করেন। কবি কামিনী রায় তাঁর *শ্রাদ্ধিকী* গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, তাঁর বাবা চণ্ডীচরণ সেন আচার্য কেশবচন্দ্র সেনের মহাত্ত্ব ও ধর্মাভাবের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হলেও নারীদের উচ্চশিক্ষা বিষয়ে তাঁর রক্ষণশীল ও অনুদার মনোভাবকে পছন্দ করতেন না। শুধু চণ্ডীচরণ সেন নয়, অনেকেই তখন নারীর প্রাতিষ্ঠানিক ও উচ্চশিক্ষার পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেন। ফলে উনিশ শতকের শেষ দিকে এসে কেশবচন্দ্র সেন ও তাঁর অনুসারীদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। নারীদের জন্য সীমিত পরিসরে হলেও উচ্চশিক্ষার দ্বার উন্মোচিত হয়। তবে বাঙালি নারীদের উচ্চশিক্ষা গ্রহণ সঙ্গত কী-না এ নিয়ে বিদ্বৎসমাজে বিতর্ক দেখা দেয়। নারীদের বিদ্যালয় শিক্ষার সমর্থন করলেও অনেকেই উচ্চশিক্ষা তথা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার বিরোধিতা করেন। এ নিয়ে পত্র-পত্রিকায় উচ্চশিক্ষার পক্ষে-বিপক্ষে তর্ক-বিতর্ক চলে। এ বিতর্কে উচ্চশিক্ষার পক্ষাবলম্বনকারীদের সমর্থনই ক্রমশ জোরালো হয়।

নারীশিক্ষা সম্পর্কিত অন্য একটি বিতর্কও এ সময় বাঙালি সমাজে দেখা যায়, আর তা হলো এর পাঠ্যসূচি কী হবে? নারীশিক্ষার সমর্থকদের মধ্যে অনেক খ্যাতিমান মানুষও নারীদের জন্য আধুনিক বিশেষ করে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেননি। কারণ তাঁদের ধারণা ছিল মেয়েরা আধুনিক শিক্ষা গ্রহণ করলে তাদের মধ্যে ধর্মের ব্যাপারে উদাসীনতা দেখা দিবে, গৃহকর্মে তাদের মন থাকবে না, তাঁরা মেমসাহেবী আচরণ করবে। যেহেতু মেয়েরা সারা জীবন গৃহকর্ম করবে তাই সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞান শিক্ষা অপেক্ষা তাদের গৃহকর্ম, ধর্ম ও সুনীতি শিক্ষা দেয়া অধিকতর প্রয়োজন। গার্হস্থ্য ধর্মপালন পালনই নারী জাতির প্রধান দায়িত্ব। পুরুষোচিত শিক্ষায় রমণী যতই উন্নত হউক না কেন গার্হস্থ্যধর্মে অভিজ্ঞতা না থাকিলে সে শিক্ষা অপূর্ণ। সে শিক্ষায় রমণী কখনই সর্বাত্মক উন্নতি লাভ করিতে পারে না– এমন মনোভাব কেবল পুরুষের নয়, অনেক নারীরও ছিল। গৃহকর্ম সম্পাদন, পিতামাতার সেবা, সন্তানপালন এ সকল বিশেষরূপে শিক্ষা নারীর কর্তব্য

বলেই তারা মনে করতেন। তবে ভিন্নমতও যে ছিল তা বলা বাহুল্য। এ কারণেই সংখ্যায় কম হলেও কাদম্বিনী বসু এবং চন্দ্রমুখী বসুর মতো কিছু নারী উনিশ শতকেই উচ্চশিক্ষা লাভের সমর্থ হন।

উনিশ শতকে বাংলায় নারীশিক্ষার যে অগ্রগতি হয়েছিল তা ছিল মুখ্যত হিন্দুসমাজে। বাঙালি হিন্দুনারীদের শিক্ষা ও জাগরণের ক্ষেত্রে হিন্দু বুদ্ধিজীবী মহল নিজেরা সংযুক্ত থেকে অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ দিয়ে যে মহতী ভূমিকা পালন করেছিলেন, অনুরূপভাবে উনিশ শতকে মুসলিম নারীদের জাগরণের ক্ষেত্রে মুসলিম বুদ্ধিজীবী ও সমাজ প্রধানদের নিকট থেকে আশাব্যঞ্জক সহযোগিতা আসেনি। উল্লেখ্য যে, উনিশ শতকের প্রথমার্ধে হিন্দু সমাজের মধ্যে যে জাগরণ শুরু হয়েছিলো, মুসলমান সমাজে সে জাগরণের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে দ্বিতীয়ার্ধে। নবজাগরণের এ পর্যায়ে বাংলার মুসলমান শিক্ষিত সমাজের নেতৃবৃন্দ প্রধানত পুরুষদের সমস্যাবলি নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন। এ নেতাদের কেউ কেউ নারী সমাজের উন্নতি বিশেষ করে তাদের শিক্ষার সপক্ষে কথা বললেও তার বাস্তব রূপ দেবার কোন পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে আসেনি। তাই এ সময়ে নারীশিক্ষার দৃশ্যমান কোনো অগ্রগতি হয়নি। এরূপ বাস্তবতায় বাঙালি মুসলিম নারীদের শিক্ষা প্রসারে নবাব ফয়জুন্নেছা, তাহেরুন্নেসা ও করিমুন্নেছা খানমসহ কয়েকজন মহিয়সী নারী এগিয়ে আসেন। সমকালে কয়েকটি সংগঠনও মুসলিম নারীদের শিক্ষার প্রসারে উদ্যোগী ভূমিকা পালন করে। তাদের উদ্যোগে মুসলিম সমাজে অন্তঃপুর শিক্ষার পাশাপাশি কিছু পরিমাণে হলেও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রসার ঘটে। তবে যে বিষয়টি বিশেষভাবে লক্ষণীয় তা হলো বাঙালি মুসলিম পরিবারের মেয়েদের শিক্ষার হার মুখ্যত প্রাথমিক স্তরেই বলতে গেলে সীমাবদ্ধ ছিল। মাধ্যমিক স্তর যৎকিঞ্চিত ছাত্রীর উপস্থিতি দেখা গেলেও উচ্চশিক্ষার স্তরে মুসলিম নারীদের উপস্থিতি ছিল না বলা যেতে পারে। পর্দাপ্রথা, বাল্যবিবাহ, নারীশিক্ষার বিষয়ে মুসলমান সমাজের রক্ষণশীল মনোভাব, মুসলিম সমাজের উপযোগী মূল পাঠ্যক্রমের অভাব, আর্থিক অসচ্ছলতা, উপযুক্ত নারী শিক্ষকের অভাব ইত্যাদি মাধ্যমিক বা উচ্চমাধ্যমিক স্তরে মুসলিম নারীশিক্ষার প্রসারে অন্যত অন্তরায় ছিল। মুসলিম সমাজে মেয়েদের আধুনিক ও ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাদান করা উচিত কী-না- এ নিয়েও বাঙালি মুসলিম সমাজ ছিল দ্বিধা-বিভক্ত। মুসলিম নারীর শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেও অনেকেই মনে করতেন যে, তাদের ধর্মীয় শিক্ষার বাইরে উর্দু ও বাংলা ভাষা শিক্ষা ছাড়া গৃহস্থালি কাজ গোছানো, স্বাস্থ্য রক্ষা, সন্তান লালন-পালন এবং স্বামী ও পরিবারের অন্যান্য বয়োজ্যেষ্ঠদের সেবা-যত্ন করার মৌলিক জ্ঞান শিক্ষাই যথেষ্ট। তাদের জন্য আধুনিক ও উচ্চশিক্ষার কোনো প্রয়োজন নেই। বস্তুত মুসলিম নারীর শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেও তারা নারীদের জন্য প্রাথমিক স্তরের এমন শিক্ষার সুপারিশ করেছে যা গ্রহণের মাধ্যমে একজন নারী সুগৃহিণী হতে পারে, একজন ভালো মা হয়ে যথাযথভাবে সন্তানের লালন-পালন করতে পারে এবং সর্বোপরি একজন আদর্শ স্ত্রী হিসেবে স্বামী ও পরিবারের বড়দের সেবা-যত্ন করতে পারে। এরূপ মনোভাবের মধ্যে আর যাই হোক নারীর নিজের আত্মোন্নয়ন ও আত্মবিকাশের জন্য যে শিক্ষা লাভ করা জরুরি, সে সত্যের স্বীকৃতি দেয়া হয়নি। পুরুষতান্ত্রিক

এরূপ মানসিকতার কারণেই উনিশ শতকের শেষপাদ অব্দি বাঙালি মুসলিম নারীশিক্ষা প্রাথমিক স্তর অতিক্রম করে মাধ্যমিক বা উচ্চমাধ্যমিক স্তরে খুব একটা যেতে পারেনি।

উনিশ শতকের প্রথমদিকে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে এদেশে নারীশিক্ষার সূচনা, নারীশিক্ষা বিষয়ে রক্ষণশীল বাঙালিসমাজের কঠোর মনোভাব ও সামাজিক প্রতিকূলতা, নারীশিক্ষার বিস্তারে খ্রিস্টান মিশনারিদের প্রচেষ্টা, প্রগতিশীল শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রচেষ্টায় ও বেথুন স্কুলকে কেন্দ্র করে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে নারীদের প্রাথমিক শিক্ষার স্বীকৃতি এবং নানা টানাপোড়েনের পর উনিশ শতকের শেষদিকে নারীদের উচ্চশিক্ষার দ্বার উদ্‌ঘাটন হয়। বিশ শতকে বাংলায় নারীশিক্ষা নতুন গতিপথ লাভ করে। এ সময় নারীশিক্ষার প্রসারে সরকারি উদ্যোগ ও পৃষ্ঠপোষকতা বৃদ্ধি পায়। পাশাপাশি চলে বেসরকারি ব্যক্তি ও সাংগঠনিক উদ্যোগে নারীশিক্ষার প্রসারের প্রচেষ্টা। ফলে নারীশিক্ষার দ্রুত প্রসার ঘটে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিকের গণ্ডি পেরিয়ে অনেক নারী বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পায়। ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে পূর্ব বাংলার নারীদের জন্যও বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার সুযোগ অবারিত হয়।

বিশ শতকে বাংলায় মুসলিম নারীশিক্ষাও নতুন গতিবেগ লাভ করে। এ সময় মুসলিম নারীশিক্ষার প্রসারে একদিকে যেমন সরকারি উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা বৃদ্ধি পায়, তেমনি এতদবিষয়ে বেসরকারি ও ব্যক্তি উদ্যোগও জোরদার হয়। পর্যালোচনাধীন সময়ে নারীমুক্তি জাগরণের অগ্রসেনানী রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনসহ মুসলিম নারী-পুরুষ বুদ্ধিজীবী ও সমাজ সংস্কারকগণ নিজ সম্প্রদায়ে নারীশিক্ষার ব্যাপারে সচেতনতা ও আগ্রহ বৃদ্ধির চেষ্টা করেন। আলোচ্য সময়কালে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনকে অনুসরণ করে তাঁর পরবর্তী উত্তরাধিকারী খায়রুন্নেসা খাতুন, মিসেস এম. রহমান, নূরুন্নেসা খাতুন, ফাতেমা খানম, ফজিলতুনেসা, মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা রাজিয়া খাতুন প্রমুখ নারীশিক্ষার প্রসার, নারীজাগরণ এবং নারীমুক্তির লক্ষ্যে অনেক জোরালো ভূমিকা পৌলন করেন। মুসলিম মনীষী, সমাজকর্মী, লেখক ও বুদ্ধিজীবী, এমনকি রাজনীতিবিদগণও তাদের লেখনী, আলোচনা এবং সংঘ-সমিতির মাধ্যমে নিজেদের সম্প্রদায়ের কাছে নারীশিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার কথা দ্ব্যর্থহীনভাবে তুলে ধরেন। তাদের অব্যাহত প্রচেষ্টায় নারীশিক্ষার প্রতি মুসলিম সমাজে আগ্রহ ও সচেতনতা বৃদ্ধি পায়। উল্লেখ্য যে, এ সময়ও বাঙালি মুসলিম সমাজে নারীশিক্ষার প্রসারে নানা প্রতিবন্ধকতা ছিল। এসব অন্তরায়সমূহ দূরীভূত করে নারীশিক্ষার প্রসারে যেমন সরকার নানামুখী ব্যবস্থা গ্রহণ করে, তেমনি বেসরকারি ও ব্যক্তি উদ্যোগেও তা নিরসন করার চেষ্টা করা হয়। নারীশিক্ষার প্রসারে বিশ শতকের ত্রিশের দশক পর্যন্ত মুসলিম সমাজের ঐতিহ্যবাহী জেনানা বা অন্তঃপুর শিক্ষার ধারা বজায় রাখা হয়। একই সাথে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগ ও ব্যবস্থাপনায় নারীশিক্ষার বিদ্যায়তনিক কার্যক্রম জোরদার করা হয়। এক্ষেত্রে রোকেয়ার প্রতিষ্ঠিত সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল পথ প্রদর্শকের ভূমিকা পালন করে। এ স্কুলটির দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে বাংলার বিভিন্ন স্থানে

বেসরকারি উদ্যোগে মুসলিম নারীশিক্ষার জন্য আরো বেশ কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং সরকারি উদ্যোগে পরিচালিত প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়ার সুযোগ পাওয়ার ফলশ্রুতিতে মুসলিম সমাজে নারীশিক্ষার বিশেষ অগ্রগতি সাধিত হয়। তবে এ অগ্রগতিতে বেসরকারি ও ব্যক্তি উদ্যোগের অবদান কতটুকু, প্রয়োজনীয় তথ্য প্রমাণের অপর্যাপ্ততার কারণে এ বিষয়ে পৃথক পরিসংখ্যান প্রদান করা সম্ভব নয়। অবশ্য এ কথা বলা অযৌক্তিক হবে না যে, মুসলিম নারীশিক্ষার এ অগ্রগতিতে বেসরকারি ও ব্যক্তি উদ্যোগ ও প্রচেষ্টার যথেষ্ট অবদান ছিল। বর্তমান অভিসন্দর্ভের ষষ্ঠ অধ্যায়ের আলোচনায় এটি প্রমাণিত হয়েছে। এ সময় মুসলিম নারীরা উচ্চশিক্ষা গ্রহণেরও সুযোগ পায়। ফজিলাতুন্নেসা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মুসলিম নারী শিক্ষার্থী হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। কেবল তাই নয়, তিনিই প্রথম মুসলিম নারী যিনি উচ্চশিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে বিলেত গমনের কৃতিত্ব অর্জন করেন। ফজিলাতুন্নেসা কেবল নিজে শিক্ষা লাভ করেননি, বাঙালি মুসলিমসমাজে নারীশিক্ষার প্রসারেও অনন্য ভূমিকা পালন করেছেন। শুধু ফজিলাতুন্নেসা নয়, রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের অনুসারী আরো অনেকে নারীশিক্ষার প্রসারে এগ্রিয়ে আসেন। তাদের উদ্যোগ ও প্রচেষ্টায় সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেন অনেক মুসলিম মনীষী, বুদ্ধিজীবী, সমাজ সংস্কারক ও রাজনীতিবিদ। এদের মধ্যে নবাব সলিমুল্লাহ, নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী, একে ফজুলল হক ও খান বাহাদুর আহছানউল্লাহ প্রমুখের নাম বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। বস্তুত, নারী-পুরুষ সকলের ঐক্যবদ্ধ ও সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বিশ শতকের প্রথমার্ধেই বাঙালি মুসলিম সমাজে নারীশিক্ষার তাৎপর্যপূর্ণ অগ্রগতি সাধিত হয়।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে উনিশ শতকে বাংলায় নবজাগরণের যুগে নারীসমাজ বিশেষ করে হিন্দু সমাজস্থ নারীদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটে। সরকারি উদ্যোগের বাইরে এ সময় ব্যক্তি ও বেসরকারি সাংগঠনিক তৎপরতায় বাঙালি হিন্দু নারীরা জেনানা শিক্ষার পাশাপাশি বিদ্যায়তনিক শিক্ষাগ্রহণে আগ্রহী হয়। এমনকি উনিশ শতকের শেষ দিকে সংখ্যায় কম হলেও বাঙালি হিন্দু নারীরা উচ্চশিক্ষার দ্বারেও পৌঁছাতে সক্ষম হয়। বিশ শতকের শুরুতে সরকারি উদ্যোগে পরিচালিত শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করে তুলনামূলক বিচারে বাঙালি হিন্দু পরিবারের মেয়েরা মুসলিম মেয়েদের তুলনায় সমাজ জীবনে আরো এগিয়ে যায়। বাঙালি হিন্দু সমাজে নারীশিক্ষার প্রসারের ফলে বিশ শতকের প্রারম্ভে তাদের মধ্যে বৈচিত্র্যপূর্ণ ও ভিন্নতর আত্মপ্রকাশ ঘটে।

বিশ শতকের সূচনা থেকে নারীশিক্ষার ব্যাপারে সরকারি উদ্যোগ প্রসারিত হলেও বাঙালি হিন্দু সমাজে ব্যক্তিগত ও বেসরকারি প্রচেষ্টার আবেদন ও গুরুত্ব নিঃশেষ হয়ে যায়নি। তাই বাংলায় নারীশিক্ষা প্রসারে অনেকে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা ও উদ্যোগ নিয়েছিলেন। বর্তমান অভিসন্দর্ভের সপ্তম অধ্যায়ে এ বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। সরলা রায়, সরলা দেবী চৌধুরাণী, লেডি অবলা বসু, সরোজনলীনী দত্ত ও লীলা নাগ প্রমুখ ব্যক্তি উদ্যোগে নারী শিক্ষার প্রসারে নানামুখী প্রচেষ্টা ও উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। সাংগঠনিক পর্যায়ে ভারত স্ত্রী মহামণ্ডল, নারী শিক্ষা সমিতি, বেঙ্গল উইমেন্স এসোসিয়েশন, সরোজনলিনী দত্ত নারী মঙ্গল সমিতি ও

দিপালী সংঘ ইত্যাদি নিজ সম্প্রদায়ের নারীদের শিক্ষা এবং তাদের আত্মোন্নয়নে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা ও উদ্যোগ গ্রহণ করে। পূর্বোক্ত ব্যক্তি ও সংগঠনের উদ্যোগে জেনেনা শিক্ষার পাশাপাশি প্রাতিষ্ঠানিক নারীশিক্ষার প্রসারেও অনন্য ভূমিকা পালন করা হয়। এ সময় বেসরকারি উদ্যোগে বাংলার বিভিন্ন স্থানে অনেকগুলো নারীশিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। লক্ষণীয় যে, বিশ শতকে বেসরকারি ব্যক্তিগত ও সাংগঠনিক উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত শিক্ষায়তনে সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি নারীদের জন্য কর্মোপযোগী বৃত্তিমূলক শিক্ষার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। এ পর্বের নারীশিক্ষা প্রসার আন্দোলনের সাথে যুক্ত সমাজ সংস্কারকগণ উপলব্ধি করেছিলেন যে, নারীসমাজের আত্মোন্নয়ন ও তাদের সামাজিক মুক্তির জন্য আর্থিক স্বনির্ভরতা বিশেষভাবে প্রয়োজন। তাই বিশ শতকে বেসরকারি ব্যক্তি ও সাংগঠনিক উদ্যোগে পরিচালিত নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে এ বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছিল।

উনিশ শতকে বাঙালি নারীদের মুক্তি ও জাগরণের লক্ষ্যে পরিচালিত আন্দোলনে অন্যতম কার্যক্রম ছিল নারীশিক্ষা। শিক্ষাসহ নারীসমাজের এ মুক্তি আন্দোলন শুরু করেছিলেন পুরুষরা। তাই অনেকে মনে করেন, সত্যিকার অর্থে বাংলার নারী আন্দোলন পুরুষদের অধীন থেকে নারীদের পুরোপুরি মুক্তি বা স্বাধীন করার আন্দোলন ছিল না। বস্তুত শিক্ষাসহ নারীদের নানা সামাজিক কুসংস্কারের কবল থেকে রক্ষার জন্য পুরুষদের নানামুখী কার্যক্রমের পিছনে তাদের বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। আর তা হলো নারীদের উন্নততর স্ত্রী ও মাতায় পরিণত করা। আরো স্পষ্ট করে বলতে গেলে পুরুষরা নারীদের জীবনমানের উন্নতির জন্য যে সকল উদ্যোগ নিয়েছিলেন তা কেবল নারীদের স্বার্থে নয়, বরং এর পিছনে নিজেদের জীবনের পরিপূর্ণতার কথাও বিবেচনায় ছিল। তাই উনিশ শতকে শিক্ষাক্ষেত্রে নারীদের এমন শিক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল যাতে করে একজন নারী স্বামীর উপযুক্ত জীবনসঙ্গী, শ্বশুর বাড়িতে একজন সুগৃহিণী এবং সন্তানের আদর্শ মাতা হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করতে পারেন। এ শিক্ষা ব্যবস্থায় নারীদের পরিপূর্ণ আত্মবিকাশের সুযোগ ছিল না বললেই চলে। তবে এ কথাও স্বীকার করতে হবে যে, এ শিক্ষার মাধ্যমেই নারীরা নিজেদের জীবন ও মূল্যবোধ সম্পর্কে কিছু নতুন ধারণা ও অভিজ্ঞতা অর্জন করেন, যার মাধ্যমে তাদের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে। নারী-পুরুষ সনাতন সম্পর্কের উপর এর প্রভাব পড়ে। শিক্ষার আলোকে আলোকিত নারীরা পরিবার ও সমাজে তাদের অবস্থান, ভূমিকা ও মর্যাদা নিয়ে নতুনভাবে ভাবতে শুরু করেন। স্বজাতীয় নারীদের শিক্ষা ও মানবিক অবস্থার উন্নয়নেও এসব নারীদের কেউ কেউ স্বউদ্যোগে এগিয়ে আসেন। বাঙালি সমাজে নারীদের এ অবস্থানগত পরিবর্তন সমাজপতি ও সমাজ সংস্কারকদের চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ফলে অনেকেই নারীর এ জাগরণের বিরুদ্ধাচারণ শুরু করেন। সামান্য পরিমাণে হলেও নারীদের মধ্যে ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের প্রকাশ পুরুষদের সচকিত করে। ফলে তারা এমনকি প্রগতিশীল ব্রাহ্মদের একাংশও উচ্চশিক্ষাসহ নারীদের স্বাধীনতার

বিরোধিতা শুরু করে। এতে নারীশিক্ষাসহ নারীমুক্তির লক্ষ্যে সমাজ সংস্কার আন্দোলন কিছুটা হলেও বাধাগ্রস্থ হয়।

বাঙালি প্রগতিশীল পুরুষদের মনোজগতের উপর্যুক্ত পরিবর্তন কোনো কোনো নারীর মধ্যেও সঞ্চারিত হয়েছিল। তবে সামগ্রিক পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও বাঙালি নারীর শিক্ষা ও জাগরণের ধারাকে থামানো যায়নি। উনিশ শতকের শেষার্ধে এসে বাঙালি নারীদের কেউ কেউ উচ্চশিক্ষার দ্বারে পেঁছে যান। বিশ শতকে বাঙালি নারীরা শিক্ষার নতুন আলোকে নিজেদের আরো পরিবর্তন করেন। শুধু গৃহ পরিমণ্ডলের কাজ ব্যতীত নারীর যে আরো বহুমুখী কর্মকাণ্ডে অবদান রাখার সুযোগ আছে, এ বিষয়টি উপলব্ধির পর এ সময় বাঙালি নারীর যেরূপ উল্লেখযোগ্য ইতিবাচক পরিবর্তনের সূচনা হয়, তাকে নিশ্চিতভাবে নারী জাগরণের যুগ বলে আখ্যায়িত করা যায়। জাগরণের এ যুগে হিন্দু এবং মুসলমান মেয়েরা শিক্ষালয়ে. এমনকি উপার্জনক্ষেত্রে প্রবেশ করে নিজেদের সক্ষমতার পরিচয় দেন। তবে এ কথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, নারীদের ব্যক্তিত্বের বিকাশ, সামাজিক স্তরে বৈষম্যহীন অধিকার প্রাপ্তি বা প্রতিভা বিকাশের উপযোগী পরিবেশের পরিপূর্ণ সুযোগ লাভ করতে তাদের বিশ শতকের প্রথমার্ধের শেষাবধি অপেক্ষা এবং কঠিন পথ অতিক্রম করতে হয়। অবশ্য ইতিহাসের চলমান ধারায় নানা সীমাবদ্ধতার মধ্যেও শিক্ষিত নারীরা সংসার ও কর্মক্ষেত্রের মধ্যে সমন্বয় সাধন ও নারীশিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধিসহ নারীকেন্দ্রিক বিভিন্ন সমস্যার সমাধান প্রয়াসের মধ্যেই নিজেদের কেবল সম্পৃক্ত রাখেনি, বরং জীবনের বহুমুখী চাহিদার সাথে মিল রেখে নারীমুক্তির দাবিকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করে তোলে। এমনকি তারা রাজনৈতিক পরিমণ্ডলেও নিজেদের সক্রিয়ভাবে যুক্ত করে এবং দেশ মাতৃকার স্বাধীনতা সংগ্রামে ভূমিকা রাখে। একে নারীশিক্ষা প্রসারের অন্যতম তাৎপর্যপূর্ণ ফল বলা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-১

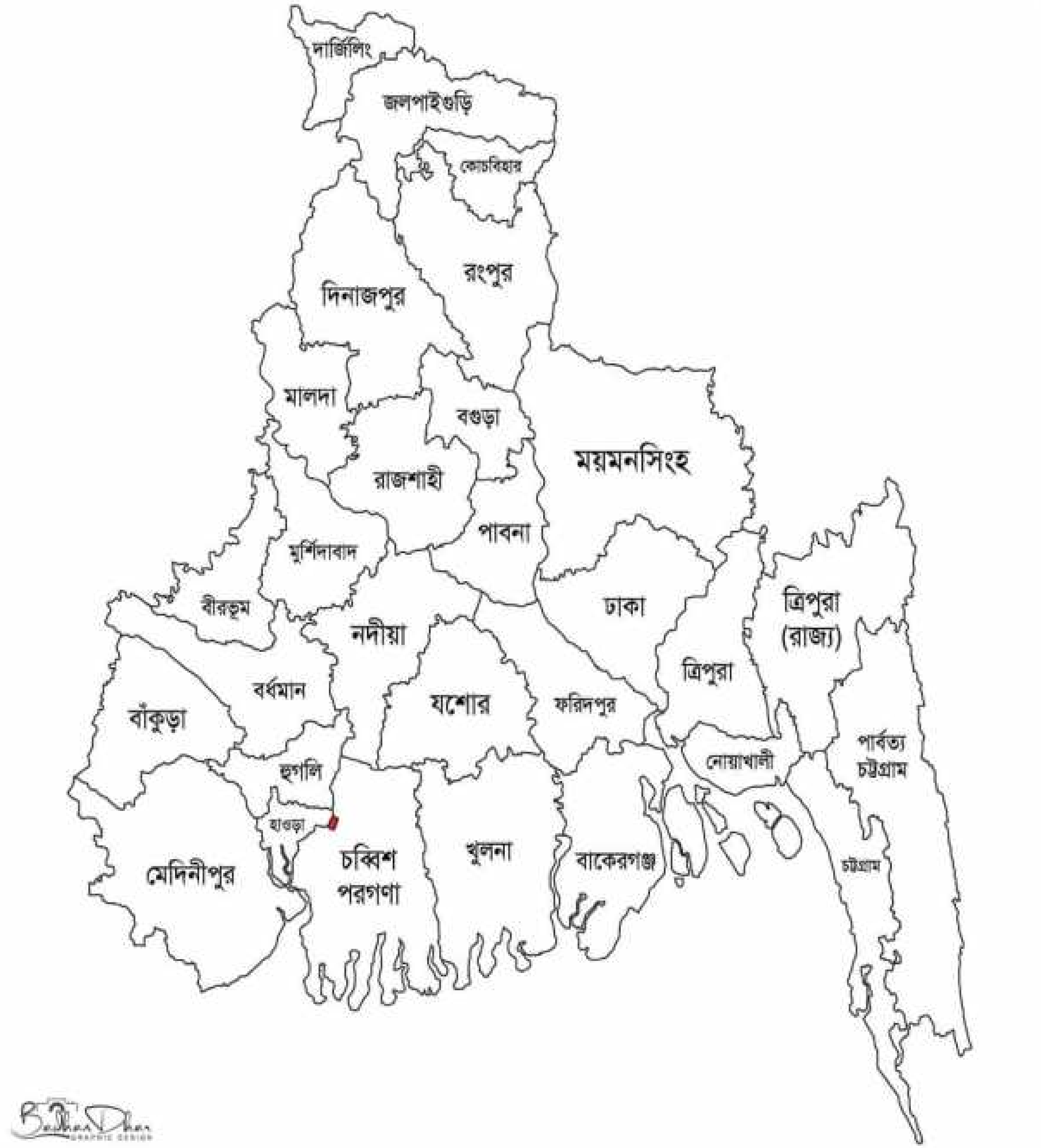

অবিভক্ত বাংলার মানচিত্র

সূত্রঃ https://www.google.com/search? retrived on 20.8.2023

পরিশিষ্ট-২

আলোকচিত্রে নারীশিক্ষার পথিকৃৎ জন

রাজা রামমোহন রায়

দ্বরকানাথ ঠাকুর

রাধাকান্ত দেব

হেনরি লুইস ভি ডিরোজিও

জন এলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন

রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

কেশবচন্দ্র সেন

শিবনাথ শাস্ত্রী

নবাব ফয়জুন্নেছা চৌধুরাণী

স্বর্ণকুমারী দেবী

সরলা দেবী রায় চৌধুরাণী

ডা. কাদম্বিনী বসু (গাঙ্গুলী)

চন্দ্রমুখী বসু

লেডি অবলা বসু

সিস্টার নিবেদিতা

সরোজ নলিনী দত্ত

কামিনী রায়

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন

খুজিস্তা বানু

লীলা নাগ (রায়)

ফজিলাতুন্নেসা জ্বোহা

নুরুন্নেসা খাতুন

আনোয়ারা বাহার চৌধুরী

ফাতেমা খানম

দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি

নবাব স্যার সলিমুল্লাহ

নবাব নওয়াব আলী চৌধূরী

জ্ঞানদানন্দিনী

কৃষ্ণভাবিনী দাস

প্রিয়ম্বদা দেবী

এ কে ফজলুল হক

মোহাম্মদ নসিরউদ্দীন

ইসমাঈল হোসেন সিরাজী

খান বাহাদুর আহছানউল্লা

শামসুন নাহার মাহমুদ

হিরন্ময়ী দেবী

বঙ্গ বালিকা মহিলা কলেজের (বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত প্রথম মহিলা কলেজ)
শিক্ষক ও শিক্ষার্থী

ছবিসমূহের সূত্র: ইন্টারনেট

পরিশিষ্ট-৩

আলোকচিত্রে ব্যক্তিগত ও বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত বাংলার কতিপয় উল্লেখযোগ্য নারীশিক্ষা প্রতিষ্ঠান

বারাসাত কালীকৃষ্ণ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় (১৮৪৭)

বেথুন স্কুল (১৮৪৯), কলকাতা

ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয় (১৮৯০), কলকাতা

নবাব ফয়জুন্নেছা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, কুমিল্লা

ইডেন কলেজ, ঢাকা

বিদ্যাময়ী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ময়মনসিংহ

সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুল (১৯১০)

পি এন বালিকা বিদ্যালয়, রাজশাহী

বিন্দুবাসিনী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, টাঙ্গাইল

ডা. খাস্তগীর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম

Dhaka University Institutional Repository

করোনেশন স্কুল, খুলনা

কামরুন্নেসা বালিকা বিদ্যালয়, ঢাকা

ছবিসমূহের সূত্রঃ ইন্টারনেট

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-৪

নারীশিক্ষার সপক্ষে জনমত তৈরিতে ভূমিকা রাখা কতিপয় সংবাদপত্র

একমেবাদ্বিতীয়ং
দ্বিতীয় ভাগ
১৬ সংখ্যা
১ অগ্রহায়ণ ১৭৬৬ শক
তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

বঙ্গলক্ষ্মী

সমাচার দর্পণ

সমাচার দর্পণ।

Dhaka University Institutional Repository

সংবাদপ্রভাকর

প্রাত্যহিকপত্র

['সংবাদ প্রভাকর' পত্রের একটি পৃষ্ঠার প্রতিলিপি]

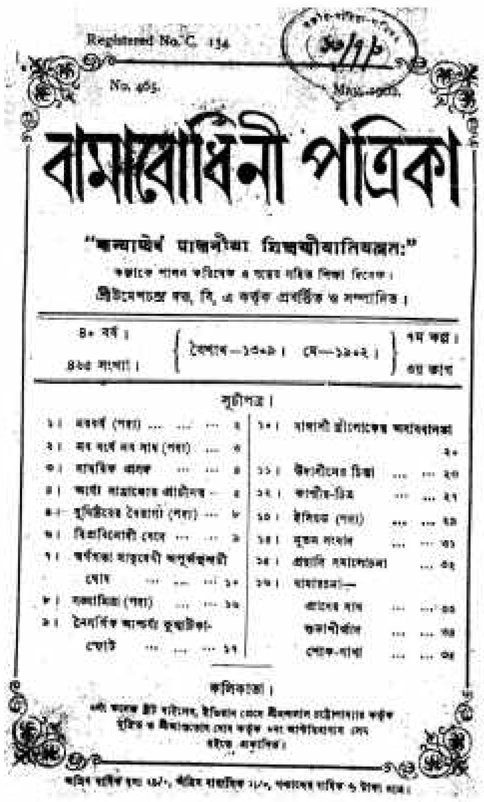

Registered No. C. 134

No. 465.

বামাবোধিনী পত্রিকা

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

সূচীপত্র।

কলিকাতা।

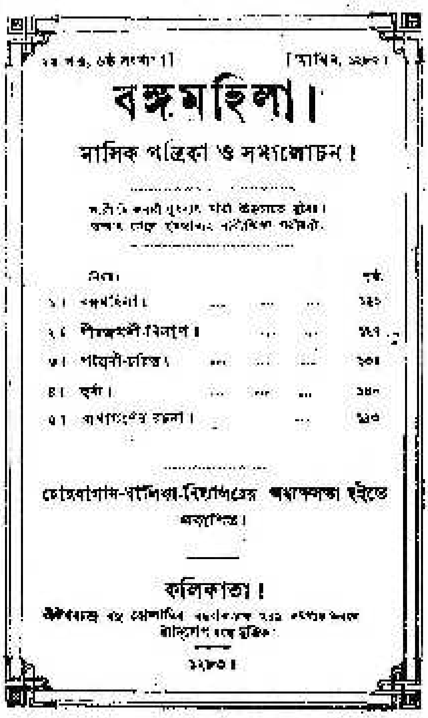

বঙ্গমহিলা।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচন।

কলিকাতা।

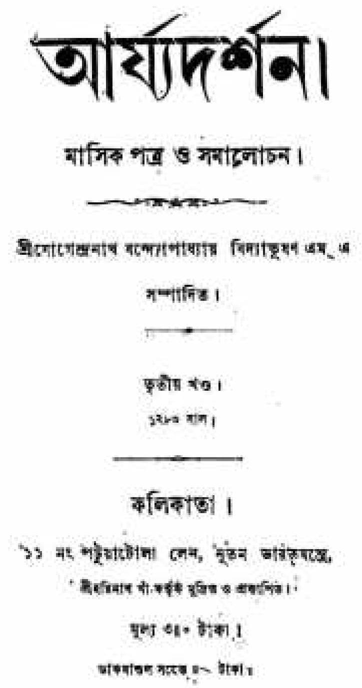

আর্য্যদর্শন।

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণ এম্ এ

সম্পাদিত।

তৃতীয় খণ্ড।

১২৮৩ সাল।

কলিকাতা।

১১ নং পটুয়াটোলা লেন, নূতন ভারতযন্ত্রে,

শ্রীহরিনাথ দাঁ-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

মূল্য ৩৷৹ টাকা।

ডাকমাশুল সমেত ৩৷৵ টাকা।

ভারতী

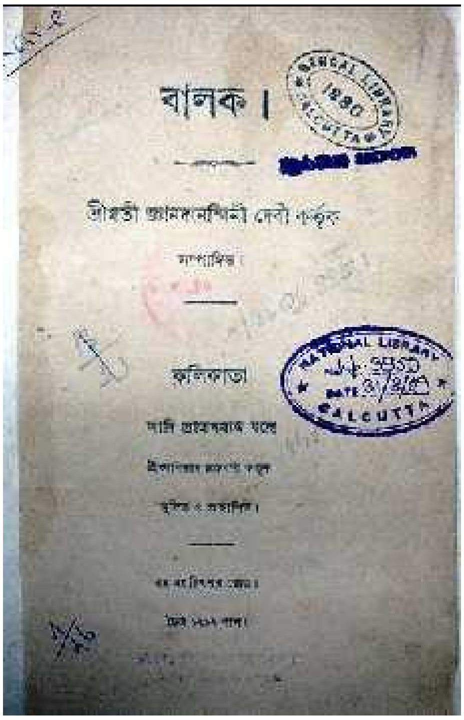
বালক।
শ্রীমতী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী কর্ত্তৃক
সম্পাদিত।
কলিকাতা

REFERENCE ONLY
অবলাবান্ধব।
মাসিক পত্র।
দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়
সম্পাদিত
অবলাবান্ধব (নবপর্য্যায়)
প্রসঙ্গ: নারী

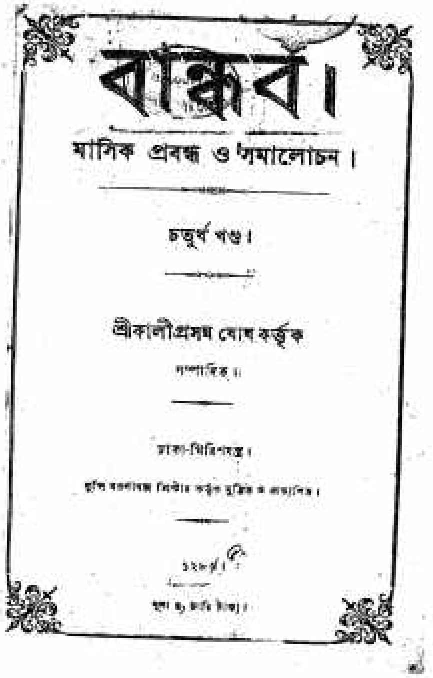
বান্ধব।
মাসিক প্রবন্ধ ও সমালোচন।
চতুর্থ খণ্ড।
শ্রীকালীপ্রসন্ন ঘোষ কর্ত্তৃক
সম্পাদিত।
ঢাকা-গিরিশযন্ত্র।

Dhaka University Institutional Repository

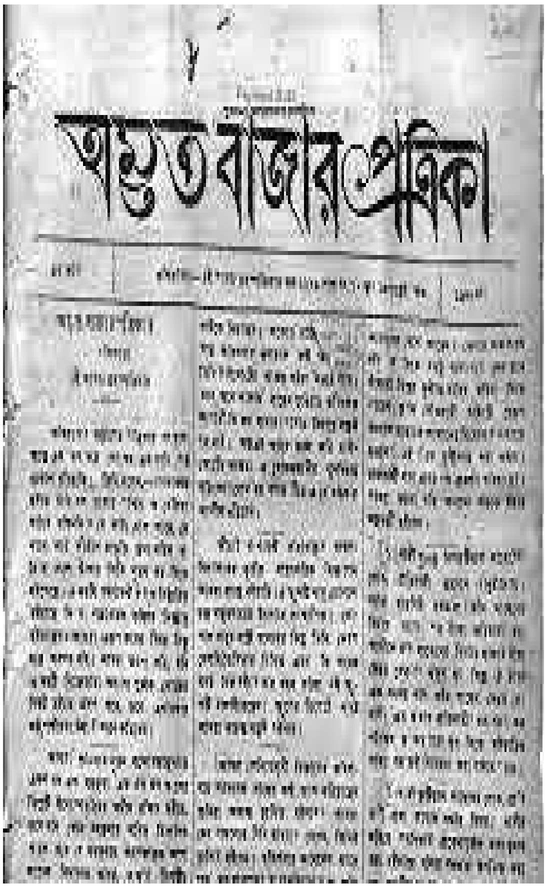
অমৃতবাজার পত্রিকা

বামাবোধিনী পত্রিকা

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

সমাচার দর্পণ

সোমপ্রকাশ

বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদর্শন।

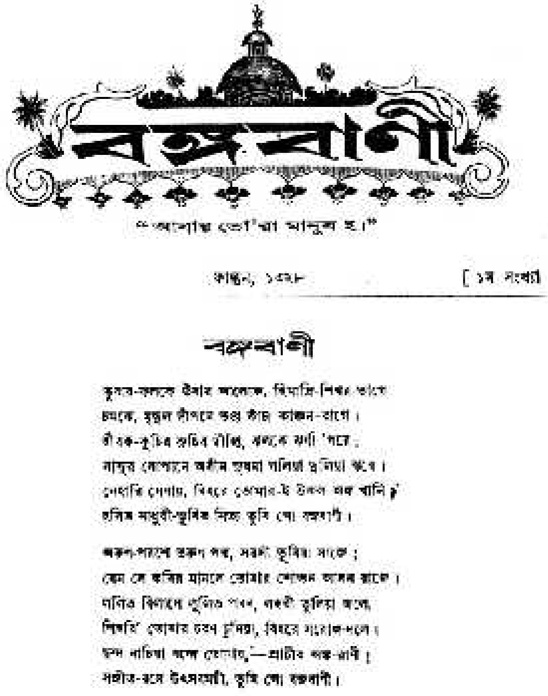

বঙ্গবাণী

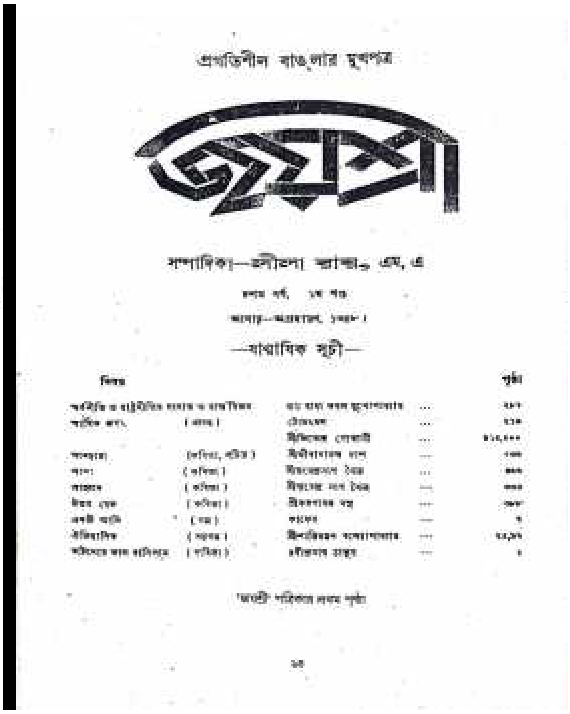

প্রগতিশীল বাঙলার মুখপত্র

জয়শ্রী

সম্পাদিকা—শ্রীলীলা নাগ, এম, এ

—যাণ্মাসিক সূচী—

ঢাকাপ্রকাশ

অরুণোদয়

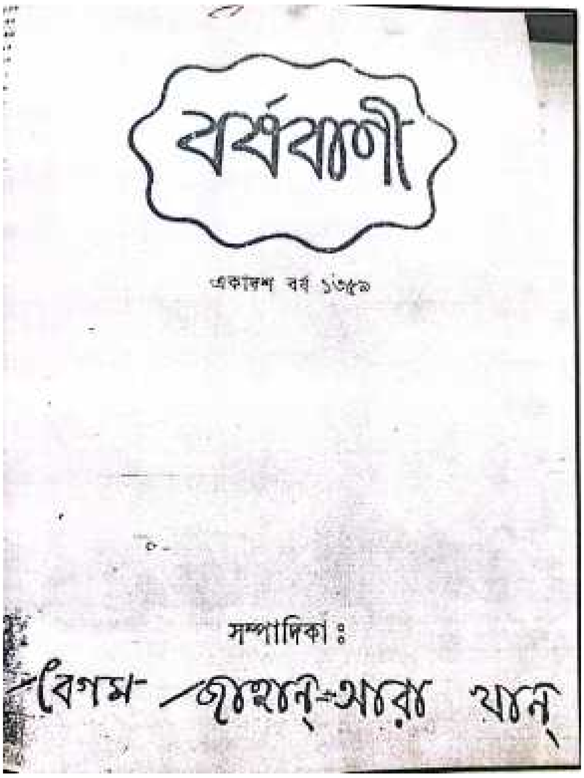

বুলবুল পত্রিকার প্রচ্ছদ

ছবিসূত্রঃ ইন্টারনেট

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-৫

নারীশিক্ষা সম্পর্কে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন ও ফজিলাতুন্নেসার দুটি লেখা

EDUCATIONAL IDEALS FOR THE MODERN INDIAN GIRL

Mrs R.S. Hossain's Interesting Paper

From the most ancient times there has existed in India a system of education which though distinct in its characteristics and ideals from the modern western system has produced great men and earnest seekers after truth. This ancient Indian Education developed in the early period of history the science of grammer and mathematics. It has enabled India to made the mark in the sphere of high philosophy and metaphysics. Conditions of life have changed considerably from those prevalent in those early days and to work out without many essential modifications ancient theories and practices in education is by no means a practical proposition. Yes we must seek the elements of value in our ancient heritage. We must assimilate the old while holding to the now. Thus will we render more beneficial our present educational system the great defect of which is that it is an exotric in an alien soil. It is unsuited to our needs and requirements and incapable of developing the distinctive thread of our national thought and culture.

If education is described as the preparation for life or for complete living the Indian educator had formed of it a true and valuable conception. The ancient curriculum was not confined to mere book-learning. It included many more things. Physical dovelopment received its due share of attention. In those early days little was known of our vast expenditure on costly

Dhaka University Institutional Repository

buildings. The place of instruction outdoor under the shade of a tree, in a natural environment which impressed what was was learnt all the more deeply on the mind. The student's life was, more over, one of healthy activity for he had to work for the teacher in his house and on the field, looking after his cattle and even collecting alms for him. Moral education was similarly not neglected. The period of studentship was a time for vigorous desciplinc. Rigid rules were laid down for the conduct of the pupils including hygienic, moral and religious precepts and the regulation of good manners. Implicit obedienc was expected and obtained from the student by the teacher and there were elaborate rules for the respect due to the latter.

The modern demand is for an education which develops all the faculties, physical, moral and mental. From what we know of the ancient system of education in this aim. Those were days before science was known or had changed the possibilities of existence. Yet in this civilised and advanced generation we must acknowledge the value of Indian methods. The necessity for open air schooling as far as practicable is emphasised by us today. Healthy outdoor sports are recommended to keep up the physipue of the student and the value of moral training is endersed. We are thus advancing in a right direction. What we should recognise, however is that our educational goal is age old. We are not experimenting with new fangied ideas but are adopting traditions or our ancient system in introducing what we consider are twentheith century educational reforms. Thus progrese be accelerated, for the indian mind is slow to accept innovalone but that which is traditional and of proved utility finds ready favour.

Religion is a tremendous force and the chief concerns of all Asiatic people. From start to finish Eastern philosophy and literature are religious. In India religion has pervaded education as all things else. The very purpose of education in the early ages was religious, namely, to train young Brahmans for their duties in life as priest and teachers of others. Thus the spiritual side of education wa greatly stresse. The idea of educational discipline was extended to the whole of life and the theory of Asrams or stages those of student, house holderm hermit and wandering ascetic was developed. The student was first to acquire learning. He was next to enter upon the 2nd stage that of grihasta or house holder. Then after having brought up a family and done his duty in the world he would enter upon the life of a Vanprastha or forest harmit and later become a `Sannyasi' or wandering ascetic. The ancient Brahmanic education was therfore not only a preparation for the life but for a future existence as well.

In this utilitarian age when religion is trested as obsolete and the all engrossing objective ordinarily are personal ambition and the advancement of material prosperity it becomes all the more necessary for us to retain our ancient ideals. We should try as in the past to teach true values and give the students a guidance for all duties and relations of life... the practical duties

Dhaka University Institutional Repository

of life, at a later stage of history in Indias (as in the Middle age in Europe) a tendency arose to life. The current philosophy taught the unreality of the world and that the highest wisdom was to... release from worldly fetters. But Islam has disaproved strongly of extreme other worldliness. The Holy Quaran has declared against the monsatic life, for if all were to forsake the world and good in the hereafter", our sin should be to hermonise in due proportion the two purposes, spiritual and secular in the education we impart. Much can be done in zaccomplishing this aim by impressing on the girls the excellence of our ancient ideals and of the life of great national heroes.

One of the most notable characteristics of indian educational ideals is the relation between pupil and teacher. The Indian system knew nothing of a large institution or a large class of pupils tought togeter. There was usually one teacher for a few pupils from the beginning to the end of his period of studies. Thus individual attention was given. A family relationship sprang up between teacher and pupils which had a high moral effect. "In the most", writes an educationist "It is the Institution rather than the teacher which is emphasised and it is the school or college which a student regards as his 'Alma mater'. In india it is the teacher rather than the Institution that is prominent and the same affection and reverence which a western student has for his `Alma mater' is in India bestowed with a life long devotion upon the teacher", It is not desirable or practicable in this democratic age when a general spread of education should be our aim to abolish large Institution. But we may with benefit repuire of the teacher the high responsibility of moulding the character of the pupil by personal influence and example. We must repuire of our teachers a high intellectual moral and spiritual standard and our aim should be to work for a condition which shall make such a class of teachers availbale. The teaching profession is one of the noblest in the world. Its responsibilities and opportunities both require to be incressed.

The state of the education of women in India has for long centuries been deplorable. In the early Aryan period women held a position of authority and honour. We are told in the `Upa nishads' of women who took part in deep discussion on philosophical truths and the authorship of some Vavic hymna is ascribed to them. Yet even in the Rigg Veds there are indications that women were coming to be looked down upon as inferior beings who should remain in subjection to men. Education for women has therefore become aynonymous with us for breaking the barrior of ancient custom which shut them from learing. When we advocate the education of girls we generally imply the adoption of western methods and ideas in their training to the exclusion of all that is Indian. This mistade on our part cannot be too strongly guarded against. We should not fall to set before the Indian girl the great and noble ideals of womenhood which our tradition has developed. This ideal was narrow and circumscribed in the past. We may dnlarge and widen it thus incressing its excellence but what we should avoid

is its total neglect and a tendency to slavish imitations of Wastern custom and rradition. In the past, with a few exception our women were not noted for scholastic attamments. Their sphere was the domestic. Yet in the obscurity of their lives they conducted their duties with capacity and considerable amount of... and care. Their fingers were toilworn. The cares of family, the effort to advance the happiness of others, these engrossed them. They were loyal and steadfast in times of endurance and hardship and proved to be in the words of the Mahabharata——

"A companion in solitude a father in advice. A rest in passing through life's wilderness".

We should by all means broaden the out-look of our girls and teach them to moderanise themselves. Yet they should be made to realise that the domestic duties entrusted to them cover a task on which the welfare of the country depends. They should not fall behind their illiterate sisters in splindid endurance, heroism and discipline. We should teach our girls if they are to fulfil their heavy duties commendably, above all to concentrate on desires and efforts which are not superficial. We should teach them that the art of happiness lies just in discipline, that service should be their watchword, even though that service may not be more than a detemination "not to a by add transient sigh to the sum total of the world's unhappiness."

In ancient India the arts and crafts were not negleted. The caste system with its many disadvantages, helped to foster them and keep up the standard of work. The dex terity and skill of each particular trade was handed down from father to son. The teaching was by handling and observing real things and unconsciously the boy picked up from his father many secrets of the trade. The encouragement of kings and great nobles was also responsible for the production of really fine work. But in these days the tradition of vocational traning has disappeared in India. Patents give no thought to the career which their boy or girl adopted by temperament to adopt, all that they desire being that their child should obtain a hallmark of the University, a degree I feel tempted to quote from a poem by Justice Akbar, which runs thus——

"Tifl men bu a'e Keya ma bap atwar kee, Dooth to dibbe ka hai, Ta'llm hai Sircar Kee"

That is, How can the infant get any scent of
its parents' character.
While it is fed on tinned milk and gets educated
by the Government?

The ancient tradition of vocational training (although this training must be given today under changed circumstances) must be revived by active propagands.

The future of India lies in its girls. The development of its educational system on proper lines is therefore a question of permanent importance.

Dhaka University Institutional Repository

Although India must learn many lessond from the West. to impose on it the western system without modefications to make it suitable to us is a huge mistake. India must retain the elements of good in her age old traditions of thought and methods, It must retain her social Inheritence of ideas and emotions, while at the same time by incorporating that which is useful from the West a new educational Practice and tradition may be envolved which will transcenq both that of East and the West.

In short our girls should not only obtain University degrees but must be ideal daughter. wives and mothers or I may say obedient daughters, loving sisters, dutiful wives and Instructive mothers.

সূত্রঃ মুহম্মদ শামসুল আলম, রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনঃ জীবন ও সাহিত্যকর্ম, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৯, পৃ. ২৬৫-২৬৯

Dhaka University Institutional Repository

নারী জীবনে আধুনিক শিক্ষার আস্বাদ

মিস ফজিলাতুন্নেসা এম.এ.

সুন্দর করে একটি প্রবন্ধ সৃষ্টি করবার জন্য যা কিছুর বড়ো প্রয়োজন সে চিন্তাশীলতা বা জ্ঞানের গভীরতা আমার নেই। তাই আপনাদের নিকট আমার অনুরোধ এই যে, একে প্রবন্ধ হিসেবে বিচার না করে শুধু আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা প্রসূত সামান্য দু একটি কথা বলেই গ্রহণ করবেন।

নারী জীবনে আধুনিক শিক্ষার আস্বাদের রূপটি ফুটিয়ে তোলার ভার আপনারা একটি নারীকেই দিয়েছেন, কিন্তু এমন সিদ্ধান্ত কি বাস্তবিকই কিছু আছে সেটা বিশ্বজননী অনুভূতিরই ফল? একই জিনিসকে মানুষ তার প্রবৃত্তি ও প্রবণতা অনুসারে সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে দেখে থাকে এবং তার থেকে যেটুকু রস গ্রহণ করে থাকে তারও স্বাদ সম্পূর্ণ বিভিন্ন। আমিও তাই একান্তভাবে আমারই অনুভূতিলব্ধ কয়েকটি কথা বলব।

আধুনিক শিক্ষা যা কিছু আমি আমার জীবনে পেয়েছি তাতে হয়ত ভুল পাওয়ার পরিমাণই বেশি। বুদ্ধির ত্রুটিতে অনেক জায়গায়ই আমি বঞ্চিত এই কথাটা মনে রেখে আজ আপনারা আমার সবকথা গ্রহণ করবেন।

নারীজীবনে আধুনিক শিক্ষার আস্বাদ সম্বন্ধে বলতে হলে আমি বুঝি যে আধুনিক শিক্ষার সংস্পর্শে এসে নারী জীবন কিছু নতুন উপলব্ধি নতুন চেতনা

২৬৩

লাভ করেছে কিনা এবং যদি লাভ করে থাকে তবে সেই নারীত্বটুকু তার জীবনে কোন রস জাগিয়ে তুলেছে তারই আলোচনা। আরো ব্যাপকভাবে নিলে একথাও বলা যায় যে, এই শিক্ষার সাহায্যে আপনাকে জানবার ও বুঝবার জন্য মানব হৃদয়ে যে অনন্ত কামনা তাকে নারী এতটুকুও চরিতার্থ করতে পারছে কিনা তাই এ আলোচনার উদ্দেশ্য।

প্রথমেই আমরা দেখতে পাই যে, আধুনিক শিক্ষা প্রণালিতে ভুলত্রুটি যতই থাক না কেন, তবু নারী জীবনে তা মধুরতার স্বাদই এনে দিয়েছে। তার পরিচয় আমরা নারী-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে নবোদ্বুদ্ধ চেতনাতেই পেয়ে থাকি। যদি আমরা অতীত নারী-জীবনের সঙ্গে বর্তমান নারী-জীবনের তুলনা করে দেখি তবেই এ মধুরতা এ নতুন আত্মোপলব্ধির চেষ্টার রূপটি পূর্ণ হয়ে আপনি এসে আমাদের চোখে ধরা দেবে। এ আলোচনায় আমরা শুধু এটুকুই দেখব যে, আধুনিক শিক্ষার প্রচলনের পূর্বে নারী এ সুখদুখ প্রভৃতি নানারসে ভরা জীবনকে কীরকমভাবে পেয়েছিল এবং এই শিক্ষার আলোকে এস্তাসিত নবীন চেতনার সাহায্যেই বা তাঁরা তাঁদের জীবনকে কীভাবে পাচ্ছেন। এখানেই মতান্তরের সৃষ্টি। কিন্তু বিভিন্ন মতবাদকে দূরে রেখে কিছুক্ষণের জন্য আমরা ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে দেখব।

স্রষ্টা আদমকে সৃষ্টি করলেন কিন্তু বেহেশতে আদম নানা সুখে থাকলেও কিসের এক অজানিত অভাবে তিনি ম্রিয়মান হয়ে পড়তেন। তখন সেই অভাবব পূরণ করা হল যাকে দিয়ে তিনি হলেন আনন্দরূপিনী নারী। এক্ষেত্রে নর-নারী সৃষ্টির উদ্দেশ্য হিসেবে যদি আমি বলি যে ''নারী ও পুরুষ

পরস্পরের complement একে অন্যের substitute নয়'' তাহলে বোধ হয় আপনারা অস্বীকার করবেন না।

তারপরই আমাদের যে সবচেয়ে পুরান ইতিহাস পাওয়া যায় তাতে দেখি যে নরনারী জীবনযাত্রার পথে সৃষ্টির এ মূল উদ্দেশ্যটি ভুলে যাননি। গৃহের অভ্যন্তরে ও বাইরে সর্বত্রই নর-নারী পরস্পরের সঙ্গী। শিক্ষার ক্ষেত্রে তাদের জ্ঞান, চিন্তা ও সৃষ্টির স্রোত পাশাপাশি বয়ে চলছে। কর্মের ক্ষেত্রেও তাই, প্রয়োজন অনুসারে হয়ত কোনো কোনো ক্ষেত্রে কারো দায়িত্ব বেশি রয়েছে, কিন্তু কোথাও একের জীবন অন্যের জীবনের বিকাশে পরিপন্থী হয়ে উঠছে না। কী এক অপূর্ব চেতনা তাদের জীবনকে রসে, গন্ধে, গানে ভরে দিয়ে পূর্ণ করে সুন্দর করে তুলেছে। কিন্তু এই বিশিষ্ট চেতনার জ্যোতি চিরদিন এমনি উজ্জ্বল রইল না। নানা ঘাত-প্রতিঘাতে যে শিক্ষা পদ্ধতি তাদের উপলব্ধি এনে দিয়েছিল, সে পদ্ধতি ধীরে ধীরে আবিল হয়ে এল, তাতে আর প্রাণ রইল না, রইল শুধু আচার বিচারে বাহ্যিক আবরণ। তাই ধীরে ধীরে সে চেতনাও ম্লান হতে হতে একেবারেই নিভে গেল। যে শিক্ষার প্রভাবে একটি অপরূপ চেতনা নরনারীর জীবনকে সুখময় করে তুলেছিল, সে শিক্ষা ও সে চেতনা একেবারেই লুপ্ত হয়ে গেল।

কিন্তু এই হারিয়ে ফেলার মাঝেও পুরুষ আপনাকে কিছু বাঁচিয়ে রাখল। একান্তভাবেই আপনাকে হারাল নারী। সে যে মানুষ-জীবনের বৈচিত্র্য থেকে রস গ্রহণ করবার অধিকার যে তারও আছে, এ জ্ঞান তার নিঃশেষেই লোপ পেল এবং সে সঙ্গেই তার বেঁচে মরে থাকা শুরু হল। তার জ্ঞান লাভের পথ, প্রতিভার স্ফূর্তির পথ সব নষ্ট হয়ে গেল। কর্তব্যজ্ঞান, আত্মসম্মান-জ্ঞান

২৬৫

বিলুপ্ত হল। পুরুষের ইচ্ছার কাছে নিজেকে নত করে, আচারের দাসত্বে আপনাকে একান্তভাবে বিকিয়ে দিল। নারীর জীবনে বাকি রইল শুধু ব্যর্থতা আর বেদনার হাহাকার।

আজ যে যুগের অবসান হয়েছে, আজ নবীন ভাবের নব নব বন্যা জগতের মানব হৃদয়ে প্রবাহিত। এই স্রোতের বেগ কোনো দেশেই একেবারে রুদ্ধ করতে পারেনি। তাই এর আলোড়ন আমাদের এ নিশ্চেষ্ট অসাড় নারী জীবনেও অনুভূত হচ্ছে। এ ভাবের প্রধান বাহন হয়েছে আধুনিক শিক্ষা। এখন আলোচ্য বিষয় হচ্ছে এ আলোড়নের ফলে নারী কী পেয়েছে?

সে কথাটাই আমি আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে সকল মতবাদ আলোচনা করে বলতে চাই।আমি বলতে চাই যে এ শিক্ষা নারীকে পূর্ণতা দিতে না পারলেও মুক্তি দিতে না পারলেও পুনর্জন্ম দিয়েছে। সে আপনার প্রাণের অস্তিত্ব ভুলে গিয়েছিল, তাকে সে বেঁচে থাকবার অধিকার সম্বন্ধে সচেতন করে তুলেছে। এ তার সার্থকতা। নারী জীবনে আধুনিক শিক্ষার আস্বাদ তাই মধুর হয়েছে। অবশ্য একথা বলবার মতো স্পর্ধা আমার নেই যে আধুনিক শিক্ষার আস্বাদ-লাভে নারী-জীবন বর্তমানে সবরকমই মধুর ও সুষমামণ্ডিত হয়েছে, আমি জানি যে এ শিক্ষার মধ্যে ত্রুটি অনেক আছে এবং এ শিক্ষার সংস্পর্শে এসে অনেক জীবনই বিপরীত পথে চালিত হয়েছে। আমি শুধু এটুকু বলতে চাই যে এ শিক্ষা সর্বজনীনভাবে নারীকে তার মনুষ্যত্ব সম্বন্ধে সচেতন করেছে। তাকে এ বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবনের রস গ্রহণ করতে শিখিয়েছে। তাই এর আস্বাদ আমাদের কাছে বড়ো মধুর।

২৬৬

Dhaka University Institutional Repository

কেউ কেউ বলে থাকেন যে, এ শিক্ষা নারীকে অন্তর্মুখী হতে না শিখিয়ে বহির্মুখী করে তুলেছে। নারীর একমাত্র কর্মক্ষেত্র গৃহাভ্যন্তর হতে তাকে বাইরে নিয়ে এসেছে। এতে নারী জীবনের আসল উদ্দেশ্য সফল হতে পারছে না। কিন্তু আমার মনে হয় এ তর্ক এখানে না তুললেও চলে। মানুষকে মনুষ্য-পদবাচ্য করতে সাহায্য করাই শিক্ষার প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য। একথা আমাদের মনে রাখতে হবে যে কোনোরকম সম্পূর্ণ শিক্ষা পদ্ধতি আজ পর্যন্ত পাওয়া সম্ভব হয়নি। এবং হয়ত ভবিষ্যতেও পাওয়া সহজ হবে না। কাজেই যে শিক্ষা আংশিকরূপেও সে উদ্দেশ্য সাধনে সামর্থ হয়েছে সেটা কি নারী পুরুষ সবার জীবনেই সার্থক। তাই যে শিক্ষা নারীকে এত বড়ো অনুভূতি এনে দিয়েছে তাকে নারী জীবনে নিরর্থক বলে অবহেলা করব কোন সাহসে? হয়ত সে শিক্ষা ঠিক পথ খুঁজে নিতে সাহায্য করেনি কিন্তু তবুও তো সে প্রাণের সাড়া জাগিয়ে দিয়েছে। এত বড়ো দানকে কি অগ্রাহ্য করা যায়?

যত বড়ো ভুল পথেই অগ্রসর হউক না কেন নারী তো আজ এ শিক্ষার বলেই জীবনের একটা উদ্দেশ্য খুঁজে পেয়েছে। ''আমরা জীবনকে জানব'' এ দাবি তো তাঁরা বিশ্ব সম্মুখে আনতে পারছে। কীভাবে জানবে, কোন পথে জীবন সম্বন্ধে তাদের সত্য উপলব্ধিটি সহজ হবে তাই নিয়ে মতভেদ করে লাভ কী? কী যে হওয়া উচিত সে বিষয়ে যথার্থ কজন ভাবতে পারে? এক্ষেত্রে নর বা নারীর প্রকৃতি তাকে যে পথে যাত্রা করতে উদ্বুদ্ধ করে সে পথেই তাকে যেতে দেওয়া বোধ হয় শ্রেয়। আগেই বলেছি যে নরনারী সকল ক্ষেত্রেই পরস্পরের complement. কাজেই তাদের কর্মক্ষেত্র বিশিষ্টরূপে সীমাবদ্ধ করে দেওয়া যায় না। নারী যদি তার জীবনের পূর্ণ বিকাশের পক্ষে বহির্মুখিতাকেও প্রয়োজনীয় মনে করে তাহলে তো তার বিরুদ্ধে কোনো কথা

বলা চলে না। আর যে শিক্ষা তাকে এই প্রয়োজনটুকুর কথা ভাবতে শিখিয়েছে তাকেও নিরর্থক বলা চলে না। বরং একথা স্বীকার করতেই হয় যে ভাবতে শিখিয়ে মনুষ্য পদবাচ্য করে তুলেছে বলেই এ শিক্ষার আস্বাদ বর্তমান নারী জীবনে কাম্য হয়েছে।

আজ নারীর মুখে লুপ্ত হাসি ফুটে উঠেছে। বহু বছর পর্যন্ত অজ্ঞানতার অতল স্পর্শ গর্তে থেকে আজ তার উত্থান হয়েছে। বহু বছর অন্যায় অত্যাচার সয়ে নারীর ধৈর্যচ্যুতি হয়েছে। আজ তাদের লুপ্ত অধিকার ফিরিয়ে নেবার দিন এসেছে।

যে সমাজ নারীকে এতখানি হীন করে রেখেছিল, আজ নব্য শিক্ষার গুণে নারীই আবার জয় গৌরবের চরম শিখরে আরোহণ করে বিজয়ী বীরের মতন সেই সমাজের নিকট হতে জয়মাল্য আদায় করে নিচ্ছে। শিক্ষার স্বাদ পেয়ে আজ নারী পুরুষের কাছে নিজের অধিকার দাবি করবার সাহস ও শক্তি পেয়েছে।

পূর্বে স্ত্রী স্বামীর সহধর্মিনী মাত্র ছিল, এখন সহ-কর্মিনী। শিক্ষিতা নারী স্বামীর ওপর ধর্ম ও কর্মের বোঝা চাপিয়ে পাপের বোঝা বাড়িয়ে তোলে না, স্ত্রীই তাঁকে সকল বিষয়ে সাহায্য করে তাঁর পরিশ্রমের কষ্ট লাঘব করে দেয়।

কয়েক শতাব্দী পূর্বে পুরুষ যে নারীকে পদদলিত করে চলে গেলে যন্ত্রণায় তার বুক বিদীর্ণ হলেও তবে মুখে ভাষা ফুটত না, আজ সেই মূক নারীর মুখে ভাষা ফুটেছে। নব্যশিক্ষা নারীকে তার নারীত্বের গৌরব, নারীত্বের মর্যাদা

ভালো করে বুঝিয়ে দিয়েছে।যেখানে স্নেহ নেই, মমতা নেই, সম্মান নেই আছে কেবল পরাধীনতা, অন্যায় অবিচার, আধুনিক শিক্ষা সেখানে স্বাধীনতা ও পূর্ণ অধিকার জোর করে আদায় করবার সাহস দিয়েছে। নারীকে আজ প্রান খুলে বলতে শিখিয়েছে ''স্বাধীনতা চাই, আত্মার মুক্তি চাই''। নারীকে আজ বলতে শিখিয়েছে ''আমরা অজ্ঞতার কালো আবরণে আর ঢাকা থাকব না, আমরা অত্যাচারী স্বেচ্ছাচারী পুরুষের পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙে চূর্ণ বিচূর্ণ করব। আমরা জ্ঞানের আলোকে দীপ্ত হয়ে সেই আলোকে বিশ্ব-জগৎ উদ্ভাসিত করব, প্রতিগৃহে মঙ্গলদীপ জ্বালিয়ে জগতের মহৎ কল্যাণ সাধন করব। আমরা স্নেহে মমতায়, দয়ায়, সেবায়, ঘরে ঘরে শান্তি বারি সিঞ্চন করব। আমরা কুসংস্কার পদদলিত করে জগতের মঙ্গলার্থে অগ্রসর হব''।

নবাশিক্ষা ভারতের ঘরে ঘরে প্রত্যেক নারীকে জাগবার ও সমস্বরে স্বাধীনতা চাইবার দীক্ষায় দীক্ষিত করুক এই আমার আন্তরিক কামনা। আমার বক্তব্য বিশেষ কিছুই নেই, তবু যেটুকু বলতে চাই তাকেই পরিস্কার করে বলতে যেয়ে একই কথা অনেকবার বলে আপনাদের ধৈয ও সময় নষ্ট করেছি। আশা আকাঙ্ক্ষা দুঃখের বিচিত্রতায় জীবন যে পূর্ণ এ চেতনা নারী হৃদয়ে জাগিয়ে তুলতে সাহায্য করে যে শিক্ষা নারীকে জীবনের পূর্ণ পাত্রের রস আস্বাদনে সাহায্য করেছে, সে শিক্ষাকে আমার জীবনে আমি বড়ো করেই পেয়েছি একথা বলেই আজ আপনাদের কাছে বিদায় নিচ্ছি।

নির্বাচিত সংকলন ; মাসিক জাগরণ পত্রিকা
হাবিব রহমান সম্পাদিত

প্রকাশক, ঐতিহ্য ঢাকা
প্রকাশকাল, ২০০৫ সাল
পৃষ্টাঃ ৯৬-১০০

সূত্রঃ দেবশ্রী মুখার্জি, ফজিলাতুন্নেসাজোহা ও তৎকালীন বাংলার মুসলমান নারী সমাজ (১৯০৫-১৯৪৭), অপ্রকাশিত পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০২১, পৃ. ২৬৩-২৭০

সহায়ক তথ্য ও গ্রন্থপঞ্জি

১. প্রাথমিক ও আকর তথ্য-উৎস

ক. দাপ্তরিক রেকর্ডস ও প্রসেডিংস

A Note on Muhammadan Education by the Hon'ble Mr. A k Ghaznavi to be considered by Muhammadan Educational Advisory Committee, Calcutta, 1915

General Report on Public Instruction in Bengal for 1873-74, Calcutta, Bengal Secretariat Press, 1875

General Report on Public Instruction in the Bengal Presidency for 1842–43. Calcutta: Military Orphan Press, 1843

Progress of Education in Bengal 1932-37, Alipore, 1939

Progress of Education in India, 193-1947. Decennnial Review. 2 Vols. New Delhi, Government of India

Progress of Education in Bengal: 1902-03 to 1906-07: Third Quinquennial Reivew, Calcutta, Office of the Superintendent of Government Printing, 1907

Progress of Education in Bengal: 1907-08 to 1911-12 Fourth Quinquennial Review, Calcutta, Bengal Secretariat Book Depot, 1913

Progress of Education in Bengal 1932-37, Alipore, 1939

Progress of Education in India: 1881-1886: First Quinquennial Review, Calcutta, 1888

Progress of Education in India: 1887-88 to 1891-92: Second Quinquennial Review, Calcutta, 1893.

Progress of Education in India: 1892-93 to 1896-97: Third Quinquennial Review : London, Darlings Sons, 1898

Progress of Education in India: 1897-98 to 1901-02: Fourth Quinquennial Review, Calcutta, 1904

Progress of Education in India: 1902-03 to 1906-07: Fifth Quinquennial Review, Calcutta, 1909.

Proceedings of the Provincial Mohammedan Educational Conference, Eastern Bengal and Assam, Dhaka, 1906

Proceedings of the Provincial Mohammedan Educational Conference, Eastern Bengal and Assam, Mymansingh, 1908

Proceedings of the Provincial Mohammedan Educational Conference, Eastern Bengal and Assam, Bogra, 1910

Proceedings of the Provincial Mohammedan Educational Conference, Eastern Bengal and Assam, Bogra, 1911

Report on Public Instruction in Bengal 1932-33, p.31; *Seventh Quinquennial Review on the Proceedings of the Ist sitting of the Sub-Committee for Mohammedan Female Education, 5 March, 1908*

Proceedings of the Ist sitting of the Sub-Committee for Mohammedan Female Education, 2 March, 1908
Proceedings of a meeting of the Sub-Committee for Mohammedan Female Education, 10 June, 1908
Proceedings of the Government of Bengal on Education, upto 1940, West Bengal State Archives, Calcutta. Reports on the Newspapers, 1877-1930, West Bengal State Archives, Calcutta
Report on the progress of Education in Eastern Bengal and Assam, During the years 1907-1908 to 1911-1912, vol. I, p. 101, Para 229
Proceedings of the Bengal Legislative Council, vol. XLIX, 1917
Quinquennial Report on Female Education for the Dacca circle 1917-18, 1920 -22
'Questions relating to Female Education Reports' *Proceedings & Papers Female Education Committee, Eastern Bengal and Assam,* 1908-12, Vol. I
Report on the Female Education in the Presidency and Burdwan Divisions, 1917, p. 8: *Report on Public Instruction in Bengal 1920-22*
Report on Public Instruction in Bengal 1932-33, p.31; *Seventh Quinquennial Review on the Report on Public Instruction in Bengal, 1922-23*
Report of the Moslem Education Advisory Committee, 1934
Report on Public Instruction in Bengal, 1922-23,
Report of the Moslem Education Advisory Committee, 1934
Report of the Legislative Council of Eastern Bengal and Assam, 6 April 1908, Part-6
Report on the Sub-Committee for Female Education among *Mohammedans,* Dacca, 20 December,1908
Report on the progress of Education in Eastern Bengal and Assam, During the years 1907-1908 to 1911-1912, vol. I
Review of Education in Bengal: 1892-93 to 1896-97: First Quinquennial Review, Calcutta, Office of the Superintendent of Government Printing, 1897
Review of Education in Bengal: 1897-98 to 1901-02: Second Quinquennial Review, Calcutta, Office of the Superintendent of Government Printing, 1902
Seventh Quinquennial Review on the Progress of Education in Bengal 1920-22, 1926-27
Supplement to the Progress of Education in Bengal 1912 -13 to 1916- 17 (Fifth Quinquennial Review), Calcutta 1918
The Eastern Bengal Assam Gazette, Part VI, May 13, 1908, 21 April, 1909

খ. সমসাময়িক লিখিত গ্রন্থাবলি

Adam, William — *Reports on the State of Education in Bengal of 1835 &1838* (ed.) by A Basu, Calcutta University, Calcutta, 1941
Ali, Syed Ameer — *Muhammadan Education and Muhammadan Society,* Presidential Address deliverd at the Muhammadan Educational Conference of 1899, Calcutta, 1900
Benerjee, K Mohan — *A Prize Eassay an Native Female Education,* Calcutta, 1841
Chapman, Priscilla — *Hindoo Female Education,* R. B. Seeley and W. Burnside, London, 1839

Ghose¸ J C (ed.) *The English Works of Raja Rammohan Roy,* S. Roy,, Calcutta, 1901
Haq, Muhammed Azizul *History and Problems of Muslem Education in Bengal*, Calcutta, 1917
Hunter, W.W, *The Indian Musalmans,* Trubner and Company, London, 1876
A Statistical Account of Bengal, Volume. II, (Districts of Nadiya & Jessore), Trubner & Co., London, 1875
Karim, Abdul, *Muhammadan Education in Bengal,* Calcutta, 1900
Law,Nagendranath *Promotion of Learning in India During Muhammadan Rule,* Longmans (Green), London, 1916
Lovett, Richard *The History of the London Missionary Society, 1795-1895,* Oxford University Press, London 1899
Long, James *Hand Book of Bengal Mission,* London 1848
Mahmood, Syed *A History of English Education in India (1781-1893),* M A O C, Alighare, 1895
Marshman, J. C. *Life and Times of Carey, Marshman and Ward*: *Embracing the History of the Serampore Mission.* vol.2, Longman Brown, London, 1859
Mill, John Stuart, *The Subjection of Women,* Longman, London, 1929
Mitra, Peary Chand *A Biographical Sketch of David Hare,* W. Newman & Co., Calcutta, 1877
Richey, J.A. *Selection from Educational Records.* Part II, 1840-59, Calcutta, 1922
Urquhat, M M *Women in Bengal,* Y M C A, London, 1925
Winks, Joseph Foulkes (ed.) *The Baptist Reporter & Tract Magazine,* Simpkin and Marshall, Londond, January, 1843
Wollstonecraft, Mary *A Vindication of the Rights of Men*, J. Johnson, London, 1790
A Vindication of the Rights of Woman, J. Johnson, London, 1792

চৌধুরী, দেবীপ্রসন্ন রায় *নারীশিক্ষা* ২ খণ্ড, বামাবোধিনী সভা, কলকাতা, ১৮৬৮
চৌধুরাণী, সরলাদেবী *জীবনের ঝরাপাতা*, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৭৫
ঘোষ, কালীপ্রসন্ন, *নারীজাতি বিষয়ক প্রস্তাব,* কলকাতা, কাব্যপ্রকাশ প্রেস, ১৮৬৯
ঘোষ, গিরিশচন্দ্র *পাঁচকনে*, কলিকাতা, ১৮৯৬
তর্করত্ন, তারাশঙ্কর, *ভারতবর্ষীয় স্ত্রীগণের বিদ্যাশিক্ষা*, কলকাতা, ১৮৫০
দত্ত, গুরুসদয় *সরোজনলিনী*, কলিকাতা, ১৯২৬
দাসী, রাসসুন্দরী *আমার জীবন*, কলেজ স্ট্রিট পাবলিকেশন প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৩৫৯
দেবী, নিস্তারিণী, *সেকেলে কথা, আত্মকথা*, নরেশচন্দ্র জানা সম্পাদিত, ২য় খণ্ড, কলকাতা, ১৯৮২
দেবী, বামাসুন্দরী *কি কি কুসংকার তিরোহিত হইলে এদেশের শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে*, কলিকাতা, ১৮৬১
দেবী, রাস সুন্দরী *আমার জীবন*, কলকাতা, ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ
দেবী, শ্রীমতী কৈলবাসিনী *হিন্দু মহিলাগণের হীনাবস্থা*, কলিকাতা, ১৭৬৫ শকাব্দ
হিন্দু অবলাকুলের বিদ্যাভ্যাস ও তাহার সমুন্নতি, কলিকাতা, ১৭৮৭ শকাব্দ
বন্দ্যোপাধ্যায়, কামাখ্যাচরণ *স্ত্রীশিক্ষা*, কলিকাতা, ১৩০৪ বঙ্গাব্দ
বসু, রাজনারায়ণ *আত্মচরিত*, কুন্তলাইন প্রেস, কলিকাতা, ১৩১৫ বঙ্গাব্দ
বসু, শ্রীশশিভুষণ *রাজা রামমোহন রায়ের জীবনী*, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, কলিকাতা, ১৩১৮ বঙ্গাব্দ
বিদ্যারত্ন, শম্ভুচন্দ্র, *বিদ্যাসাগর জীবনচরিত ও ভ্রমনিরাশ*, বুকল্যান্ড, কলিকাতা, ১৮৯১

বিদ্যালঙ্কার, গৌরমোহন *স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক*, ৩য় সংস্করণ, ফিমেল, জুভেনাইল সোসাইটি, কলকাতা, ১৮২৪

মল্লিক, শ্রীকুমুদনাথ *সতীদাহ*, কলিকাতা, ১৯১২

রায়, দ্বারকানাথ *স্ত্রীশিক্ষা বিধান*, কলকাতা, ১২৬৪ বঙ্গাব্দ

রায়, রাজা রামমোহন *রাজা রামমোহন রায় প্রণীত গ্রন্থাবলী* (রাজ নারায়ণবসু ও আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ সম্পাদিত), এস. এন, এস. আই, কলকাতা, ১৮৭৩

রায়, রামসুন্দর *স্ত্রী ধর্ম্মবিধায়ক*, কলিকাতা, ১৮৭১ শকাব্দ

শাস্ত্রী, শিবনাথ *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ*, এসকে লাহিড়ী এণ্ড কোং, কলকাতা, ১৯০৯

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও ব্রাহ্মনন্দ কেশবচন্দ্র, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, কলিকাতা, ১৩১৭ বঙ্গাব্দ

সিরাজী, ইসমাইল হোসেন, *স্ত্রীশিক্ষা*, ভুথনাথ পালিত কর্তক প্রকাশিত, কলকাতা, ১৯০৮

সেনগুপ্ত, বিপিনমোহন *হিন্দুমহিলা*, কলকাতা, ১৮৬৮

সেন, চন্দ্রকান্ত *বামাসুন্দরী বা অর্দশ নারী*, কলকাতা, ১৩১৬ বঙ্গাব্দ

হোসেন, রোকেয়া সাখাওয়াত, *অবরোধবাসিনী*, নারী গ্রন্থ কর্তৃক পুনর্মুদ্রিত, ঢাকা, ১৯৯৮

গ. সাময়িক পত্র ও পত্রিকা (ইংরেজি)

Amrita Bazar Patrika, Calcutta, 1868

The Bengal Spectator, Calcutta, 1842

The Bengalee, Calcutta, 1862

The Calcutta Review, Calcutta, 1844

The Moslem Chronicle, Calcutta, 1895

The Mussalman, Calcutta

The Pioneer, Allahabad, 1865

The Statesman, Calcutta, 1875

ঘ. সাময়িকপত্র ও পত্রিকা (বাংলা)

অনাথিনী, (থাকমনি দেবী), কলকাতা, ১৮৭৫

অবলা বান্ধব (দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, কলকাতা, ১৮৬৯

অমৃতবাজার পত্রিকা, (শিশির কুমার ঘোষ, মতি লাল ঘোষ), যশোর, ১৮৬৮

অরুনোদয়, (লাল বিহারী দে), ১৮৫৬

অন্তঃপুর, (বনলতা দেবী), কলকাতা, ১৮৯৮

আন্নেসা, (বেগম সফিয়া খাতুন), চট্টগ্রাম, ১৯২১

আল এসলাম, (মোহাম্মদ আকরম খাঁ), কলকাতা, ১৯১৫

ইসলাম প্রচারক, (মোহাম্মদ রেয়াজউদ্দিন আহমদ), কলকাতা, ১৮৯১

কোহিনূর, (মোহাম্মদ রওশন আলী চৌধুরী), কলকাতা, ১৮৯৮

জয়শ্রী, (লীলানাগ), ঢাকা, ১৯৩১

জাগরণ, (এম. আহ্মদ আলী), কলকাতা, ১৯২৮

জ্ঞানান্বেষণ (প্যারিচাদ মিত্র), কলকাতা, ১৮৩৬

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, (অক্ষয় কুমার দত্ত), কলকাতা, ১৮৪৩

নবনূর, (সৈয়দ এমদাদ আলী), কলকাতা, ১৯০৩

বঙ্গবাণী, কলকাতা,

বঙ্গদর্শন, কলকাতা,

বঙ্গমহিলা, (মোক্ষদায়িনী মুখোপাধ্যায়), কলকাতা, ১৮৭০
বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা, (মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ এবং মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক), কলকাতা, ১৯১৮
বান্ধব, কলকাতা, ১৮৭৪
বামাবোধিনী পত্রিকা, (উমেশদত্ত), কলকাতা, ১২৭০ বঙ্গাব্দ
বেগম পত্রিকা, (নূরজাহান বেগম), ঢাকা, ১৯৪৭
বুলবুল, (শামসুন নাহার মাহমুদ ও হাবীবুল্লাহ বাহার), কলকাতা, ১৯৩৩
মাসিক মোহাম্মদী, (মোহাম্মদ আকরম খাঁ), কলকাতা ও ঢাকা, ১৯০৩
শিখা, (আবুল হুসেন), ঢাকা, ১৯২৭
মিহির, কলকাতা, ১৮৯২
মিহির ও সুধাকর, কলকাতা
মোসলেম ভারত (কবি মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক), কলকাতা, ১৯২০
সওগাত, (মোহাম্মদ নাসিরুদ্দীন), কলকাতা ও ঢাকা, ১৯১৮
সমাচার দর্পণ (জন ক্লার্ক মার্শম্যান), কলকাতা, ১৮১৮
সহচর, কলকাতা
সংবাদ প্রভাকর (ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত), কলকাতা, ১৮৩১
সাধনা, কলকাতা ও চট্টগ্রাম
সুধাকর (শেখ আবদুর রহিম), কলকাতা, ১৮৮৯
ঢাকা প্রকাশ, ঢাকা, ১৮৬৩

২. অপ্রকাশিত পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভ

আক্তার, আনোয়ারা, পূর্ব বাংলার রাজনীতিতে নারী: ১৯৪৭-১৯৭১ খ্রি., ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০২১

খাতুন, মোছা. রূপালী পূর্ববাংলায় নারী জাগরণ ও আন্দোলন (১৯০১-১৯৭১), ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০২০

নাজনীন, মীর জাহেদা, বাংলাদেশে নারী উন্নয়নের ধারা (১৯৪৭-১৯৯৫), অপ্রকাশিত পিএইচডি থিসিস, ইতিহাস বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৯

মুখার্জি, দেবশ্রী, ফজিলাতুন্নেসাজোহা ও তৎকালীন বাংলার মুসলমান নারী সমাজ (১৯০৫-১৯৪৭) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০২১

রায়, তুফান *আত্মকথায় উনিশ শতকের সংস্কৃতি ও নারী: নারী আত্মকথা কেন্দ্রিক সমীক্ষা*, অপ্রকাশিত পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ২০২০

সুলতানা, আরিফা বাংলার সমাজ ও রাজনীতিতে নারী : ১৯০৫-১৯৪৭, অপ্রকাশিত পি এইচ ডি অভিসন্দর্ভ ইতিহাস বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা, ডিসেম্বর, ২০০৯

Biswas, Supriya, Investigating Gender Equality and Women Empowerment: A Study on the Women Associations of Colonial Bengal (1865-1943): A Thesis submitted to the University of North Bengal For the award of Doctor of Philosophy in History, Department of History University of North Bengal, 2016

Nayeem, Asha Islam, From Andarmahal to Schools: Women's Education in Eastern Bengal in the 19th and 20th Centuries., unpublished Ph.D. dissertation, University of Dhaka, 2013

৩. দ্বৈতায়িক গ্রন্থাবলি

Ahmed, Leila *Women and Gender in Islam,* Yale University Press, USA, 1992

Ahmed, Sufia, *Muslim Community in Bengal, 1884-1912,* The University. Press Limited, Dhaka, 1974

Ali, M Mohar *The Bengal Reaction to Christian Missionary Activities*: 1833-1847, The Mehrab Publications, Chittagong, 1965

Amin, Sonia Nishat, *The World of Muslim Women in Colonial Benal (1876-1939),* Lieden, 1996

Bagal, J. C. *Women's Education in Eastern India: the first Phase*, World Press Private, Calcutta, 1956

Beginnings of Modern Education in Bengal Women's Education, Ranjan Publishing House, Calcutta, 1944

Women's Education in Eastern India, World Press, Calcutta, 1956

Basu, Aparna & Ray, Bharati *Women's Struggle : A History of the All India Women's Conference 1927-1990*, Manohar Publications, New Delhi, 1990

,

Bhattacharjee, K.S *The Bengal Renaissance: Social and Political Thoughts,* Classical Publishing Company, New Delhi, 1986

Borthwick , Meredith *The Changing role of Women's in Bengal (1849-1905),* Princeton, University Press, 1984

Carpenter, Mary *The Last Days in England of The Rajah Rammohun Roy,* Trubner & Co., London, 1866

Chakraborty, Rachana *Higher Education in Bengal, 1919-1947 : A Study of its Administration and Management,* Minerva Associates (Publications) Pvt. Ltd., Calcutta, 1997

Chakrabarty, Usha *Condition of Bengali Women around the 2nd half of the 19th Century,* Calcutta, 1961

Chatopadhyay, Gautam (ed.) *Awakening in Bengal in early I 9th Century,* Progressive Publishers, Calcutta, I 905

Dani, Ahmed Hasan *Dhaka: A Record of its Changing Fortunes,* The Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka, 1956

Devendra, Kiran *Changing Status of Women in India,* Parama, Dhaka, 1998

Dil, Anwar Dil, Afia, *Women's Changing Position in Bangladesh Tribute to Begum Rokeya,* Adorn Books, Dhaka, 2014

Engels, Dagmar *Beyond Purdah? Women in Bengal 1890-1939*, Oxford University Press, New Delhi, 1996

Forbes, Geraldine *Women in Colonial India: Essays on Politics, Medicine and Historiography,* D C Publishers, New Delhi, 2005

Woman in Modern India, The New Cambridge History of India, Vol. 2, Cambridge University Press, New Delhi, 2000

Fuller, Margaret *Woman in the Nineteenth Century, Brown*, Taggard and Chase, Boston, 1860 (Originally Published in 1845)

Goodall, Norman *A History of the London Missionary Society, 1895-1945*, Oxford University Press, London, 1954

Gohain, Hiren, *The Idea of Popular Culture in the Early Nineteenth Century*, Calcutta, 1991

Hashmi, Taj *Women and Islam in Bangladesh*, Palgrave Macmillan, New York, 2000

Hossain, Anowar *Muslim Women's Struggle for Freedom in Colonial Bengal (1873-1940)*, Progressive Publishers, Kolkata, 2003

Hussain, Shahanara *The Social Life of Women in Early Medieval Bengal*, Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka, 1985

Joarder, Hasina & Joarder, Safiuddin Begum Rokeya : The Emancipator, Nari Kalyan Sangstha, Dhaka, 1980

Kaur, Manmohan *Women in India's Freedom Struggle*, Sterling Publishers Private Limited, New Delhi, 1992

Kelly, Joan *Women, History and Theory*. Chicago University Press, Chicago, 1984

Kopf, David *The Brahmo Samaj and the Shaping of the Modern Mind*. Princeton University Press, Princeton, 1979

Kumar, Radha *History of Doing: An Illustrated Account of Movement for Women's Rights and Feminism In India, 1800-1990*, New Delhi, 2002

Lahiri, Prodip Kumar *Bengali Muslim Thought, 1818-1947*, K.P Bagchi, Calcutta, 1984

Larid, M. A *Missionaries and Education in Bengal*, Oxford University Press, London

Majumder, J.K, *Raja Rammohun Roy and Progressive Movements in India*, The Author, Calcutta, 1941

Majumdar, Vina (ed.), *From Pardah to Modernity*, New Delhi, 1976

Mallick, A. R. *British Policy and the Muslims in Bengal, 1757-1856*, Asiatic Society of Pakistan, Dhaka, 1961

Mathur, Y. B. *Women's Education in India, 1813-1966*, Asia Publishing House, Bombay, 1981

Mies, Maria. Indian *Women and Patrirchy*, Concept Publishers, New Delhi, 1979

Mollah, M K U *The New Province of Eastern Bengal and Assam* 195-1911, Institute of Bangladesh Studies, Rajshahi University, 1981 London, 1972

Mukherjee, Amitavo *Reforms and Regenerations (1774 -1823) in Bengal*, Calcutta, Rabindra Bharati University 1968.

Mukherjee, Kanak, *Women's Emancipation Movement in India*, National Book Centre, New Delhi, 1989

Murshid, Gulam *Reluctant Debutante Response of Bengali Women to Modernisation*, Sahitya Samsad, Rajshani University, 1983

Nag, Kalidas & Lotika Ghoshe (ed.) *Bethune School & College Centenary Volume 1849 -1949*, Calcutta, 1950

Nurullah, S.A. & Nayek J.P., *History of Education in India*, Bombay, 1951

Omvedt, Gail *Feminism and the Women's Movement in India*, Mimeograph.

Research Centre for Women's Studies, S.N.D.T. Uuniversity, Bombay, 1987

Potts, Deniael — *British Baptist Missionaries in India (1793-1837): The History of Serampore Mission,* Cambridge University Press, 1967

Rahman, A. F. — *The Bengali Muslims and the English Education (1765-1855),* Dacca, 1973

Roy, Bharati (ed) — From the seams of history; Essays on Indian Women; Oxford University press, 1955

Sharma, Usha & Sharma B.M. (eds) — *Women Education in Modern India,* Commonwealth Publishers, New Delhi, 1995

Women Education in British India, Commonwealth Publishers, New Delhi, 1995

Sinha, N.K. — *The Economic History of Bengal Vol -1*, First Edition, 1956, Second edition 1961, Third edition 1965, Reprint 1981, Firma K.L.Pvt. Ltd. Kolkata.

Stark, Herbert Alick, — *Vernacular Education in Bengal from 1813 to 1912,* Calcutta, 1916

আকবর, শ্যামলী — *নারীশিক্ষা: উদ্ভব ও বিকাশ*, ঢাকা ১৪০৫ বাং,

আখতার, সৈয়দা তাহমিনা ও বেগম, জাহানারা আরা

আনিসুজ্জামান — *মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য ১৭৫১-১৯১৮*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৪

বাঙালি নারী সাহিত্যে ও সমাজে, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৩

মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৯

আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ — *আধুনিক শিক্ষা বিস্তারে বাংলার কয়েকজন মুসলিম দিশারী*, ঢাকা, ২০০০

নওয়াব আলী চৌধুরী: জীবন ও কর্ম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮৭

আমিন, সোনিয়া নিশাত — *বাঙলি মুসলিম নারীর আধুনিকায়ন* (অনু. পাপড়ীন নাহার), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০২

(সম্পাদিত), *ঢাকা নগর জীবনে নারী*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০১০

আল মাসুম, মো. আবদুল্লাহ — *ব্রিটিশ আমলে বাংলার মুসলিম শিক্ষা: সমস্যা ও প্রসার*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৮

বাংলা মুসলিম সমাজে আধুনিক শিক্ষার অগ্রগতি, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৭

আলম, তাহমিনা — *বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন: চিন্তাচেতনার ধারা ও সমাজকর্ম*, ঢাকা, ১৯৯২

বাংলার সাময়িকপত্রে বাঙালি মুসলিম নারী সমাজ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৮

আলম, মুহম্মদ শামসুল — রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন জীবন ও সাহিত্যকর্ম, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৯

আহমদ, ওয়াকিল — *উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানের চিন্তা ও চেতনারধারা*, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৩

বাংলার রেনেসাঁ ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, বাতায়ন প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৪

আহমদ, সফিউদ্দন, — *ডিরোজিও জীবন ও সাহিত্য*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৫

আহমেদ, সুফিয়া — *বাংলায় মুসলিম সম্প্রদায় ১৮৮২-১৯১২* (সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ অনুদিত), বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০২

ইউসুফজী,নওশের আলী খাঁন — *বঙ্গীয় মুসলমান*, কলিকাতা, ১৩২১ বঙ্গাব্দ

ইমাম, আখতার *ইডেন থেকে বেথুন*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস, ঢাকা, ১৯৯০

ইসলাম, খোন্দকার সিরাজুল *মুসলিম সাহিত্য -সমাজ: সমাজচিন্তা ও সাহিত্যকর্ম*, সূচীপত্র, ঢাকা, ২০০৬

ইসলাম, জুলফিয়া *সমাজ সংস্কৃতিতে নারী*, বিদ্যা প্রকাশ, ঢাকা, ২০০১

ইসলাম, মাহমুদা *নারী ইতিহাসে উপেক্ষিতা*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০১২

ইসলাম, মুস্তফা নূর উল *সাময়িকপত্রে জীবন ও জনমত*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৭

ইসলাম, সিরাজুল (সম্পা.) *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১*, ৩খণ্ড বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ১৯৯৩

উদ্দীন, মজির *বাংলা সাহিত্যে মুসলিম মহিলা*, দিদার পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ১৯৬৭

কর, রাধাগোবিন্দ *বাংলার নবজাগরণে রামমোহন ও ঠাকুর পরিবার*, ১ম খণ্ড, জিজ্ঞাসা, কলিকাতা, ১৯৯৬

কর, শ্রীবঙ্কবিহারী *পূর্ব্ব বাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত*, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, কলিকাতা, ১৯৫

কাদির, আবদুল (সম্পাদিত) *রোকেয়া রচনাবলী*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৩

কায়সার, শান্তনু *রাজিয়া খাতুন চৌধুরাণী*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৯

খান, আয়াসিন (সম্পা.) *সমকালীন ভাবনায় নারী*, এডুকেশন ফোরাম, কলকাতা, ২০১৫

খানম, মাসুমা *নজরুল চেতনায় নারী ও নারীত্ব*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০১

গঙ্গোপাধ্যায়, প্রভাতচন্দ্র *বাংলার নবজাগরণ*, কলকাতা: সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, ১৯৪৬

গুপ্ত, সুখময় সেন, *বঙ্গদেশ ইংরেজী শিক্ষা ও বাঙ্গালীর শিক্ষা চিন্তা*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ কলিকাতা, ১৯৮৫

গোস্বামী, জয়ন্ত *সমাজচিত্রে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা প্রহসন*, সাহিত্যশ্রী, কলিকাতা, ১৩৮১ বঙ্গাব্দ

ঘোষ, বিনয় *বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ*, ওরিয়েন্ট এণ্ড লংম্যান, কলকাতা, ১৯৮৪

বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা (১৮০০-১৯০০), বুক ক্লাব, কলকাতা, ১৯৬৮

বাংলার নব জাগৃতি, ওরিয়েন্ট লংম্যান লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৯৩

কলকাতা শহরের ইতিবৃত্ত - প্রথম খণ্ড, কলকাতা, ১৯৬২, *সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজ চিত্র ১৮৪০-১৯০৫*, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৬৩

সরকার, সৌমেন্দ্রনাথ *বাঙালি জীবনে বিদ্যাসাগর*, সাহিত্যশ্রী, কলকাতা, ১৯৭৬

বিদ্রোহী ডিরোজিও, বাক্ -সাহিত্য প্রাইভেট লি., কলকাতা, ২০০৫

ঘোষ, সারদা *নারী চেতনা ও সংগঠন: ঔপনিবেশিক বাংলা ১৮২৯-১৯২৫*, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১৩

ঘোষ, সুস্মিতা *বাংলার নারী আন্দোলন এবং শ্রীশ্রী মা সারদা দেবী*, কলিকাতা, ১৯৯৯

ঘোষাল, ধনঞ্জয় (সম্পা.) *নবচেতনায় বঙ্গনারী: প্রাক স্বাধীনতা পর্ব*, আশাদ্বীপ, কলকাতা, ২০১৫

চক্রবর্তী, রতনলাল *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নারী ১৯২১-১৯৫২*, কল্যাণ প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৪

চক্রবর্তী, মনোতোষ, *হিন্দু কলেজ ও উনিশ শতকের বাংলার সমাজ*, সুবর্ণরেখা, কলকাতা, ১৯৯৭

চক্রবর্তী, সম্বুদ্ধ *অন্দরে অন্তরে: উনিশ শতকে বাঙালি ভদ্রমহিলা*, কলকাতা, ২০১০

চক্রবর্তী, সুবোধ (সম্পা. *বিদ্যাসাগর রচনাবলী* (অখণ্ড সংস্করণ), কামিনী প্রকাশালয়, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ: চৈত্র ১৪১৬

চট্টোপাধ্যায়, রত্নাবলী, নিয়োগী, গৌতম (সম্পা.) *ভারত ইতিহাসে নারী*, কে.পি.বাগচী, কলকাতা, ২০০৯

চিত্রাদেব *ঠাকুর বাড়ির অন্দরমহল*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৮০

অন্তঃপুরের আত্মকথা, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৯

চৌধুরী, আনোয়ারা বাহার, *শামসুন্নাহার মাহমুদ*, (১৯০৮-১৯৬৪), ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৭

জামান, লায়লা *দি মুসলমান পত্রিকায় রোকেয়া প্রসঙ্গ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৪

জাহান, মেরিনা *রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন*, পশ্চিমবঙ্গ, বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ১৯৯৮

জেসমিন, সুলতানা *বাংলাদেশের শিক্ষানীতি ও নারীশিক্ষা*, ঐতিহ্য প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৬

দাশগুপ্তা, কমলা *স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী, সংগ্রামী ভূমিকায় দেড়শো বছর*, কলিকাতা, ১৯৬৩

দে, রমাপ্রসাদ, (সম্পা.) *ডিরোজিও*, শশধর প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৮৩

দেবী, শ্রীসুনীতি *শিবনাথ*, পুনমুদ্রণ, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, কলিকাতা, ১৩৯৬ বঙ্গাব্দ

নাসিরউদ্দীন, মোহাম্মদ, *বাংলা সাহিত্য সওগাত যুগ*, ঢাকা: নূরজাহান বেগম কর্তৃক প্রকাশিত ১৯৮৫

নিয়োগী, গৌতম মুখোপাধ্যায়, অরুন্ধতী *তত্ত্ববোধিনী সভার কথা*, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, কলিকাতা, ১৪২৪ বঙ্গাব্দ

নিয়োগী, গৌতম *উনিশ শতকের বাংলা-বাঙ্গালী প্রসঙ্গ: ব্রাহ্মসমাজ*, অভিযান পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১৮

প্রধান, ফরিদা (সম্মাদিত) *বেগম রোকেয়া ও নারী জাগরণ*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রোকেয়া হল, ২০০৫

পারভীন, শাহিদা, *শামসুন্নাহার মাহমুদ ও সমকালীন নারীসমাজের অগ্রগতি*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০১২

ফারুকী, রশীদ আল *নুরুন্নেছা খাতুন বিদ্যাবিনোদিনী*, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৭

ফাল্গুনী, অদিতি *বাংলার নারী: সংগ্রামী ঐতিহ্যের সন্ধানে*, স্টেপস্ টুয়ার্ডস্ ডেভেলপমেন্ট, ঢাকা, ১৯৯৭

বন্দ্যোপাধ্যায়, বজেন্দ্রনাথ (সম্পা.) *সংবাদপত্রে সেকালের কথা*, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মন্দির, কলিকাতা, ১৩৫৯ বঙ্গাব্দ

বঙ্গসাহিত্যে নারী, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৯৫১

বন্দ্যোপাধ্যায়, রণজিৎ *উনিশ শতকে নারী মুক্তি আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য*, পুস্তক বিপনি, কলকাতা, ১৯৯৯

বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীতা *আধুনিকতার অভিমুখে বঙ্গনারী*, অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, কলকাতা, ২০০৫

বসু (রায়), ছবি *বাঙলার নারীর আন্দোলন (সংগ্রামী ভূমিকায় দেড়শ' বছর)*, দে্জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯১২

বসু, পূরবী *বাংলার স্মরণীয় নারী*, অন্যপ্রকাশ, ঢাকা, ২০১৬

বসু, রামদুলাল *বঙ্কিচন্দ্রের সমকালীন গৌণ ঔপন্যাসিকবৃন্দ*, কলকাতা, ১৯৭৪

বসু, স্বপন *উনিশ শতকে বাংলায় নব চেতনা*, পরিবর্ধিত সুবর্ণ সংস্করণ, সুবর্ণ, ঢাকা, ২০১১

বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০১৬

বাংলার নারী আন্দোলন, ছবি বসুর রচনা সংকলন, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৫

(সম্পা.) *উনিশ শতকে স্ত্রী শিক্ষা, দুস্প্রাপ্য গ্রন্থমালা:১*, কলিকাতা, ২০০৫

বসু, স্বপন চৌধুরী ইন্দ্রজিৎ (সম্পা.) *উনিশ শতকের বাঙালিজীবন ও সংস্কৃতি*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০০৩

বাগাল, যোগেশচন্দ্র *বাংলার স্ত্রীশিক্ষা, ১৮০০-১৮৫৬*, বিশ্বভারতীয় গ্রন্থালয়, কলিকাতা, ১৩৫১ বঙ্গাব্দ

বিশ্বাস, দিলীপ কুমার *রামমোহন সমীক্ষা*, সারস্বত লাইব্রেরি, কলকা, ১৯৮৩

বেগম, রওশন আরা *নবাব ফয়জুন্নেসা ও পূর্ববঙ্গের মুসলিম সমাজ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩

বেগম, মালেকা *বাংলার নারী আন্দোলন*, দ্যা ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ২০১০

অগ্নিযুগের দুই বিপ্লবী মৃত্যুঞ্জয়ী রোকেয়া ও প্রীতিলতা, ঐতিহ্য, ঢাকা, ২০০৮

বেগম, মালেকা ও হক, সৈয়দ আজিজুল *আমি নারী: তিনশ বছরের বাঙালি নারীর ইতিহাস*, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ২০০১

বেগম, রেজিনা *রাজনৈতিক আন্দোলনে নারী*, ১৯০৫-৪৭, বেঙ্গল পাবলিকেশন্স লিমটেড, ঢাকা, ২০১৬

বেগম, সালেহা, *পথিকৃৎ মুসলমান নারী*, প্রগতিশীল প্রকাশক, কলকাতা, পৃ. ২০১৩

বেগম, হাসনা *নারীমুক্তি বেগম রোকেয়া এবং অন্যান্য*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৪

ভট্টাচার্য, মীরা সেন শান্তা (সম্পা.) *বেথুন কলেজ শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ, ১৮৭৯-১৯৭৯*, বেথুন কলেজ, কলকাতা, ১৯৮০

ভট্রাচার্য, সূতপা (সংকলিত ও সম্পাদিত) *বাঙালি মেয়ের ভাবনামূলক গদ্য উনিশ শতক*, সাহিত্য অকাদেমি, কলকাতা, ১৯৯৯

ভূঁইয়া, গোলাম কিবরিয়া *বাংলায় মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩

মকসুদ, সৈয়দ আবুল *পথিকৃৎ নারী খায়রুন্নেসা খাতুন*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯২

মজিদ, মোহাম্মদ আবদুল *খানবাহাদুর আহাছানউল্লা: শিক্ষা ও সমাজচিন্তা*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০১২

মজুমদার, রমেশচন্দ্র (সম্পা:) *বাংলাদেশের ইতিহাস*, ২য় খন্ড, (মধ্যযুগ) কলিকাতা, চতুর্থ সংস্করণ, ১৯৮৭, ১৯৯৫

বাংলাদেশের ইতিহাস, তৃতীয় খন্ড, (আধুনিক যুগ), তৃতীয় সংস্করণ, কলিকাতা, ১৯৮১

মঞ্জুর, নূরুল ইসলাম, *রামমোহন রায় ও তৎকালীন বাংলার সমাজ*, সমতট প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯০

মামুন, মুনতাসীর *উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ সাময়িক পত্র (১৮৪৭-১৯০৫)*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৭

উনিশ শতকে পূর্ববঙ্গে ব্রাহ্ম আন্দোলন, অনন্যা, ঢাকা, ২০১৭

মালেক, আব্দুল *বাঙলির সমাজচিন্তায় শিক্ষা প্রসঙ্গ*, বাংলা প্রকাশ, ঢাকা, ২০২২

মাহমুদ, মোশফেকা, *পত্রে রোকেয়া পরিচিতি*, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৯

মাহমুদ, শামসুন নাহার, *রোকেয়া জীবনী*, প্রথম স্কুল সংস্করণ, ঢাকা; শ্রী রমেশচন্দ্র দত্ত মজুমদার, ১৯৫৮

মিত্র, রাধারামণ *কলিকাতায় বিদ্যাসাগর*, বাণী শিল্প, কলিকাতা, ১৯৭৭

মিত্র, সুধীর কুমার *হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গ সমাজ*, কলকাতা, ১৯৬২

মুরশিদ, গোলাম *নারী প্রগতি: আধুনিকতার অভিঘাতে বঙ্গরমণী*, কলকাতা, প্রথম ভারতীয় সংস্করণ, ২০০৮

সংকোচের বিহ্বলতা, আধুনিকতার অভিঘাতে বঙ্গরমণীর প্রতিক্রিয়া ১৮৪৯-১৯০৫, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫

সমাজ সংস্কার আন্দোলন ও বাংলা নাটক, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৮৪

মুখোপাধ্যায়, অমিতা *উনিশ শতকের সমাজ ও সংস্কৃতি*, কলকাতা জেনারেল প্রিন্টার্স, কলকাত, ১৯৭১

মোহন্ত, দীপংকর *লীলা রায় ও বাংলার নারী জাগরণ*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯৯

লীলা নাগ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৯

মৈত্র, জ্ঞানেশ *নারী জাগৃতি ও বাংলা সাহিত্য*, ন্যাশনাল পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৮৭

রহমান, আকিমুন, *বিবি থেকে বেগম বাঙালি মুসলমান নারীর ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৬

রহমান, হাবিব, *বাঙালি মুসলমান সমাজে প্রগতিশীলতা ও রক্ষণশীলতার দ্বন্দ্ব*, কথা প্রকাশ, ঢাকা, ২০১২

রহিম, এম.এ. *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, ১ম খন্ড (১২০৩-১৫৭৬) মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান (অনু.) বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০১

বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, ১৭৫৭-১৯৪৭, আহমদ পাবলিশিং হাউজ, ঢাকা, ১৯৭৬

রায়, অন্নদাশঙ্কর *বাংলার রেনেসাঁস*, কলিকাতা, ১৯৮১

রায়, বিনয়ভূষণ *অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা*, পরিমার্জিত সংস্করণ, নয়া উদ্যোগ, কলকাতা, ২০১৫

রায়, ভারতী (সংকলন ও সম্পাদানা) *বামাবোধিনী পত্রিকা, স্বাধীনতা আন্দোলন এবং বাংলাদেশে নারীজাগরণ*, কলকাতা, ২০১২

নারী ও পরিবার: বামাবোধিনী পত্রিকা, আনন্দ, কলকাতা, ২০১৪

সেকালের স্ত্রীশিক্ষা: বামাবোধিনী পত্রিকা, উইমেন স্টাডিজ রিসার্চ সেন্টার, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ১৯৯৪

রীত, প্রত্যুষকুমার (সম্পা.) *স্ত্রীশিক্ষা ও জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি*, প্রতিভাস, কলকাতা, ২০১৩

শরীফ, আহমদ *বাঙলা, বাঙালী ও বাঙালীত্ব*, অনন্যা, ঢাকা, ২০০৭

সরকার, অজয়েন্দ্রনাথ *উনিশ শতকের সমাজ সংস্কার আন্দোলন ও বাংলা বিতর্ক রচনা*, পুস্তক বিপনি, কলকাতা, ১৯৮২

সরকার, সৌমেন্দ্রনাথ *বাঙালি জীবনে বিদ্যাসাগর*, সাহিত্যশ্রী, কলকাতা, ১৯৭৬

সামন্ত, বসন্তকুমার *হিতকরী সভা: স্ত্রী-শিক্ষা ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ*, সাহিত্যলোক, কলকাতা, ১৯৮৭

সিকদার, সৌরভ *বাংলা ভাষায় নারী শব্দাভিধান*, মাওলা ব্রাদ্রার্স, ঢাকা, ২০০৯

নাসরীন, সালমা (সংকলন)

সিংহ, মঞ্জুশ্রী *ঊনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে বঙ্গমহিলা*, কলিকাতা, ২০০০

সেনগুপ্ত, গীতশ্রী বন্দনা *স্পন্দিত অন্তর্লোক-আত্মচরিতে নারী*, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৯

সেন, দীনেশ চন্দ্র *বৃহৎবঙ্গ*, ২য় খন্ড, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯০

সেন, রঞ্জিত *ভাবিত পুরুষ অ-ভাবিত নারী: নারী প্রশ্নের সেকাল-একাল*, অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০২

সুফী, মোতাহার হোসেন, *বেগম রোকেয়া: জীবন ও সাহিত্য*, ইউনিভার্সিটি প্রেস, ঢাকা, ১৯৮৬

সুলতান, আমিনুর রহমান (সংকলন ও সম্পাদনা) *মাসিক মোহাম্মদী পত্রিকায় রোকেয়া প্রসঙ্গ*, জাগৃতি প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৩

সুলতানা, আরিফা *ঔপনিবেশিক বাংলার নারী*, অবসর, ঢাকা, ২০২৩

সৈয়দ, আবদুল মান্নান, *বেগম রোকেয়া*, আহমদ পাবলিশার্স, ঢাকা, ১৯৮৩

হক, মফিদুল *নারী মুক্তির পথিকৃৎ*, দি ইউনির্ভাসিটি প্রেস লিমিডেট, ঢাকা, ২০১৪

হক, মাহমুদ শামসুল, *বাঙালি নারী: হাজার বছরের বাঙালি নারী*, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা, ২০০০

হাসনাত, আবুল (সম্পাদিত) *নারীর কথা*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০১

হাসান, মোরশেদ শফিউল *বেগম রোকেয়া সময় ও সাহিত্য*, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৯

হোসেন, আনোয়ার, *স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার মুসলিম নারী (১৮৭৩-১৯৪৭)*, পুনর্মুদ্রণ, কলকাতা, প্রগতিশীল প্রকাশক, ২০০৯

হোসেন, দিলওয়ার (সংগ্রহ ও সম্পাদনা) *মোহাম্মদী পত্রিকায় মুসলিম সমাজ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৪

হোসেন, শাহানারা, *ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে বাঙালি মুসলিম নারী রোকেয়ার নারীবাদ ও তার ধারাবাহিকতা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১৪

হোসেন, সেলিনা ও মাসুদুজ্জামান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের নারী ও সমাজ*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৯

৪. নির্বাচিত প্রবন্ধাবলি

ক. ইংরেজি প্রবন্ধাবলি

Amin, Sonia Nishat, “The Early Muslim Bhadramahila: The Growth of Learning and Creativity, 1876-1939”, *From the Seams of History*, 1995

"Rokeya Sakhawat Hossain and the Legacy of Bengal Renaissance", *Journal of Asiatic Society of Bangladesh,* Vol. XXXIV, No. 2, December, 1989

"The New Women in Literature and the Novels of Najibar Rahman and Rokeya Sakhawat Hossain", *In Finite Variety : Women in Society and Literature*, Ferdous Azim and Niaz Zaman (eds.), Dacca: University Press Ltd. 1994

Hossain, Mrs. R. S., "Educational Ideals for the Modern Indian Girls", *The Mussalman*, Vol. XXV, March 5, 1931

Hossain, Sahanara, "Glimpses in the Condition of Bengali Women during the later half of the Nineteenth Century", *The Journal of the Institute of Bangladesh Studies*, University of Rajshahi, Vol. IX and X, 1978-1979

"Karimunnesa Khanam Choudhury- A Notable Bengali Muslim Lady of the 19th century", *The Rajshahi University Studies*, Vol. IX & X, Rajshahi, 1978 and 1979

"Glimpses in the Condition of Bengali Muslim Women, During the later half of the Nineteenth Century: A Study Based on the 406 Bamabodhini Potrika", *The Journal of the Institute of Bangladesh Studies*, Vol. 3, Institute of Bangladesh Studies, Rajshahi, 1978

Minault, Gail, "Purdah Progress: The Beginning of School Education for Indian Muslim Women", *Individuals and Ideals of Modern India, The Extended Family*, South East Asian Book, New Delhi, 1981

Molla, M. K. U., "Women Education in Early Twentieth Century in Bengal", *Bengal Studies*, University of Michigan, 1985

Nayeem, Asha Islam, "Women's Emancipation Through Education in 19th Century Eastern Bengal : Private Enterprise or Government Agency?", *Journal of the Asiatic Society of Bangladesh, (Humanities)*, Vol. 60 No 1, June 2015

"The Attitude Towards Women's Educaton in Eastern Bengal in the Twentieth Century", *Bangladesh Historical Studies*, (Professor Abu Md. Delwar Hossain and others eds.), Vol. XXIII, 2012-14

Qaiyam, M. Nurul, "The Bengali Muslim Press and Education of the Muslim Women in Bengal 1900-1940", *Journal of the Institute of Bangladesh*, Rajshahi University Press, Vol. XIII, 1990

Salik, J. S., "Muslim Girls College-The Purdah Years", *Lady Brabourne College Magazine*, Golden Jubilee Volume, Calcutta, 1989.

খ. নির্বাচিত বাংলা প্রবন্ধাবলি

আহমেদ, আয়েষা, "মুসলিম সমাজে উন্নতির অন্তরায়", *সওগাত*, ভাদ্র, ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ

আলি, নাসির এম., "নারী প্রগতির অগ্রনায়িকা", *মাসিক মোহাম্মাদী*, মাঘ, ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ

আহমেদ, তাহেরুদ্দিন, "স্ত্রীশিক্ষা", *সওগাত*, কার্তিক, ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ

আলি, খোন্দকার আহমেদ, "মুসলিম নারীর শিক্ষা নৈপুণ্য", *আল-ইসলাম*, কার্তিক, ১৩২২ বঙ্গাব্দ

Dhaka University Institutional Repository

আমিন, সোনিয়া নিশাত, "রোকেয়া শাখাওয়াত হোসেন: তাঁর লড়াইয়ের বিভিন্ন পর্যায়", *সেন্ট্রাল স্যোসাল স্টাডিজ পত্রিকা*, সংখ্যা ৩০, ৩১, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৯

বসু, শীলা, "রাজনৈতিক পটভূমিকায় বাংলার মুসলিম নারীশিক্ষার বিকাশ", *ঐতিহাসিক*, এপ্রিল, ১৯৮৮

"বাংলার মুসলিম নারীশিক্ষার বিকাশ (১৯০৫-১৯১৯)", *ইতিহাস অনুসন্ধান*, ৪র্থ খণ্ড, কলকাতা, ১৯৮৯

বেগম, ফিরোজা, "আমাদের শিক্ষার অন্তরায়", *নবনূর*, মাঘ, ১৩১০ বঙ্গাব্দ

"আমাদের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা", *সওগাত*, ভাদ্র, ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ

ভট্টাচার্য, মায়া, "শতাব্দীপূর্বে মুসলিম অন্তঃপুরবাসিনীদের বিদ্যাচর্চা", *বাংলা একাডেমী পত্রিকা*, ঢাকা, ১৯৮৮

দত্ত, অক্ষয়কুমার "হিন্দু স্ত্রীদিগের বিদ্যাশিক্ষা", *বিদ্যাদর্শন*, জুন, ১৮৪২ খ্রিস্টাব্দ

দে, ধূর্জটি প্রসাদ, "বাংলার মুসলমান সমাজে নারীমুক্তি আন্দোলন ও সমাজ সচেতনতা (১৯০০-১৯৩০)", *ইতিহাস অনুসন্ধান*, ২য় খণ্ড, কলকাতা, ১৯৮৯

দেবী, নিস্তারিনী "বিদ্যার সমান বন্ধু নাই", *বামাবোধিনী*, মাঘ, ১২৭৮ বঙ্গাব্দ

দেবী, শ্রী কুলবালা "হিন্দুরমনীর বিদ্যাশিক্ষা ও পরাধীনতা", *বামাবোধিনী*, জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৯ বঙ্গাব্দ

"প্রাচীন ও আধুনিক স্ত্রীশিক্ষার প্রভেদ", *বামাবোধিনী*, শ্রাবণ, ১২৯১ বঙ্গাব্দ

ফজিলাতুন্নেসা, "মুসলিম নারীর শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা", *সওগাত*, অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ

"নারীজীবনে আধুনিক শিক্ষার আস্বাদ", *শিখা*, ঢাকা, ১৩২৮ বঙ্গাব্দ

জমিরুদ্দিন, শেখ, "মুসলিম সমাজে স্ত্রী জাতির প্রতি ভীষণ অত্যাচার", *ইসলাম প্রচারক*, ভাদ্র-আশ্বিন, ১৩১০ বঙ্গাব্দ

খাতুন, শরিফা, "আধুনিক শিক্ষা ও উনিশ শতকের বাংলার নারীসমাজ", *এনামুল হক স্মারক গ্রন্থ*, ঢাকা, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯৮৫

খাতুন, রাজিয়া চৌধুরাণী, "বঙ্গীয় মুসলিম মহিলাগণের শিক্ষার ধারা", *সওগাত*, আষাঢ়, ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ

খাতুন, কাশেমা, "নারীর কথা", *সওগাত*, আষাঢ়, ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ

খাতুন, নুরুন্নেসা, "স্ত্রীজাতির শিক্ষা", সওগাত, ১৩২৬ বঙ্গাব্দ।

খাতুন, বদরুন্নেসা, "স্ত্রীশিক্ষা", *সওগাত*, ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ

খাতুন, আমিনা, "আমাদের অবনতির কারণ", *মাসিক মোহাম্মাদী*, আশ্বিন, ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ

খয়রুন্নেসা, "স্বদেশানুরাগ", *নবনূর*, আশ্বিন, ১৩১২ বঙ্গাব্দ

লোহানী, বেগম ফতেমা, "নারী সমাজের কর্তব্য", *সওগাত*, ভাদ্র, ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ

মুর্শিদ, গোলাম "অন্ধজনে দেহ আলো: বাংলাদেশে স্ত্রীশিক্ষার সূচনা এবং শিক্ষার প্রতি ভদ্রমহিলাদের মনোভাব ১৮৪৯-১৯০৫", *ভাষা সাহিত্য পত্র*, ১৩৮৭ বঙ্গাব্দ

মাহমুদ, শামসুন্নাহার, "মুসলিম বঙ্গে স্ত্রীশিক্ষা", *মাসিক মোহম্মাদী*, কার্তিক, ১৩৪৭ বঙ্গাব্দ

মহালনবিশজা "স্ত্রীশিক্ষা", *বামাবোধিনী*, আশ্বিন, ১২৮৩ বঙ্গাব্দ

মিত্র, নলিনী সুন্দরী "স্ত্রীশিক্ষা" *বামাবোধিনী*, কার্তিক, ১২৯৫ বঙ্গাব্দ

রহমান, মিসেস এম., "পর্দা বনাম প্রবঞ্চনা", সওগাত, ভাদ্র, ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ

রহমান, শেখ আব্দুর, "শিক্ষার ভিত্তি", *আল-ইসলাম*, কার্তিক, ১৩২৬ বঙ্গাব্দ

সরকার, শিপ্রা, "অন্দরমহল থেকে রাজপথ", *আনন্দবাজার পত্রিকা*, মার্চ ৭, ১৯৯০

সিরাজী, ইসমাইল হোসেন, "স্ত্রীজাতির স্বাধীনতা", *আল-ইসলাম*, কলকাতা, ১৩২৩ বঙ্গাব্দ

সুন্দরী, বারদা "স্ত্রীলোকের বিদ্যাশিক্ষার আবশ্যকতা", *বামাবোধিনী*, আষাঢ়, ১২৮২ বঙ্গাব্দ

ইউসুফজাই, নৌসের আলি খান, "একেই বলে কি অবনতি?" *নবনূর*, কার্তিক ১৩১১ বঙ্গাব্দ

জামান, সেলিনা বাহার, "কালান্তরে নারী: নবাব ফৈজুন্নেসার জীবন ও সাহিত্যকর্ম", *সংবাদ পত্রিকা*, ১৩৮৭ বঙ্গাব্দ

আখতার, শিরীন, "ঊনিশ ও বিশ শতকের ষাটের দশক পর্যন্ত পূর্ব বাংলায় নারী শিক্ষা, সাহিত্য চর্চা ও সাংবাদিকতা", *আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ স্মারক বক্তৃতা ২০১৪*, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২৯ নভেম্বর ২০১৪

আহমদ, ওয়াকিল, "বাংলার বিদ্বৎসভা : ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী", *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা*, ৭ম সংখ্যা, জুন ১৯৭৮

খান, মুহাম্মদ জাকারিয়া, "বাংলাদেশের নারী শিক্ষায় জন এলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটারের ভূমিকা", *বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা*, ৩য় সংখ্যা, ঢাকা, পৌষ-চৈত্র ১৩৯৪ বঙ্গাব্দ

পালিত, চিত্তব্রত, "বিপ্লবী লীলারায় ১৯০০-১৯৭০", (আবদুল মমিন চৌধুরী ও শরীফউদ্দিন আহমদ সম্পাদিত), *রাজধানী ঢাকার ৪০০ বছর ও উত্তরকাল*, প্রথম খণ্ড (রাজনীতি সমাজ প্রশাসন), বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০২

ব্যানার্জী, মল্লিকা, "উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে বাংলাদেশে স্ত্রী শিক্ষার বিস্তার সম্বন্ধে দুই একটি ভাবনা", পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, বেথুন কলেজ, কলকাতা, ২০০১

মন্ডল, পলাশ, "ঢাকার 'দীপালি সংঘ' থেকে 'শ্রীসংঘ' : লীলারায়ের (১৯০০-৭০ খ্রিস্টাব্দ) চিন্তা ও কর্মের বিবর্তন", *ইতিহাস সমিতি পত্রিকা*, বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি, সংখ্যা ৩৫-৩৬, ১৪১৯- ১৪২১/মে ২০১৫

সুলতানা, আরিফা, "উনিশ শতকে বাংলায় নারী শিক্ষা", *ইতিহাস সমিতি পত্রিকা*, সংখ্যা ২৫-২৬, বর্ষ ১৪০৫-১৪০৮/ ১৯৯৮-২০০১

হোসেন, সৈয়দ আনোয়ার, "সরোজিনী নাইডু: উপমহাদেশে নারী-আন্দোলন ও ক্ষমতায়নের পথিকৃৎ", *বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা*, পঞ্চাদশ খণ্ড, প্রথম সংখ্যা, জুন ১৯৯৭

অজ্ঞাত লেখক "'স্ত্রীশিক্ষা", *বামাবোধিনী*, অগ্রহায়ণ, ১২৯৯ বঙ্গাব্দ

"'স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি", *বামাবোধিনী*, এপ্রিল, ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দ